



পত্নানুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শ্রীমেবেন্দ্রবিহার বসু ।

“गुताशुनेहं तिष्ठामि गुता मे चोत्तमं गुहम् ।
गुताज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम् ॥
गुता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः ।
अर्द्धमात्राकरा नित्या सानिर्काच्यपदाश्रिका ॥”

गुतामाहात्म्यम्-१-१-८

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু-

প্রণীত

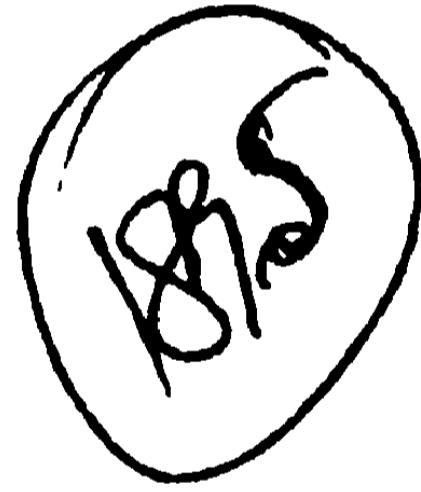
পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমেত :

—*:::~*—

পঞ্চম ভাগ।

তৃতীয় ষটক—প্রথম খণ্ড,

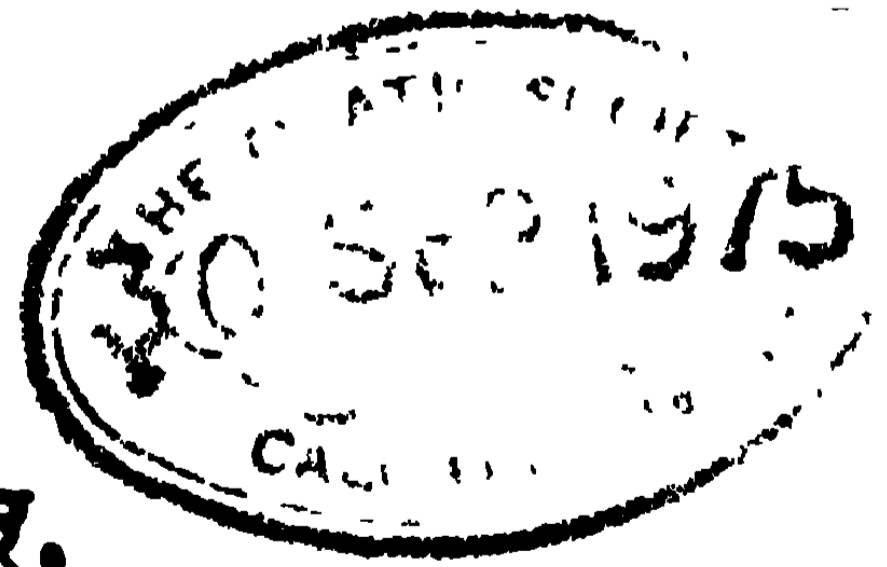
ত্রয়োদশ অধ্যায়।



প্রিন্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী।

মেট্রিক প্রেস,

৭৯ নং বলরাম বে ষ্ট্রীট—কলিকাতা।



প্রকাশক—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু,

দীনধাম, ৬ নং দীনবন্ধু লেন,—কলিকাতা।

[মূল্য,—১১০, ভাল বাঁধাই ২ টাকা।

5
294. 3924
13 575 d
V-5

“समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वरम् ।

विनश्यन्स्विनश्यन्तः यः पशति स पशति ॥

समं पशन् हि सर्वत्र समबहिर्भूतमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यान्नात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥”

(गीता, १७।२९-२८ ।)

Sl-no: 07-5158

বিজ্ঞাপন ।

গীতার পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হইল । ইহাতে গীতার
শাদশ অধ্যায় মাত্র সম্মিলিত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে বাহা
জ্ঞানার্থ, তাহাই বিবৃত হইয়াছে ; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ,
ন-অজ্ঞান, জ্ঞেয় ব্রহ্ম, এবং প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব, এই অধ্যায়ে
বিস্তৃত হইয়াছে । এ সকল তত্ত্ব অতি দুষ্কর ; উপনিষদ,
সমুদ্রদর্শন ও সাংখ্যদর্শন বিশেষভাবে না জানিলে এ
সকল তত্ত্ব বুঝা যায় না । ব্যাখ্যায় এই সকল মূল তত্ত্ব, উপনিষদ
উক্ত দর্শনের সহিত আলোচনা করিয়া, বুঝিতে চেষ্টা
করিয়াছি । এজন্য এ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা বিস্তৃত হইয়াছে ।
যায় যে তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা না বুঝিলে গীতার্থ
স্বতন্ত্ররূপে জানা যায় না । যাহাতে সে অর্থ জানা যায়, তাহার
বিশেষ যত্ন করিয়াছি । ইতি—

1875

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় যশু ।

ডি: ১০
১০৭

দেবধাম, বারাণসী

পঞ্চমী ১৩২৩ সাল,

১৭৭
১৭১৭

वर्दस्तु तं तद्विदस्तु वज्रज्ञानमधरम् ।
ब्रह्मेति परमाश्चेति भगवानिति शक्यते ॥

श्रीमद्भागवत १।२।१३

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

—:0:—

বিষয়-ব্যবচ্ছেদক সূচী ।

—:0:—

বিষয়,

শ্লোকসংখ্যা পত্রিকা ।

অর্জুন কহিলেন,—

পুরুষ-প্রকৃতি কি, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ কি, জ্ঞান-ক্ষেত্র কি ?

হে কেশব ! ইহা জানিতে ইচ্ছা করি । (ক) ৯

ভগবান্ বলিলেন—

“এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে এবং যে ইহার বেত্তা, তাহাকে
ক্ষেত্রজ্ঞ বলে”... (১) ১২

“আর সর্বক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও । ক্ষেত্র-
ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, তাহাই জ্ঞান” ... (২) ১৩

“সেই ক্ষেত্র ষাড়া, যাদৃশ, যে বিকারযুক্ত এবং ষাড়া হইতে ষাড়া
উৎপন্ন এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ ষাড়া, যে বিকারযুক্ত, তাহা
সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে” ... (৩) ১৮

“এই তত্ত্ব ঋষিগণ দ্বারা বিবিধ পৃথক্ ছন্দে ও হেতুমৎ বিনিশ্চিত
ব্রহ্মসূত্রপদে বহুরূপে বিবৃত হইয়াছে” ... (৪) ১০

ক্ষেত্রের স্বরূপ—

পঞ্চ মহাত্মত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চেন্দ্রিয়-গোচর
(স্থলত্মত,) ... (৫) ৮২

বিষয়	শ্লোক	পত্রাঙ্ক ।
ইচ্ছা, ঘেব, সূখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, ধৃতি-ইহাই বিকারসহিত কেন্দ্র, সংক্ষেপে উক্ত হইল (৬)	৮৩	
জ্ঞান ও অজ্ঞান-তত্ত্ব—		
অমানিষ, অমস্তিষ, অহিংসা, কান্তি, ধর্মুতা, আচার্যোপাসনা, শৌচ, স্থিরতা, আত্মবিনিগ্রহা, ... (৭)	১২২	
বিষয়-বৈরাগ্য, অনহঙ্কার এবং জন্ম মৃত্যু জরা, ব্যাধি দুঃখ ও দোষের পর্যালোচন (৮)	১২৪	
পুত্র, দারা গৃহ প্রভৃতিতে অনাসক্তি ও অসঙ্গত, আর ঠষ্ট বা অনিষ্ট-প্রাপ্তিতে সর্বদা সমচিন্ততা, ... (৯)	১২৫	
আমাতে স্নানক্রমোগে একান্ত ভক্তি, চিন্তপ্রসাদকর নির্জন প্রদেশে বাস জন-সংসর্গে বিরাগ, ... (১০)	১২৭	
অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যস্থিতি এবং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন এইগুলি জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, আর যাহা ইহাদের বিপরীত, তাহা অজ্ঞান (১১)	১২৯	

জ্ঞেয় ব্রহ্ম—

ভগবান্ বলিতেছেন,—“যাহা জ্ঞেয় এবং যাহা জ্ঞাত হইলে মোক লাভ করিতে পারা যায়, তাহা বলিতেছি । তাহা অনাদিমং, পরমব্রহ্ম, তাহা সৎ বা অসৎপদ বাচ্য নহেন , (১২)	১৪৫
“ব্রহ্ম সর্বত্র হস্তপদ সর্বত্র অক্ষিরোমুখ :সর্বত্র শ্রুতিমান্, লোকে সমুদয় ব্যাপিরা অবস্থিত আছেন” ... (১৩)	১৮২
“ব্রহ্ম সমুদায় ইন্দ্রিয়গুণের আভাসা অথচ সর্বৈন্দ্রিয়বিবর্জিত ;	

বিষয়	শ্লোক	পত্রিক
তিনি নিঃসঙ্গ অথচ স্বয়ং সকলের আধারভূত এবং নিঃসঙ্গ অথচ গুণভোক্তা” (১৪)		১২১
“ব্রহ্মভূতগণের বাহির ও অন্তর, অচর হইয়াও চর, তিনি সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয়ঃ, দূরস্থ অথচ নিকটস্থ, ... (১৫)		২১৫
“ব্রহ্ম অবিভক্ত হইয়াও সর্বভূতে বিভক্তের ভায় স্থিত ; তিনি ভূতগণের পালনকর্তা গ্রাসকর্তা এবং সৃষ্টি- কর্তা (১৬)		২২৪
ব্রহ্ম সর্বজ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ তমের অতীত তিনিজ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্যরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত (১৭)		২৩৪
“এইরূপে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে উক্ত হইল । আমার ভক্ত হইয়া জানিয়া আমার ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হয় (১৮)		২৭১

প্রকৃতি, পুরুষ-তত্ত্ব—

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই অনাদি ; বিকার এবং গুণপরিণাম সকল প্রকৃতি-সমুহ (১৯)		২৭৬
কার্য-কারণ-কর্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতি হেতু আর পুরুষ স্বধ-হৃৎধের ভোক্তা হইলে বিষয়ে হেতু বলিয়া অভিহিত ... (২০)		৩০০
পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিতে গুণ ভোগ করেন । এই গুণে আসক্তিই পুরুষের সদসদ্বোধনিত্তে জন্মের কারণ (২১)		৩১৮
পুরুষ উপদ্রষ্টা, অসুখমস্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হন । তিনি এই দেহের অতীত (২২)		৩৪৫
যে ব্যক্তি এইরূপে পুরুষকে এবং প্রকৃতিকে গুণের সহিত জানেন, তিনি যে কোনরূপে অবস্থান করিলেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, (২৩)		৩৬৪

বিষয়	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক ।
কেহ ধ্যানদ্বারা আত্ম বলে আত্মদ্বারা আত্মাকে অব- লোকন করেন ; কেহ বা সাংখ্যযোগের দ্বারা কেহ বা কর্মযোগ দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারেন ... (২৪)		৩৭৭
আর অপরে এইরূপে আত্মাকে না জানিয়া অস্ত্রের নিকট শ্রবণ করিয়া উপাসনা করে । সেই সকল শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিও মৃত্যু আতিক্রম করেন ... (২৫)		৩৮৫
ভগবান্ অর্জুনকে বলিলেন, —“হে অর্জুন ! স্থাবর বা অস্থাবর যে কিছু সত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ এই উভয়ের সংযোগ হইতে হয় জানিবে” ... (২৬)		৩৮৯
সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং বিনাশিগণের মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি দর্শন করেন তিনিই দ্রষ্টা (২৭)		৪০৩
সর্বত্র সমবস্থিত ঈশ্বরকে সমভাবে দর্শন করিলে যিনি আত্মার দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না, তিনি তাহার ফলে পরমশান্তি লাভ করেন ... (২৮)		৪২৩
প্রকৃতিই সর্বপ্রকারে সর্ববিধ কার্য সম্পাদন করিতেছেন আত্মা স্বয়ং কিছু করেন না ; যিনি ইহা দর্শন করেন, তিনিই সম্যক্ দ্রষ্টা ... (২৯)		৪৩০
যখন ভূতগণের বিভিন্ন ভাব সকলকে একস্থ এবং সেই এক হইতে অভিব্যক্ত ইহা দর্শন হয়, তখন ব্রহ্মস্ব লাভ হয় (৩০)		৪৩২
অনাদিত্ব হেতু এবং নিগুণত্বহেতু এই অব্যয় পরমাত্মা শরীরস্থ হইয়াও কিছুই করেন না বা কিছুতেই লিপ্ত হন না (৩১)		৪ ৩
যেমন সর্বত্র অবস্থিত আকাশ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ সর্ববিধ দেহে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মা কিছুতেই লিপ্ত হন না ... (৩২)		৪৫৫

বিষয়	শ্লোক	পত্রিক
যেমন একই সূর্য্য এই পৃথক্ পৃথক্ সমুদায় লোককে প্রকাশ করেন, সেইরূপ একই ক্ষেত্রী সমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন (৩৩)		৪৫৮
এইরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের পার্থক্য এবং ভূত প্রকৃতি ও মোক্ষতত্ত্ব জ্ঞানচক্ষু দ্বারা যাঁহারা অবগত হন, তাঁহারা পরম পদ লাভ করেন (৩৪)		৪৬১
ত্রয়োদশ অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব ।		৪৬৮
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-তত্ত্ব		৪৬২
জ্ঞান ও অজ্ঞান		৬৮৩
জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম		৪৮৮
প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব		৫০১

শুদ্ধিপত্র ।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১২	অধ্যায়	অধ্যায়
৪	২০		
১৬	২২	দর্শনের	দর্শনে
৫৪	১৭	পরমায়িক	পারমার্থিক
৭৬	১১	Logvs	Logos
১৭৫	৯	শব্দদ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ	শব্দদ্বারা নির্দেশ
১৭৬	২৫	sproximity	Proximity
১৮৪	২১	ধর্মের	ব্রহ্মের
২৮৪	১০	প্রকৃতি	আকৃতি
২৯০	৬	অতির	অনন্ত
৩৮৭	১	যথার্থ	যাথার্থ্য
৩৮৮	১৮	হইবেনই	হইবেই
৩৯১	২২	জীবের	জীবের
৩৯৪	৪	Nougr	Noughr
৩৯৬	২৪	পুনঃ	পুরুষ
৪০১	২৫	মেনত্রাসে	মেলত্রাসে
৪০৫	১১	নগবাদির	নগরাদির
৪১৭	৩	অজ্ঞ	অজ্ঞাত
৪২৮	২০	due	sum
৪৩৮	২০	মূল্যতত্ত্ব	মূলতত্ত্ব
৪৬৯	২৪	পুরুষতত্ত্ব	অক্ষর-পুরুষতত্ত্ব

୫୧୦	୫	ବ୍ୟାପ୍ତିତତ୍ତ୍ୱକେତ୍ରରୂପ	ବ୍ୟାପ୍ତିକେତ୍ରରୂପ
୫୧୮	୧୨	କ୍ଷୟ	କ୍ଷେୟ
୫୮୫	୧୮	ସୋଗେ	ସୋଗେ
୫୮୮	୨୦	ଅଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ	ଅଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ
୫୦୭	୧୮	କ୍ଷୟ	କ୍ଷୟ
୫୦୮	୨	ସ୍ୱତି	ଅସ୍ୱତି
୫୦୮	୫	କୋନ	କେନ
୫୧୦	୧୨	ଲିଙ୍ଗବଂ	ଲିଙ୍ଗମ୍
୫୨୧	୧୧	ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ	ଅପରିଚ୍ଛିନ୍ନ
୫୨୧	୨୧	ଅଂଶ	ଅଂଶୀ
୫୨୨	୧୫	ଏହି	ବା

—————

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রয়োদশ অধ্যায়—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।



ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।



প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-যোগঃ ।



“ভক্তানাং হ মুক্তাঃ সংসারাদিত্যবা দি যৎ ।
ত্রয়োদশে হ তৎ সিন্ধৌ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্যতে ॥
বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্র প্রকৃতিপুরুষৌ ।
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমৌশ্বরম্ ॥”



গীতার এই ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত শেষ ছয় অধ্যায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । এই অংশে জ্ঞানের বাহা পরম জ্ঞেয়, বাহা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানার্থ, তাহা বিবৃত হইয়াছে । ইহাতে কেন্দ্র-কেন্দ্রজ্ঞতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে । গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে—আত্মতত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বলাভের জন্য যে বিভিন্ন সাধনা, তাহার তত্ত্ব অর্থাৎ কর্মযোগ, কর্মসন্ন্যাসযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ বিবৃত হইয়াছে । মধ্যের ছয় অধ্যায়ে—ঈশ্বরতত্ত্ব এবং তত্ত্বিমার্গে সাধনা-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । আর এই শেষ ছয় অধ্যায়ে—জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব, জীব

জগৎ ও ঈশ্বর তত্ত্ব, এবং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । জ্ঞানের যাহা চরম সীমা—যাহা প্রকৃত বেদান্ত—তাহা এইরূপে বিস্তারিত হইয়াছে । কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে গীতা—“তত্ত্বমসি” এই বেদান্তোক্ত মহাবাক্যের ব্যাখ্যামাত্র । তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায় ‘ত্বম্’ পদার্থ বা আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, মধ্যের ছয় অধ্যায়ে ‘তৎ’ পদার্থ বা ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে “অসি” অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ তত্ত্ব বুবান হইয়াছে । সুতরাং গীতার এই শেষ ছয় অধ্যায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় । এই শেষ ছয় অধ্যায় সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের অভিপ্রায় এস্থলে উল্লিখিত হইল ।—

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

“সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বরের দুই প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে । একটি ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টপ্রকারে ভিন্না সংসারহেতু জন্তু অপরা, আর একটি জীবাত্মতা ক্ষেত্রজ্ঞ-লক্ষণা ঈশ্বরাত্মিকা পরা প্রকৃতি । এই দুই প্রকৃতি দ্বারা ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ হন । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-লক্ষণ প্রকৃতি যের নিরূপণ দ্বারা, সেই দুই প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বরের তত্ত্ব নির্দ্ধারণার্থ এই ক্ষেত্রাধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে । পূর্বাধ্যায়ে ১৩শ হইতে ২০শ শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসীদের নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে । তাঁহারা কিরূপ তত্ত্বজ্ঞানে যুক্ত থাকিয়া উক্তরূপ ধর্মাচরণ দ্বারা ভগবানের প্রিয় হন, এক্ষণ তাহা নির্দ্ধারণার্থ এই অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে ।”

আনন্দগিরি বলিয়াছেন,—

“প্রথম ও মধ্যম ছয় অধ্যায়ে ত্বং ও তৎ পদার্থ উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে বেদান্ত-বাক্যানিষ্ঠ সমাকৃজ্ঞান-প্রধান অস্তিম ছয় অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে ।”

রামানুজ বলিয়াছেন,—

“যে জীবাত্মা ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে, তাহার যথাযথস্বরূপজ্ঞান, পরম প্রাপ্য পরব্রহ্ম বাসুদেবকে পাইবার উপায়,—ভক্তিরূপ উপাসনার অঙ্গ ।

এই যথাযথ স্বরূপজ্ঞান জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ রূপ নিষ্ঠাধ্বন দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে সেই যথাযথ স্বরূপজ্ঞান উক্ত হইয়াছে। মধ্য ছয় অধ্যায়ে, প্রথমতঃ পরম প্রাপ্য ভগবানের ষথার্থ তত্ত্ব ও তাঁহার মাহাত্ম্য জ্ঞানের উল্লেখ করিয়া, ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নিষ্ঠা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাহারা নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যাপেক্ষী এবং আত্মকৈবল্য-মাত্রাপেক্ষী, তাঁহাদিগের পক্ষে ভক্তিযোগ যে তত্পযোগী সাধন, ইহাও উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃতি-পুরুষ ও তৎসংসর্গ রূপ প্রপঞ্চ ও ঈশ্বরের যথার্থ তত্ত্ব, কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ এবং উহাদিগের উপাসনা প্রকার, যাহা প্রথম ও মধ্যের ছয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, তাহাই অন্তিম ছয় অধ্যায়ে শোধিত হইয়াছে। এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেহ ও আত্মার স্বরূপ, দেহ যথাযতঃ কি; উপযুক্তরূপে তাহার প্রদর্শন, দেহবিমুক্ত আত্মাকে কি প্রকারে পাওয়া যায়—তাহার উপায়, এবং যে আত্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে ও যাহার স্বরূপ জ্ঞানগোচর হইয়াছে, উপযুক্তরূপে তাহার প্রদর্শন, তথাবিধ আত্মার আচরণ (বা জড়) সম্বন্ধ হেতু, তদনন্তর বিবেকানু-সন্ধানের প্রকার উক্ত হইয়াছে।”

শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন,—

“সংসার হইতে ভক্তগণের উদ্ধার কর্তা আমি,—এই যে ভগবান্ পূর্বে” বলিয়াছিলেন, তাহার সিদ্ধির জন্ত ত্রয়োদশে তত্ত্বজ্ঞান উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সকল ব্যক্তিকে আমি আঁচরে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি,— ভগবান্ পূর্বে এ প্রাতজ্ঞা করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান বিনা সংসার হইতে উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এজন্ত এহ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ জন্ত প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক অধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে পরা ও অপরা প্রকৃতির কথা উক্ত হইয়াছে। তাহার ষথার্থ তত্ত্ব না জানিয়া জীবভাবা-পন্ন চিদংশের সংসার-গতি হয়। যে প্রকৃতিধ্বন যোগে ঈশ্বর জীবগণের উপভোগার্থ সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ পদবাচ্য

সেই প্রকৃতিধর্মকে পরম্পর হইতে বিভক্ত করিয়া তত্ত্বতঃ নিরূপণজ্ঞ এ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে ।”

বলদেব বলিয়াছেন,—

：“নিকাম কর্ম দ্বারা জীব সম্পর্কে যে জ্ঞান সাধিত হয়, সেই জ্ঞান পরাত্ম-
জ্ঞানের উপযোগী । এজ্ঞ প্রথম ছয় অধ্যায়ে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে ।
মধ্যের ছয় অধ্যায়ে প্রথমে ভগবানের মহিমা উল্লেখ করিয়া ভক্তিমার্গে
পরমাত্মার উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে । জ্ঞানাদি অবিমিশ্র সেই উপাসনা,
ভগবদ্বশ্বতাসাধক বলিয়া, ভগবান্কে পাইবার হেতু । সেই উপাসনা
যখন একান্তিগণের ভাবের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন উক্ত জ্ঞানাদি অবি-
মিশ্র হইয়া ভগবান্কে পাইবার যোগ্য হয় । যোগ ও জ্ঞানের সহিত
সংসৃষ্ট সেই উপাসনা তাঁহার ঐশ্বর্য্যপ্রধান রূপের উপলক্ষি, ও জীবের
মুক্তির কারণ হয়, ইহা কথিত হইয়াছে । এই শেষ ছয় অধ্যায়ে প্রকৃতি
ও পুরুষ ও তৎসংযোগোৎপন্ন জগৎ ও জগতের ঈশ্বরের স্বরূপ এবং কর্ম,
জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ বিবক্ষিত হইয়াছে । জ্ঞানের নিশ্চলতাসাধন জ্ঞ
এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেহ, জীব ও পরমেশ্বরের স্বরূপ বিবেচনীয় ।
দেহাদি হইতে জীবাত্মা পৃথক্ হইলেও জীব যখন দেহের সহিত সম্বন্ধ,
তখন তাহাকে কি প্রকারে সেই পৃথক্ ভাবের অনুসন্ধান করিতে হইবে
তাহাও এ অধ্যায়ে বিবেচ্য ।”

নোলকঠ বলেন,—

“ব্যবহার দশায় জীব ঈশ্বরে যে ভেদ, তাহার নিরসন জ্ঞ এই শেষ ছয়
অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে ।”

হনুমান বলিয়াছেন,—

“ভূমি অপ্ প্রভৃতি অষ্টবিধ অপরা প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তিরূপা, ইহা পূর্বে
প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর ঈশ্বরের স্বরূপভূতা ও জীবভূতা যে পরা-
প্রকৃতি, ইহাও পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । সেই প্রকৃতিধর্ম-

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ রূপ, তাহা ঈশ্বরেরই স্বরূপ, তাহারই যথাবৎ অববোধার্থ এই অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে ।”

বল্লভ-সম্প্রদায় মতে,—

“প্রপঞ্চাদি সর্ব স্বরূপ জ্ঞানের অভাবে ভক্তি কিরূপে হইবে? এইজন্য জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ।”

মধুসূদন বলিয়াছেন,—

“প্রথম ছয় অধ্যায়ে ‘ত্বং’ পদার্থ উক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ‘তৎ’ পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। শেষ ছয় অধ্যায়ে সেই বাক্যার্থনিষ্ঠ সম্যক্ জ্ঞান প্রধানতঃ উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ পূর্বে বলি ‘ছেন, ‘তাহাদিগকে আমি মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করি।’ আত্ম জ্ঞান ব্যতীত সে মুক্তি সম্ভব হয় না। অতএব যেকোন আত্মজ্ঞান দ্বারা মৃত্যুসংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার পরমাত্মার সহিত জীবের অভেদ ভাব জ্ঞানের বিষদীভূত করা যায়। সেই ভেদ—ভ্রম বা অবিদ্যামূলক, তাহাই সকল অনর্থের মূল। তাহা হইতেই সংসারী জীব প্রতিক্ষেত্রে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। অবিদ্যা আত্মার ধর্ম্য নহে। এজন্য সেই অবিদ্যাহেতু জীবের —পরমেশ্বরের সহিত ঐক্যের বাধা হয় না। যখন অবিদ্যা দূর হয়, তখন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ প্রতি ক্ষেত্র হইতে আপনাকে ভিন্ন, এবং সর্ব ক্ষেত্রে তিনি একই ক্ষেত্রজ্ঞ ইহা জানিতে পারেন। এই জ্ঞানেই মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এজন্য এই অধ্যায়ে এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞান বা প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে ।”

কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন,—

“প্রত্যগাত্মার যথাাত্ম্য, এবং সপরিষ্কর জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ-লক্ষণ নিষ্ঠাধর্ম, যাহা পরমেশ্বরপ্রাপ্তির অসাধারণ উপায় ভক্তিযোগের অঙ্গী-ভূত তাহা প্রথম ষট্কে নিরূপিত হইয়াছে। সেই পরম প্রাপ্য

ভগবানের যাথাত্ম্যত্ব ও তাঁহার মাহাত্ম্য ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানসহকারে তাঁহাতে যে অনন্ত ভক্তিযোগ,—তাহা মধ্যম ষট্কে নিরূপিত হইয়াছে। ইদানীং উক্ত দুই ষট্কে উল্লিখিত প্রকৃতি পুরুষ ও পরমাত্মার স্বরূপ স্বভাব সম্বন্ধ যাথাত্ম্য বিবেক এবং তাহার অধিকারী নির্ণয়ার্থ দেবাসুর সম্পদ বিভাগ, শ্রদ্ধা আহার, যজ্ঞ তপঃ দান ত্যাগ, কৰ্ত্তা বুদ্ধি প্রভৃতির গুণভেদ হেতু ত্রিবিধ বিভাগ, দৈবী সম্পদাশ্রিত সাত্ত্বিক অনন্তভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য সম্পন্ন লোকদের পরাভক্তিদ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তি লক্ষণ ও নিরতিশয় অনন্ত ফল নিরূপণার্থ এই শেষ ষট্কে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বে ‘তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ’ এই বাক্য দ্বারা ভগবান্ স্বভক্তগণের উদ্ধার কৰ্ত্তা ইহা বলিয়াছেন। সেই উদ্ধারের উপায়সমাধানার্থ প্রকৃতি পুরুষ-বিবেক প্রদশনার্থ এই ত্রয়োদশ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।”

শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন,—

মুমুক্শুগণের সম্বন্ধে জ্ঞান ঐশ্বর্য্যোপাসনা অবশ্য কৰ্ত্তব্য। মন অশ্রমিত ইত্যাদিরূপ বুদ্ধিভেদ হেতু উপাসকগণের উপাসনা ভেদ হয়, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। যাঁহাদের চিত্ত পরিশুদ্ধ, বিদেহমুক্তির জ্ঞান তাঁহাদের অক্ষর-উপাসনা কৰ্ত্তব্য, ইহা সূচনা করিবার জ্ঞান, শ্রবণাদি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট সাধন প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদনন্তর ব্রহ্মাত্মিকত্ব বিজ্ঞান দ্বারা যাঁহারা অনাত্মবন্ধন বিনিমুক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা জীবন্মুক্ত ব্রহ্মবিদ সৰ্বভূতের অদ্বৈতা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত সাধক, তাঁহাদের যেরূপ সাধনা অনুর্ত্তেয়, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। ইদানীং মোক্ষার্থকামী জিজ্ঞাসুর কিরূপে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বিজ্ঞান হয়, ব্রহ্ম কি, আত্মা কি, অনাত্মা কি, অনাত্মকৃত বন্ধন কিরূপ, কিরূপে জ্ঞানের দ্বারা সে বন্ধন নিবৃত্ত হয়, জ্ঞান কি, জ্ঞানসাধন কি, কিরূপে বা জীবন্মুক্তি হয়.—এই আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ; অনাত্মা-আত্মা বা প্রকৃতি-পুরুষ বিবেচন বিবিধ আত্মার ব্রহ্মৈকত্ব এবং বিবিধ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বৈগুণ্য-জ্ঞান

তৃষ্ণা করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ বিবেচন, প্রকৃতির বন্ধকত্ব, অধ্যাসহেতু
আত্মার বন্ধন, আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব ইত্যাদি প্রতিপাদন জন্ত এই ত্রয়োদশ
অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে ।”

অতএব সকল ব্যাখ্যাকারগণই স্বীকার করেন যে, এই শেষ ছয়
অধ্যায়ে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে । এক অর্থে প্রথম ও মধ্যম ছয়
অধ্যায় তাহার উপক্রমণিকা মাত্র । যাহা হউক, গীতার এই তৃতীয় ষট্কে
সম্যক্ বুঝিতে পারা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার । সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন
সামঞ্জস্য পূর্বক প্রকৃত বেদান্ত জ্ঞান এই ষট্কে উপদিষ্ট হইয়াছে ।
অতএব সাংখ্যদর্শন, বেদান্তদর্শন এবং উপনিষদ্ বিশেষরূপে আয়ত্ত
করিতে না পারিলে, এই ষট্কে বুঝিতে পারা যাইবে না । ইহাতে অতি
সংক্ষেপে মুগ্ধতত্ত্ব সকল বিবৃত হইয়াছে । অতি কঠিন দুর্কোধ্য দার্শনিক
তত্ত্ব, দর্শন শাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রবেশ ব্যতীত আয়ত্ত করা যায় না ।

যাঁহারা মনে করেন যে, গীতা প্রধানতঃ ভক্তিশাস্ত্র, তাঁহাদের মধ্যে
কেহ কেহ বলেন যে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ই গীতার শেষ, গীতার দ্বিতীয় ষট্কেই
গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিযোগ বিবৃত হইয়াছে ।
সুতরাং গীতার তৃতীয় ষট্কে তত প্রয়োজনীয় নহে । তাহাতে যে জ্ঞান
জ্ঞেয় পভূতি বিবৃত হইয়াছে, তাহা ভক্তিসাধনেরই অঙ্গ মাত্র । কেহ
কেহ আরও বলেন যে, এই শেষ ছয় অধ্যায় সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত । এই
মত নিতান্ত অসঙ্গত ও অগ্রাহ্য । শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার অনুবর্তী ব্যাখ্যা-
কারগণ এই ষট্কেই গীতার সার বলিয়াছেন । বৈষ্ণবাচার্য্যগণও এই
তৃতীয় ষট্কেই প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন । গীতোক্ত জ্ঞানযোগ—এই
তৃতীয় ষট্কেই বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে । আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা
করিয়াছি যে, গীতার প্রথমে ‘আত্ম’তত্ত্ব ও আত্মবিজ্ঞান লাভের উপায়
যে কর্মযোগ, কর্মসন্ন্যাসযোগ ও ধ্যানযোগ তাহা বিবৃত হইয়াছে, এবং
গীতার দ্বিতীয় ষট্কে সর্বাঙ্গী সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরতত্ত্ব ও সেই তত্ত্বজ্ঞান

বিজ্ঞান সহিত লাভের প্রধান সাধন যে ভক্তির্যোগ, তাহা বিবৃত হইয়াছে । স্মৃতরাং ষাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত যাহা প্রকৃত জ্ঞানযোগ, যাহা মূলতত্ত্ব—তাহা বিবৃত হয় নাই । ব্রহ্মতত্ত্ব, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব, প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব, পুরুষোত্তমতত্ত্ব, ক্ষর ও অক্ষর পুরুষতত্ত্ব, ত্রিগুণতত্ত্ব, সংসারতত্ত্ব, সংসার মুক্তিতত্ত্ব, এবং যে জ্ঞান দ্বারা এই সকল তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন হয়, সেই জ্ঞানতত্ত্ব—পূর্বে গীতার বিবৃত হয় নাই । এ সকল মূলতত্ত্ব যে শাস্ত্রে বিবৃত না থাকে, সে শাস্ত্র অসম্পূর্ণ । গীতা প্রধান মোক্ষশাস্ত্র । গীতার মূলসূত্র বা মূল প্রতিপাদ্য বিষয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, এবং সেই ব্রহ্মস্বরূপ লাভপূর্বক মুক্তির উপায় বা সাধন—কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগ । ইহাই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় । প্রথম আত্মজ্ঞানলাভ না হইলে, তাহার মধ্য দিয়া ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা নিগুণ অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হইতে পারে না । এজন্ত প্রথম ষট্কে আত্মতত্ত্ব এবং আত্ম জ্ঞান লাভের প্রধান সাধন কর্মযোগ প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে । সেই আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, তাহার পরিণামে যে পরমাত্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান ভক্তির্যোগ সাধন দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা দ্বিতীয় ষট্কে বিবৃত হইয়াছে । সেই আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব উক্তরূপ সাধন দ্বারা লাভ করিলে, যে জ্ঞান সিদ্ধ হয়, ও সেই জ্ঞানে 'জ্ঞেয়' যাহা সেই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, ও তদন্তর্গত ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধতত্ত্ব—এক কথায় যে জ্ঞান মুক্তির উপায়, সেই জ্ঞান এই তৃতীয় ষট্কে বিবৃত হইয়াছে । এই জ্ঞানই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান, ইহাই দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় । জর্মান দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ক্যান্ট্ পরম জ্ঞানের এই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়কে Ideals of Reason বলিয়াছেন । অষ্টেতব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে,—

“জীবতত্ত্বং জগত্তত্ত্বমীশতত্ত্বং তৃতীয়কম্ ।

স্থিতৈকাদশতন্ত্রেষু তত্ত্বদ্যুক্তা নিরূপিতং ॥

পশ্চাদ্ বেদান্ত সদ্যুক্ত্যা অদ্বৈতশ্রুতিমানতঃ ।

অদ্বয়ং ব্রহ্ম সংসিদ্ধং দ্বৈতশ্রাবসরঃ কুতঃ ॥”

অর্থাৎ যে দ্বাদশ প্রকার তত্ত্ব বা দর্শন শাস্ত্র (ছয় আন্তিক দর্শন ও ছয় নাস্তিক দর্শন) আছে, তন্মধ্যে (বেদান্ত ব্যতীত) একাদশ প্রকার তত্ত্বে নিজ নিজ অভিমত যুক্তি অবলম্বন পূর্বক জীবতত্ত্ব জগতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব—এই তিন তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। পশ্চাৎ বেদান্ত দর্শন সদ্যুক্তি ও অদ্বৈত শ্রুতি প্রমাণ হইতে (উক্ত তিন তত্ত্বের সমন্বয়পূর্বক) অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। অতঃপর আর দ্বৈত মতের অবসর নাই।”

অতএব জীবতত্ত্ব জগতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণই সকল দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহার সমন্বয়পূর্বক অদ্বয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণই দর্শনশাস্ত্রের চরম লক্ষ্য। তাহাই বেদান্ত,—তাহাতেই জ্ঞানের পরিসমাপ্তি। গীতার তৃতীয় ষট্কে—এই পরম (Transcendental) জ্ঞান—ও সেই জ্ঞানের জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব ও তদন্তর্গত উক্ত জীবতত্ত্ব সংসারতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই জ্ঞান এই তৃতীয় ষট্কে গীতার সার। ইহা বাদ দিলে গীতার গীতাত্ম থাকে না।

অর্জুন উবাচ ।

প্রকৃতিং পুরুষকৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজমেব চ ।

এতদ্বেদিভুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ (ক)

হে কেশব ! কিবা হয় প্রকৃতি পুরুষ,

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ কিবা, জ্ঞান জ্ঞেয় আর,—

জানিতে এ সব আমি করি অভিলাষ। (ক)

(ক) এই শ্লোক গীতার প্রক্ষিপ্ত । শঙ্করাচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি কোন ব্যাখ্যাকারই ইহা গ্রহণ করেন নাই । যাহা কর্তৃক এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তিনি অদূরদর্শী । তিনি বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ অধ্যায় শেষ হইলে, গীতার বর্ণনীয় বিষয় শেষ হইল । সুতরাং ভগবান্ স্ততঃ প্রণোদিত হইয়া আর ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় তত্ত্ব বুঝাইতে আরম্ভ করিতে পারেন না । অতএব এ সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্ন উপলক্ষেই ভগবানের এই তত্ত্বোপদেশ আরম্ভ হইয়াছে মনে করিতে হইবে । এ কারণ তিনি অর্জুনের মুখে এই প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন ।

কিন্তু পূর্বাপর বিবেচনা করিলে জানা যায় যে, মধ্যের ছয় অধ্যায়ের প্রথমে সপ্তম অধ্যায়ে পরমাত্মাকে আশ্রয় পূর্বক যোগযুক্ত হইলে তাঁহার যে সমগ্রস্বরূপ জানা যায়, সেই সমগ্রস্বরূপ বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে । সেই স্থলে পরমেশ্বরের ছইরূপ প্রকৃতির কথা, এবং তাঁহার স্বরূপের কথা ভগবান্ বলিতে আরম্ভ করেন । সেই প্রশ্ন মধ্যই অর্জুন প্রশ্ন করেন, এবং তাঁহার উত্তরে ভগবান্ অষ্টম অধ্যায়ে অধ্যাত্মাদি ব্রহ্মতত্ত্ব অব্যক্ত তত্ত্ব ও ছইরূপ গতিতত্ত্ব বর্ণনা করেন । পুনরায় নবম অধ্যায়ে ভগবান্ পরমেশ্বরের স্বরূপ তত্ত্ব বা বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান বিবৃত করিতে আরম্ভ করেন তাহা শেষ হইতে না হইতে অর্জুনের প্রশ্নে ভগবান্ দশম ও একাদশ অধ্যায়ে, ঈশ্বরের বিভূতি যোগ বর্ণনা করেন, এবং অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান । পুনর্বার অর্জুনের প্রশ্নে, দ্বাদশ অধ্যায়ে, ছইরূপ উপাসনা প্রণালী ও তাহাদের পার্থক্য এবং শ্রষ্ঠভক্তের লক্ষণ বর্ণন করেন । এজন্ত সপ্তম অধ্যায়ে ও নবম অধ্যায়ে ভগবান্ যে আপনার সমগ্র স্বরূপের বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে প্রশ্ন শেষ হয় নাই ।

ভগবান্ যে সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ — সে তত্ত্ব পূর্বে উক্ত হয় নাই । তিনি যে

ঈশ্বররূপে, সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত সকলের নিয়ন্তা, পরম পুরুষ পরমাত্মারূপে সর্বদোহ অধিষ্ঠিত, তাহা পূর্বে উক্ত হয় না। তাঁহার যে পরম রূপ পরম অক্ষর ব্রহ্ম—তাহা অষ্টম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইলেও সে তত্ত্ব—সে ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্বে বিবৃত হয় নাই। এই সকল তত্ত্ব জানিতে হইলে, যেরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হয় বা যেরূপ অধিকারী হইতে হয়, তাহা পূর্বে উক্ত হয় নাই। পূর্বে যে সপ্তম অধ্যায়ে তাঁহার দুইরূপ প্রকৃতির কথা ভগবান্ বলিয়াছেন, সেই প্রকৃতি তত্ত্বও পূর্বে বিবৃত হয় নাই এবং 'যে দেহীর ও দেহের কথা পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে, সেই দেহী বা ক্ষেত্রজ পুরুষের কথা ও দেহ বা ক্ষেত্ররূপ প্রকৃতির কথা পূর্বে বিস্তারিত হয় নাই। ভগবান্ যে সর্বক্ষেত্র ক্ষেত্রজ, তাহা জানিতে হইলে যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ স্বরূপ—যে প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব জানা প্রয়োজন, তাহা পূর্বে বিশেষ ভাবে বিবৃত হয় না। এ সকল তত্ত্ব না জানিলে সমগ্র পরমেশ্বর তত্ত্ব জানা যায় না। পরমেশ্বরই—'সর্ব' তিনিই সর্বাশ্রয়। তাঁহাকে 'সমগ্র' ভাবে যথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে, এ সকল তত্ত্ব অশুভ জানিতে হয়। পূর্বে এ সকল তত্ত্ব বিবৃত হয় নাই। এজন্য ভগবান্ সেই তত্ত্ব ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রকৃতি-পুরুষ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ, জ্ঞান জ্ঞেয়—এ সকলই পরমেশ্বরের বিভিন্নভাব, সগুণ রূপে তিনি এই সকল ভাবে জগদবস্থায় অভিব্যক্ত (manifest) হন। তাঁহার সমগ্রস্বরূপ বিজ্ঞান সহিত জানিতে হইলে, এ সকলের তত্ত্ব জানা নিতান্ত প্রয়োজন। নতুবা পূর্ণ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। সে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে। এজন্য ভগবান্ এই তত্ত্ব বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই জ্ঞান অর্জুনের কোন প্রশ্নের আবশ্যিক নাই। বোধ হয়, এ প্রশ্ন করিবার অধিকারও অর্জুনের ছিল না।

এই অধ্যায়ে যে সকল তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে

সাংখ্যজ্ঞান প্রসঙ্গে তাহার কতক উল্লেখ আছে । দেহ হইতে দেহী ভিন্ন
ও বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট, সর্ব দেহে দেহী এক, এ সকল কথা 'আভাস' সে
স্থলে দেওয়া আছে মাত্র । তাহা এ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । দ্বিতীয়
অধ্যায়ের শেষ ব্যাখ্যায় যে সকল তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা এখানে
দ্রষ্টব্য ।

—:~:—

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং শরীরং কোশ্চেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্জহীতি তদ্বিদঃ ॥ ১ ॥

—:*~:—

শ্রীভগবান্ ।

এই যে শরীর ইহা হয় হে কোশ্চেয় !

'ক্ষেত্র' নামে অভিহিত ; যে জানে ইহারে

তাহাকে ক্ষেত্রজ্জহীতি কহে তত্ত্ববিদগণ । ১

(১) এই শরীর...ক্ষেত্র—প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—এই প্রকৃতি সকল
প্রকার কার্য, কারণ ও বিষয়রূপে পার্ণত হইয়া থাকে, এবং জীবের ভোগ
ও অপবর্গ সিদ্ধির জন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি আকারে সংহত হয় । সেই
সংঘাতই এই শরীর । এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলা যায় । যাহা দ্বারা
ক্ষত হইতে জ্ঞান পাওয়া যায়, অথবা যাহার ক্ষয় বা ক্ষরণ হয়,
কিংবা যাহাতে বীজ বপন করিলে ফল লাভ হয়, তাহা ক্ষেত্র ।
এই দেহে কৃতকর্মের ফল ভোগ হয়, এইজন্তু এ দেহকে ক্ষেত্র
বলা যায় (শরীর) । আমি দেব, আমি মনুষ্য, আমি স্থল, আমি কুশ,
ইত্যাত্মক, ভোক্তার সমান অধিকরণ দ্বারা প্রতীয়মান, ভোক্তার আশ্রয়

অর্থাৎ ভূত তাহার যে ভোগক্ষেত্র বা ভোগায়তন, সেই শরীরই ক্ষেত্র (রামানুজ) । সংসার-প্ররোহভূমি হেতু ভোগায়তন শরীরই ক্ষেত্র (স্বামী) । ভোক্তা জীবের ভোগ্য সুখদুঃখাদি প্ররোহ-কারণ হেতু এই ইন্দ্রিয়প্রাণাদিবৃক্ত শরীরই ক্ষেত্র, (বলদেব) ।

যাহারা অজ্ঞানী, তাহার আামি জীব, আামি দেব, আামি মানুষ, আামি কুশ বা সুল—ইত্যাদিরূপে দেহাত্মবাদী বা দেহ ও আত্মার অভেদবাদী । তাহার জ্ঞানী—তাহারা শরীরকে আত্মার ভোগায়তন বলিয়া জানেন । (বলদেব) । শ্রীভাগবতে আছে,—

“অদন্তি চৈকং ফলমশ্র গৃধ্রা

গ্রামে চরা একমরণ্যবাসাঃ ।

হংসা য একং বহুরূপমিষ্টৈঃ

মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্ ॥”

(শ্রীবলদেব উক্ত বচন) ।

ক্ষেত্র,—অর্থাৎ সর্ক-উৎপত্তি স্থান, জ্ঞানাদির প্ররোহ স্থান (বলদেব) । কর্তা ও ভোক্তা জীবাশ্রয় স্বয় শুভাশুভ কর্মে ভোগ ও উৎপত্তি স্থান (কেশব) ।

শরীর—যাহা ভোক্তা আত্মা হইতে পৃথক (বিলক্ষণ) প্রতীয়মান হয় (নীর্যতে) তাহাই শরীর (কেশব) । ইহাকে ‘ইদং’ বলা হইয়াছে, কারণ এ শরীর দ্রষ্টার ‘দৃষ্ট’, দ্রষ্টা আত্মা হইতে পৃথক্ (গিরি) ।

এই প্রত্যক্ষ অনুভূয়মান শরীর দ্বারা পুরুষ রাগদ্বेषাদিবৃক্ত হইয়া ক্রমশীল হয়—বা ক্রম স্বভাবযুক্ত হয়, ইহাই আবার, পুরুষের সংসার সম্বন্ধ হেতু, যে দুঃখরূপ ক্ষত হয়, তাহা হইতে ত্রাণের কারণ হয়, ইহা—অর্থাৎ এই শরীর সর্বদা দীপশিখাবৎ স্বয়ং ক্ষীণ হয়, ইহা সুখদুঃখাদি ফলোৎপাদনে ক্ষেত্রবৎ আচরণ করে, এই জন্ত বিদ্বানেরা ইহাকে ক্ষেত্র বলেন (শঙ্করানন্দ) ।

যাহা হউক, এই শরীরকে—অর্থাৎ প্রাকৃত তত্ত্ব হইতে সংহত দেহকে ‘ক্ষেত্র’ নামে অভিহিত করিবার নানা হেতু থাকিলেও, ইহার প্রধান হেতু এই যে, ইহা জীবত্বের উৎপত্তি ও বিকাশ স্থান । বৃক্ষবীজ যেমন ভূমিতে পতিত না হইলে—বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না, জীববীজও সেইরূপ প্রকৃতি গর্ভে উপস্থিত না হইলে জীবত্বের বিকাশ হয় না । পরে চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন যে,—

‘মম যোনি মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥” (গীতা, ১৪।৩)

ভগবানের অংশ—আত্মা রূপ অংশ—জীবলোকে জীবভূত হয় (গীতা, ১৫।৭) । তাহাই জীববীজ । ভগবান্ সেই জীববীজ—মহদ্ব্যোনি বা প্রকৃতির গর্ভে নিষেক করেন । তাহা হইতেই সর্বভূতের উৎপত্তি হয় । অতএব প্রকৃতিই জীবযোনি, তাহা ক্ষেত্র । শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন, প্রকৃতি এবং প্রাকৃত দৃশ্যজাত সমুদায়ই ক্ষেত্র । উপনিষদ্ হইতেও এই অর্থ পাওয়া যায় ।

ক্ষেত্র সম্বন্ধে উপনিষদে আছে—

“যো যোনিং যোনিমাধতিষ্ঠতি একো

বিধানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ ।

* * *

একৈক জালং বহুধা বিকূর্কন্

অস্মিন্ ক্ষেত্রে সংচরত্যেষ দেবঃ ॥”

(ইতি শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৫।২-৩) ।

সুতরাং ক্ষেত্র অর্থে যোনি বা উৎপত্তি স্থান । যাহা হউক, এখানে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জীব-শরীরকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে । শরীরই আমাদের কর্ম্ম ও ভোগাদির উৎপত্তি ও বিকাশ-স্থান । ইহার সাহায্যেই আমরা পুণ্যাদি অর্জন করিয়া দেবাদের পদ ভোগ করি, ও পরিণামে

যুক্তি লাভ করিতে পারি। এই শরীর আমাদের পাপপুণ্যাদি কর্ম ও তাহার ফল সঞ্চয় স্থান বলিয়াও ক্ষেত্র বলা যায়। শ্রুতিতে অগ্রত আছে—
 “ক্ষেত্রং ক্ষেত্রং বৈ মাত্রেয়া সম্প্রস্তুতে।” (নৃসিংহ পূর্ষিতাপনীয় উপনিষদ, ৫।১)।

এই ক্ষেত্রের স্বরূপ পরে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

অভিহিত—ক্ষেত্র তত্ত্বজ্ঞগণের দ্বারা অভিহিত (বলদেব)।

ক্ষেত্রজ্ঞ—এই শরীর রূপ ক্ষেত্রকে জিনি জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এই শরীরকে যিনি নিজ জ্ঞানের বিষয় করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বাভাবিক কিংবা উপদেশ জনিত অনুভবের বিষয় করিয়া থাকেন, দেহ হইতে পৃথক্ ভাবে সেই দেহবেত্তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে (শঙ্কর)। এই শরীর বা ক্ষেত্রকে ‘আমি জানিতেছি’ এইরূপ যিনি জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ (রামানুজ)। এই শরীর বা ক্ষেত্রকে যিনি ‘আমি বা আমার’ বলিয়া মনে করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। ভূমিতে ক্ষেত্রপতি যেমন কাঁচকর্ম্ম দ্বারা তাহার ফল ভোগ করে, শরীর হইতে সেইরূপ ফল ভোগ যিনি করেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ (স্বামী, মধু)। এই শরীরকে, ‘আমি দেব’ ‘আমি মনুষ্য’ ‘আমি স্থূল’ ‘আমি কৃশ’ এই জ্ঞানে অজ্ঞানীরা কখন আপনা হইতে পৃথক মনে করতে পারে না। যে জ্ঞানী অশনাদির গ্রাস শরীরকে আপনা হইতে ভিন্ন এবং আত্মার ভোগ মোক্ষ সাধন বলিয়া জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। যে শরীরাত্মবাদী সে ক্ষেত্রজ্ঞ নহে, তাহার ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হয় নাই (বলদেব)। এই ক্ষেত্রকে যথার্থরূপে যিনি জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ (বল্লভ)। স্বাভাবিক ‘আমি মানুষ’ ইত্যাদি জ্ঞান উপদেশিক। দেহ দৃশ্য বলিয়া দ্রষ্টা আমি দেহ নহি, এই বিভাগ পূর্বক, দেহকে আত্মা হইতে অতিরিক্তরূপে জ্ঞান পারমাধিক (গিরি)। ক্ষেত্রকে আত্মা হইতে পৃথক্ রূপে যিনি জানেন (কেশব)। খেতাখতর উপনিষদে আছে।

প্রধান-ক্ষেত্রজ-পতি স্তূপেশঃ ।” (৬।১৬)—

অর্থাৎ ঈশ্বর প্রধান বা জগতের উপাদানভূত মূল প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ বা জীবাত্মা, এ উভয়ের পতি, এবং স্তূপত্রয়ের নিয়ন্তা ।

স্মৃতিতে আছে—

“ক্ষেত্রানি হি শরীরানি বীজ্ঞানপি শুভাশুভে ।

তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ উচ্যতে ॥”

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেহ ও দেহীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং দেহী যে দেহ হইতে ভিন্ন, এবং দেহের ধর্ম দেহীতে নাই, তাহাও উক্ত হইয়াছে । দেহের অবস্থাস্তর আছে, জন্ম জরা মৃত্যু আছে, দেহীর তাহা নাই । দেহী অবিনাশী, তাহা দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত, দেহী অব্যয়, অপ্রমেয়, ষড়ভাব-বিকার-রহিত, অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকারী, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অদাহ, অশোষা, সর্বদেহে এই দেহী নিত্য, অবধ্য,—ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । এই দেহী ক্ষেত্রজ, আর এ দেহ ক্ষেত্র, ইহা এই অধ্যায়ে এস্থলে উক্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেহীর স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, দেহের স্বরূপ উক্ত হয় নাই । এই অধ্যায়ে সেই দেহী কে, এবং দেহের স্বরূপ কি, তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । এই দেহের তত্ত্ব যে সাংখ্যদর্শন অনুযায়ী, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে । দেহীর স্বরূপ পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর পুনরুক্ত হয় নাই । তবে দেহীর প্রকৃত তত্ত্ব যাহা,—দেহী যে ক্ষেত্রজ এবং সর্বদেহে ভগবান্ই যে ক্ষেত্রজ, ইহাই কেবল এ স্থানে বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে । সাংখ্য দর্শনের ‘বহু’ পুরুষবাদ প্রতিষ্ঠিত । সাংখ্যদর্শনে আছে,—

“জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম ।” (১।১৪৭) ।

কিন্তু গীতা অনুসারে, জীব ভূত বা প্রাণী—ক্ষরপুরুষ রূপে বা প্রতি দেহে ভিন্ন ক্ষেত্রজ রূপে ভগবানের অংশ স্বরূপে বহু হইলেও, সর্বক্ষেত্রে

পরমেশ্বর সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ রূপে, অন্তর্ধ্যামিরূপে, নিয়ন্তুরূপে অবস্থিত । পুরুষ একই তত্ত্ব । অতএব প্রতি ক্ষেত্রে স্বক্ষেত্রজ স্বর পুরুষরূপে ভিন্ন হইলেও, পরমার্থতঃ যে সর্বক্ষেত্রের পরম ক্ষেত্রজ পুরুষ একই, তিনিই যে অবিভক্ত হইয়াও সংসার দশায় বিভক্তের গায়, প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন স্বর পুরুষের গায়—বা ভিন্ন ক্ষেত্রজের গায় ব্যবহারিক ভাবে প্রতীয়মান হন, তাহা এস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে । সাংখ্যদর্শনের বহুপুরুষ-বাদের সহিত বেদান্ত দর্শনের ত্বেত, ত্বেগাত্বেত ও ত্বেত্বেত্ববাদের এইরূপে সামঞ্জস্য হইয়াছে । ইহা পরের শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হইবে ।

গীতা অনুসারে দেহাভিমানী জীবাত্মা—স্বর পুরুষ । কিন্তু পুরুষ স্বরূপতঃ অস্বর, দেহাতিরিক্ত (‘শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত অসৌ পূমান্’— ইতি সাংখ্যদর্শন, ১।১৩৭) কেবল দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ জ্ঞানযুক্ত ‘জ্ঞ’-স্বরূপ জ্ঞের ক্ষেত্রের জ্ঞাতা—দ্রষ্টা । ক্ষেত্রজ পুরুষ—কুটস্থ অস্বর পুরুষ । আর সর্বভূতাত্মভূতাত্মা, সর্বাণ্ডর্যামী সর্বশরীরস্থিত পরমেশ্বর সর্বদেহের এক ক্ষেত্রজ পরমপুরুষ । এ তত্ত্ব পরে (১৫।১৬-১৮ শ্লোকে) উল্লিখিত হইয়াছে । পুরুষের এই তিন ভাব না বুঝিলে পরবর্তী শ্লোক বুঝা যাইবে না । সাংখ্য দর্শনে বহু বক্ত, সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের কথা আছে । কিন্তু নিত্য পরম পুরুষের কথা—সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ সর্বাণ্ডর্যামী সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের কথা—সাংখ্যদর্শনে নাই । পাতঞ্জল-দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে সর্বক্ষেত্রে একই ক্ষেত্রজ, তাহা কোথাও উক্ত হয় নাই ।

এই শ্লোকোক্ত ক্ষেত্রজ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে । অনেক ব্যাখ্যাকারের মতে ইনি দেহাভিমানী জীব—স্বর পুরুষ । কিন্তু বলদেব প্রভৃতির মতে যিনি ক্ষেত্রে জ্ঞানেন, অর্থাৎ ক্ষেত্রের বা দেহের স্বরূপ জ্ঞানেন, এবং আপনাকে সেই ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ । তিনি অস্বর পুরুষ । ইনি ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়াও তাহার

জ্ঞাতা মাত্র । দেহস্থ হইলেও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের অভিমান তাঁহার নাই । তিনি কর্ম করেন না, কর্মের ফল ভোগও করেন না । তিনি 'জ্ঞ'-স্বরূপ, দ্রষ্টা মাত্র ।

কিন্তু সেই দ্রষ্টা পুরুষই সাংখ্যমতে জ্ঞান হেতু প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়া জীব ভাবাপন্ন হন, আপনাকে কর্তা ভোক্তা শরীরী মনে করেন । সাংখ্যমতে যে পুরুষ স্বরূপতঃ মুক্তশুদ্ধবুদ্ধস্বভাব, তিনিই অজ্ঞানবশে আপনাকে বদ্ধ পাপবদ্ধ ও অজ্ঞানী মনে করেন । অতএব সাংখ্যমতে (বদ্ধ) ক্ষর পুরুষই স্বরূপতঃক্ষর পুরুষ । গীতার দেহাভিমানী পুরুষকে 'দেহী' এবং দেহাভিমানশূন্য পুরুষকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও, দেহাভিমানী জীবও, দেহকে আমার বলিয়া অভিমান থাকায় যে আংশিকভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ—ইহা বলিতেই হইবে ।

এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি এই ক্ষেত্রের বেত্তা তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ; ক্ষেত্রবিৎই ক্ষেত্রজ্ঞ । পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিদ্ ধাতুর সাধারণ অর্থ জানা । কিন্তু ইহার বিশেষ অর্থ আছে । বিদ্ ধাতুর অর্থ অনুভব করা । বেদন, বেদনা—বিদ্ ধাতু হইতে এই অর্থে নিস্পন্ন হইয়াছে । এই অর্থে যিনি শরীরযুক্ত বা শরীরবিশিষ্ট হইয়া, আপনাকে দেহী বা শরীররূপে অনুভব করেন, সেই ক্ষেত্রবেত্তাই এই ক্ষেত্রজ্ঞ । তিনি অবিদ্যাবশে আপনার সহিত ক্ষেত্রের তাদাত্ম্য বোধ করিতে পারেন । তিনি দেহাত্ম-জ্ঞানী হইতে পারেন, অথবা জ্ঞান লাভে আপনাকে শরীর বা ক্ষেত্র হইতে অতিরিক্ত তত্ত্বরূপে ধারণা করিতে পারেন । কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন, তিনি ক্ষেত্রের বেত্তা—এবং এজন্য ক্ষেত্রজ্ঞ । অতএব যিনি জ্ঞানলাভ করিয়া আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথকরূপে জানিয়াছেন, তিনিই যে কেবল ক্ষেত্রজ্ঞ তাহা বলা যায় না । সাধারণ অর্থে দেহরূপ পুরে অবস্থিত পুরুষমাত্রই ক্ষেত্রজ্ঞ । দেহ-বদ্ধ পুরুষ ও দেহাভিমান-যুক্ত পুরুষ উভয়েই ক্ষেত্রজ্ঞ ।

ইংরাজী দর্শনের ভাষায় যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি Subject বা জ্ঞাতা 'অহম্' । আর তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূত বিষয় বা ইদম্ (Immediate object of perception) তাঁহার শরীর । এই শরীরকে অবলম্বন করিয়াই তাহার বেত্তারূপে ক্ষেত্রজ্ঞ আপনাকে 'অহং' ভাবে জানিতে পারেন । শরীররূপ পুরে অবস্থিত বলিয়া তিনি পুরুষ । সাংখ্যদর্শন অনুসারে এই বেত্তের বেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞই যে পুরুষ, তাগা উক্ত হইয়াছে ।

সে তত্ত্ব জ্ঞানীরা—(তদ্বিদঃ) ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিৎ পণ্ডিতগণ, যাহারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে পৃথকভাবে জানেন (শকর) । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেকজ্ঞানী (স্বামী) । ইহারা প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান-সম্পন্ন সাংখ্য পণ্ডিত ।

সাংখ্য দর্শন অনুসারে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয় । সে জ্ঞান সহজে তত্ত্বতঃ লাভ করা যায় না । তাহা বিশেষ সাধনাসাধা । অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই শ্লোকে সংক্ষেপে সাংখ্য জ্ঞান উক্ত হইয়াছে । •

কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন,—প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান দর্শনর্থ এই ত্রয়োদশ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে । পূর্বে ভগবান্ (৭ম অধ্যায় ৪৮ শ্লোকে) আপনার পরা ও অপরা এই দুই প্রকার শক্তিরূপা প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন । সেই অপরা প্রকৃতিই শরীর, আর পরা প্রকৃতি জাত্মা বা জীবাত্মা, তাহাই ক্ষেত্রজ্ঞ । বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ ক্ষেত্রজ্ঞকে পরা প্রকৃত বালন । এ অর্থ সঙ্গত নহে । ক্ষেত্রজ্ঞ—পুরুষ সর্কারূপে পুরুষ । সমস্তায়াং পুরুষ সর্কারূপ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন । এ তত্ত্ব যথাস্থানে বিবৃত হইবে ।

ক্ষেত্রজ্ঞাংপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যত্ত্বজ্জ্ঞানং মত্তং মম ॥ ২

আরও তুমি হে ভারত ! সকল ক্ষেত্রেতে
ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জান । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের
জ্ঞান যাহা তাই জ্ঞান,—আমার এ মত ॥ ২

(২) সকল ক্ষেত্রেতে ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জান—
পূর্ব শ্লোকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান যথেষ্ট নহে । যে ক্ষেত্রজ্ঞের
স্বরূপ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা যে আমি অর্থাৎ অসংসারী পরমেশ্বর,
তাহাও তুমি জান । যাহা ব্রহ্মা হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত অনেক শরীরে নানা
উপাধি দ্বারা বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান, তাহা বাস্তবক সকল প্রকার
উপাধির সহিত অসংসৃষ্ট ; সূত্রাং উপাধিকৃত ভেদ-বিরহিত । এবং
সৎ বা অসৎ এরূপ কোন শব্দজনিত প্রতীতির অবিষয় (শব্দর) ।
দেব-মনুষ্যানি সমক্ষেত্রে একান্ত বেদিতা ক্ষেত্রজ্ঞ যে মদাত্মক বা আমার
স্বরূপ, ইহা জানিও । মূল শ্লোকে ‘অপিচ’ (আরও) এই শব্দ আছে অর্থাৎ
ক্ষেত্রজ্ঞ যে আমি—ইহাও জানিও । ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ—এক বিশেষণ স্বভাব ।
তাহা সমানাধি করণ দ্বারা নির্দিষ্ট । একত্র উভয়ে পৃথক নহে । আর
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ আমারই বিশেষণ, আমারই সামান্য অধিকরণ রূপে
নির্দিষ্ট । ক্ষেত্রজ্ঞ—বদ্ধ ও মুক্ত । বন্ধাবস্থায় ‘ক্ষর’-শব্দ-নির্দিষ্ট এবং
‘অক্ষর’ শব্দ দ্বারা মুক্তাবস্থা নির্দিষ্ট । এই উভয় ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন
পরব্রহ্ম বাসুদেব—উত্তম পুরুষ । উভয় ক্ষেত্রজ্ঞই ভগবদাত্মস্বভাব
(রামানুজ) । পূর্ব শ্লোকে সংসারী ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে ।
তাহার পারমাথিক অসংসারী স্বরূপ কি, তাহা এ শ্লোকে উক্ত হইল ।
সংসারী জীব বস্তুতঃ পারমাথিক অসংসারি-স্বরূপ সর্বক্ষেত্রানুগত আমিই—
ইহা তুমি জান । ‘তত্ত্বমসি’ এই শ্রুত্যাগলক্ষিত চিন্তনে জীব আমারই
রূপ । আদ্যার্থে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, (স্বামী) । এস্থলে দেহেন্দ্রিয়াদি
হইতে বিলক্ষণ স্বপ্রকাশ ক্ষেত্রজ্ঞের পারমাথিক তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে ।

এস্থলে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের সহিত অসংসারী পরমাঙ্গার ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে । সৰ্বক্ষেত্রে যে এক ক্ষেত্রজ্ঞ স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ নিত্য বিভূ, তাহাতে অবিদ্যারোপিত কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সংসারধর্ম সমুদায় মিথ্যা । সেই অবিদ্যা পরিত্যাগপূর্বক আমাকেই সেই অসংসারী অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান । ক্ষেত্র মায়া-কল্পিত—মিথ্যা, ক্ষেত্রজ্ঞই পরমার্থ সত্য (মধু) । জীবাঙ্গা যে ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । পরমাঙ্গাও যে ক্ষেত্রজ্ঞ এস্থলে তাহা উক্ত হইল । জীব স্বীয় স্বীয় শরীর বা ক্ষেত্রে নিজে নিজে ভোগ ও মোক্ষ সাধন বলিয়া জানে ; এজন্য তাহার ক্ষেত্রজ্ঞ । আর আমি সর্বেশ্বর, একাই সেই সকলকে জানিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করি, ভরণ করি । রাজা যেমন সকল প্রজার ক্ষেত্র জানেন, সেইরূপ সর্বেশ্বর সকল ক্ষেত্র জানেন । তাই তিনিও ক্ষেত্রজ্ঞ (বলদেব) । আমাকে অর্থাৎ আমারই অংশকে সর্বক্ষেত্রে রসানুভব জন্ত আমার স্বরূপে স্থিত বলিয়া জানিও (বল্লভ) ।

পূর্বে শ্লোকে পরম্পর সংসৃষ্ট শরীর ও আঙ্গা বা প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিবেক প্রদর্শিত হইয়াছে । এ স্থলে তাহাদের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, তাহা উক্ত হইতেছে । পূর্বে সাধারণ ভাবে ভগবানের সহিত সমুদায় জগতের সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে । কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ, বিভাগপূর্বক তাহার সহিত ভগবানের সম্বন্ধ উক্ত হয় নাই । পূর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের সহিত জগতের ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে । তিনি সর্বভূতে অবস্থিত, অথচ অবস্থিত নহেন ইত্যাদি বাক্য তাহার প্রমাণ । পূর্বে উপাস্য উপাসক-ভেদও উক্ত হইয়াছে । অতএব পরা প্রকৃতিভূত জীব বা পুরুষ ইত্যাদি শব্দদ্বারা অভিধেয় ক্ষেত্রজ্ঞ উপাসক, আর পরেশ্বর তাহার উপাস্ত,—এই ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে । এস্থলে আবার সেই ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের সহিত ঈশ্বরের অভেদ বা তাদাঙ্গ্য প্রতিপাদিত হইতেছে । এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন সর্বক্ষেত্রে

বা দেব-মনুষ্যাদি সর্বশরীরে আমাকেই ক্ষেত্রজরূপে জান, —মদাত্মকত্ব হেতু অ'মা হইতে অভিন্নরূপে জান । এই শ্লোকে 'চ' শব্দ দ্বারা এই ভেদবাদ ও অভেদবাদ সমন্বিত হইয়াছে (কেশব) ।

ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্যাস্ত সর্বক্ষেত্রে বা শরীরে যিনি ক্ষেত্রজ—অর্থাৎ সেই সেই ক্ষেত্র, তাহার ধর্ম, তাহার কর্ম ও তাহার অবস্থা পড়াতির যিনি জ্ঞাতা, তিনি একও পরিপূর্ণ হইয়াও যেমন ঘটাদির দ্বারা আকাশ ভিন্ন হয়, সেইরূপ স্বয়ং আবিষ্টা দ্বারা আত্মাতে কল্পিত সেই সেই রূপাদি দ্বারা এবং সুখ দুঃখাদি প্রত্যয় দ্বারা বিভক্তের গ্ৰাহ হন ; প্রতি শরীরে 'আমি' রূপ অহং প্রত্যয়ের বিষয়রূপে স্থিত হন, সর্ব প্রত্যয়সমষ্টি প্রত্যগাত্মরূপে সর্বক্ষেত্রের দ্বারা সমাগু বিভক্তবৎ হইয়াও তত্তৎ উপাধি ধর্ম ও কর্মাদি দ্বারা অস্পষ্ট থাকেন,—সেই সেই শব্দ প্রত্যয়ের অগোচর থাকেন । তিনি নিরাকার নির্বিকার, নিরঞ্জন, কূটস্থ, অসঙ্গ, চিৎরূপ আত্মা । আমাকে সেই সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ আত্মা-রূপে জানিও । আমিই সেই সর্বশ্রুতি-প্রসিদ্ধ সত্য-জ্ঞানাদি লক্ষণ । নির্বিশেষে পরম-ব্রহ্ম । সর্বক্ষেত্রে 'অহং' প্রত্যয়রূপে স্থিত আত্মাই ব্রহ্ম (শঙ্করানন্দ) ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের জ্ঞান...তাই জ্ঞান—যেহেতু ঈশ্বরই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ স্বরূপ ও এই দুইয়ের যথার্থ স্বরূপ বাতরেকে অণু কোন জ্ঞানের বিষয় নাই, সেই হেতু এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের জ্ঞান, অর্থাৎ যে জ্ঞানে এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারা যায়, সেই জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান (শঙ্কর) । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের বৈলক্ষণ্য জ্ঞানই মোক্ষহেতু বলিয়া যথার্থ জ্ঞান । যে জ্ঞান মোক্ষের হেতু, তাহাই বিদ্যা বা প্রকৃত জ্ঞান । শাস্ত্রে আছে, “তৎ কর্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা চ মুক্তয়ে ।” (স্বামী) ।

এই ক্ষেত্র মায়াকল্পিত—মিথ্যা, এবং ক্ষেত্রজই পরমার্থ সত্য—এইরূপ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজের জ্ঞানই অবিদ্যাবিরোধী প্রকাশরূপ, মোক্ষহেতু । তাহাই যথার্থ জ্ঞান । অণু জ্ঞান—অজ্ঞান (মধু) । ক্ষেত্রের সহিত উভয়

ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান (বলদেব) । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ লীলার্থ আমারই অংশ এই জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান । ইহার বিপরীত যে জ্ঞান, অর্থাৎ দেহাদি কন্মাদি জন্ম জ্ঞান আর এইরূপ জ্ঞানবানু জীবের যে ক্ষেত্রজ্ঞত্ব জ্ঞান, তাহা মিথ্যা জ্ঞান (বল্লভ) । এই প্রকার যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান তাহাই যথার্থ জ্ঞান, ইহা সর্বজ্ঞ বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ সর্বেশ্বর আমার সম্মত (কেশব) ।

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান কি আর ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে, তাহা এখানে বিশেষ ভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে । এই জ্ঞানই গীতার মূল সূত্র । ইহা না বুঝিলে গীতার্থ বুঝা যায় না । ব্যাখ্যাকারগণ ইহা বিশেষভাবে—বিভিন্নরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ।

এই সকল বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, যাহারা জীবব্রহ্মে একত্ববাদী, তাহারা তদনুসারে জীবকে ও ঈশ্বরকে অভেদভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন । যাহারা ভেদাভেদ-বাদী, তাহারা ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ও ঈশ্বরে ভেদ ও অভেদ সিদ্ধান্ত করেন । আর যাহারা ভেদ-বাদী ও বহুজীব-বাদী, তাহারা পরমেশ্বরকে অন্তর্ধ্যামী নিরন্তর বলিয়া তাহাকে সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন । তাহাদের মতে সকল দেহের জাতৃত্ব ও নিরন্তৃত্ব এক পরমাত্মাতেই সম্ভবে ; একজন্ম তিনি সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ । জীব কেবল নিজ শরীর সম্বন্ধে ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারে । জীবজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন । একজন্ম জীব সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন । জীব ভোক্তা প্রকৃত জ্ঞাতা নহে । পরমেশ্বরই জ্ঞাতার জ্ঞাতা, সর্বসাক্ষী, সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বক্ষেত্রজ্ঞ ।

শ্রুতি প্রমাণ হইতে আমরা প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা ও সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা পরমেশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারি ।

শ্রুতিঅনুসারে দুই পুরুষ শরীরে বাস করেন । একজন দ্রষ্টা আর একজন ভোক্তা । যিনি দ্রষ্টা তিনি ঈশ্বর—আর যিনি ভোক্তা—তিনি ক্ষরপুরুষ—জীবাত্মা । যখন ভোক্তা দ্রষ্টাকে দেখিতে পার, তখন তাহার

মুক্তি হয় । ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূত্রের একবিংশ ধ্যে ও মুণ্ডক উপনিষদের ৩।১।১ মন্ত্রে আছে,—

“দ্বা স্পর্গা সযুজা সখায়া
সমানঃ বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।
তয়োরত্তং পিঙ্গলং স্বাধ্বত্তি
অনশ্বরত্তোহভিচাকশীতি ॥”

মুণ্ডক উপনিষদে (৩।১।২ মন্ত্রে) আছে,—

“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
হনৌশয়া শোচতি মুহমানঃ ।
জুষ্টং যদা পশুত্যাশ্রমীশ-
মশ্রু মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥”

দেহস্থিত এই দুই জন মধ্যে একজন ক্ষর পুরুষ, জীব । আর একজন উত্তম পুরুষ, ঈশ্বর । ইহাই গীতা ও উপনিষদের সিদ্ধান্ত, এতদনুসারে প্রথম শ্লোকোক্ত ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’—জীব । আর এই শ্লোকোক্ত ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’—ঈশ্বর । শ্রুতি অনুসারে দেহ মধ্যে স্থিত দুই তত্ত্ব,—ভৌতিকা (জীব) ও দ্রষ্টা (ঈশ্বর) । এই দেহস্থ দ্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞই নিয়ন্তা, অন্তর্যামী পরম পুরুষ পরমেশ্বর । শ্রুতি অনুসারে তিনিই প্রেরয়িতা ।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে,—

“ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাঅনাবীশতে দেব একঃ ॥” (১।১০)
“ভৌতিকা ভোগ্যং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা
সর্বং প্রোকৃতং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥” (১।১২)

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যদ্বাক্রুতানি মায়ায়া ॥ (১৮।১৬)

এই রূপে শ্রুতি ও গীতা হইতে এই দুইরূপ ক্ষেত্রজ-তত্ত্ব জানিতে পারা যায় । এই দুই ক্ষেত্রজ পুরুষ । জীব ও ঈশ্বর সংসার-দশায় ভিন্ন হইলেও পরমার্থতঃ ভিন্ন নহে । জীব পরমেশ্বরের অংশ হইলেও এবং সংসার-দশায় এই অংশ-অংশী ভেদ থাকিলেও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই ।

গীতা হইতে আমরা এই অর্থে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের, অথবা অভেদবাদ ভেদাভেদবাদ ও ভেদবাদের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই এবং শ্রুতি প্রমাণ সমন্বয় পূর্বক গ্রহণ করিলেও আমরা এই তত্ত্ব জানিতে পারি । সে যাহা হউক, বিভিন্নবাদিগণ এই দুই শ্লোক অবলম্বন করিয়া যেরূপে স্ব স্ব মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমাদের এস্থলে বুঝিতে হইবে ।

পূর্বে বলিয়াছি যে, এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং বলদেব প্রভৃতি দ্বৈতবাদী বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ প্রায়শঃ রামানুজকে অনুসরণ করিয়াছেন । শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইল ।

শঙ্করাচার্য্য বলেন—

“যদি সকল দেহেই এক ঈশ্বর বিद्यমান, তিনি ভিন্ন অণু কোন ভোক্তা নাই—ইহা সিদ্ধান্ত হয়, তবে ঈশ্বরই সংসারী জীব হইয়া পড়েন, অথবা ঈশ্বর ভিন্ন অণু কোন ভোক্তা না থাকায় সংসারের অভাব হয় । তাহা হইলে বন্ধমোক্ষ, এবং মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র ব্যর্থ হয় এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় । কারণ সুখ দুঃখ ও তৎসাধন সংসার প্রত্যক্ষসিদ্ধ । আর জগতের বৈষম্য দেখিয়া, যে এই বিচিত্র সংসারের কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম, এইরূপ অসম্ভব হয়, তাহাও ব্যুৎপন্ন হয় না । জীবাত্মা ও ঈশ্বর একই বস্তু হইলে এ সকল উপপন্ন হয় না ।

“এ আপত্তি হইতে পারে না । জ্ঞান ও অজ্ঞান এবং তাহাদের ফলের

প্রভেদ স্বীকার করিলে ইহা উপপন্ন হইতে পারে । শাস্ত্রে এই জ্ঞান ও অজ্ঞান বা বিদ্যা ও অবিদ্যা এবং ইহাদের ফল যে পরস্পর বিভিন্ন তাহা বিবৃত হইয়াছে । জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান সহিত তাহার কার্য্য বিনাশ করিবার উপদেশও শাস্ত্রে আছে । জ্ঞানে শ্রেয় (মোক্ষ) লাভ হয়, জ্ঞানে আত্মাকে জানিলে মরণ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, জ্ঞানে ভয় দূর হয়, ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মই হয়, আত্মবিৎ সৰ্বস্বরূপ হয়, ইত্যাদি বহু শ্রুতি আছে । স্মৃতিতে ইহার বহু উপদেশ আছে । যুক্তি দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয় ।

“যদি ইহাই সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে, যে জীব সে বাস্তবিক ঈশ্বর হইলেও, অবিদ্যা-কল্লিত যে সকল উপাধি, তাহাদেরই ভেদজন্য যেম সে সংসারী হইয়া থাকে । এই অবিদ্যাবশে আত্মাকে লোকে দেহাদিরূপে বুঝিয়া থাকে । দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে যে আত্ম-ভাব আরোপিত হয়, আত্মা বলিয়া যে ভ্রম হয়, তাহা অবিদ্যার কার্য্য । জরা মৃত্যু, সুখ দুঃখ মোহ অবিদ্যার কার্য্য,—আত্মার ধর্ম্য নহে । শরীর জ্ঞেয়, আত্মা জ্ঞাতা । জ্ঞেয়ের ধর্ম্য ‘জ্ঞাতা’র এবং জ্ঞাতার ধর্ম্য ‘জ্ঞেয়ে’ আরোপিত করা অবিদ্যার কার্য্য । জ্ঞানরূপ আত্মাতে কোন ভেদ বা উপাদেয় কার্য্য থাকিতে পারে না । সুখদুঃখাদি অবিদ্যার কার্য্য, তাহা আত্মার ধর্ম্য হইতে পারে না । দেহের কোন ধর্ম্য আত্মার হইতে পারে না ।

“সেইরূপ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এই দুই প্রকার সংসার—জ্ঞেয় বা জড় বস্তুরূপ ধর্ম্য, তাহা আত্মার ধর্ম্য নহে । অবিদ্যার দ্বারা এই ধর্ম্য জ্ঞাতা আত্মাতে আরোপিত হয় । সুতরাং এই আরোপিত সংসার থাকার, আত্মা কিছুতেই দূষিত হইতে পারে না । অজ্ঞ ব্যক্তি আকাশে ভূতলের মলিনতা আরোপ করিলে, তাহাতে আকাশ মলিন হয় না । তাহা হইলে সকল দেহে সেই একমাত্র জ্ঞাতা ঈশ্বরেরও বাস্তবিক কোন প্রকার সংসারিত্ব থাকিতে পারে না । আবদ্বা দ্বারা আরোপিত ধর্ম্য কাহারও উপকার বা অপকার হয় নী । স্থাপুত (শুক বৃকক্কে) অক-

কারে ভ্রম বশতঃ পুরুষের ধর্ম আরোপিত হইল, সে স্থানু প্রকৃত সেই পুরুষ-ধর্মযুক্ত হয় না ।

“কেহ কেহ বলেন জ্ঞান মরণাদি দেহের ধর্ম বটে, কিন্তু সুখ-দুঃখাদি যখন ‘জ্ঞেয়’, তখন তাহা ‘জ্ঞাতা’ আত্মার ধর্ম । ইহা হইতে পারে না । সুখিও দুঃখিও যখন ‘জ্ঞেয়’, তখন তাহা জ্ঞেয় বস্তুই ধর্ম, জ্ঞাতা আত্মার ধর্ম নহে । কেহ বলেন যে, যখন ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরে অবিদ্যা রহিয়াছে, তখন সংসারিত্বও থাকিবে । তাহাও ঠিক নহে । কারণ অবিদ্যাও তামস—তাহা জড়ের ধর্ম । উহা আত্মার আরোপিত ধর্ম, বাস্তবিক ধর্ম নহে । অবিদ্যা বাস্তবিক জ্ঞাতার ধর্ম হইলে, এবং ঈশ্বরই ক্ষেত্রজ্ঞ হইলে, ঈশ্বরের সংসারিত্ব হইতে পারিত । তাহা নহে । বিপরীত জ্ঞানের কারণ—ইন্দ্রিয়ের দোষ । এই জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয়ের ধর্ম । বিপরীত গ্রহণ, সংশয় ও অগ্রহণ, এই তিন প্রকার অবিদ্যাই কোন না কোন করণের (ইন্দ্রিয়ের) ধর্ম । উহা জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম হইতে পারে না । সুখ দুঃখাদি যাহা কিছু জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা আত্মার ধর্ম হইতে পারে না । যাহা জ্ঞেয় তাহা কখন আপনার দ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারে না, তাহার নিজের প্রকাশের জ্ঞাত আত্মব্যতিরিক্ত প্রকাশের অপেক্ষা করিয়া থাকে । জ্ঞাতা স্বপ্রকাশ, নিজের প্রকাশ জ্ঞাত জ্ঞাত কাহারও বা কিছুই অপেক্ষা রাখে না । একজ্ঞ কৈবল্যে ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ দূর হইলে, আত্মাতে আর কোন প্রকার অবিদ্যা থাকে না,—সুখ দুঃখ থাকে না, কোন পদার্থের সহিত সংযোগ বা বিরোগ ভাব থাকে না । এ সকল আত্মার ধর্ম হইলে কখন বিনষ্ট হইতে পারিত না । * * * এই সকল যুক্তি দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের ঈশ্বর স্বভাব সর্বদাঃ সিদ্ধ হইতেছে ।

“এখন আপত্তি হইতে পারে যে, যদি বাস্তবিক সংসার ও সংসারী জীব :কেহ না থাকে, তবে বন্ধ মোক্ষের ব্যবস্থাপক শাস্ত্র সকলই নিরর্থক । ইহার উত্তর এই যে, যাহারা আত্মার অমরত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন,

তাঁহারা এই শাস্ত্রের এই নিরর্থকত্ব দোষ মানিয়াছেন । ইহাদের মতে মুক্ত আত্মার সম্বন্ধে সংসার ও সংসার-ব্যবহার নিরর্থক । সেইরূপ যাহারা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেও বিধি নিষেধ শাস্ত্র নিরর্থক । দ্বৈতবাদীদের মতে শাস্ত্র বন্ধাবস্থায় সার্থক, মুক্তাবস্থায় নিরর্থক । কারণ, তাঁহাদের মতে আত্মার মুক্ত ও বন্ধাবস্থা—এই দুইটি ষথার্থতত্ত্ব । কিন্তু আত্মার বন্ধ ও মুক্ত এই দুই পরস্পর বিরোধী ভাব যুগগৎ বা পরস্পরক্রমে কিছুতেই হইতে পারে না । বন্ধ ভাব পারমার্থিক মিথ্যা বলিলে, পরমার্থতঃ অদ্বৈতবাদ আসিয়া পড়ে এবং বন্ধমোক্ষাদি শাস্ত্রও, নিরর্থক হয় ।

আরও এক কথা । যদি আত্মার এই বন্ধ ও মুক্ত এই দুই অবস্থা স্বীকার করিতে হয় ; তবে তাহাদের কোন্টি আদি ? যদি বন্ধাবস্থাকে পূর্বসিদ্ধ বা অনাদি, এবং মুক্ত হইলে তাহার অন্ত হয় বলা যায়—তবে যাহা অনাদি তাহার অন্ত আছে—এরূপ কল্পনা করিতে হয় । সেইরূপ যে মুক্তাবস্থা এইরূপে লাভ হয় তাহা ও আদিমতী অথচ অন্তহীন এইরূপ কল্পনা করিতে হয় । এ প্রকার কল্পনা প্রমাণ-বিরুদ্ধ । এই দোষ পরিহারার্থ যদি বলা যায় যে বন্ধমোক্ষাবস্থা পারমার্থিক নহে, তবে দ্বৈতবাদীর মতেও বন্ধমোক্ষাদি শাস্ত্রের অনর্থকত্ব অপরিহার্য্য হয় ।

“যাহা হউক, শাস্ত্র একেবারে নিরর্থক নহে । যাহারা অনাত্মজ, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্র সার্থক । কারণ তাহাদের অবিद्या বশে, কার্য্য ও কারণে আত্মদৃষ্টি থাকে । তাহারা লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে । বিদ্বানের পক্ষে কিন্তু শাস্ত্র নিরর্থক । কার্য্য ও কারণ সম্বন্ধে যাহার আত্মবোধ আছে, সেই বিধি নিষেধ শাস্ত্রের অধিকারী । এই সব সাধারণ লোকের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বোধ থাকে,—শাস্ত্রীয় ব্যবহার কালেও থাকে । শাস্ত্র অনুযায়ী প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কালেও আত্মা হইতে

দেহের পৃথকত্ব জ্ঞান সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কার্য ও কারণে আত্মাভিমান সম্ভব হয় ।

“আপত্তি হইতে পারে যে, বিদ্বান্ লোকই শাস্ত্রীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, ও শাস্ত্রানিষিদ্ধ ব্যাপারে হইতে নিবৃত্ত হয়, অথচ তাহাদের দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য বোধ থাকে । সুতরাং পৃথকত্ব বোধ হইলেই যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হইতে পারে না, এ সিদ্ধান্ত প্রামাণিক নহে । এ আপত্তিও দৃষ্ট নহে । কারণ, এ পৃথকত্ব জ্ঞানের পূর্বেই কার্য ও কারণে আত্মাভিমান ও তাহার ফলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্ভব । সে জ্ঞান হইলে ইহা সম্ভব হয় না ।

“বিহিত কর্মের অনুর্ত্তান ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করিলে, কালক্রমে চিত্তনিকরুহ হইলে, কার্য ও কারণ হইতে আত্মার পৃথকত্ব জ্ঞান হয় । তাহার পূর্বে হয় না । একজ্ঞ অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্র সার্থক । যাহারা কেবল সুলদেহাত্মবাদী,—। দেহান্তে আত্মার অস্তিত্ব মানে না, বিধি নিষেধ শাস্ত্র তাহাদের পক্ষে নিরর্থক । যাহাদের সুলদেহে আত্মদৃষ্টি নাই, অথচ পারলৌকিক আত্মসত্ত্বায় বিশ্বাস আছে, অর্থাৎ যাহার সূক্ষ্ম পারলৌকিক দেহে আত্মদৃষ্টি আছে, সেই শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধের অধিকারী । অন্ত দিকে যাহার জীববন্ধে অভেদ জ্ঞান হইয়াছে, তাহার শাস্ত্রের বিধি নিষেধ নিরর্থক । (এস্থলে জড়বাদী ও ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ জীববন্ধে অভেদবাদী উভয়ের পক্ষেই শাস্ত্র নিরর্থক, ইহা উক্ত হইয়াছে) ।

“যদি বলা যায় যে, যে বিবেকী, সে শাস্ত্র অনুসরণ না করিলে, তাহার দৃষ্টান্তে যে অবিবেকী সেও শাস্ত্র অনুসরণ করিবে না, যথেষ্ট ব্যবহার করিবে । তাহা নহে । এই সকল অবিবেকী লোক রাগ-দ্বেষ-চালিত, প্রবৃত্তিবশে কর্মে রত । (‘স্বভাবস্ত’ প্রবর্ততে—ইতি গীতা) । কাগরও উপদেশ বা দৃষ্টান্তের ইহার অনুবর্তী হইতে পারেনা । আর একপ বিবেকীর সংখ্যাও অতি অল্প । কদাচিৎ কেহ বিবেকী হন । সুতরাং

সাধারণ লোক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অনুবর্তী লোকেরই অনুসরণ করিতে পারে।

“ক্ষেত্রজ্ঞ নিজস্বরূপে সর্বদা এক। সংসার অবিদ্যা-কার্য। সংসার ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না,—মিথ্যাজ্ঞান পরমার্থ বস্তুকে দূষিত করিতে পারে না। যে বিদ্বান্ সে আত্মার অবিকারস্বভাব অনুভব করিয়া থাকে। কোন কার্যফলে তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কোন কার্যে প্রবৃত্তি থাকে না। সুতরাং তাহার সকল প্রকার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আপনিই উপরত হয়। ইহাই নিবৃত্তির অবস্থা।”

“এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যেমন ‘আমি এই’ ‘ইহা আমার’ এই প্রকার ভ্রমে সংসারী জীব পতিত, পণ্ডিতগণও সেই ভ্রমে পতিত। এই ভ্রম কেন হয়? ইহার কারণ সেই সকল পণ্ডিত দেহায়ুদৃষ্টিযুক্ত। যদি তাহারা ক্ষেত্রজ্ঞকে অবিক্রিয় বলিয়া জানিত, তবে কখনই তাহাদের ভোগ ও ভোগ সাধন কর্মের আকাঙ্ক্ষা থাকিত না।”

“সুতরাং ক্ষেত্রজ্ঞ নিজ স্বরূপে সর্বদা এক। তাহার সহিত অবিদ্যা ও তাহার কার্য সংসারের সম্বন্ধ নাই। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ এতন্ম পরমাত্মা। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, ‘আমাকেই সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও।’

“অনেকে এস্থলে অর্থ করিতে পারেন যে, ক্ষেত্রজ্ঞই বাস্তবিক ঈশ্বর, ক্ষেত্র ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, এবং ক্ষেত্র সেই ঈশ্বরেরই জ্ঞানের বিষয়। আমি কিন্তু সুখী দুঃখী—সংসারবদ্ধ জীব। আমি আমার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেও, আমি সর্বক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর নহি। সংসাররূপ দুঃখের উপশম আমারই কর্তব্য। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এ উভয়েই জ্ঞান ও ধ্যান দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার স্বরূপে অবস্থান করিব। এই প্রকার যে বুঝে বা বুঝায়, এবং এইরূপে যে বদ্ধ ও মোক্ষ শাস্ত্রের সার্থকতা সিদ্ধান্ত করিতে চাহে, সে সর্বশাস্ত্রবিৎ হইলেও মূঢ়ের স্থায় উপেক্ষণীয়।

“অতএব ঈশ্বর ক্ষেত্রজ্ঞ হইলে, তিনি সংসারী জীব হইয়া পড়েন—
আর ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরে সংসারের অভাব হইয়া পড়ে—এরূপ আপত্তি
হইতে পারে না। বিদ্যা ও অবিদ্যার বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিলে, এ
আপত্তি নিরস্ত হয়। অবিদ্যার দ্বারা যে দোষ পরিকল্পিত, তাহা দ্বারা
বাস্তবিক বস্তু কিছুতেই দূষিত হয় না। মরীচিকার জলে মরুভূমি পঙ্কিল
হয় না।

“সংসার ও সংসারী বস্তু—উভয়ই অবিদ্যাকল্পিত। তাহাদের বাস্তব
সত্তা নাই। যদি বলা যায় যে, অবিদ্যা সম্বন্ধেই ক্ষেত্রজ্ঞের সংসারিত্ব এবং
দুঃখিত্ব প্রভৃতি ধর্ম হয়.—তাহাও ঠিক নহে। কেন না, পূর্বে উক্ত
হইয়াছে যে, যাহা জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয়, তাহা ক্ষেত্রের ধর্ম, ক্ষেত্রজ্ঞের
ধর্ম হইতে পারে না। আর যদি এই সকল ধর্ম জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞের হইত,
তবে তাহা কখন জ্ঞেয় হইতে পারিত না। যাহা কিছু ‘জ্ঞেয়’ তাহাই
ক্ষেত্র। ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞাতা হইতে পারে, কখন ‘জ্ঞেয়’ হইতে পারে না।
অবিদ্যা হেতু যদি দুঃখিত্ব প্রভৃতি ধর্ম ক্ষেত্রজ্ঞের হইত, তাহা হইলেও
উহা জ্ঞেয় বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইত না। যাহা কিছু জ্ঞেয়, তাহা
ক্ষেত্র। যে জ্ঞাতা সে ক্ষেত্রজ্ঞ,—ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে অবিদ্যা বা
তাহার কার্য বা অবিদ্যার ধর্ম—যাহা কেবল জ্ঞেয়, তাহা ক্ষেত্রজ্ঞের
হইতেই পারে না।

“প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে অবিদ্যা কাহার? এই প্রশ্ন নিরর্থক।
জ্ঞাতার জ্ঞেয়ভূত অবিদ্যার সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ, কোন প্রকারে
বুঝিবার যোগ্যতা নাই। অবিদ্যা কাহারও জ্ঞানের বিষয়রূপে অবশ্য প্রকা-
শিত হইবে। অবিদ্যা ও অবিদ্যার সহিত জ্ঞাতার সম্বন্ধ—ইহাদের গৃহীতাও
—জ্ঞাতা, তাহাকে যে জ্ঞানে প্রকাশ করা যায়, সেই জ্ঞানেরও সম্ভাবনা
থাকে। এরূপ কল্পনা ঠিক নহে। তাহাতে অনবশ্য দোষ হয়। যদি
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে সেই

জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া, আর একজন জ্ঞাতা কল্পনা করিতে হয় । সেই জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ—জ্ঞানের বিষয় হইলে, তাহার আশ্রয় বলিয়া আর একটি জ্ঞাতা কল্পনা করিতে হয় । এইরূপ ভাবে জ্ঞাতৃত্ব কল্পনার শেষ পাওয়া যায় না; সূত্রাং অনবস্থ দোষ হয় । যদি অবিদ্যা কেবল জ্ঞেয়ই হয়, জ্ঞাতার সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে জ্ঞাতা কেবল জ্ঞা গাই হইবে, জ্ঞেয় হইতে পারিবে না । সূত্রাং অবিদ্যা ও তৎকার্য্য দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা কোন প্রকারে দূষিত হইতে পারে না ।

“যদি বলা যায় যে, অবিদ্যা ক্ষেত্রের ধর্ম, তাহা হইলে আত্মাকে দোষযুক্ত ক্ষেত্রের জ্ঞাতা বলিতে হয় । তাহাও বলা যায় না । আত্মা স্বয়ং বিজ্ঞান স্বরূপ, অবিকারী । ক্ষেত্র-বিজ্ঞাতারূপ ধর্ম ও সেই বিজ্ঞানস্বভাব আত্মাতে আরোপিত মাত্র । বাস্তবিক আত্মা বিজ্ঞাতা নহে—উহা বিজ্ঞান স্বরূপ মাত্র । যেমন উষ্ণতা বহির স্বভাব বলিয়া তাপ ক্রিয়া তাহাতে আরোপিত, সেইরূপ আত্মা বিজ্ঞানস্বভাব বলিয়া বিজ্ঞাতৃত্ব আত্মাতে আরোপিত ।

“ভগবান্ ৭ গীতাতে দেখাইয়াছেন যে, আত্মাতে ক্রিয়াকারক ও ফল-স্বরূপতার অভাব স্বতঃসিদ্ধ । আবদ্যাবশে তাহা আত্মাতে আরোপিত হয় । “য এনং বেত্তি হস্তারং” “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণান গুণৈঃ কশ্মাণি সর্গশঃ” “নাদত্তে কশ্চিৎ পাপং” ইত্যাদি স্থলে ইহা দেখান হইয়াছে । যাহা হউক, আত্মাতে ক্রিয়া কারক ও ফল এই ত্রি-বধ উপাধির যদি ঐকান্তিক অভাব হইল, এবং এই সকল যদি অবিদ্যা নিবন্ধন আত্মাতে আরোপিত ইহা সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে, কর্ম সকল অবিদ্যানেই কর্তব্য—হইয়া দাঁড়াইল, বিদ্বানের পক্ষে আর কোন প্রকার কর্ম কর্তব্য থাকিতেছে না । অজ্ঞানারই কর্মে মণিকার (গীতা ১৮.১১ প্র ৮) জ্ঞানের যাগ পরনিষ্ঠা, যাহাতে ব্রহ্মই লাভ হয় তাহা নৈকয়া-নিকি সে অবস্থায় কর্ম থাকে না (গীতা ১৮.৫০ শ্লোক) ।”

একগে রামানুজ ষাহা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে ।
তিনি বলিয়াছেন,—

“ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) বন্ধ ও মুক্ত । বন্ধ জীব—ক্ষর পুরুষ আর মুক্ত
জীব অক্ষর পুরুষ । পরব্রহ্ম বাসুদেব উত্তম পুরুষ । তিনি ক্ষর ও অক্ষর
পুরুষের অতীত (গীতা ১৫।১৬-১৮) । পৃথিব্যাদি সংঘাতরূপ এ জগৎ
ভগবানের শরীর, এজন্ত তাহা ভগবদাত্মক—ভগবৎস্বভাব ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় ব্রাহ্মণে, সপ্তম অধ্যায়ে (৩-২৩ মন্ত্রে)
আছে,—

“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যঃ পৃথিবী ন বেদ যশ্চ পৃথিবী
শরীরং যঃ পৃথিবীং অন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ ।”

“যঃ অপ্সু...অগ্নৌ...অন্তরীক্ষে...বায়ৌ...দিবি...আদিত্যে...দিক্ষু
...চন্দ্রতুরকে...আকাশে...তমসি...তেজসি তিষ্ঠন্...এষ ত আত্মা অন্ত-
র্যামী অমৃতঃ ।” ইতি অধিদৈবতম্ ।

“অধাধিভূতম্ । যঃ সর্কেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্কেষু ভূতেভ্যো অন্তরো
যঃ সর্কানি ভূতানি ন বিদুঃ, যশ্চ সর্কানি ভূতানি শরীরং, যঃ সর্কানি
ভূতানি অন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ ।”

“অথ অধ্যায়ম্ । যঃ প্রাণে...বাচি...চক্ষুষি...শ্রোত্রে...মনসি...হৃদি
...বিজ্ঞানে...রেতসি তিষ্ঠন্...এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ ॥”

“অদৃষ্টো দৃষ্টা, অশ্রুতং শ্রোতা, অমতো মস্তা, অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা,
নান্তোহতোহস্তি দৃষ্টা, নান্তোহতোহস্তি শ্রোতা, নান্তোহতোহস্তি মস্তা,
নান্তোহতোহস্তি বিজ্ঞাতা এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমতোহতো-
হন্যদার্তম্ ।”

“অতএব ভগবান্ অন্তর্যামী বলিয়া সর্ক-ক্ষেত্রজ্ঞদিগের অবস্থান,
তাহার সমান অধিকরণ রূপে ব্যপদ্রষ্ট হইয়াছে । তিনি সর্কক্ষেত্রে
সমুদায় ক্ষেত্রজগণের স্থায় ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।

গীতাতেও আছে—

“অহম্ আত্মা শুড়াকেশ সৰ্বভূতাশয়স্থিতঃ ।” (১০।২০)

“ন তদস্তি বিনা যৎ শ্ৰীং ময়্যা ভূতং চরাচরম্ ।” (১০।৩৯) ।

বিষ্টভ্যাহং ইদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ । (১০।৪২)

“অতএব জগতের অগ্রে, পশ্চাতে ও মধ্যে সৰ্বত্র সমান ভাবে ভগবানের সমান অধিকরণে অধিষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে ।

“এ স্থলে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিবেক বিষয় উক্ত হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে উভয়েই ভগবানের স্বরূপ ভগবানাথক বিষয়, তাহা উক্ত হইয়াছে, এবং ইহাই যে উপদেশ জ্ঞান—ইহা কথিত হইয়াছে ।

“কেহ কেহ বলেন যে, ‘এ স্থলে ‘ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি’ এই উপদেশ দ্বারা সমান অধিকরণতা হেতু একত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে । ঈশ্বরই অজ্ঞান হেতু ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) গ্ৰাম হন । এই অজ্ঞান-নিবৃত্তি জ্ঞানই এই একত্বোপদেশ । ভগবানের এই উপদেশ দ্বারা, রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের গ্ৰাম, ক্ষেত্রজ্ঞ-ভ্রমও নিরাস হয় ।’ ইহাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, এই উপদেশটা ভগবান্ পরমেশ্বর বাসুদেব কি আত্মবাধাত্ম্য সাক্ষাৎপূর্বক অজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়াছেন, কি করেন নাই ? যদি তাঁহার অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তবে নির্বিশেষ চিন্মাত্র-স্বরূপ আত্মাতে, অনাত্ম-স্বরূপের অধ্যাস অসম্ভব, এবং অর্জুন প্রভৃতি ভেদ দর্শন, এবং তাহার প্রতি উপদেশ ব্যাপারও অসম্ভব । আর যদি তাঁহার আত্মসাক্ষাৎকার না হইয়া থাকে, ও অজ্ঞান নিবৃত্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, নিজে অজ্ঞানী হওয়ার তাঁহার আত্মা সম্বন্ধে উপদেশও সম্ভব হয় না । কেন না, জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীই জ্ঞান উপদেশ দিবার অধিকারী (গীতা, ৪।৩৪) । অতএব ইহাদের যে মত, তাহা ভ্রান্ত তাহা অনাকুলিত শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণ ও সদাচার-বিরোধী । ইহা স্ববাক্য-বিরোধী,—স্ববচন স্থাপনের বৃথা আয়াস মাত্র । ইহা অজ্ঞানীদের দ্বারা জগৎমোহনজন্য প্রবর্তিত মাত্র । ইহা অগ্রাহ্য ।

“অতএব প্রকৃত তত্ত্ব কি ? স্বরূপতত্ত্বজ্ঞানিগণের মতে, মূলতত্ত্ব তিন :—(১) অচিৎ বস্তু সকল—ইহারা ভোগ্য, (২) চিৎবস্তু সকল—ইহারা ভোক্তা, আর (৩) পরব্রহ্ম (পরমেশ্বর)—ইনি প্রেরয়িতা মহেশ্বর । এ সম্বন্ধে বহু শ্রুতি আছে । যথা—

“যস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ

ভস্মিং শ্চাত্মো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ।” (শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৪।৯) ।

“মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনস্তু মহেশ্বরম্ ।

তত্শাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সৰ্ব্বমিদং জগৎ ॥” (শ্বেতঃ উপঃ, ৪।১০) ।

“ক্ষরঃ প্রধানং অনৃতাক্ষরং হরঃ

ক্ষরাত্মানাবীশতে দেবঃ একঃ ।” (শ্বেতঃ উপঃ, ১।১০)

“স কারণং করণাধিপাধিপো

ন চাস্ত কশ্চিৎ জনিতা ন চাধিপঃ ।” (শ্বেতঃ উপঃ, ৬।৯)

• “প্রধান-ক্ষেত্রজ-পতি গুণেশঃ

সংসার-মোক্ষঃ স্থিতিবন্ধ-হেতুঃ ।” (শ্বেতঃ উপঃ, ৬।১৬)

“জ্ঞাত্ত্বৌ দ্বাবেতোবীশানীশৌ ।” (শ্বেতঃ উপঃ, ১।৯)

• “নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং

একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।” (কঠঃ উপঃ, ৫.১৩)

• “ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা

সৰ্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ।” (শ্বেতঃ উপঃ, ১।১২)

• “দ্বা সূপর্ণা সমুজ্জা সখায়া

সমান-বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।

তয়োন্ন্যঃ পিপ্পলং স্বাদতি

অনশ্নন্নতোহভিচকশীতি ॥” (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।২১)

• “অজাং একাং লোহিতশুক্কৃষ্ণাং

বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাম্ ।

অজ্ঞো হেকো জুষমাণোহনুশেতে

অহাত্যোনাং ভুক্তভোগাং অজ্ঞোহনুঃ ।” (শ্বেতঃ উপঃ, ৪।৭)

“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-

হনৌশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুষ্টং যদা পশুত্যন্যমীশং

অশ্রু মহিমামিতি বীতশোকঃ ।” (মুক্তক উপঃ, ৩.১।২)

“গৌরনাশ্বস্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী ।” (চুলিকা, ৪।৩।৭)

গীতাতেও এই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে । যথা—

“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অপরেয়ং ইতস্তুগ্ৰাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যস্মেদং ধার্য্যতে জগৎ ॥” (৭।৪-৫) ।

“সৰ্বভূতানি কোশ্বেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।

কল্পক্রে পুনস্তানি কল্পান্তৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥

প্রকৃতিং স্বাং অবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামং ইমং কৃৎস্নং অবশং প্রকৃতেবশাৎ ॥” (৯।৭-৮)

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃষতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কোশ্বেয় জগৎ বিপরিবর্ততে ॥” (৯।১০)

“প্রকৃতিং পুরুষক্ৰেব বিদ্যানাদৌ উভাবপি ।” (১৩।১৯)

“মম যোনিমহদব্রহ্ম তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্ ।

সস্তবঃ সৰ্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥” (১৪।৩)

“এই শেষ শ্লোক হইতে জানা যায় যে, সমস্ত জগতের যোনিভূত মহৎ ব্রহ্মই ভগবানের প্রকৃতি । তাহা সূক্ষ্মভূত—অচিৎবস্তু । তাহাতেই ভগবান্ চেতনাখ্য গৰ্ভ সংযোগ করেন । ভগবানের সেই সঙ্কল্পকৃত চিদ-চিৎ-সংসর্গেই দেবাদি স্থাবরাস্ত অচিৎমিশ্রিত সৰ্বভূতের উৎপত্তি হয় ।

শ্রুতিতেও অধিভূতাদি সূক্ষ্ম বস্তু সকল যে ব্রহ্ম, ইহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে । যথা—

“যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিদ্ যশ্চ জ্ঞানময়ঃ তপঃ ।

তস্মাদ্ তদ্ব্রহ্ম নামরূপং অন্নং চ জায়তে ॥”

(মুণ্ডক উপঃ, ১।১।২) ।

“অর্থাৎ যিনি সৰ্বজ্ঞ, সৰ্ববিদ্, যাহার তপ জ্ঞানময়, তাহা হইতে সেই ব্রহ্ম (বা মহত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ) নামরূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয় ।

“অতএবভোক্তা ও ভোগ্যরূপে সর্বাবস্থায় অবস্থিত চিৎ ও অচিৎ বস্তু পরম পুরুষেরই শরীর, এবং তাহাদের নিয়ন্তাস্বরূপে তাহা হইতে অপৃথক্ভাবে পরমেশ্বর স্থিত । এজন্য তিনি তাহাদের আত্মা । “যঃ পৃথিব্যাস্তিষ্ঠন্” ইত্যাদি (পূর্বোক্ত) শ্রুতিতে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে । সর্বাবস্থায় অবস্থিত চিৎ ও অচিৎ বস্তু পরমেশ্বরেরই শরীর । এজন্য সেই শরীরবৃত্ত পৰম পুরুষ কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থাবৃত্ত জগৎরূপে অবস্থিত । ভগবান্‌ই কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থাবৃত্ত জগৎরূপ । শ্রুতিতেও ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে । “সদেব...সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ং... তদৈক্ষত বহু স্মাং প্রজায়ের” (ছান্দোগ্য ৬।২।২-৩) । “সনুলং সৌম্য ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠা এতদাত্মাঃ ইদং সৰ্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি...” (ছান্দোগ্য ৬।৮।৬...) । ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রতিগাদক । তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১।২।৬) আছে,—

“স অকাময়ত বহু স্মাং প্রজায়ের ইতি । স তপো অতপ্যত স তপ-
স্তপ্তা ইদং সৰ্বং অসৃজত । যদিদং কিঞ্চ তৎ সৃষ্টা তদেব অনুপ্রাশিশৎ ।
‘তৎ’ অনুপ্রাশিশ সচ্চত্যাচ অভবৎ ।...”

“চিৎ অচিৎ বস্তু হইতে পৃথক্ পরম পুরুষের স্বরূপ-বিবেক জন্মও এইরূপ অনেক শ্রুতি আছে । অতএব কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থাবৃত্ত হুল সূক্ষ্ম চিৎ অচিৎ ইহারা পরম পুরুষেরই শরীর । কার্য হইতে কারণ

ভিন্ন নহে । এজন্য কারণ-বিজ্ঞানের দ্বারাই সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় । কার্য কারণাবস্থা সমান অধিকরণ-বিশিষ্ট । পরমাত্মা কারণাবস্থা-বাচক । অতএব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিদচিৎ কার্যকারণ সকলই ব্রহ্ম ।

“জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্ম । উপাদানরূপে সংসৃষ্ট থাকিলেও এবং চিদচিৎ বস্তুর উপাদান হইয়াও, চিদচিৎ বস্তু হইতে ব্রহ্মের স্বভাব পৃথক্ থাকে, সংমিশ্রিত হয় না । যেমন শূক, নীল, পীতাদি বিভিন্ন বর্ণের সূত্র দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রে এই বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণ হয় না—পার্থক্য থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম কারণ অবস্থায় যেমন, কার্যাবস্থায়ও তেমনই ‘সর্বত্র পৃথক্ (অসঙ্কর) থাকেন । ব্রহ্ম চিদচিৎ বস্তু সকলের উপাদান হইলেও জগতের কার্যাবস্থায় ভোক্তৃ, ভোগ্যত্ব ও নিমন্তৃত্ব পরস্পর পৃথক্ ও অসংসৃষ্ট (অসঙ্কর) থাকে । পরম পুরুষ কারণ ও কার্য, তিনি সমুদায় । সর্বাবস্থায় অবস্থিত চিৎ অচিৎ বস্তু সমুদায় তাঁহার শরীর । ইহাই পারমার্থিক তত্ত্ব । এই চিৎ (ভোক্তা), অচিৎ (ভোগ্য) ও পরমেশ্বর (প্রেরয়িতা)-পরস্পরের বিশেষ স্বভাবভেদ ও স্বরূপগত ভেদ আছে । অতএব পরব্রহ্ম কার্যমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও, তাঁহার স্বরূপের অগ্ৰথা-ভাব হয় না, বিকৃতি হয় না । সূক্ষ্মাবস্থায় নামরূপে বিভক্ত চিৎ অচিৎ বস্তু আত্মস্বরূপে অবস্থান করে না । তাহা কার্যরূপেই উপপন্ন হয় । অবস্থান্তর-প্রাপ্তিতেই কার্যত্ব ।

“তবে ব্রহ্ম নিগুণ—ইহার অর্থ কি ? পরব্রহ্মে হেয়গুণের সম্বন্ধ নাই । শ্রুতিতে আছে—

“এষ আত্মা অপহতপাপ্না বিজরঃ বিশোকঃ বিমৃত্যুঃ বিজিঘৎসঃ
অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ ।”— (ছান্দোগ্য উপঃ, ৮।১।৫) ।

অতএব শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পরব্রহ্ম অনন্ত গুণের আকর । তাঁহাতে যে গুণের নিষেধ হইয়াছে, তাহা হেয়গুণের নিষেধ মাত্র ।

“কাহারও মতে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ । তিনি জ্ঞাতা নহেন । এ মত ঠিক নহে । ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, অনন্ত কল্যাণগুণের আকর । পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ হেতু জ্ঞানস্বরূপ । অথচ তিনি সর্বজ্ঞ—সর্ববিদ ।

শ্রুতিতে আছে—

“পরাস্রশক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ।” (শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮)

“অরে বিজ্ঞাতায়ং কেন বিজ্ঞানীয়াৎ ।” (বৃহদারণ্যক ২।৪।১৪)

ইহা দ্বারা পরব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় । শ্রুতিতে যে “সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম” (তৈত্তিরীয় উপঃ ২।১।১) ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা জ্ঞানের ঐক্য নিরূপণার্থ তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে মাত্র ।

শ্রুতিতে আরও আছে যে—

“স অকাময়ত বহু শ্রাং প্রজায়েয় ।” (তৈত্তিরীয়, ২।৬।১)

“য ঐক্ষত বহু শ্রাং প্রজায়েয়...।” (ছান্দোগ্য, ৬।২।৩)

“আত্মনি বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতং ভবতি...।”

(মুণ্ডক ১।১।১২, বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৬) ।

“তস্ম বা এতস্ম মহতো ভূতস্ম নিঃস্বসিতমেতদ্ যদ্

ঋগ্বেদঃ সামবেদঃ...ইত্যাদি ।” (বৃহদারণ্যক, ২।৪।১০) ।

“ব্রহ্মই বস্তু সকল সংকল্প করিয়া, তাহা সৃষ্টি করিয়া, এবং তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া (‘তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ’—ইতি শ্রুতিঃ) বিবিধরূপে স্থিত । চরাচররূপে তিনিই নানা প্রকারে অবস্থিত । এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মাত্মক । নানা বস্তু ভিন্ন ভাবে নানা দর্শন—সেই জন্ত শ্রুতিতে প্রতীতিসিদ্ধ হইয়াছে । (বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৪।৪।১২) আছে,—

“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি য ইহ নানৈব পশুতি । ন ইহ নানাতি কিঞ্চন । যত্র হি দ্বৈতমিষ ভবতি তৎ ইতর ইতরং পশুতি যত্র তু অস্ত সর্বম্ আট্মৈব অভূৎ তৎ কেন কং পশুৎ...ইতি ।”

“অতএব ‘বহু স্রাং প্রজায়ের’ এই শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের স্বয়ং কল্পকৃত নানা নামরূপের দ্বারা যে নানা প্রকারত্ব—তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই। যখন সমুদায়ই আত্মা এই প্রতীতি হয়, তখন এই নানা ত্ব দর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। অতএব যাহারা (যে বিশিষ্টা দ্বৈতবাদীরা) ব্রহ্মের চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই ত্রিবিধ স্বরূপ ভেদ অঙ্গীকার করেন, এবং কার্য ও কারণের অনন্তত্ব স্বীকার করেন, তাহাদের মতের সহিত শ্রুতির কোন বিরোধ নাই। শ্রুতি দ্বারাই এই মত স্থাপিত হয়। অন্য দিকে ব্রহ্মজ্ঞানবাদ, উপাধি-গত ব্রহ্মভেদবাদ যুক্তিযুক্ত নহে, এবং তাহা শ্রুতির বিরোধী। তাহার কোন ভিত্তি নাই।”

ইহাই রামানুজের সিদ্ধান্ত। দ্বৈতবাদী বলদেবও রামানুজকে অনু-সরণ করিয়া, এবং রামানুজের উক্ত পূর্বোক্ত শ্রুতি-বচন অবলম্বন করিয়া অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য তিনি ভেদবাদ-প্রতিপাদক শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যও উক্ত করিয়াছেন। এ স্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নমো-জন। তিনি বলেন—“প্রকৃতি ভোগ্য, জীব ভোক্তা, আর ঈশ্বর নিয়ন্তা। ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ থাকিলেও একের ধর্ম অন্যের হইতে পারে না। পটে চিত্র-সম্বন্ধ থাকিলেও, যেমন পটের ধর্ম চিত্রে, এবং চিত্রের ধর্ম পটে সংক্রামিত হয় না, সেইরূপ জীব, প্রকৃতি ও ঈশ্বর ইহাদের কাহারও ধর্ম অন্যে সংক্রামিত হয় না। যাহারা একাত্মবাদী, তাহাদের মতে—ভগবান্ যে ‘সর্বক্ষেত্রে আত্মাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও’ বলিয়াছেন, তাহা সমান অধিকরণ-প্রতীতিমূলক। অবিদ্যা হেতুই পরমেশ্বরের ক্ষেত্রজ্ঞ-ভাব হয়। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের স্থায় ইহা দ্রাস্তি মাত্র। ইহা নিবৃত্তি জন্ত ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন যে, ‘আমাকে সর্বদেহে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও, আমি ভিন্ন আর কেহ ক্ষেত্রজ্ঞ আছে, ইহা বুঝিও না।’ কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে।”

কেশবাচার্য্য্য ঐতৈত্ত্ববাদ বা ভেদাভেদ বাদ স্থাপন জন্ত এ শ্লোকের
বেরূপ অর্থ করিয়াছেন ও যে বিচার করিয়াছেন, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে
উক্ত হইল ।—

“পূর্ব শ্লোকে পরম্পর সংসৃষ্ট শরীরাত্মভূত প্রকৃতি-পুরুষের ক্ষেত্র-
ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে বিবেক প্রদর্শিত হইয়াছে । এ শ্লোকে এ উভয়ের সহিত
পরমেশ্বরের সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে । পূর্বে নবম অধ্যায়ে “একত্বেন
পৃথক্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সামান্যভাবে সর্ব
জগতের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ প্রকার উক্ত হইয়াছে । কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ
বিভাগ পূর্বক তাহা উক্ত হয় নাই । ইদানীং সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বতাদাত্মা
কথিত হইতেছে ।

“পূর্বে উক্ত হইয়াছে,—

“অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।”

“ময়ি সর্বমিদং শ্রোতং স্মৃত্রে মণিগণা ইব ।”

“ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমুর্ত্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি... ..”

“ইহৈকম্ভং জগৎ কৃৎস্নং পশ্চাৎ সচরাচরম্ ।”

ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সমুদায় জগতের ভগবান্ হইতে পৃথক ভাবে, স্থিতি ও
প্রবৃত্তির অভাব হেতু, ভগবান্ হইতে অভিন্নত্ব উক্ত হইয়াছে ।
অন্যদিকে,—

“ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ।”

“ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ।”

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্মৃতে সচরাচরম্ ।”

ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সর্ব জগতের ভগবান্ হইতে ভিন্নত্ব উক্ত হইয়াছে ।
সেই হেতু অর্জুন বলিয়াছেন—

“সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ”

আরও পূর্বাধ্যায়ের উক্ত হইয়াছে—

“যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংশ্রুয়া মৎপরঃ ।

অনন্যো নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ।

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ॥”

ইহা দ্বারাও পরাপ্রকৃতিভূত জীবপুরুষাদিশব্দাভিধেয় ক্ষেত্রক্ষেত্র ষাৎত্ব উপাসকত্ব উদ্ধার্যত্ব দ্বারা প্রতীত কেবল ভিন্নত্ব উক্ত হইয়াছে । তাহা প্রতিষেধ জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, দেবমনুষ্যাতির্য্যাগাদি সর্বক্ষেত্রে তাঁহাকেই ক্ষেত্ররূপে জানিতে হইবে । অর্থাৎ সেই সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরাত্মকত্ব হেতু ভগবান্ হইতে অভিন্নরূপে জানিতে হইবে । এই শ্লোকে ‘চ’ শব্দ দ্বারা পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার বৈলক্ষণ্যও সূচিত হইয়াছে । এইরূপে অভেদ ও ভেদ সমুচ্চয় হইয়াছে । “শ্রুতি হইতেও ইহা জানা যায় ।

শ্রুতিতে আছে—

“এতদাত্মমিদং সর্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি য়েতকেতো ।”

“অম্মমাত্মা ব্রহ্ম, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ।”

“তজ্জলান্ হাত ।”

“অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্নোষি যদা আত্মানং বেদাহং ব্রহ্মাস্মি ইতি ।”

ইত্যাদি বাক্য ভগবানের সর্বাশ্রয়কত্ব দ্বারা সর্ব সামানাধিকরণ্য-
বাচক । সেইরূপ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

“সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুঃ

ন লিপ্যতে চাক্ষুর্ষৈবাহদোষৈঃ ।

একস্তথা সর্বভূতাস্তরায়া

ন লিপ্যতে লোকহুঃখেন বাহুঃ ॥

বায়ুর্ঘর্থে কা ভুবনং প্ৰবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব ॥

একস্তথা সৰ্বভূতাস্তরায়া

রূপং রূপং প্রতিক্রপং বহিষ্চ ॥”

ত্যাঙ্গি বাক্য ভগবানের সৰ্বরূপত্ব সত্ত্বেও সৰ্ববৈলক্ষণ্য বোধক ।

“এই অর্থে এস্থলে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজকে তাদাত্ম্যরূপে পরমেশ্বর হইতে মূখ্যত্ব ভাবে জানিতে হইবে । ইহাই জ্ঞান । ইহার অন্যথা জ্ঞান—মজ্ঞান । ইহাই সৰ্বজ্ঞ বেদান্তকৃতং বেদবিৎ সৰ্বেশ্বরের অভিমত ।

(এক্ষণে অভেদবাদ ও ভেদবাদের দোষ আলোচিত হইতেছে) ।
‘কেহ (অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীগণ) এই শ্লোকের এই অর্থ করেন যে, সমানাধি-
ফরণ নির্দেশ দ্বারা এস্থলে পরমাত্মাই অবিদ্যা উপাধি বশে পরিচ্ছিন্ন
ইয়া, যেন সংসারী ক্ষেত্রজ হইলেন ও সেই অবিদ্যা উপাধি ত্যাগে শুদ্ধ
সংসারী পরমাত্মা স্বরূপ লাভ করেন, ইহা বুঝিতে হইবে । তাই
গবান্ বসিতেছেন যে, পরমেশ্বর আমাকেই সৰ্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ
রূপে জানিও ।

‘কিন্তু এ অর্থ অসং । এ অর্থ সৰ্ব-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ । ক্ষেত্রজ সকলের
স্বরূপে ঐক্য শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না ।

“শ্রুতিতে আছে, —

“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং

একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।”

“জ্ঞাত্তো দ্বাবজাবীশানীশৌ ।”

“দ্বা স্পর্শা সযুজা সখায়ী

সমানং ব্রহ্মং পরিষষজাতে ।

তয়োৱন্যঃ পিপ্পলং স্বাধতি

অনগ্নন্নন্যোহভিচাকশীতি ॥”

“প্রধান-ক্ষেত্রজ-পতি গুণেশঃ ।”

“অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ।”

‘সৰ্বস্য বশী সৰ্বশ্চ ঈশানঃ ।’

‘একো বশী সৰ্বেশঃ কৃষ্ণ ইড্যঃ

অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্ ।’

‘য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো

যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরম্,

এষ তে আত্মাহস্তর্যাম্যমৃতঃ ।’

ব্রহ্ম সূত্রে (বেদান্ত দর্শনে) আছে,—

‘ভেদব্যাপদেশাচ্চান্যঃ ।’

‘ভেদব্যাপদেশাচ্চ ।’

‘অনুপপত্তেষু ন শারীরঃ ।’

‘কর্মকর্তৃব্যাপদেশাচ্চ ।’

‘পত্যাदिशकेभ्यः ।’

‘অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ ।’

‘এইরূপ ইতিহাস ও পুরাণে ভেদবিষয়ক বাক্য আছে । যথা—

‘ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ সত্ত্বং তেজো বলং ধৃতিঃ ।

বাসুদেবাত্মকান্যাত্মঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ ॥

‘সসুরাসুরগন্ধর্বং সযক্ষোরগরাক্ষসাম্ ।

জগদ্বশে বর্ততেহদঃ কৃষ্ণস্য সচরাচরম্ ॥

‘বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা চেতনাখ্যা তথাহপরা ।

অজ্ঞো জস্তরনীশশ্চ স্বাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ ।

ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা স্বভ্রমেব বা ॥

‘দাসভূতাঃ স্তবঃ সর্বে হাত্মনঃ পরমাত্মনঃ ।

নান্যথা লক্ষণং তেষাং বন্ধে মোক্ষে চ বিদ্যতে ।

তত্র যঃ পরমাত্মা তু স নিত্যো নিগুণঃ স্তবঃ ।

ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্বপত্রমিবাস্তসা ॥

কর্শ্বাশ্রয়পরো যোহসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে ।

স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ ॥

তবাস্তুরাশ্রা মম চ যে চান্যে দেহিসংস্কৃতাঃ ।

সর্কেষাং সাক্ষিভূতোহসৌ ন গ্রাহঃ কেনচিৎ কচিৎ ॥”

“গীতাতেও আছে,—

“অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যস্মেদং ধার্ষ্যতে জগৎ ॥

“দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরচ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥

উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমায়েত্যানুদাহৃতঃ ।”

এই সকল বাক্য অদ্বৈতবাদের বা অভেদবাদের বাধক । অতএব এই বাদে . নাস্তিকত্ব দোষ দুর্বীর হইয়া পড়ে ।

আর এই দোষ কেবল ভেদবাদিমতেও সমান । সেই মতেও অভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্র-বাক্যের বাধা হয় । অতএব ভেদবাদ বা অভেদবাদ, ইহাদের একবিধ বাদপ্রতিপাদক বাক্যের বাধা ব্যতীত কেবল ভেদবাদ বা কেবল অভেদবাদ সিদ্ধ হয় না । অর্থাৎ কেবল ভেদবাদে অভেদ-প্রতিপাদক বাক্যের বাধা হয়, আর কেবল অভেদবাদে ভেদপ্রতিপাদক বাক্যের বাধা বা বিরোধ হয় ।

“বলিতে পারা যায় যে, ‘আমি ঈশ্বর নহি’ ইত্যাদি প্রতীতিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ভেদ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষার বা বাক্যার্থ জ্ঞানের হেতুর অভাব না থাকায়, ভেদবাক্য সকলের বাধাপ্রসঙ্গ হয় না । অতথা ব্রহ্মভেদ-প্রতিপাদক সহস্র সহস্র বাক্যের বিরোধ হইত । কিন্তু তাহা বলা যায় না । জীবের ভেদের প্রত্যক্ষ অভাব হেতুও ভেদপ্রত্যক্ষের প্রতিযোগী প্রত্যক্ষের অধীনত্ব হেতু, তাহা বলা যায় না । জীবও ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্ত হেতু এই প্রত্যক্ষ অসম্ভব । ‘আমি ঈশ্বর নহি’ ইত্যাদি প্রতীতিতেও ‘শুদ্ধোক্ত

সর্বজ্ঞত্ব অচিন্ত্যশক্তিত্ব স্বতন্ত্রত্ব সর্বনিয়ন্তৃত্ব জগৎ-জন্মানাদিকারণত্ব প্রভৃতি ঈশ্বরত্ব-প্রয়োজক ধর্ম সকলের আত্মাতে অসম্ভব হেতুও আত্মার অল্পত্ব অল্পশক্তিত্ব ঈশ্বরনিয়মাত্ব ও ঈশ্বরের অধীনত্ব জ্ঞান হইতে—উক্ত প্রতীতির ষাধার্থ্য সিদ্ধ হয় । (অর্থাৎ ‘আমি ঈশ্বর নহি’ এই প্রতীতি শাস্ত্রজ্ঞানমূলক, ইহা প্রত্যক্ষগম্য নহে) ।

“অবিদ্যাত্মক উপাধি পরিচ্ছেদের অপেক্ষায়, ঈশ্বরত্ব সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তি-মত্ব ও ঈশিতব্যত্ব এবং অল্পশক্তিমত্ব অল্পজ্ঞত্ব প্রভৃতি ব্যবহার, বিদ্যাদ্বারা সর্ব উপাধিরূপ দূর হইলে, পরমার্থতঃ, উপপন্ন হয় না,—ইহাও বলা যায় না । পরমাত্মা ব্রহ্মের সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্যত্ব, একত্ব, অসঙ্গত্ব, স্বয়ংপ্রকাশত্ব অভ্যুপগম্য । আবার তাঁহারই উপাধিবশত্ব পরি-চ্ছিন্নত্ব অজ্ঞত্ব অল্পজ্ঞত্ব ইত্যাদি কল্পনার অত্যন্ত বিরোধ হয় । ‘আমার মাতা বন্ধ্যা’—এইরূপ বাদের ন্যায় তাহার ব্যাঘাত হয় । প্রচণ্ড মার্ভণ্ড-মণ্ডলে অন্ধকারবৎ, স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ আত্মাতে অবিদ্যার অবচ্ছেদ হয়, এরূপ বাদ উন্মত্তপ্রলাপ মাত্র ।

‘অপিচ, অবিদ্যাসম্বন্ধ সহেতুক না নিহেতুক ? তাহা সহেতুক হইতে পারে না, কারণ তাহা অপ্রসিদ্ধ । অবিদ্যা ও ব্রহ্ম হইতে অপর কোন তৃতীয় পদার্থ সে সম্বন্ধের কারণ হইতে পারে না । আর সে সম্বন্ধ অহেতুকও হইতে পারে না । অবিদ্যা যদি বিনা হেতুতে স্বয়ংই আত্মাতে সহজ হয় বলা যায়, তবে একেরই উপাধির বশতায় তাহার নিবর্তক চেতনাস্তর না থাকায়, কখনও সে উপাধির নিবৃত্তি হইতে পারে না, মোক্ষও হইতে পারে না । যদি বলা যায় যে, স্বসামর্থ্যের দ্বারাই অবিদ্যা নিবারিত হয়, তাহা অল্প কারণের অপেক্ষা রাখে না,—তাহাও সম্ভব হয়না । যদি এরূপ হইত, তবে স্বয়ং প্রকাশ স্বতন্ত্র সমর্থ (আত্মার) অবিদ্যা সম্বন্ধেরও যোগ্যতা থাকিত না ।

“অপিচ, অবিদ্যার স্বরূপ ব্রহ্ম (বা আত্মা) জানেন কি না ? যদি

জানেন, তবে তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ স্বতন্ত্র হইয়াও কেন কুকুর শূকর তির্যাক্ কীটাদি যোনি ও তজ্জগৎ চঃখহেতুভূত অবিদ্যাস্বরূপ জানিয়া, তাহাতে যুক্ত হইবেন ? যদি তিনি না জানেন, তাহা হইলে অজ্ঞতা হেতু তাঁহার ব্রহ্মত্বের হানি হয় । অতএব সৰ্ব্বপ্রকারেই ব্রহ্মে অবিদ্যার যোগবাদ উপপন্ন হয় না । যদি বল যে, অবিদ্যা ও তাহার কার্য মিথ্যাজ্ঞান মাত্র, তাহা পরমার্থ বস্তুকে দূষিত করিতে পারে না,—যেমন মরীচিকার জল মরুভূমিকে পঙ্কিল করিতে পারে না, সেইরূপ অবিদ্যাও ক্ষেত্রজ্ঞের কিছুই করিতে পারে না,—ইহাও সঙ্গত নহে । যদি অবিদ্যার দোষ-কারিত্বই না থাকে, তবে তাহা নিবৃত্তির জন্য উপায় সমুদায়ই ব্যর্থ হয় । আর বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রও অনর্থক হয় । অতএব ব্রহ্মে অবিদ্যা সম্বন্ধবাদ গ্রাহ্য নহে । সেই অবিদ্যাকৃত জীবেশ্বর বিভাগ সিদ্ধান্ত পূৰ্বক যে ব্রহ্মান্ত পণ্ডিতগণ জগতের ব্যামোহ উৎপাদন করেন, তাঁহারা শ্রেয়ঃ প্রার্থীর দ্বারা উপেক্ষণীয় ।

“সে যাহা হউক, সৰ্ব্ব-ব্রহ্ম অভেদ প্রতিপাদক (শাস্ত্র) বাক্য সকলের বিরোধও শঙ্কনীয় নহে । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতি-পুরুষ ক্ষর-অক্ষর ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অভিধেয় জড়-চেতনাত্মক সমুদায়ের ব্রহ্মাত্মকত্ব ব্রহ্মব্যাপ্যত্ব ব্রহ্মাধীনত্বাদি হেতু দ্বারা ও ব্রহ্মের সৰ্ব্বাত্মত্ব সৰ্ব্বব্যাপকত্ব স্বতন্ত্রত্বাদি হেতু দ্বারা যে অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতেই সেই সকল অভেদ প্রতিপাদক বাক্যের সার্থকতা । নিম্নোক্ত শাস্ত্র বাক্য ইহার পোষক ।—

“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং...সৰ্ব্বাত্মা ।”

“যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রয়তেহপি বা ।

অন্তর্বহিষ্চ তৎসৰ্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ।”

“অহমাত্মা গুড়াকেশ সৰ্ব্বভূতাত্ম-স্থিতঃ ।”

“ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ সৰ্ব্বং তেজোবলং ধৃতিঃ ।

বাসুদেবাত্মকাগ্ৰাহঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ ॥”

“ষোড়শং ভবাগতো দেব ! সমীপে দেবতাগণঃ ।

স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সৰ্ব্বগতো ভবান্ ॥”

“সৰ্ব্বগত্বাদনন্তত্বাৎ স এবাহমবস্থিতঃ ।”

“সৰ্ব্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সৰ্ব্বঃ ।”

“সৰ্ব্বশ্চ বশী সৰ্ব্বশ্চ ক্ৰীশানঃ আত্মা হি

পরমঃ স্বতন্ত্রঃ অধিগুণঃ জীবোহল্লশক্তিরস্বতন্ত্রোহবরঃ ।”

“সত্ত্বং স্বাতন্ত্র্যমুদ্দিষ্টং তচ্চ কৃষ্ণে ন চাপরে ।

অস্বাতন্ত্র্যাৎ তদন্তেষাং সত্ত্বং বিদ্ধি ভাবতঃ ॥

কিমেনে জগন্নাথ সৰ্ব্বং ত্বদ্বশগং জগৎ ।”

“এইরূপ শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদি বাক্য দ্বারা জানা যায় যে, যে বস্তুর স্থিতি ও প্রকৃতি বাহার আয়ত্ত, তাহার সহিত তাহার অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাণেন্দ্রিয় সংবাদে আছে,—

“ন বৈ বাচো ন চক্ষুঃষি ন মন ইত্যাচক্ষতে প্রাণ ইত্যেব আচক্ষতে ইতি ।”

“আরও ভেদ-ব্যপদেশ হেতু, এবং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার স্বরূপ ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন হেতু এইরূপ মুখ্যার্থই উপপন্ন হয়। “সৰ্ব্বং তং পরাদদয়োহন্ত্রাত্মানঃ সৰ্ব্বং বেদ নাশ্রতোহস্তি দ্রষ্টা দ্বিতীয়ার্থে ভয়ং ভবতি”, এই শ্রুতি দ্বারা যে ভেদের নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে—যে পরমাত্মা হইতে অপর স্বতন্ত্র অবচ্ছিন্ন বস্তুর নিষেধ হইয়াছে, তাহা দ্বারাও এই অর্থই উপপন্ন হয়। এইরূপ অর্থে আর কোন বাক্যের বিরোধ থাকে না। অতএব ভেদবিষয়ক ও অভেদ বিষয়ক বাক্য সকলের যে পরস্পর বাধ্যবাধকতা (একের দ্বারা যে অপরের বাধ হয়), তাহা বলা যায় না। কেন না তাহা তুল্যবলযুক্ত (সমভাবেই প্রামাণ্য)।

“এই তাৎপর্য্য অবলম্বন করিয়াই ভগবান্ সূত্রকার (বেদান্ত সূত্রকার বাদরায়ণ) পরস্পর বিরুদ্ধার্থক ভেদবাক্য ও অভেদবাক্য সকলের

পরস্পর অরিরোধ দ্বারা সমন্বয় প্রকার প্রদর্শনার্থ ও ব্রহ্মের সহিত চেতন অচেতন সকলের ভেদাভেদ সম্বন্ধের নির্দোষত্ব খ্যাপন জন্য তদযোজক সূত্র সকল প্রণয়ন করিয়াছেন । (অংশো নানাভব্যপদেশাৎ ইত্যাদি সূত্র দ্রষ্টব্য) । শ্রুতিতেও এইরূপ ঘটক বা যোজক বাক্য আছে । যথা—“একঃ সন্ বহুধা বিচচার, একো দেবো বহুধা বহুন্ প্রবিষ্টঃ, ত্বমেকোহসি বহুধা বহুন্ প্রবিষ্টঃ”...ইত্যাদি । এইরূপ যোজক (ভেদাভেদ যোজক) বাক্য স্মৃতি পুরাণাদিতেও পাওয়া যায় । যথা,—

“একত্বে সতি নানাভং নানাভে সতি চৈকতা ।

অচিন্ত্যং ব্রহ্মণো রূপং কস্তদ্বেদিতুমর্হতি ॥”

(ইতি মনু) ।

“জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজন্তো মামুপাসতে ।

একত্বেন পৃথক্বেন বহুধা বিশ্বতো মুখম ॥”

(ইতি ভগবদ্বাক্য) ।

“ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা ।

ব্যতিরিক্তং ন যশ্চাস্তি ব্যতিরিক্তোহখিলশ্চ যঃ ॥

নিত্যানিত্যপ্রপঞ্চায়ন্ নিস্প্রপঞ্চমনাশ্রিত ।

একানেক নমস্তভ্যঃ বাসুদেবাদিকারণ ॥

যঃ স্থলস্থল্লঃ প্রকটঃ প্রকাশঃ

যঃ সর্বভূতঃ ন চ সর্বভূতঃ

বিশ্বং যতশ্চৈতদ্বিশ্বহেতুঃ ॥”

(ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ বাক্য)

“পৃথগ্ভূতৈকভূতায় ভূতভূতায়নে নমঃ ।”

(ইতি বিষ্ণুপুরাণে ঋববাক্য) ।

“অনেকমেকং বহুধা বদন্তি

শ্রুতিস্মৃতিশ্রায়নিবিষ্টচিত্তাঃ ।

আর্হর্যমাগ্নানমজং পুরাণং

দ্রষ্টুং তমীশং বয়মুত্ততাঃ স্ব ॥”

(ইতি হরিবংশ) ।

“ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো

যতো জগৎ স্থাননিরোধসম্ভবঃ ।

তন্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাহপি বৈ

প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্ ॥

(ইতি শ্রীভাগবতে প্রথম খণ্ডে নারদ বাক্য) ।

“সোহয়ং তেহভিহিতস্তাত ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

সমাসেন হরেন্নিত্যদন্ত্যাং সদসচ্চ যৎ ॥”

(ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মবাক্য) ।

“অতএব সর্ব শ্রুতিস্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদি বাক্যের অনির্ভুক্ত ও ভগবান্ সূত্রকারের সম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মের সহিত চিদচিৎ সমুদায়ের স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ । ইহাই সংসম্প্রদায়গণের উপাদেয় । কেবল ভেদ বা কেবল অভেদ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হেতু ও ভ্রান্তি বশে পরিগৃহীত হেতু তাহা উপেক্ষণীয় ।

(এক্ষণে বিশিষ্টাষ্টৈতবাদ আলোচিত হইতেছে ।) বিশিষ্টাষ্টৈতবাদ মতে এ স্থলে অর্থ এই যে, দেবমনুষ্যাদি ক্ষেত্রে, বেত্বরূপে একাকার ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকেই জানিও, অর্থাৎ মদাত্মক জানিও । এ শ্লোকে যে ‘চ’ ‘অপি’ শব্দ আছে, তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, আর যাহা ক্ষেত্র তাহাও যে আমি (পরমেশ্বর) তাহাও জানিও । যেমন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এক বিশেষণ-স্বভাব হেতু তাহাদের অপৃথক্ হইয়া যায়, ও তাহারা সমানাধিকরণ দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, সেইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকেই (পরমেশ্বরের) বিশেষণ স্বভাব হেতু আমি হইতে অপৃথক্— ইহা সিদ্ধ হয়, ও আমার সহিত সমানাধিকরণ দ্বারা নির্দিষ্ট হয় । বহু মোক্ষ উভয়

অবস্থায়ুক্ত কল্প ও অক্ষর শব্দ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে অগ্নি বা তিন্ন অর্থে পরম ব্রহ্ম বাহুদেব “উত্তম পুরুষ” বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । যাহা পৃথিব্যাদি সজ্জাতরূপ, তাহা ভগবানের শরীররূপে এক-স্বভাব হেতু যে ভগবানাত্মক, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যন্তরো যঃ পৃথিবীং ন বেদ যশ্চ পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি স তে আত্মাহুস্তুর্য্যাম্যমৃতঃ,” ইত্যাদি হইতে “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ যশ্চাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি স তে আত্মাহুস্তুর্য্যাম্যমৃতঃ”—এই পর্য্যন্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, অন্তর্য্যামিরূপে সর্বক্ষেত্রজ্ঞগণের মধ্যে ভগবানের অবস্থান, তাহার সহিত সমানাধিকরণত্ব দ্বারা ব্যপদিষ্ট হইয়াছে । এইরূপ সমানাধিকরণত্ব প্রতিপাদ্য । ইহা অচিৎ বস্তু সকলের ভোগ্যত্ব চিদ্বস্তু সকলের ভোক্তৃত্ব ও পরব্রহ্মের ঈশিত্ব দ্বারা ও তাহাদের স্বরূপ স্বভাব বিবেক দ্বারা প্রতিপাদ্য ।

“হস্তোহহমিমাস্তিশ্রো দেবতা, অনেন জীবেন আত্মনাহুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণীতি, তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ, বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং সত্যং চানৃতং চ অভবৎ”—ইতি শ্রুতিঃ । অতএব ‘স্ব’আত্মকজীবানুপ্রবেশ দ্বারা ও নামরূপ ব্যাকরণ বচন দ্বারা সমুদায় বাচক শব্দ অচিৎ-জীব-বিশিষ্ট পরমাত্ম-বাচক । কারণবস্থ পরমাত্মবাচক শব্দের সহিত কার্য্যবাচক শব্দের সমানাধিকরণত্বই মুখ্যবৃত্তি বা সার সিক্কান্ত । অতএব সূত্র সূক্ষ্ম চিদচিৎ প্রকার ব্রহ্মই কার্য্য ও কারণ । বিশিষ্টাঐতবাদ ইহাই অঙ্গীকার পূর্বক বা ভোক্তৃভোগ্য নিয়ন্তৃত্ব চিদচিৎ ব্রহ্মের স্বরূপ স্বভাবভেদ অঙ্গীকার পূর্বক ধর্ম্মসাক্ষর্য্য নিবারণ করেন । বিশিষ্টাঐতবাদ মতে, বিশেষণ—বিশিষ্ট বস্তুর একদেশ মাত্র ; এজন্য এ উভয়ের অশ্বেদ ব্যবহার মুখ্য, ও বিশেষণ বিশেষ্য উভয়ের স্বরূপ স্বভাব ভেদ হেতু ভেদব্যবহারও মুখ্য ;—এই অর্থে সর্ব বাক্যের অবিরোধ সিদ্ধ হয় । এই রূপে ভেদাভেদ ব্যবহার মুখ্যরূপে অঙ্গীকার

করায়, এ সম্বন্ধে ভেদাভেদবাদের সহিত বিশিষ্টাষ্টৈত বাদের বিরোধ হয় না। ভেদাভেদবাদ যে শ্রুতি স্মৃতি সূত্র প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা বিশিষ্ট ঐতৈতবাদেও উক্ত হইয়াছে ।

“কিন্তু বিশিষ্টাষ্টৈতবাদ মতে ব্রহ্ম চিদচিৎ বিশিষ্ট । ইহা অসম্ভব। চিৎ ও অচিৎ—ইহাদের বিশেষণত্ব উপপন্ন হয় না। বিশেষণ যে ইতর ব্যাবর্তক (বিরোধী বিশেষণের বাধক) তাহা সৰ্বশাস্ত্রসম্মত । এই লক্ষণের সহিত চিৎ অচিৎ ইহাদের সমন্বয় হয় না। (অর্থাৎ চিৎ ও তাহার বিপরীত অর্থযুক্ত অচিৎ—এই উভয় একেরই বিশেষণ হইতে পারে না) । বিশিষ্টাষ্টৈতবাদ মতে চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন তত্ত্ব ব্যতীত অল্প বস্তু অঙ্গীকৃত হয় নাই। আরও, যেমন শৃঙ্গগলকম্বলাদি গোলক্ষণ দ্বারা মহিষাদি হইতে গো-কে পৃথক্ করা যায়, সেইরূপ বিশেষণ রূপে অভিমত চিদচিৎ পদার্থ দ্বারা কি কোন বস্তু ব্যাবর্তিত বা পৃথক্ ভাবে জানা যায় ? ব্রহ্ম ব্যতীত ত অপর কোন বস্তু নাই। শ্রুতিতে আছে, “একমেবাদ্বিতীয়ম্।” শ্রুতি হইতে ব্রহ্মের একত্ব অবধারণ হয়। ব্রহ্ম হইতে চেতন ও অচেতনকে পৃথক্ রূপে স্বীকার না করায় ব্যাবর্তকত্ব (পৃথক্ত্ব) রূপ বিশেষণও অসম্ভব হয়। বিশিষ্টাষ্টৈতবাদ মতে (ব্যাবর্ত্য) পৃথক্ কৃত ভাব কিছুতেই সিদ্ধ হয় না, এবং পৃথক্ কারক (ব্যাবর্তক) কিছুই সিদ্ধ হয় না। অতএব চিদচিৎ এ উভয়ের পৃথক্ কারকত্ব অভাবে বিশেষণত্বও সিদ্ধ হয় না। বিশেষণত্ব সিদ্ধ না হইলে, তদ্বিশিষ্টত্বও উপপন্ন হয় না।

“আরও চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের বিশেষণ, এ সিদ্ধান্ত শ্রুতি স্মৃতি বা সূত্র প্রমাণের বিরুদ্ধ। অতএব যেমন মার্বাদিগণের সিদ্ধান্ত শাস্ত্রেও অনুভব বিরুদ্ধ ও ব্রহ্মে অবিষ্কার অধ্যাস অঙ্গীকার উপপন্ন হয় না, সেইরূপ বিশিষ্টাষ্টৈতবাদও অগ্রাহ্য, ইহা সম্প্রদায় বিশেষের স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধির জন্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে মাত্র।

“অতএব ভেদাভেদবাদ (বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ) অনুযায়ী উক্তরূপ মর্থই উপাদেয় ।”

এইরূপে এই দুই শ্লোকে উক্ত প্রতি শরীরের বা ক্ষেত্রের বেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাশ্মা এবং সর্বক্ষেত্রে এক ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাশ্মা পরমেশ্বর—এই দুই প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর সম্বন্ধ, বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্নভাবে স্ব স্ব মতানুসারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । এ স্থলে গীতার সে সম্বন্ধ কি প্রকার, তাহা স্পষ্ট উক্ত হয় নাই । এ স্থলে এই মাত্র বলা হইয়াছে যে, এই শরীর বা ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন তাহার বেত্তাই ক্ষেত্রজ্ঞ, আর সর্বক্ষেত্রে ভগবানই ক্ষেত্রজ্ঞ । এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানই পরমার্থ-জ্ঞান । এই ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান লাভের জন্ত এই দুই প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞ মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা অবশ্যস্বাভাবী । তাই এস্থলে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ স্ব স্ব মত অনুসারে এই সম্বন্ধ বিশেষ ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি । গীতার এস্থলে এই সম্বন্ধ তৎ স্পষ্ট উক্ত না হওয়ায় এইরূপ বিভিন্ন মতের স্থান আছে ।

এই সকল বিভিন্ন মত এস্থলে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করা আবশ্যিক । অদ্বৈতবাদ অনুসারে জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদ প্রতিষ্ঠিত । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অনুসারে জীব-ব্রহ্মে ভেদাভেদবাদ স্থাপিত । আর দ্বৈতবাদ অনুসারে জীব-ব্রহ্মে ভেদবাদ গৃহীত । সকল বাদকেই শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে ।

শ্রুত্বাক্ত মহাবাক্য—“সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম”, “তত্ত্বমসি,” “সোহহং”, “অহং ব্রহ্মাস্মি,” প্রভৃতি হইতে অভেদবাদই সিদ্ধান্ত আপাততঃ মনে হয় বটে, কিন্তু ভেদাভেদবাদ এমন কি ভেদবাদও এই সকল মহাবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । বিভিন্নবাদ অনুসারে এই সকল মহাবাক্যের অর্থ ভিন্ন । এস্থলে তাহা উল্লেখের প্রয়োজন নাই । ইহা ব্যতীত শ্রুতিতে এবং স্মৃতি

পুরাণাদি শাস্ত্রে জীব ব্রহ্মে অভেদ-প্রতিপাদক ও ভেদ-প্রতিপাদক—উভয় রূপ অনেক বাক্য আছে । অভেদবাদী আচার্য্যগণ অভেদ প্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্যই প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়াছেন । সেইরূপ ভেদবাদিগণ ভেদ প্রতিপাদক শাস্ত্র বাক্য প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছেন । ভেদাভেদবাদে ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে এই উভয় প্রকার পরস্পর বিরোধী বাক্যের (thesis এবং antithesis এর) সমন্বয় (Synthesis) চেষ্টা হইয়াছে ।

ইহা ব্যতীত, ব্রহ্মের অর্থ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে । শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব—একমেবাদ্বিতীয়ম্ । ব্রহ্ম নিগুণ নিরূপাধিক 'তৎ' শব্দ বাচ্য, ও সেইরূপ সগুণ সোপাধিক 'সঃ' শব্দ বাচ্য । ব্রহ্ম নিগুণ ও সগুণ, নির্কিংশেষ ও সবিশেষ, নিরূপাধিক ও সোপাধিক ।

শ্রুতিতে নিগুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক ও সগুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক অনেক বাক্য আছে । শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নিগুণ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বর্ণিয়াছি । রামানুজ প্রভৃতি সগুণ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য অবলম্বন করিয়া স্বমত স্থাপন করিয়াছেন । শঙ্করাচার্য্য সগুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিকে গ্রহণ করেন নাই । মায়াহেতুই ব্রহ্ম সগুণরূপে প্রতীয়মান হন । ব্রহ্মে ঈশ্বর ভাব মায়িক—তাহা ব্যাবহারিক ভাবে সত্য হইলেও পারমার্থিক সত্য নহে । সেই রূপ জীব ও জগৎ মায়িক—তাহাদেরও ব্যাবহারিক সত্তা ব্যতীত পারমার্থিক সত্তা নাই । শঙ্কর সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতিকে অবিজ্ঞা-কাল্পিত বলিয়াছেন । এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া শঙ্কর সগুণব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতি গুলি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন । অন্য দিকে রামানুজ কেশব ও দ্বৈতমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ কেবল সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াছেন । তাহাদের মতে নিগুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ ভ্রম । নিগুণ অর্থে সমুদায় হেয়গুণ-বিরাহিত । অতএব

সগুণ ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব,—তিনিই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বাসুদেব । তিনিই সমস্ত হেয়গুণবিহীন বলিয়া নিগূর্ণ । অথবা মুক্ত জীবই অক্ষর বা নিগূর্ণ ব্রহ্ম । আত্মাই ব্রহ্ম । তিনি পরম ব্রহ্ম নহেন । কারণ, পরম ব্রহ্ম সগুণ ।

শঙ্করাচার্যের মতে নিগূর্ণ (Transcedent Impersonal) ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য । তিনি জ্ঞান স্বরূপ (Absolute Reason) । সেই জ্ঞান নির্বিশেষ,—তাহা জ্ঞাতৃজ্ঞেয় রূপে বিভক্ত হয় না (not differentiated into absolute Subject and absolute Object) । সে জ্ঞান আত্মজ্ঞান ও (Absolute Ego) নহে । সে জ্ঞানে—‘আমি’(subject) বহু (Object) হইব—এ কল্পনা আসিতে পারে না এবং তাহা নাম (name) ও রূপ (form) দ্বারা বহু (Object) হইয়া, তাহাদের মধ্যে জ্ঞাতৃরূপে (Subject রূপে) অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না । সে জ্ঞান নিষ্ক্রিয় । যে জ্ঞান ক্রিয়াকালে বিকাশ জগ্ৰী তাহার স্বাভাবিক নিয়মে পরস্পর বিরোধী ধর্মের বিকাশ ও তাহাদের সামঞ্জস্য দ্বারা ক্রম-বিবর্তিত হইতে থাকে (Proceeds through the logical necessity of the law of contradiction and identity) — ব্রহ্মজ্ঞান সেরূপ নহে । ব্রহ্ম-জ্ঞান নির্বিকার, অনির্দেশ্য, অনির্কার্য নির্বিশেষ । যে জ্ঞান মায়াবশে সীমাবদ্ধ হয়, পরিচ্ছিন্ন হয়, (limited হয়) অজ্ঞানযুক্ত হয়, যাহা এই মায়া দ্বারা জ্ঞাতৃজ্ঞেয় এই ত্রৈত-ভাবে বিভক্ত হয়, যাহা দেশকাল নিমিত্ত দ্বারা উপাধিযুক্ত হয়, যে জ্ঞানে ভেদ দৃষ্টি হয়—ব্যক্তিভাব (Principium Individuationis) হয়, তাহা পরমব্রহ্মজ্ঞান নহে । তাহা পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞান আবরণ যুক্ত । এই ব্রহ্ম-জ্ঞানকে পাশ্চাত্যদার্শনিক পণ্ডিতগণ মধ্যে কেহ Absolute, Transcendental বা Impersonal Reason, কেহ বা The Unconscious বলিয়াছেন । এই যে সীমাবদ্ধ মায়া বা অবিঘ্না দূষিত জ্ঞান (Reason bound by its logical law of contradiction and identity) ইহা জীব-

জ্ঞান । এই অজ্ঞান হেতুই জীবের জীবত্ব, তাহার ব্রহ্মস্বরূপ অপ্রকাশিত । এ অজ্ঞান কাহার ও কোথা হইতে আসে, তাহা শঙ্কর বলেন নাই, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি । কেহ কেহ বলেন, ইহা ব্রহ্ম জ্ঞানেরই বিকাশ-বিস্তার ধর্ম । জ্ঞান তাহার বিরোধী অজ্ঞানকে বিকাশ পূর্বক তৎসহ মিলিত না হইলে, জ্ঞানের ক্রিয়া হয় না । ইহাই মায়া । এই মায়া হেতু নিশ্চয় জ্ঞানস্বভাব ব্রহ্মের সঙ্গুণ ভাব হয়, তাহাতে জীব ও জগৎ এই মায়া দ্বারা বিবর্তিত হয় । তাহা হইতে ব্রহ্মে ঈশ্বর ভাব হয় । ব্রহ্মের এই সঙ্গুণ ঈশ্বর ভাব সেইজন্ত পারমার্থিক সত্য নহে,—জীবের জীবভাবও পারমার্থিক সত্য নহে । জীব ব্রহ্মই বটে । কেবল অবিদ্যা জন্ত ব্রহ্ম হেতু তাহার এই জীবত্ব বোধ,—তাহার কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা ভাব হয় । কর্তা ও ভোক্তা ভাব যেমন অবিদ্যাবশে তাহাতে আরোপিত, জ্ঞাতা ভাব-‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ ভাবও তাহাতে আরোপিত । এই মায়াবশেই ব্রহ্মে সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞতাভাবও আরোপিত । কেন না প্রকৃত জ্ঞানস্বরূপ যাহা, তাহা নিষ্ক্রিয়, সে জ্ঞান অজ্ঞান মিশ্রিত হয় না, তাহাতে জ্ঞাতা ভাব আসে না, তাহার কোন জ্ঞেয় থাকে না ।

শঙ্করাচার্য্য কতকটা এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া পরমার্থ অদ্বৈত-তত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন । তিনি আরও বলিয়াছেন যে, নির্বিশেষে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে যদি মায়া হেতু জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভেদ হয়, স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও অবশ্য বলিতে হইবে যে, যাহা জ্ঞাতা তাহা কখন জ্ঞেয় হইতে পারে না । সমস্ত জ্ঞেয় হইতে পৃথক করিয়াই জ্ঞাতা আপনাকে জানিতে পারে, বা জ্ঞাতৃস্বরূপ লাভ করে । সেই জ্ঞাতার জ্ঞাতা স্বতন্ত্র কেহ থাকিতে পারে না । অর্থাৎ জ্ঞাতা কাহারও জ্ঞেয় হইতে পারে না ।

* সপেন্‌হর বলিয়াছেন—If the veil of Maya, the *principium Individuationis* is lifted, the man no longer distinguishes between himself and others, he recognises in all beings his own inmost true Self Schopenhauer's World as Will and Idea, Sec. 65.

শব্দের-বুক্তি প্রণালী অতি উপাদেয়, এবং এজন্য ইহা প্রকৃত দার্শনিক পণ্ডিতগণের নিকট বিশেষ আদৃত । কিন্তু কেবল আমাদের নিজের জ্ঞান-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, আমাদের বুদ্ধি-জ্ঞানের ধর্ম পর্যালোচনা করিয়া, তর্ক বুদ্ধি বা বিচার দ্বারা, পরম ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না । এজন্য ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, প্রধানতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিপাদক শ্রুতির উপরই নির্ভর করিতে হয় এবং গীতা যদি ভগবানের বাক্য বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে তাহার উপরও নির্ভর করিতে হয় । পরম ব্রহ্ম আমাদের সীমাবদ্ধ দেশকালনিমিত্তপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জ্ঞেয় নহেন । তাই শ্রুতি ব্রহ্মকে অবাচ্য—অচিন্ত্য—অজ্ঞেয়—অনির্দেশ্য—অপ্রমেয় বলিয়াছেন, 'এবং 'নেতি নেতি,' নিষেধমুখে তাঁহাকে ইন্দ্রিতে নির্দেশ করিয়াছেন । আমাদের জ্ঞান যতই বিকাশিত হউক,—যতই অজ্ঞানমুক্ত হউক, তাহা দ্বারা ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন করা যায় না—সীমাবদ্ধ করা যায় না । অনন্ত ব্রহ্মকে আমাদের এই জ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে কখন আনা যায় না । তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবের অতীত । তাঁহার স্বরূপ অচিন্ত্য । পরমাখ্যার বাহা ঐশ্বর্য যোগ, তাহাও মানুষে ধারণা করিতে পারে না । তিনি সবিশেষ নির্কিশেষ সগুণ-নিগুণ ভূতস্থ হইয়াও ভূতস্থ নহেন, কিংহু (Immanent) হইয়াও বিখ্যাতীত (Transcendent) । তাঁহাতে ঐশ্বরীয় যোগ হেতু কিরূপে এই সকল পরস্পর বিরোধী ধর্মের গুণের বা ভাবের সমাবেশ হইতে পারে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই পরস্পর বিরোধী ভাব কিরূপে সেই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপে অভিব্যক্ত হইতে পারে, তাহা আমরা কোনরূপ বুদ্ধি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে বা বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারি না । শাস্ত্র বাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হয় । শ্রুতি বলিয়াছেন যে, পরব্রহ্মে নিগুণ ও সগুণ—এ উভয়ভাব একীভূত । তিনি নির্কিশেষ রূপে জ্ঞানের চিন্তার ও ধারণার অতীত হইলেও সবিশেষ রূপে তিনি জ্ঞেয় হইতে পারেন । নিগুণ পরম

ব্রহ্মকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না, তাহা অনির্বাচ্য, তাহা কোন বাক্য দ্বারা ধারণা করা যায় না । শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্ম সগুণভাবে যেমন অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ, তেমনই তিনি অনন্ত শক্তিস্বরূপ । শঙ্করাচার্য্য যাহাকে মায়ী বলিয়াছেন, তাহা শঙ্করের মতেই ব্রহ্মশক্তি । শক্তি নিত্য—এক অনন্ত অক্ষয় । তাহার দুই রূপ—এক নিষ্ক্রিয় কারণ (potential) রূপ, আর এক সক্রিয়—কার্য্য (kinetic) রূপ । শঙ্করই বলিয়াছেন, কারণের অন্তর্ভূত শক্তি, আর শক্তির অন্তর্ভূত কার্য্য । এই ব্রহ্ম-শক্তি মায়ী এক অর্থে প্রকৃতি রূপেই জগৎকারণ । ব্রহ্মশক্তিই ক্ষেত্রজ্ঞ জীবরূপে ও ক্ষেত্র জড় সংঘাত রূপে কার্য্যাবস্থায় অভিব্যক্ত । এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে বা এই জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্বন্ধ দ্বারা এ জগৎ বিধৃত । একই তর্কে এই বিভাগ ও সংযোগ বা সম্বন্ধ সত্য হইলে, এই জীব জড়ময় জগৎ সত্য, ইহা পারমার্থিক সত্য,—ইহা অজ্ঞান-প্রসূত বা মিথ্যা নহে । শ্রুতি বলিয়াছেন,—“...সন্মূলাঃ সৌম্য ইমাঃ সর্ষাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠা...” “ঐতদাত্মামিদং সর্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি...” (ছান্দোগ্য, ৬।৮।৬-৭) । আর এ সম্বন্ধ বা সংযোগ যদি মিথ্যা—অজ্ঞান বা মায়ীপ্রসূত হয়, যদি ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদ কল্পনা অসম্ভব হয়, তবে অবশ্য ইহাকে মায়িক মিথ্যা বলিতে হয় । কিন্তু শ্রুতি অনুসারে, যাহা ‘মায়ী’, তাহা নানা স্থানে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, তাহা যে পরব্রহ্মের পরাশক্তি, তাহা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে । খেতাখতর উপনিষদ বলিয়াছেন,—

“পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব ক্রমতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥”

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, এই পরাশক্তি হেতু ব্রহ্মই সগুণ শক্তিমান্ হন । শক্তি ও তৎকার্য্য দ্বারা তিনি জ্ঞেয় হন । তাঁহার জ্ঞান-বল-ক্রিয়ায়িকা শক্তি চরাচর জগৎরূপে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া, তিনি জগৎ সম্বন্ধে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা জ্ঞেয় হন । চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎরূপ

কল্পনা (thought) সংস্বরূপ তাঁহারই ক্রিয়াত্মিক শক্তি দ্বারা ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হয়,—তাঁহারই সত্তা সত্তায়ুক্ত (being) হয় । একারণ তিনি জগৎ সম্বন্ধে সগুণ রূপে অভিব্যক্ত হন । তিনিই জীব জগৎ ও ঈশ্বর বা ভোক্তা ভোগ্য ও প্রেরয়িতা রূপেই জ্ঞেয় হন । একই পরম তত্ত্ব অনন্ত জ্ঞানবলক্রিয়াশক্তিমান্ বলিয়া, সেই একে এই অনন্ত ভেদ আমরা জ্ঞানে ধারণা করিতে পারি ।

কিন্তু শব্দর শ্রুতির উপদিষ্ট সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব যুক্তি দ্বারা বা বিচারপূর্বক স্বীকার করিতে পারেন নাই । তিনি একেই পরম্পর বিরোধী ধর্মের গুণের ও ভাবের সমাবেশ বা সমন্বয় করিতে পারেন নাই বলিয়া, তিনি সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বকে মায়িক বা পারমার্থিক মিথ্যা সিদ্ধান্ত করিয়া, কেবল নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্বকে পারমার্থিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং মান্ববাদ স্থাপন করিয়াছেন । শব্দর নিত্য বিজ্ঞানবাদী । তিনি যে ব্রহ্মতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ—নিত্যবোধ-স্বরূপ । সুতরাং সেই ব্রহ্মে যে শক্তি—যে মায়াখ্য পরাশক্তি, তাহা কেবল জ্ঞানাত্মিক । এজন্য মায়া হেতু তাঁহাতে যে বহু কল্পনা হয়, যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভেদ হয়, তাহা কেবল সেই জ্ঞানেই বিবৃত হয় । 'তাহা সংরূপে পরিণত হয় না । তাই এ জগৎ পরমার্থতঃ মায়িক বা অসৎ । এইজন্য ব্রহ্মে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই । ইহাই সংক্ষেপে শব্দরের সিদ্ধান্ত । কিন্তু ইহাই যে চরম সিদ্ধান্ত, তাহা বলা যায় না । তিনি ব্রহ্মে চিৎ বা জ্ঞান মাত্র দেখিয়াছেন, কিন্তু 'সৎ' বা সংশক্তির—অনন্তবল ক্রিয়াত্মিক শক্তির দিক্ লক্ষ্য করেন নাই । তিনি ব্রহ্মের সংরূপ স্বীকার করিলেও তাহার 'ভাবের' দিক্টা স্বীকার করেন নাই । 'নাসতো বিদ্বতে ভাবো নাভাবো! বিদ্বতে সতঃ' (গীতা, ২।৩৬) । এই তত্ত্ব, এবং 'সৎ' হইতেই যে ভাবের অভিব্যক্তি হয়, সংস্বরূপের যে 'প্রভব' হয়, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই । তিনি যে উপায় অবগম্বন করিয়া

সত্যের বা পরম তত্ত্বের সন্ধান করিয়াছেন, সেই উপায়ও চরম উপায়
নহে । সত্যার্থ লাভের জন্য তাঁহার নির্দিষ্ট 'জ্ঞান'-পথ সামান্য
—সঙ্কীর্ণ । যোগজ অনুভূতি দ্বারা—ভাবসমম্বিত ভঙ্গনা দ্বারা সে
জ্ঞানপথে অগ্রসর হইতে হয় । জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত লাভ করিতে হইলে,
যে দিব্য যোগদৃষ্টি আবশ্যিক, তাহা লাভ করিতে হয় । শঙ্কর বেদান্তসূত্রের
ভাষ্যে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্যাসাদ ঋষির গ্রাম্য তাঁহার যোগ-
দৃষ্টি ছিল না । নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, বিচারপূর্বক শঙ্করা-
চার্য্য যে অভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব
মায়িক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এই সকল কারণে দৈতবাদী বা
দ্বৈতাদ্বৈতবাদী পাণ্ডিত্যগণ স্বীকার করেন না । ইহারা শ্রুত প্রমাণের
উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিয়াছেন ।

অন্য দিকে রামানুজ প্রভৃতি এই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব স্বীকার করিলেও
তাঁহারা নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব স্বীকার করেন নাহ । তাঁহারা নিগুণ ব্রহ্ম-প্রা-
পাদক শ্রুতি সকলের অপ্রাসঙ্গিক অর্থ করিয়া স্ব-স্ব মত স্থাপন করিয়া-
ছেন । রামানুজ কেবল সগুণব্রহ্মপ্রাপাদক শ্রুতি বাক্যের উপরই নির্ভর
করিয়াছেন । সুতরাং তিনিও শঙ্করের গ্রাম্য একদেশদর্শী । শ্রুতি অনুসারে
সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্ম, সেই এক পরব্রহ্মেরই বিভিন্ন ভাবমাত্র । তিনিই
জগদতীত, সর্বাতীত, নিগুণ,—আবার তিনিই অক্ষর, তিনিই ঈশ্বর,
তিনিই জগৎ ও জীবরূপ ও জগৎকারণরূপ । তাঁহারই জ্ঞান—কল্পনা
বা ঈক্ষণ জগতের নিমিত্ত কারণ । তাঁহারই মায়া বা শক্তিরূপা
শ্রুতি জগতের উপাদান কারণ । তাঁহা হইতেই ক্ষেত্রজ জীব ও
ক্ষেত্র জড় ক্ষেত্রের অভিব্যক্তি । তাহা বিশ্বমায়া হেতু ব্রহ্মে বিবর্তিত
মাত্র নহে, তাহা অনন্ত শক্তি হেতু ব্রহ্মে অভিব্যক্ত । ব্রহ্ম—ঈশ্বর
অন্তর্যামী নিয়ন্তা সর্বাঙ্ক-রূপ সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট । অতএব পরব্রহ্ম
তত্ত্ব কেবল নিগুণ নহে, কেবল গুণও নহে । তিনি নির্বিশেষ,

নিরুপাধিক ও অনির্দেশ্য ; তিনিই আবার সগুণ ও সোপাধিক । তিনিই অক্ষর আর তিনিই ভোক্তা ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এই ত্রিবিধ ভাবে জ্ঞেয় । ইহাই পরমতত্ত্ব, ইহাই শ্রুতির সার উপদেশ । এই পরম তত্ত্ব বুদ্ধি দ্বারা তর্কযুক্তি দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না । স্মৃতরাং সাধনা দ্বারা অজ্ঞানজ তমঃ পরিহার পূর্বক, যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া, ভাবের দিক্ হইতে সাধনা করিয়া, পরমাশ্রম রূপা লাভপূর্বক, তাহা আমাদের দেখিতে চেষ্টা করিতে হইবে । এই তত্ত্ব নবম ও একাদশ অধ্যায়ের বাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে ।

যাহা হউক, গীতা বুদ্ধিতে চইলে, আমাদের এই সাধনা পথ অবলম্বন করিতে হইবে । কেবল যুক্তি তর্ক দ্বারা কোন বিশেষ 'বাদ' অবলম্বন করিয়া তাহা বুদ্ধিতে চেষ্টা করা উচিত নহে । গীতা দ্বারা অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—কোন বিশেষ মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করাও উচিত নহে । এমন কি, গীতা বুদ্ধিতে চইলে শ্রুতিও অবলম্বন করিবার তত প্রয়োজন মনে হয় না ।

গীতামাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—

“গীতা স্মৃগীতা কর্তব্য। কিমতৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ ।

যা স্বয়ং পদ্যনাভশ্চ মুখপদ্য-বিনিঃসৃত্য ॥

গীতা শ্রীভগবানের বাক্য, গীতা উপনিষদ্ গীতা শ্রেষ্ঠ Revelation । গীতা অন্ততঃ শ্রুতির গ্ৰাম প্রামাণ্য । উপনিষদে মূলতত্ত্ব নানা স্থানে নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু গীতায় উপনিষদের সেই সকল উপদেশ (disconnected aphorisms of the Upanishads—*Schaupenhauer*), এবং অণু মূল জ্ঞাতব্য তত্ত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সমুদায় সমন্বয় পূর্বক উপদিষ্ট হইয়াছে । একত্র গীতা উপনিষদের সার । পূর্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া গীতার প্রত্যেক শ্লোকের অর্থ করিতে হয়, ও ধ্যানপূর্বক প্রত্যেক শ্লোক বুদ্ধিতে হয় । শ্রুতি-বাক্য গীতা বুদ্ধিবার

সহায় অবশ্য ; কিন্তু যদি কোন শ্রুতি-বাক্যের সহিত গীতার কোন বাক্যের বিরোধ মনে হয়, তবে গীতাকেই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু কোথাও এরূপ বিরোধ নাই। গীতা ও শ্রুতি সমন্বয়পূর্বক অর্থ করিলে, অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির বিরোধ থাকে না। এ সমুদায় বাদের প্রকৃত সামঞ্জস্য হয়। পরম তত্ত্ব এ বাদ-বিবাদের অতীত। শাস্ত্র সমন্বয় দ্বারা (“তৎ তু সমন্বয়াৎ”) ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। তবে এ সমন্বয়ের মূলমন্ত্র সহজে পাওয়া যায় না। বাদরাগণ ব্যাস উত্তরমীমাংসায় যে সমন্বয় প্রণালী দেখাইয়াছেন, তাহা সহজে আমাদের বোধগম্য হয় না।

এক্ষণে গীতার পূর্বাপর আলোচনা করিয়া এই দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ বিচারপূর্বক সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। পরমেশ্বর সগুণ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এ সগুণ ভাব, এই পুরুষোত্তমভাব নিগুণ অব্যক্ত অক্ষর ভাবের ত্রায় পরম ভাব। তাহা সকল ক্ষর ভাবের অতীত। নিরূপাধিক ব্রহ্মে এই সোপাধিক সগুণ ভাবের অভিব্যক্তি হয়। তাই অব্যক্ত অব্যয়, পরম অক্ষর ভাব পরম পুরুষ ভাবের পরম ধাম—তাহা পরম গতি। এই সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভাব নিগুণ ভাবের ত্রায় নিত্য-সনাতন, তাহা পারমার্থিক সত্য—তাহা মায়িক বা কাল্পনিক নহে। পরমেশ্বরের দুই প্রকৃতি, এক পরা প্রকৃতি—জীবভূত ; আর এক অষ্টধা অপরা প্রকৃতি—বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও পঞ্চসূক্ষ্ম ভূত (তন্মাত্র) ও তাহাদের বিকারজাত জীবদেহ ও অপর জড় বর্গ। ভগবানের পরাপ্রকৃতি প্রাণ ও এই অপরা জড় প্রকৃতি নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত হইয়া ভগবান্ হইতে আত্মা-রূপ বীজ গ্রহণ করিয়া সর্বভূতের ঘোনি বা কারণ হয়। এই আত্মস্বরূপে জীব ক্ষেত্রজ, তাহা ভগবানেরই অংশ, তাহা ভগবান্ হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ নহে। ক্ষেত্রজ এক অবিভক্ত হইয়াও ক্ষেত্রভেদে পৃথক্ বা বিভক্তের ত্রায়স্থিত। আর সর্বক্ষেত্রজ ভগবান্

সর্বভূতাশয়স্থিত পরমাত্মা (গীতা ১০।২০) । কিন্তু এই জীবাশ্রয়তাব
ভূতাশয় বা ক্ষেত্র দ্বারা বদ্ধ । ক্ষেত্রের সংযোগে অভিব্যক্ত এই জীবতাব
শুণময়ী মায়ী দ্বারা সীমাবদ্ধ । একত্র তাহাকে ভগবানেরই জ্ঞান ও
শক্তির অংশ বলা যায় ।

এই ক্ষেত্র—যাহা সর্বভূতযোনি, তাহা এই পরা ও অপরা প্রকৃতি
হইতে অভিব্যক্ত । আর যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি পুরুষ । পুরুষ ত্রিবিধ ।
ভগবান্‌ই উত্তম পুরুষ । জীব ক্ষর পুরুষ । এই পুরুষ-প্রকৃতি অনাদি ।
ভগবান্‌ এই প্রকৃতিকে "আমার" বলিয়াছেন, এই প্রকৃতি স্বতন্ত্রতত্ত্ব
নহে । ভগবান্‌ই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা—নিয়ন্তা । ভগবানের অধ্যক্ষতায়
প্রকৃতি (অব্যক্ত) সচরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন । স্ব-প্রকৃতিকে অবষ্টম্বন
পূর্বক ভগবান্‌ পুনঃ পুনঃ জগৎ বিসর্জন করেন । অতএব এই অর্থে
প্রকৃতি ভগবান্‌ হইতে অভিন্ন । তাহা বাস্তব । প্রকৃতি বা প্রকৃষ্ট
কর্ম-শক্তি পরমেশ্বরেরই পরাশক্তি—স্বাভাবিকী বল-ক্রিয়াশ্রিকী শক্তি ।
গীতা অনুসারে এই প্রকৃতি ও মায়ী কিছু ভিন্নতত্ত্ব । মায়ী—গীতা অনুসারে
দৈবী মায়ী ভগবানেরই আত্মমায়ী বা যোগমায়ী । ভগবান্‌ এই মায়ী
দ্বারা সমাবৃত । এই মায়ীর ত্রিশুণময়ী ভাবের দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাশ্রয়, বদ্ধ
হয় । আমরা পূর্বে এই মায়ীতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । মায়ী
ভগবানের আত্মশক্তি, তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞানাশ্রিকী শক্তি । এই
প্রকৃতিও এক অর্থে ভগবানের আত্মশক্তি, কিন্তু ইহা তাঁহার স্বাভা-
ভিকী বলক্রিয়াশ্রিকী কর্ম-শক্তি । একত্র মায়ী তাঁহার এই প্রকৃতি বা
প্রকৃতিজাত ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন । প্রকৃতি দ্বারা ক্ষেত্র সৃষ্ট হয় । মায়ী
ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্রবদ্ধ করে মাত্র । গীতা অনুসারে মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মতাব
বা ঈশ্বরতাব সিদ্ধ হইলে, জীবাশ্রয় ও পরমাশ্রয় ভেদ থাকে না,
জীবাশ্রয় ক্ষেত্রমুক্ত হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয় । কিন্তু ক্ষেত্রবদ্ধ অবস্থায় এই
ভেদ থাকে । এইরূপে ভেদাভেদ বাদ বুঝিলে, ইহাতে সর্ববাদ সমন্বিত

হইবে । ইহা দ্বারা একই পরম ব্রহ্ম-তত্ত্বের সগুণ ও নিগুণ ভাব স বিশেষ ও নিবিশেষ ভাব কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে । সে ভেদ দূর করিবার জন্য—সে ক্ষেত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য—ত্রিগুণাতীত হইবার জন্য, গীতোক্ত সাধনার প্রয়োজন জানা যাইবে । এইরূপে গীতার ভেদাভেদবাদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে ।

নিবিশেষ নিগুণ পরম ব্রহ্ম এই মায়াশক্তিমান্ বলিয়া সগুণ পরমেশ্বর হন, এবং একাংশে এ জগৎকে ধারণ করেন, ইহা গীতাতে বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে ।

ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন যে,—

“বিষ্টভ্যাহমিদং কুৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।” (গীতা ১০ । ৪২)

অতএব এই জড়জীবময় জগৎ পরমেশ্বরের এক আংশিক ভাব মাত্র । ইহা তাঁহার আত্মবিভূতি,—তাঁহার আত্মরূপেরই বিশেষ অভিব্যক্তি । এই বিভূতিভাবেই তিনি বিশ্ব জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত (গীতা ১০ । ১৩) । এই বিশ্ব জগৎ পরমেশ্বরেরই বিরাট দেহে অবস্থিত । অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইবার সময় ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—

“ইহৈকস্থং জগৎ কুৎস্নং পশ্যাত্ত্ব সচরাচরম্ ।

মম দেহে শুড়াকেশ যচ্চাত্ত্বং দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥” (গীতা ১১ । ৩) ।

অর্জুনও বিশ্বরূপ দেখিবার সময় বলিয়াছিলেন,—

“পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে

সর্কাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্ ।” (গীতা ১১ । ১৫) ।

অতএব এই সচরাচর জগৎ সমুদায় ক্ষেত্র এবং সমুদায় ক্ষেত্রজ জীব—ভগবানের বিরাট দেহে অবস্থিত, সমুদায়ই তাঁহার বিভূতি । এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, জড় ও জীবজগৎ পরমেশ্বরের শরীরের মধ্যে তাঁহার আত্মার ভাবের মধ্যে অবস্থিত হইলেও, তাঁহার শরীর বলা যায় না এবং ভগবান্ যে এই শরীরবিশিষ্ট, তাহাও বলা যায় না ।

তাহারা ভগবানের বিরাট শরীরের অন্তঃস্থ মাত্র । একাদশ অধ্যায় হইতে আমরা ইহা জানিতে পারি ।

সে যাহা হউক, ইহা হইতে বলা যায় যে, সমষ্টি ভাব ক্ষেত্র বা “ইদং শরীরং” ভগবানের এই বিরাট দেহ এবং তাহার বেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ সর্বজ্ঞ ভগবান্ । কিন্তু ব্যষ্টি ভাবে এই ক্ষেত্র বা শরীর জীবদেহ ও তাহার বেত্তা সেই ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব । এ উভয়ই ভগবানের বিরাট শরীরের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং তাহারা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহে । অতএব এই ভাবেও গীতার প্রতিষ্ঠিত ভেদাভেদবাদ এবং অভেদবাদ ও ভেদবাদ কিরূপে সামঞ্জস্য হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে ।

এস্থলে অরও এক কথা বুঝিতে হইবে । আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি যে, এই বিশ্বজগৎকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়—এক ক্ষেত্র আর এক ক্ষেত্রজ্ঞ । সমষ্টি ভাবে ক্ষেত্র এক, ক্ষেত্রজ্ঞও এক । কিন্তু ব্যষ্টি ভাবে ক্ষেত্র বহু, ও প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞও বহু । ক্ষেত্রজ্ঞ জীব আর ক্ষেত্র জড় । ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রের বেত্তা—জ্ঞাতা, আর জড় ক্ষেত্র বেত্তা—জ্ঞেয় ।

এক অর্থে জীব জ্ঞাতরূপে তাহার জ্ঞেয় জগৎ ধারণ করে । জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞেয় থাকিতে পারে না । Subject না থাকিলে Object থাকে না । কিন্তু জীব পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতা । সে তাহার পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জ্ঞেয় যে জগৎ, তাহাই ধারণ করে । প্রকৃত জ্ঞাতা তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ—সমুদায় যাহার জ্ঞেয় । তিনি পরমেশ্বর । তিনিই স্বীয় মায়াশক্তি হেতু সীমাবদ্ধ বা পরিচ্ছিন্ন হইয়া—একই তিনি বহু হইয়া, বহু জীবাশ্রুভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ ও বহু ক্ষেত্র ভাবে বিভক্তের গ্ৰাম হইয়া, প্রত্যেক জীবাশ্রু ক্ষেত্রজ্ঞ ভাবে স্বক্ষেত্রে অভিব্যক্ত রক্তিজ্ঞানের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া অল্পজ্ঞ হন । তিনি সর্ব-ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়াও এইরূপে প্রতি ক্ষেত্রে ভিন্নের গ্ৰাম পৃথক্ ভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ হন । পরমেশ্বর তাহার যে বীজ তাহার পরা ও অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ মহৎব্রহ্ম রূপ যোনিতে বা ক্ষেত্রে নিবেক করেন বা আশ্রুভাবে

তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন, তাহাই জীবাশ্মা । সেই জীবাশ্মার সন্নিধিতে প্রতি ক্ষেত্রে জীবভাবের বিকাশ হয় । প্রতি জীবে যে পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতৃভাব— তাহা ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত পরমাশ্মার পরম জ্ঞাতৃভাবের অংশ বা ক্ষেত্রদ্বারা পরিচ্ছিন্ন রূপ মাত্র । পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বর Absolute Subject, আর জীব প্রতিক্ষেত্রে (চিত্তে) প্রতিবিম্বিত Phenomenal Subject । তাই পরম জ্ঞাতা সৰ্বজ্ঞ (Subject of all objects) . আর জীব অল্পজ্ঞ । তাই জীব তাহার নিজ শরীরে অপরোকভাবে জ্ঞাতা, আর পর-শরীরে পরোক ভাবে জ্ঞাতা হইতে পারেন । এইজন্য প্রত্যেক জীব নিজ শরীরেরই বেত্তা—ক্ষেত্রজ্ঞ । তাহার এই ক্ষেত্রজ্ঞানও সীমাবদ্ধ, নিজ শরীরে আবদ্ধ, দেশকালনিমিত্ত সীমাবদ্ধ বা উপাধিযুক্ত । পরমেশ্বর পরম জ্ঞাতা (Absolute subject) স্বরূপ—সৰ্বজ্ঞ, এজন্য তিনি সৰ্ব শরীরে বা সৰ্বক্ষেত্রেই জ্ঞাতা—সমানরূপে জ্ঞাতা । তিনি সে জ্ঞান সকলের অস্তুর্য্যামী, সকলের নিয়ন্তা । অতএব পরমেশ্বরই সৰ্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ । আর জীবরূপে প্রতিক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত, স্মৃতরাং পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতৃস্বরূপে তিনিই সেই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ । তিনি অবিভক্ত হইয়াও সৰ্বভূতে বিভক্তের স্থায় স্থিত হন ।

জীবের আত্মশরীর অপরোক ভাবে তাহার জ্ঞেয় । অন্য শরীর বা অন্য জড় সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান পরোক । অন্য শরীরে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে (বা যোগবলে পরকায় প্রবেশ সিদ্ধি না হইলে), সেই অন্য শরীর সম্বন্ধে তাহার অপরোক জ্ঞান হইতেই পারে না । জীবের জ্ঞান নিজ ক্ষেত্রে প্রধানতঃ বদ্ধ বলিয়া, সে অপরের শরীরের জ্ঞাতা বা ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারে না । নিজ উপাধি দ্বারা জীব-জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বলিয়া, তাহার পক্ষে অপরোকভাবে 'জ্ঞেয়'—কেবল তাহার নিজ শরীর এক শরীরে অনুভূত স্মৃৎ হৃৎ কর্তৃত্বাদি । ইন্দ্রিয় দ্বারে যে অনুভূতি হয়, মাত্রাস্পর্শ জনিত যে জ্ঞান হয়, তাহা হইতে কল্পনা করিয়া সে সেই

অনুভূতির বাহ্য কারণ স্থির করে, এবং তাহা বাহ্য 'ইদং'রূপে প্রত্যক্ষ করে । এইরূপে বাহ্য বিষয় তাহার জ্ঞেয় হয় । সুতরাং এই জ্ঞান পরোক্ষ ও উপাধিযুক্ত । তাহা দ্বারা সে বাহ্য বিষয়ের স্বরূপ অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারে না । জ্ঞাতা জীব যখন তাহার নিজ জ্ঞানের ক্রিয়া দ্বারা তাহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করে, তখন সে আপনার জ্ঞানকে এইরূপ সামাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন উপাধিযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারে,—তাহা যে তাহার বাহ্য 'জ্ঞেয়' দ্বারা, এবং দেশকালনিমিত্ত উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহা সে বুঝিতে পারে । তাহার সে জ্ঞান সসীম, তাহা জীবকে ব্যাক্ত্ব গণ্ডীর মধ্যে (Principium individuationis) সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয় । তাহার জ্ঞান সঙ্কীর্ণ সামাবদ্ধ, এ ধারণা হইলে, সে সেই সীমাকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করে । বাহ্য কিছু সসীম, তাহা অসীম আধারে স্থিত,—সসীম জ্ঞান,—অসীম অনন্ত জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত ও তাহা হইতে অভিব্যক্ত, ইহা তখন সে অনুভব করে । যিনি এই অসীম অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন পরম জ্ঞান স্বরূপ তিনিই পরমেশ্বর । সেই সর্ব্বত্র পরমেশ্বর সর্ব্বজীবের অন্তরে ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে অবস্থিত, তাহা হইতেই জীবভাব জীবজ্ঞান প্রতিক্ষেত্রে অভিব্যক্ত, প্রাতি ক্ষেত্রের বেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ ভাব তাহা হইতেই বিকাশিত, ইহা এইরূপে আমাদের জ্ঞান অনুভব করিতে পারে । সর্ব্বত্র পরমেশ্বরের অসীম জ্ঞান সর্ব্ব সসীম জ্ঞানকে ব্যাপিয়া, সর্ব্বক্ষেত্রে ও সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞকে ব্যাপিয়া অবস্থিত,—ইহা জ্ঞানী এইরূপে ধারণা করিতে পারেন ।

আমরা বলিয়াছি যে, জীব তাহার নিজ শরীরের বেত্তা—অপরোক্ষ-ভাবে জ্ঞাতা । কিন্তু আমরা নিজেও আমাদের দেহের সম্পূর্ণ জ্ঞাতা নহি । আমরা দেহকে 'আমার' বলিয়া কখন বা 'আমি' বলিয়া বোধ করি বটে, কিন্তু কখন সম্পূর্ণ দেহকে জানিতে পারি না । দেহ কিরূপে সৃষ্ট হয়, পরিপুষ্ট বর্দ্ধিত বা, রক্ষিত হয়, তাহা জানি না । এই যে অতি

আশ্চর্য্য অদ্ভুত দেহ যন্ত্র, ইহার সৃষ্টি ও রক্ষার কৌশল যে অতি অদ্ভুত তাহার তত্ত্বও আমরা বুঝি না। এই দেহের সৃষ্টি বা রক্ষা সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত কোন কর্তৃত্ব নাই। আমরা নিজে আমাদের দেহের সামান্য অংশও গড়িতে পারি না, একটি চুলও আমাদের গড়িবার সাধ্য নাট যে প্রাণশক্তি এই শরীরকে রক্ষা করে, ধারণ করে ও পোষণ করে তাহার কার্য্য আমরা বুঝি না। প্রাণরূপে ব্রহ্মই এ শরীরের স্রষ্টা পাতা ও রক্ষিতা শ্রুতিতে আছে—

য এষ সুপ্তেষু জাগতি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মাণঃ ।

তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।”

(কঠোপনিষদ্. ৫।৮)

অতএব সেই পরমেশ্বরই আমাদের এই শরীরকে স্বীয় প্রকৃতি দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া, আমাদের কামফলানুধায়ী বাসনা অনুসারে নির্মাণ করেন ও রক্ষা করেন। তিনিই এ শরীরের প্রকৃত জ্ঞাতা-ক্ষেত্রজ্ঞ। আমরা আমাদের শরীরকে প্রকৃতরূপে জানি না। আমরা নিজ ক্ষেত্রেরও প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ বা নিয়ন্তা নহি। সেই শরীরও আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞেয় নহে। তবে ‘এ শরীর আমার’ বা ‘আমি এ শরীর’ বলিয়া যে অজ্ঞা হেতু অভিমান হয়, তাহা হইতেই আমরা আমাদের নিজ ক্ষেত্রের বের ক্ষেত্রজ্ঞ হই। আমরা প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারি না। এ শরীর ব ক্ষেত্র যে আমার, এ মূল অজ্ঞান দূর করিবার জগুই শাস্ত্রে সর্বত্র উপদেশ আছে। “অশরীরো বাব সন্তঃ প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত”—ইতি শ্রুতি। অতএব আত্মা অশরীরী,—এই জ্ঞানই পারমার্থিক। শরীরে আত্মাধ্যাসন থাকিলে, তাহা আমার জ্ঞেয়, এ জ্ঞানও থাকে না। তখন আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ হন না। তখন জ্ঞানের ক্ষেত্রজ্ঞরূপ এ পরিচ্ছেদ দূর হয়। সূত্রং জ্ঞান স্বরূপতঃ এই ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন। পরমেশ্বরই সর্বশরীরে প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ। যে অনন্ত জ্ঞান—অনন্ত শক্তি সমস্ত জগৎকে নিয়মিত করেন, শাসন করেন,

নি সমস্ত জীব জড়ময় জগৎকে শরীর (organised body) করিয়া, হাতে আত্মা-রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরম পুরুষ পরমেশ্বর হন, সেই অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শক্তিই পারচ্ছিন্ন জ্ঞাতা ভোক্তা কর্তা জীবভাব কাণের জন্ত এঃ শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহা ধারণ রক্ষণ ও পোষণ করেন,—আমাদের কর্মফল দিতে, আমাদের অনাদিকাল প্রবৃত্ত বাসনা প্রতিপাল্য করিতে, আমাদের শরীর সৃষ্টি করেন, এবং রক্ষা করেন। তিনিই প্রতিক্ষেত্রে জীবভাবের বিকাশ করেন : তিনিই প্রকৃত সমক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। সেই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপে সর্ব পারচ্ছিন্ন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাব একা-ধৃত। তিনি পরম জ্ঞাতা বলিয়াই সমুদায় জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এই ভাবে ভগবান্ যে সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ তাহা জানিতে হয়। ইহা জানিতে পারিলে, প্রতিক্ষেত্রে জীবভাব যে পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে অভিব্যক্ত, তাঁহার সঙ্গায় সঙ্গুক্ত, তাঁহার সচ্চিদানন্দময় হেতু হইয়া জ্ঞাতা ও ভোক্তা এই ত্রিবিধ ভাবযুক্ত, আর পারচ্ছিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞরূপে যে সর্বজ্ঞ ভগবানের স্বরূপ,—এবং ভগবান্ যে সর্বদা আমাদের সন্নিহিত আমাদের অন্তরস্থিত, তিনি যে আমাদের স্থিতি রক্ষা ও পালন জন্ত সর্বদা নিয়ন্তা হইয়া, অন্তর্যামী হইয়া, আমাদের অন্তরে পরম জ্ঞাতা হইয়া, সর্বদা বিরাজিত, তিনি যে অন্তরে বাহিরে, নিকটে দূরে, সর্বদা অবস্থিত,—তাঁহাতে স্থিত বলিয়াই যে শরীরী আমরা জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা চেতন জীব হইয়াছি,—ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়াছি, আর তিনিও পরম সর্কেশ্বর, সর্কাতীত হইয়াও আত্মা-স্বরূপে আমাদের এই জীবভাবের সন্নিহিত আমাদের অনুগ্রহার্থ যেন বদ্ধ হইয়া ‘জীবাত্মা’ হইয়া, অবিতর্কত তিনি বিভক্তের জ্ঞায় হইয়াছেন,—ক্ষেত্রে জীবভাবের প্রতিবিম্ব স্বয়ং প্রতিগ্রহণ করিয়া আমাদের স্বরূপ হইয়াছেন,—এক কথায় তিনিই যে আমি, আমার যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—‘সোহং’—তাহা ধারণা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি, কৃতার্থ হইতে পারি।

এইরূপে আমরা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে ও সৰ্বক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরে—পরস্পর সম্বন্ধ ধারণা করিতে পারি। এক অর্থে সে সম্বন্ধ অচিন্ত্য। গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধ যে কেবল অভেদ সম্বন্ধ,—তাহা বলা যায় না, আবার যে কেবল ভেদ সম্বন্ধ,—ইহাও বলা যায় না। সেইরূপ এ ভেদাভেদ সম্বন্ধও আমাদের জ্ঞানে ধারণা করা যায় না। যিনি বুদ্ধি দ্বারা বিচারপূর্বক কেবল অভেদবাদ বা কেবল ভেদবাদ এমনকি ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি যে সফল হইয়াছেন তাহা বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্য কেবল "অভেদ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গিয়া পরমার্থতঃ অভেদ ও ব্যবহারিক ভাবে ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীবাত্মা পরমার্থতঃ কেবল জ্ঞাত স্বরূপ। তাহার কর্তা ও ভোক্তা ভাব মায়িক,—ক্ষেত্রে অধ্যাসমূলক। তাঁহার মতে জ্ঞাতা একই—বহু জ্ঞাতা থাকিতে পারে না। কারণ, তাহাতে মূল জ্ঞানের পরিচ্ছেদ হয়। জ্ঞান—একই। তাহা স্বরূপতঃ নিত্য, অপৌকষেয়, অখণ্ড। তাহা পরমার্থতঃ জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এই দ্বৈতভাবের অতীত। সুতরাং জ্ঞানে 'জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়' এই দ্বৈতের কারণ—মায়া। এই মায়া হেতুই জ্ঞানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভেদ হয়—বহু জ্ঞাতা ও বহু জ্ঞেয় কল্পিত হয়। তাহা পারমার্থিক সত্য নহে। আরও, এই যে জ্ঞাত ভেদ—তাহাও একমুখ পারমার্থিক নহে। জ্ঞাতার জ্ঞাতাও সম্ভব নহে, একমুখ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের জ্ঞাতা কোন ঈশ্বরও স্বীকার করা যায় না সুতরাং জীবে ঈশ্বরে বা জীবে জীবে পরমার্থতঃ কোন ভেদ নাই। এই অর্থে শঙ্কর তাঁহার অভেদবাদ ও অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানের স্বপ্নাবস্থার জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভেদ ও অসংখ্য জ্ঞেয় বস্তুর অনুভব যেমন কাল্পনিক বা মিথ্যা, সেইরূপ জ্ঞানের জাগ্রদবস্থারও এই ভেদ কাল্পনিক বা মিথ্যা। জ্ঞানের স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা একই প্রকার। তবে প্রভেদ: এই যে, জাগ্রদবস্থার এই ভেদ-ব্যবহার থাকে, কিন্তু স্বপ্না-

বাহ্য ভেদ ব্যবহার জাগ্রদবস্থায় থাকে না। সেইরূপ যুক্তিতেও জাগ্রদবস্থায় ভেদ ব্যবহার থাকে না। অতএব অভেদ মধ্যে যে ভেদ—তাহা মায়িক বা কাল্পনিক—তাহা ব্যবহারিক মাত্র। কিন্তু এ পারমার্থিক এবং ব্যবহারিক ভেদ আমরা বঝিতে পারি না। এ যুক্তিও আমাদের হৃদয়গ্রাহী হয় না। গীতার এ ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। গীতাতে পরম অক্ষর সংস্করণের ক্ষর ভাব ও অব্যয় পরম সনাতন পুরুষ ভাব স্বীকৃত হইয়াছে।

রামানুজের বিশিষ্টাধৈতবাদ অনুসারে, এবং এক অর্থে বলভাচার্য্যের বিকল্প অধৈতবাদ অনুসারে, সগুণ ব্রহ্মের অচিন্ত্য মায়াক্রমিক মাত্র স্বীকৃত। সেই অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি হেতু ব্রহ্ম নিত্য সগুণ। তাঁহার এ সগুণভাব নিত্য—পারমার্থিক সত্য। এই মায়াক্রমিক হেতু ব্রহ্মজ্ঞানে যে রূপ বহু হইবার কল্পনা হয়, তাহা সংক্রমে বিবর্তিত হয়। তাঁহাতে Thought is Being। তাহাতে এই “বহু হইবার” কল্পনা হইতে প্রতিষ্ঠিত তিন ভাব—চিৎ, চিদচিৎ ও অচিৎ নিত্য সিদ্ধ। চিৎ—জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর; চিদচিৎ—জীব, আর অচিৎ—জড়। চিদচিৎ জীব ও অচিৎ জড় ভগবানেরই বিভূতি—তাঁহারই শরীর। তিনি এই চিদচিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট। ব্রহ্মে চিৎ ও অচিৎ ভেদ এইজন্ত নিত্য। উভয়ে পরস্পরে বিরুদ্ধধর্মী হইলেও একই ব্রহ্মে এই হই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের বিকাশ, তাঁহার অচিন্ত্য মায়াক্রমিক হেতু সম্ভব হয়। আরও চিদচিৎ জীব—চিদংশে বা চিৎস্বরূপে পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, কিন্তু অচিদংশে তিন্ন। এইরূপে ভেদাভেদ বাদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাতেও এই ভেদাভেদ আমাদের বোধগম্য হয় না। ব্রহ্ম কিরূপে বিশিষ্ট হন এবং বিশিষ্ট হইতে তাঁহার নিগুণ নির্কিশেষ স্বরূপের হানি হয় কিনা, তাহা আমরা জ্ঞানে ধারণা করিতে পারি না। এজন্ত রামানুজ প্রভৃতি অধিকাংশ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ এই নিগুণ নির্কিশেষ গীতোকৃত উক্ত অক্ষর পরমভাব স্বীকার করেন নাই। শ্রুতিতে ও গীতায় এই

উপদেশ কেবল যুক্তি তর্ক দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করিতে যাইলে, এইরূপে আমাদের অনেক গোলযোগে পড়িতে হয় ।

নিম্বার্কীচার্যের ভেদাভেদবাদ, এস্থলে কেশবাচার্য্য যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি । কিন্তু কেশবাচার্যের ব্যাখ্যায় নিম্বার্কীচার্যের সবিশেষ নিকাশেষ ব্রহ্মবাদের বড় আভাস পাওয়া যায় না । তিনি নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদ বুঝাইয়াছেন । এ মতে জীব-ঈশ্বরে ভেদ নিত্যসিদ্ধ । অংশ-অংশী ভাবে ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবে, নিয়ামক-নিয়ন্তৃত্ব ভাবে পরতন্ত্র-স্বতন্ত্রভাবে—ইত্যাদি প্রকারে এ ভেদ নিত্যসিদ্ধ । কিন্তু অংশীর সহিত অংশের, ব্যাপকের সহিত ব্যাপ্যের নিয়ন্তার সহিত নিয়ামকের ও স্বতন্ত্র বস্তুর সহিত তদধীন বা তৎপরতন্ত্র বস্তু সমুদায়ের প্রকৃতপক্ষে ভেদও নাই । অংশীর স্বভাব ও ধর্ম অংশেই অভিব্যক্ত হয় । স্বতন্ত্র নিয়ন্তার সহিত তৎপরতন্ত্র নিয়মের পার্থক্য থাকে না । এইরূপে সর্বত্র ঈশ্বরে ও অল্পজ্ঞ জীবে ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় । কিন্তু এ অর্থেও ভেদাভেদবাদ ধারণা করা যায় না । হহাতে বৈতবাদেরই ছায়া পড়ে । আরও যাহা এক—নিষ্কল নিরংশ পূর্ণ তত্ত্ব, তাহা কিরূপে বহু অংশে বিভক্ত হইয়াও নিরংশ থাকেন ও সর্ব অংশের নিয়ন্তা থাকেন, তাহা আমাদের জ্ঞানে ধারণা হয় না । আর এইরূপ ভেদাভেদবাদ বা ভেদবাদ বেদান্তের ‘সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম’ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ইত্যাদি অভেদ প্রতিপাদক বাক্যের বিরোধী বোধ হয় । গীতা হইতেও এ বাদ স্থাপিত হয় নাই । যদি জীব-ব্রহ্মে বা জীব-ঈশ্বরে ভেদ নিত্যসিদ্ধ হইত, যদি যুক্তিতেও এ ভেদ দূর হইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে গীতার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বা ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্তি সম্বন্ধে উপদেশ বৃথা হইত । * গীতায় যে সর্বভূতে একভাব

* গীতায় ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি সম্বন্ধে—৪২৪, ৬২৭, ১৪২৬, ১৮৫৪ শ্লোক, এবং
‘ব্রহ্মভাব ঈশ্বরভাব প্রাপ্তি সম্বন্ধে—৪১০, ৮৫, ১৩১৮, ১৪১৯ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

দর্শনের এবং সর্বভূতে ব্রহ্মভাব বা সমস্ত দর্শনের উপদেশ আছে, তাহা বার্থ হইত ।

অন্য দিকে, যদি শঙ্করের অভেদবাদ গ্রহণ করা যায়, তবে বিধিনিষেধ শাস্ত্র সমুদায়ও ব্যর্থ হয় । শঙ্কর এই আপত্তির যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত মনে হয় না । গীতাতেও নানারূপ সাধনার উপদেশ আছে । গীতার জীবাশ্মার ব্রহ্মভাব বা ঈশ্বরভাব লাভ করিবার জন্য কন্মযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগরূপ বিভিন্ন সাধনার উপদেশ আছে । কিন্তু শঙ্করের মত গ্রহণ করিলে, এ সকল ব্যর্থ হয় । যখন জীবাশ্মার ব্রহ্মভাব নিত্য সিদ্ধ—জীবাশ্মা যখন নিত্য শুদ্ধমুক্তবুদ্ধস্বভাব, তখন তাহার স্ব-ভাব লাভের জন্য কোন সাধনার প্রয়োজন হয় না । তবে অজ্ঞান বা আবৃত্তা হেতু যে বন্ধভাব বা সংসারিতাব হয়, তাহা দূর করিবার জন্য জ্ঞানদ্বারা সেই অজ্ঞানকে দূর করিতে হয়, এই মাত্র প্রয়োজন । ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত । সুতরাং এ মতে গীতার সকল প্রকার সাধনার উপদেশ ব্যর্থ হয় । জীবাশ্মার বা প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাশ্মার পরমার্থতঃ অভেদ থাকিলেও সংসার-দশায় এবং পরা মুক্তির পূর্ব পর্য্যন্ত এ ভেদভাব বাস্তবিক সত্য, ইহা সিদ্ধান্ত না করিলে, সে ভেদ দূর করিবার জন্য গীতাক্ত সাধনার সার্থকতা থাকে না ।

অতএব কেবল অভেদবাদ বা কেবল ভেদবাদ ধারণা করা যায় না । উক্ত ভেদাভেদবাদও আমরা ধারণা করিতে পারি না । এই ভেদাভেদবাদও আমাদের অচিন্ত্য । এক অদ্বয় তত্ত্ব কিরূপে কেন বহু হন— বা বহুর গ্ৰাম হন, কেন নানাবিধ ভাবে অভিব্যক্ত হন, তাহা আমরা বুঝি না । ভগবান্ বলিয়াছেন, আমার এ 'প্রভব'—দেবমানব বা মানুষ কেহই জানে না । (গীতা ১০।২) ।

সুতরাং যুক্তি ও বিচার দ্বারা কোন বাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করা যথা । গীতার বাহ্য উপদিষ্ট হইয়াছে, গীতা সমন্বয়পূর্বক, ও তাহার

সহিত শ্রুতি প্রভৃতি সমন্বয় পূর্বক তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে, এবং গীতোক সাধনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়া চিত্ত নির্মল করিয়া ও যোগদৃষ্টি লাভ পূর্বক সেই তত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিতে হইবে ও তাহা অনুভব করিতে হইবে। তবে আমরা সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব। এ জ্ঞান লাভের পূর্বে গীতা ও শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্র সমন্বয় পূর্বক প্রথমে এ শ্লোকের অর্থ বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ এ উভয়ের জ্ঞানই জ্ঞান। এক অর্থে ইহা ব্যতীত জ্ঞানের বিষয় আর কিছুই নাই। জ্ঞান যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়রূপে ভিন্ন হয়, সেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলেই জ্ঞানের চরিতার্থতা হয়। যাহা জ্ঞেয় 'ইদং' সে সমুদায়ই সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে এস্থলে ক্ষেত্র নামে অভিহিত। আর যাহা জ্ঞাতা—তাহা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে অভিহিত। ক্ষেত্রজ্ঞকে প্রতি ব্যষ্টি ক্ষেত্রে স্থিত 'আত্মা'রূপে দেহী পুরুষরূপে, এবং সমষ্টি ক্ষেত্রে অন্তর্যামী নিয়ন্তা ঈশ্বর পরমাত্মারূপে জানিতে হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞাতাকে প্রতিক্ষেত্রে পরিচ্ছিন্ন 'অহং' ও সর্বক্ষেত্রে সমষ্টিভাবে অপরিচ্ছিন্ন সর্বক্ষেত্রে 'অহং' রূপে জানিতে হয়।

এই প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্রমধ্যে পৃথক্ ভাবে—ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ করিয়া জানিতে হয়, এবং সেই জ্ঞান হইতে সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হয়। এইরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান হইলে, এ উভয়ের সমন্বয়ে এ উভয়কে একীভূত করিয়া, তবে পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারা যায়,—যাহাতে 'সর্বং খল্বিদং' এবং সর্বং 'অহং' ভাব একীভূত, সেই পরম তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। য'হাকে জানিতে হয়—তাহা 'জ্ঞেয়', তাহার সম্বন্ধে 'জিজ্ঞাসা' হয়।—ক্ষেত্র অবশ্য এইরূপে 'জ্ঞেয়'। কিন্তু জ্ঞাতা যিনি, তিনি জ্ঞেয় হন কি? শঙ্কর বাণীয়াছেন যে, জ্ঞাতা কখন জ্ঞেয় হন না। এই তত্ত্ব সহজে ধারণা হয় না। 'জ্ঞেয়' যাহা, তাহা জ্ঞাতা নহে, অথচ গীতার পরম ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, ঈশ্বরকে বিজ্ঞান সহিত জানিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ঈশ্বর—‘বেত্তাসি বেত্তঞ্চ’ (গীতায় ১১।৩৮), ব্রহ্ম ‘জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং’ (গীতায় ১৩।১৭) । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, ব্রহ্ম জ্ঞাতার জ্ঞাতা । সে তত্ত্ব কিরূপে জ্ঞেয় হইবে, বা জিজ্ঞাসার বিষয় হইবে, ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না । ‘জ্ঞাতা’ ও ‘জ্ঞেয়’ এ উভয় তত্ত্ব—যে ভূমিতে একীভূত, সে ভূমি না লাভ করিলে, ইহা অনুভব করা যায় না । এস্থলে এই মাত্র বলা যায় যে, জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বের মধ্যে—তাহার ‘আত্ম-প্রত্যয়’ মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয় বলিয়া তাহা ‘জ্ঞেয়’ বলা যায় । তাহা জ্ঞেয় ‘ইদং’ নহে । জ্ঞাতৃত্ব জ্ঞেয় সম্বন্ধে অপরোক্ষভাবে জ্ঞানের মধ্যেই অনুভূত হয় । এই অর্থে ‘জ্ঞাতা’ জ্ঞেয় হন । এই অর্থে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, ঈশ্বরতত্ত্বও জ্ঞানের বিষয় হয়, এবং তাহা আনিবার উপদেশ সার্থক হয় । কিন্তু তাহা বাহ্য বিষয়জ্ঞানের জ্ঞায় জ্ঞেয় নহে । জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই জ্ঞানের অন্তর্ভূত হয় । তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই জ্ঞান । এই ত্রয়োদশ হইতে শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতায় এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । বলিয়াছি ত, ক্ষেত্রই প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সাংখ্যোক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব । পরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে ইহা বিবৃত হইয়াছে । তাহাই সমষ্টিভাবে ও ব্যষ্টিভাবে শরীর বা ক্ষেত্র । এই প্রকৃতি-তত্ত্ব প্রকৃতিজ ত্রিগুণ তত্ত্ব—সমুদায়ই এই তৃতীয় ষট্কে বিবৃত হইয়াছে । আর ক্ষেত্রজ্ঞ বা ত্রিবিধ পুরুষতত্ত্ব—সমুদয়ও এই ষট্কে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে । ইহাই সমষ্টিভাবে সমগ্র ব্রহ্মতত্ত্ব বা তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন ।

সুতরাং এই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে যাহা সূত্ররূপে উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই তৃতীয় ষট্কে বিস্তারিত হইয়াছে । এই ষট্কে ষত্ব অগ্রসর হওয়া যাইবে, ততই এই দুই শ্লোকের অর্থ প্রান্তভাষ্য ও পারক্ষুট হইতে থাকিবে,—ততই আমাদের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান লাভ হইবে । এস্থলে তাহার আভাসমাত্র পাইলেই স্বেপ্ত হইবে ।

এই দুই শ্লোক হইতে আমাদের এইমাত্র জানিতে হইবে যে, প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্ত আমাদের “ক্ষেত্র” কি, তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন, এবং সেই ক্ষেত্রের বেত্তা ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ ও সর্বক্ষেত্রের বেত্তা ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ কে, তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন। সংক্ষেপতঃ এই শরীরই ক্ষেত্র, এই শরীরের বেত্তা যিনি, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, আর সর্বক্ষেত্রে বা এই চরাচর জগতে সমষ্টিভাবে বেত্তা বা ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি, তিনি পরমাত্মা পরমেশ্বর। জ্ঞানযোগে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান-সিদ্ধি হয়। এই জ্ঞানই পরমার্থ জ্ঞান—মুক্তি-হেতু।

— — —

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩

— — —

সে ক্ষেত্র যা’, যে প্রকার, যে বিকারযুত
যা’ হ’তে, যা’ হয় আর,—সে ক্ষেত্রজ্ঞ পুনঃ—
যাহা, যে প্রভাবযুত,—শুন সংক্ষেপেতে ॥ ৩

৩। সে ক্ষেত্র যা’—পূর্বে ‘ইদং শরীরং’ এই বাক্যের দ্বারা নির্দিষ্ট যে ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্র ষেরূপ (শরীর)। সেই জ্ঞাতব্যঃক্ষেত্র ষেরূপে যে ভাবে—জ্ঞেয় (গিরি)। সেই ক্ষেত্র যে দ্রব্য (রামানুজ, কেশব, বলদেব), বা যদাত্মক (হনু)। যে শরীরের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহা স্বরূপতঃ যে জড় দৃশ্য পরিচ্ছিন্ন ইত্যাদি স্বভাবযুক্ত (স্বামী, মধু)। যদিও চতুবিংশতি তত্ত্বে বিভক্ত যে মূল প্রকৃতি, তাহাই ক্ষেত্র, ইহাই এস্থলে অভিপ্রেত, তথাপি দেহরূপে পরিণত ইহাতে ‘অহং’ এইরূপ অবিবেক হয়। সেই অবিবেক দূর করিবার জন্ত এই দেহ সম্বন্ধে উপদেশ, (স্বামী)।

যে প্রকার—(ষাদৃক্)—ইহা স্বকীয় ধর্মের দ্বারা ষাদৃশ প্রতীয়মান হয় (শঙ্কর) । জন্মাদি তাহার ধর্ম যেরূপ (গিরি) । ধর্মতঃ যে প্রকার (কেশব) । যে আশ্রয়ভূত (রামানুজ, বলদেব) । যেরূপ ইচ্ছাদি ধর্মযুক্ত (স্বামী, মধু) ।

যে বিকারযুত—(যদ্বিকারি)—যাহা ইহার বিকার (শঙ্কর) । যে সকল কার্য ইহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই কার্যের কারণরূপ (গিরি, রামানুজ) ; যে ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত (স্বামী) । ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যে বিকারযুক্ত (মধু) । যে সকল বিকার দ্বারা যুক্ত (কেশব) ।

‘যা’ হতে, ‘যা’ হয়—(যতশ্চ যৎ)—যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, ও যে কার্য উৎপাদন করে (শঙ্কর, মধু) । যাহা হইতে ইহা উৎপন্ন, ও যে প্রয়োজনে উৎপন্ন (রামানুজ, বলদেব) । যেরূপ প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে উৎপন্ন ও যে প্রকার স্থাবর-জঙ্গমাди-ভেদে ভিন্ন (স্বামী, মধু, কেশব) ।

সে ক্ষেত্রজ্ঞ পুনঃ—(স চ)—আর যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া নির্দিষ্ট, তিনি (শঙ্কর, রামানুজ, গিরি, স্বামী) । আর সেই ক্ষেত্রের গ্রাম যে ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞাতব্য, যাহা চক্ষুঃ প্রভৃতি উপাধিকৃত দৃষ্টি প্রভৃতি শক্তিবলে জ্ঞাতব্য হইয়াছে (গিরি) । সেই জীব ও পরমেশ-লক্ষণ ক্ষেত্রজ্ঞ (বলদেব) । পূর্বেক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ (কেশব) ।

যাহা—(যঃ) স্বরূপতঃ যাহা (রামানুজ, স্বামী) । যে স্বপ্রকাশ তৈত্ত্ব আনন্দ-স্বভাব (মধু) । যে স্বরূপ (কেশব) ।

যে প্রভাবযুত—যে উপাধিকৃত শক্তিয়ুক্ত (শঙ্কর, মধু) । অচিন্ত্য ঐশ্বর্যযোগে যে প্রভাব-সম্পন্ন (স্বামী) । যে শক্তিয়ুক্ত (বলদেব) । যজ্ঞ হইয়াও ব্যাপক, ইত্যাদিরূপ অচিন্ত্য প্রভাবযুক্ত (বলভ) । যে প্রভাব দ্বারা ইহা জ্ঞাতব্য (গিরি) । ইহার যে সকল প্রভাব (কেশব) ।

শুন সংক্ষেপেতে—সেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যথার্থ তত্ত্ব সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর (শঙ্কর) ।

এই ক্ষেত্র কি, তাহার ধর্ম কি, তাহার বিকার কি, তাহার কারণ কি, ও তাহার কার্য কি,—এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা ও যেরূপ প্রভাব-যুক্ত, তাহাই ভগবান্ সংক্ষেপে অর্জুনকে শ্রবণ করাইতেছেন । সংক্ষেপে শ্রবণ করাইবার কারণ পরবর্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । সংক্ষেপ হইলেও সমগ্র তৃতীয় ষট্কে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে । এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, এ শ্লোকে একই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ ও প্রভাবের কথা উক্ত হইয়াছে । এখানে ক্ষেত্রজ্ঞের কোন ভেদ উক্ত হয় নাই ।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪

ঋষিগণ দ্বারা ইহা গীত বহুরূপে,—
বিবিধ পৃথক্ ছন্দে, আরও কতরূপ—
যুক্তিযুক্ত সুনিশ্চিত ব্রহ্মসূত্রপদে ॥ ৪

৪ । ঋষিগণ—বশিষ্ঠাদি (শঙ্কর, স্বামী) । আশ্রম ঋষিগণ (গিরি) । পরাশরাদি (রামানুজ, বলদেব, কেশব) ।

গীত—নিরূপিত (স্বামী, কেশব) । কথিত (শঙ্কর) ।

বহুরূপে—(বহুধা)—যোগশাস্ত্রে ধ্যান-ধারণাদির বিষয় ‘বিরাট’ ইত্যাদি স্বরূপে নানা প্রকারে (স্বামী, মধু) । ধর্ম-শাস্ত্রে নানা প্রকারে, (মধু) । বহুপ্রকারে (কেশব) । রামানুজ ও বলদেব এই গীতের কিঞ্চিৎ ‘পরাশরস্মৃতি’ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন । যথা—

“অহং বৃক্ষ তথাশ্চে চ ভূতৈরুহ্যাম পার্শ্বিব ।

শুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোহপি যাত্যয়ম্ ॥

কর্ষবশা গুণা হ্যেতে সস্বাভ্যাঃ পৃথিবীপতে ।
 অবিষ্ঠাসঞ্চিতং কর্ষ তচ্চাশেষেষু জন্তুযু ॥
 আত্মা শুক্লোহক্ষরঃ শাস্তো নিশ্চরণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
 তথা পিশুঃ পৃথক্ পুংসঃ শিরআস্যাঙ্গি-লক্ষণঃ ॥
 ততোহহমিতি কুত্রৈতাং সংজ্ঞাং রাজন্ করোম্যাহম্ ॥

• • • * *

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিং সস্বং তেজোবলং ধৃতিঃ ।
 বাসুদেবাত্মকাগ্ৰাহঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজমেব চ ॥” ইত্যাদি

ইহা—এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের প্রকৃত স্বরূপ (শঙ্কর) । শঙ্কর বলিয়া-
 ছেন যে, শ্রোতার বুদ্ধি-প্ররোচনের জগু এইরূপে এই ক্ষেত্রজ-তত্ত্বের
 প্রশংসা এস্থলে করা হইয়াছে । স্বামী প্রভৃতি বলেন, যে তত্ত্ব অগুত্র
 বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে একত্র এস্থলে
 সংগৃহীত হইয়াছে, ইহাই এরূপ বলিবার অভিপ্রায় ।

বিবিধ পৃথক্ ছন্দে—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ষ—বেদের এই
 সংহিতার নানা প্রকারে বিভিন্ন পৃথক্ ভাবে এই তত্ত্ব এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-
 স্বরূপ বিবেকতঃ বর্ণিত হইয়াছে (স্বামী) । বিবিধ অর্থাৎ নানা-
 প্রকারে, পৃথক্ অর্থাৎ বিবেকতঃ (অর্থাৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ বিভাগ পূর্বক),
 (শঙ্কর) । নানা প্রকার বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত বেদে (গিরি) ।

নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যকর্মাঙ্গি-বিষয়ক বেদ দ্বারা নানা পূজনীয় দেবতা-
 রূপে গীত (স্বামী) । বিবিধ নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যকর্মাঙ্গি-বিষয়ক
 ঋক্ প্রভৃতি মন্ত্রে এবং ‘ব্রাহ্মণে’ পৃথক্ ভাবে গীত (মধু) ।
 বেদে বিবিধ কর্ষজ্ঞান উপাসনা নানারূপে, এবং অধিকারি-ভেদে
 পৃথক্ ভাবে গীত (বল্লভ) ।

রামানুজ, কেশব ও বলদেব, ইহার এই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—

“তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সন্তুতঃ আকাশাঃ বায়ুঃ,

বায়োরথিঃ, অগ্নেঃ আপঃ, অদ্ব্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যা ওষধমুঃ, ওষধিত্যো-
হন্নং, অন্নং পুরুষঃ । স বা এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ ।”

(কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।১।১)

এইরূপে অন্নরসময় পুরুষের, বা সেই শরীরভিমানী পুরুষের কথা উক্ত
হইয়াছে । পরে তাহা হইতে ভিন্ন প্রাণময় কোষ, প্রাণময় কোষ হইতে
ভিন্ন মনোময় কোষ, মনোময় কোষ হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানময় কোষ—ইহা
উক্ত হইয়াছে । আর বিজ্ঞানময় কোষ যে বিজ্ঞানাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ, তাহা
কথিত হইয়াছে । পরে “তস্মাদ্বা এতস্মাৎ মনোময়াৎ অন্তোহন্তরো স্মাত্মা
বিজ্ঞানময়ঃ”—এই বাক্য দ্বারা এই ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে,
এবং এই বিজ্ঞানময় শরীর-অভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ হইতে ভিন্ন
আনন্দময় কোষ-অভিমানী অন্তরাত্মা যে ক্ষেত্রজ্ঞেরও অন্তরাত্মা বা
শান্ত পরমাত্মা, তাহা অভিহিত হইয়াছে, (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্
ব্রহ্মানন্দবল্লী দ্রষ্টব্য) । এইরূপে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদে ক্ষেত্রজ্ঞের
স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে, অথবা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ পৃথক্ ভাবে, তাহাদের
ব্রহ্মাত্মস্বরূপ সুস্পষ্ট গীত হইয়াছে ।

ব্রহ্মসূত্রপদে—ব্রহ্মের স্বরূপপ্রকাশক যে সকল মহাবাক্য আছে,
ঐ সকল বাক্যের সাহায্যে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় । এজ্ঞ
এগুলিকে পদও বলা যায় । “আত্মা ইতি এব উপাসীত”—ইত্যাদি
বেদান্তবাক্য সমূহই ব্রহ্মসূত্রপদ (শঙ্কর, গিরি) । বাহাতে ব্রহ্ম
স্মৃতিত বা প্রতিপাদিত হন, সেই সকল বাক্য ব্রহ্মসূত্র । “যতো বা
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্তি অভিসং-
বিশন্তি”...ইত্যাদি—তটস্থ-লক্ষণপর উপনিষদ্বাক্য সকল—বাহাতে
সাক্ষাদভাবে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত, তাহাই ব্রহ্মসূত্রপদ । উপনিষদ্বাক্য
ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ-জ্ঞাপকও বটে । “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”—ইহা
ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ-প্রতিপাদক পদ । ইহাই ব্রহ্মসূত্রপদ । অথবা

ব্রহ্মসূত্রপদই বেদান্ত-দর্শন । ‘অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’—ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র-
পদ । (স্বামী, মধু) ।

ব্রহ্ম-প্রতিপাদক সূত্রার্থ্য পদ বা বাক্যই শারীরক সূত্র বা বেদান্ত-
দর্শন । বেদান্ত-দর্শনে—“ন বিয়দ শ্রুতেঃ” প্রভৃতি সূত্রে ক্ষেত্রের স্বরূপ
বর্ণিত হইয়াছে, ‘ন আত্মা শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ’—ইত্যাদি সূত্রে জীবস্বরূপ
প্রতিপাদিত হইয়াছে,—“পরাত্ত তু তৎশ্রুতেঃ”—ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্ম
। ঈশ্বর-স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে (রামানুজ, বলদেব, কেশব,
বল্লভ) । কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন,—

“যে অশ্রীক্ষর বাক্যে ব্রহ্ম সূত্রিত বা বেষ্টিত হন, তাহা ব্রহ্মসূত্রপদ ।
বেদেই এই সকল ব্রহ্মসূত্রপদ আছে,—তাহাতে স্বরূপ গুণ বিভূতি সহিত
ব্রহ্মত্ব সূত্রিত হইয়াছে । সূত্রের লক্ষণ এই,—

“স্বশ্রীক্ষরমসন্ধিগ্গং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্ ।

অস্ত্যভমনবদ্বৃক্ষ সূত্রং সূত্রবিদো বিহঃ ॥”

অথবা ব্রহ্মসূত্র অর্থে শারীরক মীমাংসা-সূত্র । তাহাতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-
স্বরূপ যথাস্থ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

“আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম প্রতিপাদক পদ কিরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-
প্রতিপাদক পদ হইতে পারে ? আর যাহাতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ প্রতিপাদিত
হইয়াছে, তাহাকেই বা কিরূপে ব্রহ্মসূত্রপদ বলা যায় ? ইহার উত্তর
এই যে, ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণের অসাধারণ হেতু,—ব্রহ্মের জগৎ জন্মাদির
উপাদানত্ব, জগতের নিয়ন্তৃত্ব, প্রবর্তকত্ব, স্বতন্ত্রত্ব, ব্যাপকত্ব, অনুগ্রাহকত্ব
ইত্যাদি ধর্মের নিরূপণ । ব্রহ্ম-উপাদেয়ত্ব তৎ-নিয়ম্যত্ব, তৎ-প্রবর্তকত্ব,
তৎ-তন্ত্রত্ব, তদ্ব্যাপ্যত্ব, তদনুগ্রাহত্ব ইত্যাদি ধর্মাবচ্ছিন্ন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-
স্বরূপ নিরূপণ বিনা ইহা উপপন্ন হয় না । অতএব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-প্রতি-
পাদন দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হন । এই জন্ত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-প্রতিপাদক
পদও ব্রহ্মপ্রতিপাদক । বেদান্ত-দর্শনে “ন বিয়দ শ্রুতেঃ” ইত্যাদি পদ

দ্বারা কার্য-কারণ ভাবে ক্ষেত্র-নির্গম হইয়াছে ও “নাশ্বাশ্বতে-
নিত্যত্বাচ্চ” ইত্যাদি সূত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ নির্ণীত হইয়াছে ।”

যুক্তিযুক্ত, সুনিশ্চিত—(হেতুমস্তির্বিনিশ্চিতৈঃ)—এই সকল
ব্রহ্মসূত্রপদ যুক্তিযুক্ত, এবং ইহা দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাতে সংশয় থাকে
না,—সে জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক, (শঙ্কর)। তাহা হেতুযুক্ত, ও নির্ণয়াত্মক
(রামানুজ)।

ইহাই সূত্রের লক্ষণ । সূত্র অজ্ঞাত অর্থের বোধক, এজন্য ইহা
হেতুমৎ । ইহাতে নিশ্চিত অর্থ অবধারিত হয়, এজন্য ইহা সুনিশ্চিত
পদ (কেশব)।

এ সম্বন্ধে উপনিষদ্বাক্য যে যুক্তিযুক্ত, তাহার দৃষ্টান্ত এই :—

‘স দেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ, ... কথমসতঃ সজ্জায়েত । কো-
হবাশ্রাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন শ্রাৎ এষ হ্যেব আনন্দো
যাতি’... ইত্যাদি । আর তাহা যে বিনিশ্চিত, অর্থাৎ উপক্রম উপসংহারে
একবাক্য হেতু অসন্দিগ্ধভাবে অর্থপ্রতিপাদক, তাহাও সে স্থলে বিস্তারিত
ভাবে বর্ণিত হইয়াছে (স্বামী, কেশব, মধু)। বেদান্ত-দর্শনেও “ঈক্ষতে
নাশকং” “আনন্দমরোভ্যাসাৎ” ইত্যাদি যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব নিশ্চিতরূপে
প্রতিপাদক সূত্রপদও আছে, (স্বামী)। বিনিশ্চিত—অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ
স্বানুভবপ্রতিপাদক (বল্লভ)।

শ্লোকার্থ ।—এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব, পূর্বে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়
শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে । এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বই সমগ্র তত্ত্ব
(গীতা ১৩।২৬)। ভোক্তা (ক্ষেত্রজ্ঞ জীব) ভোগ্য (জড় ক্ষেত্র) এবং
প্রেরয়িতা (সর্ব-ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর)—ইহাই যে ত্রিবিধ ব্রহ্ম, তাহা শ্বেতাশ্বতর
উপনিষদে (১।১২) উক্ত হইয়াছে । ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্র-
জ্ঞের জ্ঞানই জ্ঞান (গীতা, ১৩।২)। উক্ত শ্লোকে এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব
সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । ইহা বহুরূপে নানাপ্রকারে বিস্তারিত ভাবে

কোথায় বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে । কোথায় এই তত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই শ্লোকের অর্থ হইতে জানা যায় । সমুদায় ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, এই তত্ত্ব (১) ঋষিগণ দ্বারা, (২) বিবিধ ছন্দ দ্বারা এবং (৩) ব্রহ্মসূত্রপদ দ্বারা বহুরূপে গীত হইয়াছে । যজুসূদন বলিয়াছেন, ঋষিগণ দ্বারা—ধর্ম্ম-শাস্ত্রে, ছন্দ দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণ দ্বারা, এবং ব্রহ্মসূত্রপদ দ্বারা—অর্থাৎ উপনিষদ বা জ্ঞানকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদান্ত অথবা বেদান্ত-দর্শন দ্বারা ইহা বিবৃত হইয়াছে ।

কিন্তু ইহার আর এক অর্থ হইতে পারে । ঋষিগণই এ তত্ত্ব নানা-রূপে প্রচার করিয়াছেন । ছন্দ ও ব্রহ্মসূত্রপদ দ্বারাই তাঁহারা এই পরমার্থ-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন । এ শ্লোকে, ঋষিগণ কর্তা আর ছন্দ ও ব্রহ্মসূত্রপদ, করণ মাত্র । ইহাই সঙ্গত অর্থ । ঋষি, ছন্দ ও ব্রহ্মসূত্রপদ সমানাধিকরণ নহে, আর ঋষিগণের উক্তি ছন্দ ও ব্রহ্মসূত্রপদ ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না । ঋষিগণ ত্রিকালদর্শী । তাঁহারা অতীত-অনাগত-দ্রষ্টা (ষাঙ্ক) । তাঁহারাই বেদমন্ত্র-দ্রষ্টা । তাঁহারাই আপ্ত । তাঁহাদের বাক্যই প্রামাণ্য ।

এই অর্থে, এক আপত্তি হইতে পারে যে, বেদ বা ছন্দ ত অপৌরুষেয় । বেদ—শ্রুতি । তাহা পরম্পরাগত । সূত্ররাং বেদ ত ঋষি-বাক্য নহে । কিন্তু ইহা বলা যায় না । বেদ অপৌরুষেয় হইলেও বেদ-মন্ত্রের যাহারা দ্রষ্টা, তাঁহারাই ঋষি । ঋগ্বেদে প্রতি সূক্তের দ্রষ্টা ঋষির নাম আছে । ঋগ্বেদের প্রধান মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি সাত জন । তাঁহাদিগকে সপ্তর্ষি বলে । ঋগ্বেদে মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষির সংখ্যা সর্বশুদ্ধ তিন শত উনত্রিশ জন । তন্মধ্যে সপ্তর্ষিগণই প্রধান । উক্ত সপ্তর্ষিগণের নাম,—বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, অত্রি ও কশ্যপ । অন্য ঋষিগণের মধ্যে, এস্থলে গৃৎসমদ, মেধাতিথি, অগস্ত্য, দীর্ঘতমা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে ।

অতএব যাহারা বেদমন্ত্র-দ্রষ্টা, তাহারাই ঋষি । বেদ অপৌরুষের সত্য,—তাঁহা নিঃস্বসিতবৎ সৃষ্টিকালে হিরণ্যগর্ভ বা মহাত্মত হইতে স্বতঃ প্রকাশিত । যে বিদ্যা বা যে জ্ঞান নিত্য, যাহা সত্য, যাহার মূলে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত, যে শব্দব্রহ্ম (Word) এই জগৎরূপে—যে Thought এই Being রূপে অভিব্যক্ত,—তাঁহাই বেদ । ব্রহ্মের বহু হইবার ঈক্ষণ হইতে যে জগতের কল্পনা,—তাঁহা নাম রূপের দ্বারা ব্যাকৃত হয় । (তৈত্তিরীয় উপঃ ২।৩।১ দ্রষ্টব্য) । মূল বেদ সেই ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎরূপে অভিব্যক্তির বা বিকাশের তত্ত্ব-প্রকাশক । ব্রহ্মজ্ঞান যেরূপে বিবর্তিত হইয়া জীর্ধজড়ময় জগৎ প্রকাশ করে, সেই জ্ঞান বাক্য বা শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত হয় । বাক্য বা শব্দ দ্বারা জ্ঞান যেরূপে বিবর্তিত হইয়া জগৎরূপ হয়, যাহা logical development of the Logos, তাহাই বেদ । বেদ ব্রহ্মেই অভিব্যক্ত, সূত্রাং নিত্য—অপৌরুষেয়, তাহা কোন পুরুষের সৃষ্ট নহে । কিন্তু সেই সকল নিত্য সত্য, যাহা হিরণ্যগর্ভের মূধ্যে নিহিত, তাহা যথাকালে ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ দ্বারাই প্রকাশিত হয় । ষিনি ত্রিকালদর্শী ঋষি, তিনিই এই সকল সত্য দর্শন করেন—অন্তরে যোগদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেন, এবং তাহা লোকহিতার্থে প্রচার করেন । আমাদের ঋষিগণ যে সত্য এইরূপে দর্শন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের বেদ । এই জন্ত নিরুক্ত অনুসারে ঋষির অর্থ বেদমন্ত্র-দ্রষ্টা । তাহারা সত্য দর্শন—করেন বা আবিষ্কার করেন (discover করেন) হাভ, তাহারা তাহার সৃষ্টি (invent) করেন না । সত্য নিত্য—তাহার সৃষ্টি নাই ।

ঋষিগণ যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন, তাহাই আমাদের বেদরূপে সংগৃহীত । বেদের মূলমন্ত্র গুলি ঋক্ । কতকগুলি মন্ত্র মিলিয়া এক এক সূক্ত । এই সূক্ত গুলি ঋগ্বেদরূপে সংগৃহীত । তাহার যে অংশ গীত হয়, তাহা সামবেদ । তাহার যে অংশ যজ্ঞে বিনিয়োগ হয়, প্রধানতঃ তাহাই—যজুর্বেদ । ইহাই ত্রয়ো । বেদের দুই অংশ—সংহিতা, এবং ব্রাহ্মণ । সংহিতা অংশকেই ছন্দ

বলে । তাহাই বেদের মন্ত্র-ভাগ । ‘ব্রাহ্মণের’ শেষ অংশ ‘আরণ্যক’ ।
 আরণ্যকের শেষ অংশ উপনিষদ । এ সকলই শ্রুতি—বেদের অন্তর্গত,
 কিন্তু ইহার “ছন্দ নহে” । বেদান্ত—শিক্ষা, কল্পসূত্র প্রভৃতিও বেদের
 অন্তর্গত । তাহা শ্রুতিও নহে । বেদের সংহিতা অংশ প্রধানতঃ শ্রুতি
 হইলেও, ব্রাহ্মণ অংশকেও শ্রুতি বলে । সকল শ্রুতিরই দ্রষ্টা ঋষিগণ ।
 মতএব ঋষিগণ যে সত্য দর্শন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা
 বহু অতীতকাল হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রুত হইয়া শিষ্যগণ লাভ
 করিয়া আসিতেছিলেন,—তাহাই শ্রুতি । বেদব্যাস ইহার যে অংশ সংগ্রহ
 করিয়া চারি বেদরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই বেদ-সংহিতা ।
 তাহা বেদের মন্ত্রভাগ । তাহাই ছন্দ । আর শ্রুতির অপর অংশমধ্যে
 যাহা ব্রহ্মপ্রতিপাদক জ্ঞানকাণ্ডীয়ক, তাহা ব্রহ্মসূত্রপদ বা উপনিষদ ।
 ঋষিগণই বিবিধ ছন্দে ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্লোকে ও উপনিষদ বা
 বেদান্তবাক্যে এ তত্ত্ব প্রচার করেন । সেই ছন্দে এবং প্রাচীন
 শ্লোকে বা উপনিষদে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব নানাপ্রকারে প্রচারিত
 হইয়াছে ।

অতএব এস্থলে সঙ্কলিতার্থ এই যে, এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব,—যাহা
 ব্রহ্ম-তত্ত্বের অন্তর্গত, তাহা ঋষিগণ পূর্বে বিস্তারিতভাবে, নানাপ্রকারে
 বেদ-সংহিতায় ও বহু ব্রহ্মসূত্রপদে বিবৃত করিয়াছেন ।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, বেদে ত বহু দেবতার স্তুতি আছে
 মাত্র, তাহাতে ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব বা জগতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ কোথাও
 নাই । ঋগ্বেদে বহু দেবতার স্তুতি আছে সত্য, কিন্তু সকল দেবতাই
 সে সেই “এক” আত্মার বিভূতি, সেই এক আত্মারই যে অধিদৈবতরূপ,
 কর্মবিভাগ হেতু যে কর্মের নিয়ন্তা পরমাত্মার অনন্ত ভাগ্য বা শক্তি
 রূপ এই বিভাগ-কল্পনা, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে । নিরুক্তকার এইরূপ
 ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ঋগ্বেদেই ইহা উক্ত হইয়াছে । যথা—

“ইন্দ্রম্ মিত্রম্ বরুণম্ অগ্নিমাহুঃ
 অথো দিব্যঃ স সুপর্ণঃ গরুয়ান্ ।
 একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি
 অগ্নিম্ যমম্ মাতরিশ্বানম্ আহুঃ ॥”

(ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬)

ঋগ্বেদ অনুসারে সৃষ্টির পূর্বে সেই একই ছিলেন, ইহাও উক্ত হইয়াছে । সৃষ্টি সম্বন্ধে “নাসদাদীম্” শ্লোকে আছে—

“অনৌদং অবাভং স্বধয়া তদেকম্ ।
 তস্মাৎ হ অন্তঃ ন পরঃ কিঞ্চ আস ॥”

(ঋগ্বেদ ১০।১২২ শ্লোক) ।

“সুপর্ণম্ বিপ্রাঃ কবয়ঃ বচোভিঃ

একম্ মন্ত্রম্ বহুধা কল্পয়ন্তি । (ঋক্, ১০।১১৪।৫-৬)

ঋগ্বেদে যেমন নিগুণ ‘তৎ’পদবাচ্য ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, সেইরূপ সগুণ ‘সঃ’ পদবাচ্য ব্রহ্মও প্রতিপাদিত হইয়াছেন ।

ঋগ্বেদে আছে—

কঃ দদর্শ প্রথমম্ জায়মানম্

অস্থবনস্তং যৎ অনস্থা বিভর্তি ।

ভূম্যা অমুঃ অমৃক আত্মা কচিৎ

কঃ বিদ্বাসং উপপাৎ প্রষ্ঠুসেদৎ”

(ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪)

ঋগ্বেদে ‘কঃ’ ‘প্রজাপতি’ বিশ্বকর্মা প্রভৃতি দেবতার শ্লোকে জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বরের কথা আছে । ঈশ্বর এবং সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে, পরমাত্মা শ্লোক (১০।১২২) দেবীশ্লোক (১০।১২৫) এবং পুরুষ-শ্লোকই (১০।১২০) প্রধান । ঋগ্বেদে জীবাত্মার কথা (১০।১১৭) আছে । ঋগ্বেদে যুক্তিযুক্ত বাণী ঈশ্বরও পরমাত্মতত্ত্ব নিশ্চয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । যথা,—

“বি মে কর্ণা পতয়তঃ বি চক্ষুঃ
বি ইদং জ্যোতিঃ হৃদয়ে আহিতম্ যৎ ।
বি মে মনঃ চরতি দূর আধিঃ
কিম্ স্মিদ্ বক্ষামি, কিম্ উনু মানিষো ॥

(ঋগ্বেদ ৬।৯।৬) ।

অন্যত্র আছে—

“অচিকিৎসান্ চিকিৎসঃ চিৎ অত্র
কচিন্ পৃচ্ছামি বিদ্বনে ন বিদ্বান্ ।
বি যঃ তস্তস্তুষৎ ইমা রজাংসি
অজস্র রূপে কিমপি স্মিৎ একম্ ॥”

(ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৬) ।

এইরূপ অনেক মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে, যাহা দ্বারা এই “এক” ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ও ভাস্মান্ত শরীর হইতে আত্মার পার্থক্যতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব বিচার পূর্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেদ-সংহিতাই ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক জ্ঞানকাণ্ডের বা বেদান্তের মূল। উপনিষদে তাহাই বিস্তারিত হইয়াছে। উপনিষদে যে ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জগতত্ত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন। এস্থলে দৃষ্টান্ত দ্বারা আর তাহা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। অতএব এ শ্লোকের এ স্থলে যে অর্থ করা হইয়াছে যে, ঋষিগণ ‘ছন্দে’ ও ব্রহ্মমূত্রপদের দ্বারা, এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব নানারূপে ও পৃথক্ ভাবে কীর্তন করিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত।

ছন্দ ।—ছন্দ অর্থে ব্যাখ্যাকারগণ চার বেদ-সংহিতা (এবং কেহ কেহ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ উভয়ই) বুঝিয়াছেন। কিন্তু ছন্দ অর্থে মূল বেদ-সংহিতা। পশ্চাৎ যাহাকে ছন্দ বলে, তাহা সকলেই জানেন। ছন্দে মাত্রা বা অক্ষর আবৃত্তি নিয়মিত। ছন্দ নানা প্রকার। বেদ-সংহিতার ছন্দ প্রধানতঃ সাতপ্রকারঃ। কিন্তু আরও অনেক ছন্দ বেদে

ব্যবহৃত । প্রধান ছন্দগুলির নাম—গায়ত্রী, উষিক্, ককুভ্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী ও বিরাট্ (ষাক্) । ইহার কোন না কোন ছন্দে বেদমন্ত্র গ্রথিত । ছন্দে গ্রথিত বলিয়া বেদসংহিতাকে ছন্দ বলা যাইতে পারে । বেদের ব্রাহ্মণাংশ ছন্দের অন্তর্গত নহে ।

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ছন্দের আর এক অর্থ করেন । যে ভাষায় বেদ রচিত, তাহা ছন্দ । ছন্দই আমাদের প্রাচীন ভাষা । তাহাই ক্রম-পরিণত হইয়া পরে সংস্কৃত ভাষা হইয়াছে । ছন্দের ভাষা কেবল বেদেই নিবদ্ধ নহে । পারাশক্দিগের ধর্মগ্রন্থ ‘জেন্দাবস্ত’ ছন্দে রচিত । এছত্ত তাহার নাম ‘জেন্দ’ । জেন্দ শব্দ ছন্দেরই অপভ্রংশ । ছন্দের অপেক্ষাও যে প্রাচীন ভাষা ছিল, তাহাতে বেদের প্রাচীনতম ‘নিবিদ্’ অংশ রচিত । বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষাকে ‘গাথা’ও বলে । যাহা হউক, এস্থলে তাহা বুঝিবার আবশ্যক নাই । এস্থলে ছন্দের অর্থ যে বিভিন্ন অক্ষরবৃত্তিক ছন্দে রচিত বেদ-সংহিতা, তাহাই বুঝিতে হইবে ।

ব্রহ্মসূত্রপদ—শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রপদ অর্থে ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য, এবং তাহা উপনিষদ্—ইহাই বুঝিয়াছেন । রামানুজ প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ ব্রহ্মসূত্রপদ অর্থে “অধাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া যে উত্তর-সীমাংসা বা শারীরক সূত্র বা বেদান্ত-দর্শন বাদরায়ণ ব্যাস কর্তৃক রচিত, তাহাই বুঝিয়াছেন । কেহ বা উত্তর অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু ‘ব্রহ্মসূত্র-পদ’—এই বেদান্ত-দর্শন হইতেই পারে না । বেদান্ত-দর্শনে অনেক স্থলে “স্বতেশ্চ” “অপিচ স্বত্যাতে” ইত্যাদি সূত্রে ‘স্বতি’ শব্দের দ্বারা ভগবদ্-গীতার উল্লেখ আছে । সে স্থলে স্বতি অর্থে যে ভগবদ্গীতা, তাহা সকল ব্যাখ্যাকারগণই স্বীকার করিয়াছেন । (বেদান্ত-দর্শনের ১।২।৩ ; ১।৩।২২ ; ২।৩।৪৫ ; ৩।২।২৭ ; ৪।১।১০ প্রভৃতি সূত্র ও তাহার ভাষ্য এস্থলে দ্রষ্টব্য) । অতএব বেদান্ত-দর্শনে সিদ্ধান্ত স্থাপন করি যখন ভগবদ্গীতার শ্লোক প্রমাণ

স্বরূপ গ্রহীত হইয়াছে, তখন বেদান্তদর্শন অবশ্য ভগবদ্গীতার পরবর্তী গ্রন্থ। তাহা হইলে গীতার বেদান্ত-দর্শনের উল্লেখ থাকিতে পারে না। আর যদি বেদান্ত-দর্শন ও গীতা উভয়ই বেদব্যাঙ্গ কর্তৃক গ্রথিত বলা যায়, তবে ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্গ যে নিজের দর্শন-শাস্ত্রের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য শ্রীভগবানের মুখে তাহার উল্লেখ করাইবেন, ইহা কখন অনুমান করা যায় না। বরং বেদান্ত-দর্শনেরই প্রমাণ স্বরূপে ভগবদ্বাক্য গ্রহণ করা, তাহার পক্ষে সম্ভব বটে। অতএব ব্রহ্মসূত্রপদ অর্থে উপনিষদ্ বা উপনিষদেরও পূর্ববর্তী কোন কোন ঋষি-প্রচারিত শ্লোক বা পদ হইতে পারে। এই কথা বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে স্থানে স্থানে তদ্বসমর্থন জন্য প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার ভাষাও অনেক স্থলে সংহিতার ভাষার স্তায় প্রাচীন। সুতরাং উপনিষদের অগ্রেও ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদক ব্রহ্মসূত্রপদ বা শ্লোক ঋষিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কেনোপনিষদে আছে—

“ইতি শুক্রম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে।” (১।৩)। ইহা দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, এই উপনিষদ-দ্রষ্টা ঋষির পূর্বেও প্রাচীন ঋষিরা ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ উপলক্ষে “তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি” এই বলিয়া প্রত্যেক অনুবাকের শেষে কয়েকটি প্রাচীন শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা এখানে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এই শ্লোক-গুলি হইতে জানা যায় যে, “অন্ন (বা অন্নময় কোষ) ব্রহ্ম, প্রাণ (বা প্রাণময় কোষ) ব্রহ্ম, বিজ্ঞান (বা বিজ্ঞানময় কোষ) ব্রহ্ম, আনন্দ (বা আনন্দময় কোষ) ব্রহ্ম, ব্রহ্ম সং ; এজগৎ পূর্বে অসৎ (অব্যাকৃত কারণে গীর্ণ) ছিল, তাহা হইতে জগৎ সংক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্মই জগতে সকলের নিয়ন্তা, তিনি আনন্দস্বরূপ।” এই সকল প্রাচীন শ্লোক হইতে জানা যায় যে, বর্তমান উপনিষদগুলির পূর্বেও ঋষিগণ-প্রচারিত

ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক অনেক পদ বা শ্লোক প্রচলিত ছিল । অতএব ব্রহ্ম-সূত্র-পদ বলিতে যে এই সকল প্রাচীন শ্লোক-নিবন্ধ গ্রন্থ বুঝায় না, তাহা বলিতে পারা যায় না । অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঋষিগণ ব্রহ্মতত্ত্ব জীব-তত্ত্ব, জগত্ত্ব আলোচনা করিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই । বর্তমান উপনিষদের প্রচারে সে সকল গ্রন্থ ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে । তাহার কোন কোন শ্লোক কোন কোন উপনিষদে উক্ত রূপে সংগৃহীত আছে মাত্র । বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদেও এইরূপ অনেক প্রাচীন শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে ।

বৃহদারণ্যকে উক্ত (৫।১।১) এইরূপ একটি প্রাচীন শ্লোকের সৃষ্টাস্ত এই,—

“পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।

পূর্ণশ্চ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥”

বর্তমান উপনিষদ্ সেই সকল ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্লোক অপেক্ষা আধুনিক । বেদান্তদর্শনে দশখানি মাত্র উপনিষদ্ প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । সেইরূপ বেদান্ত-দর্শনে গীতাও প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে । অতি প্রাচীন উপনিষদ ছান্দোগ্য হইতে, দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ যে ঘোর ঋষির নিকট বিষ্ণুভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যায় । সূত্রাং গীতা যদি শ্রীকৃষ্ণোক্ত, ও বেদব্যাস কর্তৃক মহাভারতের অন্তর্ভূত হইয়াছিল, ইহা বলা যায়, তবে গীতা উক্ত উপনিষদ্ অপেক্ষা আধুনিক নহে । অতএব ব্রহ্মসূত্রপদ অর্থে, উপনিষদ্ অপেক্ষা উক্ত ব্রহ্ম প্রতিপাদক প্রাচীন শ্লোক-গ্রন্থ, এইরূপ অনুমান অধিক সঙ্গত ।

মহাত্মতান্বেষকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।

ইন্দ্রিয়াগি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চোন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫

মহাভূতগণ, অহঙ্কার, বুদ্ধি আর—

অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়গণ—দশ এক আর,

আর সেই পঞ্চ—যাহা ইন্দ্রিয় গোচর,— ॥ ৫

মহাভূতগণ—সূক্ষ্মভূতগণ । মহৎ অর্থে বৃহৎ ব্যাপক । সকল প্রকার বিকারের ব্যাপক বলিয়া সূক্ষ্মভূত সমূহের কারণ-স্বরূপ যে সূক্ষ্ম-ভূতসমূহ তাহাই মহাভূত । ইহারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর (শব্দ) । পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এ সকল ক্ষেত্র-আরম্ভক দ্রব্যই মহাভূত (রামানুজ) । ভূমি প্রভৃতি পঞ্চভূত, (মধু, স্বামী, বলদেব) । শরীরের উপাদান দ্রব্য পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত (কেশব) । সূক্ষ্ম অপঞ্চৌকুত পঞ্চভূত—ইহারা পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চসূক্ষ্মভূত ইন্দ্রিয়ের অগোচর (শঙ্করানন্দ) ।

অতএব কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে মহাভূত অর্থে সূক্ষ্মভূত, কাহার মতে তন্মাত্র, কাহারও মতে সূক্ষ্মভূত । শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এই শ্লোকে পরে ‘পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর’ বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহারাই সূক্ষ্মভূত । এস্থলে যে মহাভূত উক্ত হইয়াছে, তাহা অবশ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর—সূত্রাং সূক্ষ্মভূত । সূক্ষ্মভূত ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে ।

সাংখ্য মতে ইহাদিগকে পঞ্চতন্মাত্র বলা হইয়াছে । রূপ রস শব্দ গন্ধ ও স্পর্শ ইহারাই পঞ্চতন্মাত্র । তন্মাত্র হইতে সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টি হইয়াছে । শব্দ হইতে আকাশের সৃষ্টি, স্পর্শ হইতে বায়ুর সৃষ্টি ইত্যাদি । সূত্রাং তন্মাত্র সূক্ষ্মভূতের কারণ বলিয়া তাহাদিগকে মহাভূত বলা যাইতে পারে । কিন্তু এ অর্থে এক আপত্তি হয় । পঞ্চভূতের মধ্যে যাহা ইন্দ্রিয়-গোচর—যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহাই তন্মাত্র শব্দস্পর্শাদিই আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর । আর তাহা হইতেই ত আমাদের সূক্ষ্মভূতের জ্ঞান হয় । সূত্রাং পঞ্চ মহাভূতদিগকে সাংখ্যিক তন্মাত্র কিরূপে বলা যাইতে

পারে ? মহাভূতের কথা সাংখ্যদর্শনে কোথাও নাই। বেদান্তেই তাহা পাওয়া যায়। বেদান্ত হইতেই মহাভূত-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

বেদান্ত মতে, আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ভূমি উৎপন্ন হয়। (তৈত্তিরীয় উপ, ২।১।১)। ইহাদের মধ্যে আকাশ ও বায়ু অমূর্ত, এবং অগ্নি, জল ও ভূমি মূর্ত। উভয় রূপই ব্রহ্মের (বৃহদারণ্যক উপঃ, ৩।২।১)। এই মূর্তই অন্ন।

এই মূর্ত ও অমূর্ত রূপ ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম ইহারা পঞ্চমহাভূত। ঐতরের উপনিষদে (৫ম খণ্ড।৩) আছে,—

“এষ ব্রহ্ম * * ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীঃষীতোতানি * * * সর্কং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং * * * প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ।”

এই পঞ্চমহাভূত—সূক্ষ্মভূত। ঋতি অনুসারে ইহারা দেবতা। এই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের পরস্পর মিশ্রণে বা পঞ্চীকরণে পঞ্চ স্থূলভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ ভূতের অর্দ্ধাংশ, ও অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ মিশিয়া স্থূল আকাশ (æther)। বায়ু ভূতের অর্দ্ধাংশের সহিত, অত্র চারি ভূতের প্রত্যেকে অষ্টমাংশ মিশিয়া স্থূল বায়ু (air—gas)। সূক্ষ্ম অগ্নির অর্দ্ধাংশের সহিত অত্র চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ মিশিয়া স্থূল অগ্নি (heat or fire)। সূক্ষ্ম জলীয় ভূতের অর্দ্ধাংশ ও অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ মিশিয়া স্থূল অপ্ ভূত (liquid)। আর সূক্ষ্ম ভূমির অর্দ্ধাংশ সহিত অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের অর্দ্ধাংশ মিশিয়া স্থূল পৃথিবী ভূত :(solid)। এই পঞ্চীকরণ দ্বারাই সূক্ষ্মভূত হইতে স্থূলভূতের উৎপত্তি হয়। ইহা ব্যতীত, মূর্ত বা মর্ত্য অগ্নি, অপ্ ও ভূমি এই তিন সূক্ষ্ম ভূতের মধ্যে ত্রিবৃৎকরণ দ্বারা (বা উক্তরূপে মিশ্রণ হইতে) উক্ত মূর্ত তিন সূক্ষ্ম

ভূতের উৎপত্তির কথাও উপনিষদে আছে । ছানোগ্য উপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে আছে যে, এই সৃষ্টির পূর্বে সত্তা (অমূর্ত আকাশ ও বায়ুরূপে স্থিত ব্রহ্ম সত্তা) ছিলেন । তিনি বহু হইবার জন্য ঈক্ষণ করিলেন । তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন । তেজঃ অপ্ সৃষ্টি করিলেন ।... অপ্ দেবতা অন্ন সৃষ্টি করিলেন । এই তিন দেবতা ত্রিলোকের বা ত্রিহানের কারণ । তেজঃ বা জ্যোতিঃ হইতে দ্যলোক, অপ্ হইতে অস্তরীক্ষ লোক আর ভূমি হইতে পৃথিবী লোক । এই তিন দেবতাই ভূতগুণের বীজ । সেই দেবতা ঈক্ষণ করিলেন,—আমিই অমুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিব । তদনন্তর তিনি এই তিন দেবতাকে ত্রিবৃৎ করিয়া সুলুকৃত করিলেন । সে যাহা হউক, এইরূপে এই পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত হইতে পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে । ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত । সূত্রাং এস্থলে মহাভূত অর্থে অপক্ষীকৃত সূক্ষ্ম ভূতই বুঝিতে হইবে ।

অহঙ্কার—সেই সূক্ষ্মভূত সকলের কারণ এবং ‘আমি’ এই প্রকার বৃত্তি বাহার লক্ষণ, সেই অন্তঃকরণকেই অহঙ্কার বলা যায় (শঙ্কর) । এই অহঙ্কারই ভূতগণের আদি (রামানুজ, কেশব) । ইহা অন্তঃকরণাত্মক (স্বামী) । উক্ত ভূতগণের কারণভূত অভিমান (মধু) । তামস অহঙ্কারই ভূতাদির কারণ (বলদেব) । শঙ্করাচার্য্য এক স্থলে বলিয়াছেন, অনায়-বিষয়ে অহংজ্ঞানই অহঙ্কার । এস্থলে অর্ধ ভিন্ন ।

সাংখ্যদর্শন অনুসারে অভিমানই অহংকার । কোন বিষয় জ্ঞেয়-রূপে জ্ঞানে উপস্থিত হইলে, তাহার সহিত জ্ঞাতা ‘আমি’ ইহা জানি-তেছি, এইরূপ সাঙ্গিক বা বৈকৃত অহঙ্কার জ্ঞাতাকে প্রকাশ করে । তামসিক অহঙ্কারকে ভূতাদি বলে, তাহা সেই ‘জ্ঞেয়’কে প্রকাশ করে । রাজস বা তৈজস অহঙ্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সাঙ্গিক অহঙ্কার মন ও মন ইন্দ্রির প্রকাশ করে । আর ভূতাদি তামস অহঙ্কার এই রাজস

অহঙ্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া পঞ্চতন্ত্রকে প্রকাশ করে, ও তাহা হইতে সুলভূতদের প্রকাশ করে। রাজস অহঙ্কারই ক্রিয়াত্মক, তাহাই সাত্বিক ও তামস অহঙ্কারকে পরিচালিত করে, তাই একাদশ ইন্দ্রিয়ের ও পঞ্চতন্ত্রের অভিব্যক্তি হয়। প্রত্যভিজ্ঞান অভিজ্ঞান সহ যুগপৎ উদ্ভিত হয়, এবং তাহারই সহিত 'আমি যে এই বিষয় জানিতেছি, তাহা সুখাত্মক কি দুঃখাত্মক' এইরূপ অনুভব হয়, এবং 'আমি সেই বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ জন্ত কৰ্ম করিব কিনা', এইরূপ বুদ্ধি হয়। এই বৃত্তিকে অহঙ্কার বলে; বুদ্ধিতে বৃত্তিজ্ঞানের ক্রিয়াকালে যে এইরূপে জ্ঞাতা, ও কর্তা ভোক্তা 'আমি'র, এবং তাহার সহিত যে জ্ঞেয় কার্য ও ভোগ্য ইহার যুগপৎ অভিব্যক্তি হয়, তাহাই অহঙ্কার। যাহা জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই ভেদ প্রধানতঃ সৃষ্টি করে, এবং জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়, তাহাই অহঙ্কার। তাহাতেই 'আমিদের' অভিব্যক্তি হয়, 'মান' বা প্রমাণ বৃত্তির ক্রিয়াকালে, তাহার 'অভি'মুখে বা তাহার সহিত যে প্রমাতার প্রমেষ হইতে পৃথক্ ভাবে অভিব্যক্তি (apperception) হয়, তাহাই অভিমান। তাই সাংখ্যদর্শন অনুসারে অভিমানই অহঙ্কার। বলিয়াছি ত, সাংখ্যমতে অহঙ্কার সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ।

সাংখ্য-কারিকায় আছে,—

“অভিমানোহহঙ্কারস্তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ ।

একাদশকশ্চ গণস্তন্ত্রাপঞ্চকশ্চৈব ॥”

“সাত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ ।

ভূতাদেস্তন্ত্রাঃ স তামসস্তৈজসাত্তমস্ ॥”

(কারিকঃ ২৪।২৫) ।

সে যাহা হউক, এই অহঙ্কারতত্ত্ব স্বতন্ত্র ভাবে বেদান্তে উল্লিখিত হয় নাই। ইহা চিন্তের ধর্ম। বেদান্তমতে ইহা মনের ধর্ম। অথবা বেদান্ত-

মতে, ইহা আত্মা—মনোময় কোষস্থ আত্মা । তাই বেদান্তে এই আত্মা হইতে আকাশাদি ক্রমে মহাভূতগণের উৎপত্তির কথা উক্ত হইয়াছে ।

তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও স্থূলভূত কিরূপে উৎপন্ন হয়, এ সম্বন্ধে আমরা আরও একটি কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব । ইন্দ্রিয়দ্বারে যখন বিষয় গ্রহণ হয়, তখন প্রথমে জ্ঞানে বৃত্তিক্রিয়া হয়। তাহা বলিয়াছি । ইহা বুদ্ধিরই ব্যাপার । বেদান্তমতে জ্ঞান তখন প্রকাশোন্মুখ হয় । সেই সময়ে জ্ঞানে যুগপৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ‘ত্রিপুটী’র বিকাশ হয় । জ্ঞাতাতে প্রকাশ স্বভাব সত্ত্ব হেতু ‘অহং’ বোধ হয় । আর জ্ঞেয় বিষয়ে আবরণ স্বভাব তমঃ হেতু ‘ইদং’ বা ‘তৎ’ অর্থাৎ ‘আমি’ হইতে ‘ভিন্ন’ অর্থ কিছু—ইহা বোধ হয় । যাহাকে এই তামসিক অহঙ্কার হেতু ‘আমি’ হইতে ভিন্ন বোধ হয়, তাহাই ভূতাদি, তাহাই সাংখ্যের তন্মাত্র ; তাহাই জ্ঞানের বিষয় । সে বিষয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ । সাংখ্যমতে তাহা তন্মাত্র (only that অথবা thing in-itself) । তাহা নির্বিশেষ অনুভূতির বিষয় । এই রূপ রসাদি ভিন্ন কোন বস্তুর কিছুই আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না । আমরা অনুমান করিয়া সেই জ্ঞানের বিষয় ‘রূপ’ তন্মাত্র হইতে তাহার বাহ্য কারণ স্থূল রূপাত্মক অগ্নি, ‘রস’ তন্মাত্র হইতে জলীয় স্থূলভূত, ‘শব্দ’ তন্মাত্র হইতে আকাশ ইত্যাদি রূপে পঞ্চ স্থূল ভূতের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করি । অতএব সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্র এইরূপে পঞ্চ স্থূল ভূতের কারণ হয় । যাহা হউক, ব্যক্তিগত অহঙ্কার (ego) যদি স্থূল ভূতের কারণ বলা যায়, তবে বিজ্ঞানবাদ (Idealism) আসিয়া পড়ে । কিন্তু সেই অহঙ্কার যদি সমষ্টিভূত অহঙ্কার বা হিরণ্যগর্ভের অহঙ্কার বলা যায়, যদি তাহাকে মনোময় বা বিজ্ঞানময় কোষস্থ ব্রহ্ম বা আত্মা বলা যায়, তবে ঠিক এ বিজ্ঞানবাদ আসে না । সাংখ্যদর্শন মতেও সূক্ষ্ম শরীর এক । “সপ্তদশৈকং লিঙ্গং”—(ইতি সাংখ্যসূত্র ৩৯) । বিজ্ঞানতিন্ধু ইহার অর্থ করেন, সপ্তদশ অবয়বযুক্ত লিঙ্গ শরীর একই । হিরণ্যগর্ভই সেই সমষ্টি-

ভূত সূক্ষ্ম-শরীরাত্তিমানিনী দেবতা । মহাভূত তাঁহারই অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন । বেদান্ত শাস্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত । তাহা পরে উল্লিখিত হইবে । এখানে সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শন অনুসারে এই অহঙ্কার-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে ।

বুদ্ধি—যাহা অহঙ্কারের কারণ, যাহা অধ্যবসায়াত্ত্বিকা বৃত্তি, তাহাই বুদ্ধি (শব্দ) । অহঙ্কারের কারণভূত জ্ঞানাত্মক বা জ্ঞানপ্রধান—বুদ্ধি (স্বামী, বলদেব) । অধ্যবসায়-লক্ষণ মহত্ত্ব (মধু) । মহত্ত্ব (রামানুজ কেশব) ।

সাংখ্যদর্শন মতে মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে এই বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্ত্ব উৎপন্ন হয় । মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি হয় । সাত্ত্বিক বুদ্ধি—ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যরূপ । রাজস-তামস বুদ্ধি তাহার বিপরীত । (কারিকা, ২৩) । বুদ্ধিই মহত্ত্ব । সাংখ্যমতে বুদ্ধি অধ্যবসায়াত্ত্বিকা । অধ্যবসায় অর্থে স্থির-নিশ্চয় হওয়া । যখন ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করিয়া মনকে অর্পণ করে, মন তাহার সহক্রে সংশয়যুক্ত হয়, তাহা কি, তাহার সে অনুভূতির কারণ কি, তাহা স্থির করিতে পারে না । বুদ্ধি তাহা বিচার পূর্বক স্থির করে,—সে বিষয় কি, ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া দেয় । মনে ইন্দ্রিয় দ্বারে যে অনুভূতি (sensation) হয়, বুদ্ধি তাহার স্বরূপ নির্ণয় (perception) করে এবং তাহা সূক্ষ্ম কি চূর্ণ, এবং তাহা ত্যাগ কি গ্রহণ করিতে হইবে, বুদ্ধি তাহা স্থির করে । সেইরূপ কর্ম সহক্রে কর্তব্য কি, তাহা বুদ্ধি স্থির করিয়া দেয় । কর্ম-সাধন জন্ত, কর্মে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্ত কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, বুদ্ধি তাহাও নিশ্চয় করিয়া দেয় । (বুদ্ধি = Understanding অথবা Intellect) । ইহাই আমাদের বুদ্ধি । কিন্তু সমষ্টি অহঙ্কারের জ্ঞান যাহা সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব, তাহা মহত্ত্ব । তাহা এখানে বিবৃত করিবার আবশ্যক নাই । সেই সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্ত্ব অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্ত । তাঁহাকেই বেদান্তে হিরণ্যগর্ভ বলে ।

অব্যক্ত—সেই বুদ্ধির বাহা কারণ, বাহা কার্যরূপে ব্যক্ত নহে, বাহা অব্যাকৃত—তাহাই অব্যক্ত । “মম মায়ী ছরত্যয়া” এই কথার বাহার পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, সেই ঈশ্বর-শক্তি মায়ী এই অব্যক্ত (শঙ্কর) । ঞ্জনাশ্রমিক প্রধানই অব্যক্ত (কেশব) । অব্যক্ত অর্থাৎ মূল প্রকৃতি (রামানুজ, স্বামী, বলদেব) । ইহা সম্বন্ধসমূহো- ঞ্জনাশ্রমিক প্রধান । ইহা :সকলের কারণ, কাহারও কার্য নহে (মধু) ।

গীতার পূর্বে উক্ত হইয়াছে, “অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ”...ইত্যাদি (গীতা ৮।১৮) । সে স্থলে অব্যক্ত অর্থে মূল প্রকৃতি । ভগবান্ অন্তত বলিয়াছেন, “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্মরতে সচরাচরম্” (৯।১০) । অতএব অব্যক্তই এই মূল প্রকৃতি । যে স্থলে ‘অব্যক্ত’ বিশেষণ, সে স্থলে ‘অব্যক্ত’ ব্রহ্মের বা আত্মার বিশেষণ । ব্রহ্ম অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত (গীতা ৮।২০) ।

সে বাহা হউক, সাংখ্যমতে এই অব্যক্তই মূল প্রকৃতি বা প্রধান । তাহা অবিকৃত । তাহা হইতে সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতির উৎপত্তি হয় । প্রকৃতি-বিকৃতি হইতে ষোড়শ প্রকার বিকৃতির অভিব্যক্তি হয় ।—

‘মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাত্মাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত ।

ষোড়শস্ত বিকারাঃ..... ।” (কারিকা, ৩) ।

এই সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি—বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র । মূল প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি হয়, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়, অহঙ্কার হইতে মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই ষোড়শ তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের উদ্ভব হয় । এই মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ সুলভূত ইহারাই ষোড়শ বিকৃতি । মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত ইহারাই কার্য, ইহা হইতে আর কিছু উৎপন্ন হয় না ; এজন্য এই ষোলটি কেবল বিকৃতি ।

“প্রকৃতেমহাংস্ততোহহংকার স্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ ।

তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ॥” (কারিকা, ২২) ।

সাংখ্য-দর্শন অনুসারে, প্রকৃতিই অবিকৃত, তাহা অব্যক্ত, তাহাই প্রধান,—মূল কারণ । প্রকৃতির যাহা কার্য্য, তাহা ব্যক্ত । এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত মধ্যে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য আছে । বৈধর্ম্য সম্বন্ধে কারিকার সূত্র এই—

“হেতুমৎ অনিত্যম্ অব্যাপি সক্রিয়ম্, অনেকম্, আশ্রিতং লিঙ্গম্ ।

সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং, বিপরীতম্ অব্যক্তম্ ॥” (১০)

উত্তরের এবং পুরুষ হইতে বৈধর্ম্য সাধর্ম্য সম্বন্ধে সূত্র এই—

ত্রিগুণম্ অবিবেকি বিষয়ঃ সামাশ্রম্ অচেতনং প্রসবধর্ম্মি ।

ব্যক্তং তথা প্রধানং, তদ্বিপরীতং তথা চ পুমান্ । (১১)

অতএব সাংখ্যমতে এই অব্যক্ত = প্রকৃতি, আর বেদান্তমতে ইহা পরমেশ্বরের পরাশক্তি—মায়া । শ্রুতিতে আছে—“মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনস্ত মহেশ্বরম্” (শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৪।১০) । আর এই মায়া বা প্রকৃতিকে ‘দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগৃঢ়াম্’ ‘স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া-শ্রিকা পরাশক্তি’ বলা হইয়াছে । (শ্বেতাশ্বতর উপঃ, দ্রষ্টব্য) । এই মায়া ও প্রকৃতি এক অর্থে অভেদ হইলেও, তাহাদের মধ্যে ভেদ গীতার উক্ত হইয়াছে । ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ।

এই যে অব্যক্ত অব্যাকৃত, অনির্কচনীয়, পরমেশ্বরের মায়াধ্য পরাশক্তি—অথবা তাহারই মূল প্রকৃতি, তাহা হইতে সৃষ্টির আদিতে কিরূপে বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদির উৎপত্তি হয়, বেদান্তেও তাহার আভাস আছে । শ্রুতিতে আছে,—সৃষ্টির প্রারম্ভে “তৎ ঐক্যত বহু স্যাৎ প্রজায়ের” —অর্থাৎ তিনি ঐক্য করিলেন—আমি প্রজনন জগৎ বহু হইব । এই ঐক্য বা কল্পনা হইতে বুদ্ধির বা মহত্ত্বেরও উৎপত্তি হয় । তাহার পর “বহু স্যাৎ প্রজায়ের” অর্থাৎ আমি বহু হইব—এই ঐক্য বা কল্পনা হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি

হয় । তাহার পর 'আয়নঃ আকাশঃ সমুতঃ' ইত্যাদি ক্রমে, এই অহকার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, ইত্যাদি ক্রমে মহাভূতগণের সৃষ্টি হয় । এইরূপে বেদান্ত হইতেও অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহকার ও পঞ্চ মহাভূততত্ত্ব জানা যায় । যাহা হউক, ভগবান্ গীতার প্রকৃতিকে বা অব্যক্তকে তাঁহার বলিয়াছেন । সুতরাং প্রকৃতি বা অব্যক্ত স্বতন্ত্রা নহে । এইরূপে গীতার সাংখ্য ও বেদান্ত মতের সামঞ্জস্য হইয়াছে । প্রকৃতি অনাদি হইলেও তাহা ভগবৎশক্তির অভিব্যক্তরূপ মাত্র ।

ভগবান্ পূর্বে (গীতা, ৭।৪ শ্লোকে) বলিয়াছেন—

“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ ধং মনো বুদ্ধিরেব চ ;

অহকার ইতীমং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অপরেয়মিতস্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥”

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ভগবানের প্রকৃতি আটভাগে ভিন্ন হয় । এই আটভাগে ভিন্ন প্রকৃতিকে অপরা প্রকৃতি বলে । এই আটের নাম—পঞ্চমহাভূত—ভূমি, অপ, অনল, বায়ু ও আকাশ, আর বুদ্ধি, মন ও অহকার । ইহাদের মধ্যে মূল প্রকৃতি বা অব্যক্তকে গ্রহণ করা হয় নাই । কারণ, ইহারা সেই অব্যক্ত প্রকৃতিরই ব্যক্তরূপ, প্রকৃতিই এইরূপে অষ্টধা ভিন্ন । কিন্তু এই আলোচ্য শ্লোকে অব্যক্ত গৃহীত হইয়াছে । কারণ, অব্যক্তই ক্ষেত্রের মূল উপাদান । সুতরাং উক্ত শ্লোকের সহিত এ শ্লোকের কোন বিরোধ নাই । তবে একটি কথা বুঝিতে হইবে । সাংখ্য-দর্শন হইতে জানা যায় যে, মূল প্রকৃতি এক—অবিকৃত । তাহা হইতে সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতির উৎপত্তি হইয়াছে । মূল প্রকৃতি ও সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি—ইহাই প্রকৃতির মূল অষ্টরূপ । মন তাহার অন্তর্ভূত নহে । কারণ, মন কেবল বিকৃতি—অহকারের কার্য্য । এইজন্য এখানে প্রথমে এই আট তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে ; যথা,—মহাভূত পাঁচ, তাহাদের

কারণ অহংকার, তাহার কারণ বুদ্ধি, তাহার কারণ অব্যক্ত । কিন্তু এই পাঁচ মহাভূত সাংখ্যের তন্মাত্র নহে, তাহারা পঞ্চ :ইন্দ্রিয়গোচর স্থূলভূত পঞ্চও নহে—তাহারা সূক্ষ্মভূত বা স্থূলভূতের কারণ, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । কিন্তু ইহা বলা যায় যে, এই মূল প্রকৃতি ও সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি এই আট তত্ত্ব উল্লেখের পরে এ শ্লোকে সাংখ্যোক্ত ষোড়শ বিকৃতি-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । তাহা একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয় । এইরূপে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও তাহা হইতে উদ্ভূত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এস্থলে ক্ষেত্রের উপাদানরূপে বিবৃত হইয়াছে,, ইহা বলা যাইতে পারে । কিন্তু ইহা এ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহাতে সাংখ্য বেদান্তের সহিত কোন বিরোধ হয় না ।

ইন্দ্রিয় দশ ও এক—চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় । এই দশ ইন্দ্রিয় । শ্রোত্রাদি পাঁচটি বুদ্ধি উৎপাদন করে বলিয়া বুদ্ধীন্দ্রিয় । বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম-নির্কর্তক বলিয়া কর্মেন্দ্রিয় । আর মনকেও এস্থলে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে । মন সংকল্পাত্মক । সেই মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণ—একাদশ । (শঙ্কর, রামানুজ, স্বামী, মধু, কেশব) ।

সাংখ্যদর্শন অনুসারে মন এক ইন্দ্রিয় মাত্র । কিন্তু বেদান্তদর্শন অনুসারে মন ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ । এস্থলে গীতার উভয় মতের সামঞ্জস্য আছে । মূলে আছে “ইন্দ্রিয়ানি দশৈককঃ ।” অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দশ আর এক । এইরূপে এই ‘এক’ মনকে ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন করা হইয়াছে, এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধও ইঙ্গিত করা হইয়াছে ।

সাংখ্যদর্শনে আছে,

“সাত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃত্যং অহংকারাং ।”

(কারিকা, ২৫)—

এই একাদশ ইন্দ্রিয় মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, ও কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি,—

“বুদ্ধীন্দ্রিয়ানি চক্ষুঃ-শ্রোত্র-স্রাণ-রসন-স্পর্শাখ্যানি ।

বাক্‌পাণিপাদপায়ুপস্থান্ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যাহঃ ॥” (কারিকা, ২৬)

আর মন একাদশক ইন্দ্রিয়,—

“উভয়াশ্রয়কমত্র মনঃ সংকল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্যাৎ ।

শূণপরিণামবিশেষায়ানাত্তং বাহুভেদাচ্চ ॥” (কারিকা, ২৭) ।

অর্থাৎ মন বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এই উভয়াশ্রয়ক । চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, এবং বাক্‌প্রভৃতি পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়ে মন অধিষ্ঠিত হইয়া তাহা-দিগকে প্রবর্তিত করে । আমাদের জানিবার বা কোন কৰ্ম করিবার ইচ্ছা হইলে, তাহা বুদ্ধিকে নিয়োজিত করে, বুদ্ধি মনকে নিয়োজিত করে, এবং মন উপযুক্ত ইন্দ্রিয়কে প্রবর্তিত করে, তখন সে ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযুক্ত হয় । সেইরূপ যখন কোন বাহু বিষয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়, ইন্দ্রিয়ের দ্বারে স্বশক্তি বলে আঘাত করে, তখন সেই বিষয়কে গ্রহণ বা আহরণ করিয়া লইয়া ইন্দ্রিয়গণ মনকে উপহার দেয় । মন যদি তখন অন্য ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে, তবে সেই উপহৃত বিষয় গ্রহণ না করিতেও পারে । আর যদি গ্রহণ করে, তবে তাহা কি, ইহা আলোচনা করে । মন তাহাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে,—ইহা কি বা কি নহে, ইহা স্থির করিতে চেষ্টা করে এবং সে সম্বন্ধে কোন কর্মেন্দ্রিয়কে প্রবর্তিত করিতে হইবে, তাহাও স্থির করিতে চেষ্টা করে । ইহাই মনের সংকল্পধর্ম্য । সংকল্প হেতুই মন ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত বিষয়কে লক্ষ্য করে, আলোচনা করে ; তাহা কি, ইহার সন্ধান করে । এই আলোচনা প্রথমতঃ নির্বিকল্প । পরে তাহা সবিকল্প হয় । তখন মন বুদ্ধির শরণ লয় । নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আসিয়া সে বিষয় যে কি, তাহা স্থির করিয়া দেয় ।—

“ততঃ পরং পুনর্বস্তুধর্ম্যৈঃ জাত্যাতিভির্ঘৃণা ।

বুদ্ধ্যাহবসীয়েতে সা হি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা ॥”

বুদ্ধি এইরূপে স্থির করিয়া দিলে, তবে সে বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান

(perception) হয় । এইরূপে যখন জ্ঞানবৃত্তি বহির্মুখী হয়, অথবা যখন বাহ্যক্রিয়া অন্তর্মুখী হয়, তখন মনের মধ্য দিগ্বাহি সে ক্রিয়া হয় । বিষয়-গ্রহণ ব্যাপারে মন ইন্দ্রিয়াত্মক । তাই সাংখ্যদর্শনে মনকে একাদশক ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে । কিন্তু বেদান্তমতে মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ । “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ” (কঠ উপঃ ৬।১) । গীতাতেও ইহাই উক্ত হইয়াছে । (গীতা, ৩।৪২ দ্রষ্টব্য) । বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৫।৩) আছে, প্রজাপতি মনকে আত্মার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন । মন ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়-ব্যাপার হয় না ।—

“অনুভবমনা অভূবং নাদর্শনম্, অনুভবমনা অভূবং ন অশ্রোষম্ ইতি । মনসা হি এব পশুতি মনসা শৃণোতি ।” ইহা ব্যতীত কামসংকল্প প্রভৃতি মনের স্বরূপ, তাহাও উক্ত হইয়াছে । “কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিঃ অধৃতিঃ হ্রাঃ, ধীঃ, ভীঃ ইত্যেতৎ সর্বং মন এব ।... মনসা বিজানাতি ।” (বৃঃ আঃ ১।৫।৩) মন যে সংকল্পাত্মক, তাহাও উক্ত হইয়াছে । “সংকল্পো বাব মনসো ভূমান্” (ছান্দোগ্য ৭।৮।১) । “সর্বেষাং সংকল্পানাং মন একায়নম্ ।” (বৃঃ আঃ ২।৪।১১) । অতএব দশ ইন্দ্রিয় হইতে মন স্বতন্ত্র । গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে, “মনঃ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি” (১।৫।৭) । সেখানে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধেই মনকে বলা হইয়াছে যে, মন বাহার ষষ্ঠ, সেই সকল ইন্দ্রিয় । এস্থলেও মনকে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম-জাতীয় বলা হয় নাই । মহাভারত যেমন পঞ্চম বেদ, মন সেইরূপ একাদশক বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় গোচর—অর্থাৎ শব্দানি বিষয় (শব্দর) । অথবা পঞ্চ স্কুলভূত (গিরি) । তবে সাংখ্যের চতুবিংশতি গুণের সহিত সামঞ্জস্য জন্ম এই পাঁচ ইন্দ্রিয়গোচর শব্দাদি বিষয়কে পঞ্চ তন্মাত্রও বলা যাইতে পারে (গিরি) । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ (রামানুজ) । ইহারাই তন্মাত্র, শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ, স্পর্শ বায়ুর বিশেষ গুণ ইত্যাদি ।

এই বিশেষ গুণ দ্বারা আকাশাদিরূপ ব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়-গোচর হয় (স্বামী) । এই শব্দাদি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞাপ্য এবং কর্মেন্দ্রিয়ের কার্যরূপে উপলব্ধি হয় । এজন্য তাহারা ইন্দ্রিয়ের গোচর বিষয় (মধু) । শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়—শব্দ-স্পর্শরূপ রস ও গন্ধ (কেশব) ।

অতএব প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারের মতে রূপরসাদি পাঁচই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচর । শঙ্কর ও গিরি বলেন যে, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর শব্দাদি বিষয়ই পঞ্চ সুলভূত । এস্থলে প্রথম অর্থ ই গ্রাহ্য ।

আপুত্তি হইতে পারে যে, যদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ তন্মাত্র হয়, আর পঞ্চ মহাভূত যদি পঞ্চ সুলভূত হয়, তবে এ শ্লোকে সুল ভূত উক্ত হয় নাই, রূপরসাদি সুলভূত নহে । এট সুলভূতও আমাদের শরীরের বা ক্ষেত্রের উপাদান । ইহা বাদ দিলে আর সুল শরীর থাকে না—সুল শরীর ও কারণ শরীর থাকিতে পারে । অথবা বেদান্ত অনুসারে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ-বিশিষ্ট দেহ বা ক্ষেত্র থাকিতে পারে, কিন্তু অন্তময় কোষ থাকে না । অতএব বলা যায়, যে শরীর স্থায়ী, আমাদের মৃত্যুতেও থাকে, তাহারই উপাদান এইগুলি । আর যে শরীরের জন্মরূক্তি মৃত্যু আছে, যাহা সংজ্ঞাত, তাহার উপাদান পরে উক্ত হইয়াছে । এই গোলযোগ নিবারণ জন্ত শঙ্কর ও গিরি পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর তন্মাত্রকেই পঞ্চ সুলভূত বলিয়াছেন । ইহা বুঝিতে হইবে ।

আমরা বুঝিতে পারি যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মন যে বিষয় গ্রহণ করে, তাহা এই শব্দ-স্পর্শ-রূপাদি-ভেদে পাঁচ প্রকার । মন ইন্দ্রিয়দ্বারা এই সকল বিষয় গ্রহণ করিয়া, সেই শব্দ-স্পর্শাদি সম্বন্ধেই আলোচনা করে । সে আলোচনার কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । কারিকায় (২৮) আছে—

“শব্দাদিষু পঞ্চানাং আলোচনমাত্রমিষাতে বৃত্তিঃ ।”

এই শব্দাদি বিষয় আলোচনাকালে মন এই শব্দাদি বিষয়ই অনুভব (sensation) করে । মন তাহার বাহিরে গিয়া সেই শব্দস্পর্শাদির

বাহ্য কারণ কি, তাহা স্থির করিতে পারে না। তাহা বুদ্ধির কার্য।
 বুদ্ধি সেই অনুভূতির বাহ্য কারণ স্থির করে। বলিয়াছি ত, তাহা হইতে
 প্রত্যক্ষ (external perception) হয়। শব্দ-তন্মাত্র হইতে
 তাহার কারণ আকাশের প্রত্যক্ষ হয়। স্পর্শানুভব হইতে বায়ুর প্রত্যক্ষ
 হয়—ইত্যাদি। এ প্রত্যক্ষও যে অনুমানমূলক, ইহা বলা যায়। এই গুণ
 ও ক্রিয়ার অনুভব হইতে তৎকারণ বাহ্য দ্রব্যের অনুমান বা প্রত্যক্ষ হয়।
 সে দ্রব্যের স্বরূপ কি, তাহা বস্তুতঃ আমরা জানিতে পারি না। এই অনুভূত
 রূপরসাদি ব্যতীত সেই অনুভূতির কারণ বাহ্যদ্রব্যে যে আর কিছু আছে,
 তাহা প্রত্যক্ষগম্য হয় না। এই জন্ত এই শব্দাদিকে তন্মাত্র-(সেই মাত্র)
 স্বরূপ বলা হয়। এ কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। * অতএব এই শব্দাদিই
 পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়, তাহা সুলভূত নহে। সে শব্দাদির কারণ বা
 আধার পঞ্চ সুলভূত হইতে পারে। কিন্তু তাহা সুলভূত নহে,

* আধুনিক পাশ্চাত্য জড়বাদী পণ্ডিতগণও এ কথা স্বীকার করেন।
 জন ট্ৰেয়ার্ট, মিল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, "Matter is that which can
 be felt, seen, heard, tasted and smelt. Matter এর স্বরূপ বুদ্ধির অগোচর।
 আর্থার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ক্যান্ট বলিয়াছেন যে, বাহ্যেন্দ্রিয় গোচর বিষয়ের যাহা স্বরূপ,—
 বাহ্যকে তিনি Thing-in-itself বা Things-in-themselves বলিয়াছেন, তাহা
 আমরা জানিতে পারি না। আমাদের ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি তাহাদের যে ভাবে—যে
 Categories বা দেশকালনিমিত্ত প্রভৃতি উপাধি বা আবরণ দ্বারা সাজাইয়া
 আমাদের যেরূপ প্রত্যক্ষ করায়, আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ হয় মনে করি। সাংখ্য দর্শন
 অনুসারে এক অর্থে এই Thing-in-itselfই তন্মাত্র—That only। তাহাই ইন্দ্রিয়-
 গ্রাহ্য রূপ-রসাদি। তাহাই ইন্দ্রিয়গোচর হয় মাত্র। তাহা হইতে বাহ্য বিষয় আমাদের
 মনই কল্পনা করে। এই জন্ত মন সংকল্পাত্মক। বেদান্তমতে এই Thing-in-itselfই
 ব্রহ্ম.—উক্ত আবরণ মায়ার আবরণ। সেই মায়ার আবরণ আবৃত বলিয়া অথবা এই—
 যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আমাদের প্রত্যক্ষ হন না। সর্পে রজু ব্রহ্মের
 স্তায় বাহ্য বিষয় মথকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। এ তদ্বৎ এ হলে বুঝিবার
 প্রয়োজন নাই।

একপে এই একে আর এক কথা বুঝিতে হইবে । এই শব্দাদি তন্মাত্র বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়কে ক্ষেত্রের উপাদান কিরূপে বলা যায় ? ইহারা ত বাহ্য-ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ, তবে কোন অর্থে ইহাদিগকে শরীরের অন্তর্ভূত পদার্থ বলিব ? সাংখ্যমতে শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র ভূতাদি অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন হয় । চিত্তে যে সংস্কারবীজ আছে, তাহা হইতে আমাদের চিত্তে জ্ঞানক্রিয়া-কালে জ্ঞেয়রূপে প্রথমে নির্বিশেষ-ভাবে রূপ-রসাদির অভিব্যক্তি হয়, সেই রূপরসাদির জ্ঞান ক্রমে সবিশেষ হয় । সুতরাং ইহারা অহঙ্কারের তামস ভূতাদিভাব । ইহা চিত্তেরই উপাদান । ইহা হইতে জ্ঞানে তাহাদের কারণরূপে বাহ্য স্থূল ভূগাদির প্রকাশ হয়, ও সেই ক্রিয়া-কালে বিশেষতঃ জ্ঞানের আগ্রহস্থায়ী স্থূল ভৌতিক শরীরেরও অনুভূতি হয় । জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারে যখন জ্ঞানক্রিয়া হয়, তখন এই ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয়রূপে এই শব্দস্পর্শাদিই অনুভব করে । চক্ষু—রূপ অনুভব করে, কর্ণ—শব্দ অনুভব করে, নাসা—গন্ধ অনুভব করে, জিহ্বা—রস অনুভব করে ও ত্বকু—স্পর্শ অনুভব করে । মন স্বয়ং বাহ্য কিছু অনুভব করে না, অক্স অস্তরে সুখদুঃখাদিও অনুভব করে । এইরূপে চিত্তে জ্ঞানক্রিয়াকালে শব্দাদি বিষয়ের অনুভব হয় । বুদ্ধ তখন সেই অনুভূতির কারণকে বাহ্য আকাশাদি ভূগুরূপে নির্দেশ করে । এইরূপে যে বাহ্য পঞ্চভৌতিক জগতের জ্ঞান ও ভোগ হয়, এই অহঙ্কারকে তাহার কারণ বলা যায় । পঞ্চদশীতেও ইহাকে মনঃ-কল্পিত জগৎ বলা হইয়াছে । ইহাও ভোগ হয় । এক অর্থে ইহাতে বিজ্ঞানবাদ আসিয়া পড়ে । যদি আমরা বাহ্যাস্তিবাদ স্বীকার করি, তবে বলা যাইতে পারে যে, বাহ্য বস্তু ইন্দ্রিয়দ্বারে ক্রিয়া করে বলিয়া, আমাদের এই শব্দাদির জ্ঞান হয় । তাহা হইলেও শব্দ স্পর্শাদি মানস ব্যাপার ও মনের বিশেষ অনুভূতি মাত্র । এক্ষণ ইহারা চিত্তের অন্তর্ভূত—চিত্তের বিকার মাত্র, সুতরাং ক্ষেত্রের অন্তর্গত । ইন্দ্রিয়গোচর

শব্দাদি কিছু বাহু পদার্থে আরোপিত হয়, তাহা বাহু পদার্থের গুণ বলিয়া, জ্ঞান স্বতঃই সিদ্ধান্ত করিয়া লয় ।

কিছু বেদান্তের সিদ্ধান্ত অঙ্কুরপ । ব্রহ্মই—‘শব্দ’ব্রহ্মরূপে জগৎ কারণ হন,—নাম ও ‘রূপ’ দ্বারা জগৎ ব্যাকৃত করেন । সুতরাং ‘শব্দ’ ‘রূপ’ প্রভৃতি আমাদের চিত্তের অন্তর্ভুক্ত নহে । শব্দাদি আকাশাদি পঞ্চ মহাত্মের কারণ । সুতরাং তাহারা বাহু । তাহারা পরমায়া হইতে অভিব্যক্ত । আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, বেদান্ত দর্শনে আছে,—

‘আত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি । কিরূপে আত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়, বেদান্ত শাস্ত্রে তাহার ইঙ্গিত আছে । আমরা তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । স্মৃতিতে আছে—
“স্তৎ ঐক্যত (বা অকাময়ত) বহু স্মাং প্রজায়ের ।” শব্দ বা বাক্য দ্বারা সেই ঐক্য বা কল্পনা সম্ভব হয় । এই কল্পনাকালে ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম হন । এইজন্ত স্মৃতিতে আছে—“বাগেব ইদং সর্বম্ ।” সেই শব্দই সৃষ্টির মূল । তাহাই ব্যাপ্ত হইয়া আকাশ হয় । সেই শব্দ যখন প্রকাশ হয়, তখন প্রাণের দ্বারা শব্দ-স্বরূপ আকাশে অনুকম্পন হয়, তাহা প্রাণে বিদ্যুত হয় । (প্রাণে এজনি নিঃসৃতম্) । প্রাণে সেই অনুকম্পন হেতু আকাশ হইতে তাহার ঘনীভূত রূপ বায়ু উৎপন্ন হয় । অনুকম্পন হেতু শব্দায়ক আকাশ ঘন ও তরল উভয়রূপ হয় । ঘনীভূত অংশ বাধা উৎপন্ন করে । স্পর্শের কারণে এই বাধা উৎপন্ন হইলে, ঘনীভূত আকাশ হইতে বায়ু হয় । এই বাধা স্পর্শায়ক—স্পর্শদ্বারা জেয় । অতএব স্পর্শ তন্মাত্র অর্থে উৎপন্ন হইয়া বায়ুর কারণ হয় । এইরূপে বেদান্তমতে শব্দব্রহ্ম হইতে আকাশ, তাহা হইতে স্পর্শ গুণ হেতু বায়ু হয় । বায়ু ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্ত বা রূপ-বিশিষ্ট হয়, তাহাতে তেজঃ বা অগ্নির উৎপত্তি হয় । এইরূপে রস ও গন্ধাদিক্রমে জল ও পৃথিবীর উৎপত্তি হয় । এইরূপেই আকাশ বায়ুর কারণ হয়, বায়ু অগ্নির কারণ, অগ্নি জলের কারণ এবং জল পৃথিবীর

কারণ হয় । কারণ-গুণ কার্যে প্রকাশিত হয় বলিয়া, বায়ুতে স্পর্শ-গুণের সহিত আকাশের গুণ (শব্দও) থাকে । অগ্নিতে রূপের সহিত বায়ু ও আকাশের গুণ—শব্দ ও স্পর্শ থাকে । তরল অপভূতে আকাশ, বায়ু ও তেজের গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ থাকে, আর কঠিন পৃথিবীভূতে আকাশাদি চারিভূতের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস থাকে । তবে যাহা কার্যের বিশেষ গুণ, তাহা বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হয় । একত্র যেমন আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, সেইরূপ বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, অগ্নির বিশেষ গুণ রূপ, জলের বিশেষ গুণ রস, ও পৃথিবীর বিশেষ গুণ স্পর্শ । সূক্ষ্ম ভূত হইতে পঙ্কীকৃত হইয়া পাঁচ স্থূলভূতের উৎপত্তি হেতু, এবং এই জড়ভগৎ এই পাঁচ স্থূলভূতের পরিণাম বলিয়া, প্রত্যেক দ্রব্যোতেই ইতর-বিশেষ ভাবে এই পাঁচ গুণের অবস্থান আছে । এ সমুদায়ই ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্ম সত্তার বিধৃত থাকে । এইরূপে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর এই রূপরসাদি বিষয়, বেদান্ত-মতে পঞ্চ তন্মাত্র নহে, পঞ্চমহাভূতের কারণ বা গুণ । ইহাই কেবল ইন্দ্রিয়ের-গোচর হয় । শ্রুতিতে আছে—

“যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ পশুতি ।

এতেনৈব বিজানাতি... ।” (কঠঃ উপঃ, ৪।৯) ।

কিন্তু এই রূপ-রসাদি বাহু ও ইন্দ্রিয়-গোচর হইলে, তাহারা আমাদের জ্ঞেয় হয় । জ্ঞেয় হয় বলিয়াই তাহারা ক্ষেত্র । শব্দর বলিয়াছেন,—যাহা জ্ঞেয়, তাহাই ক্ষেত্র । এইজন্ত তাহাদিগকে ক্ষেত্রের উপাদান বলা হয় ।

এই রূপ-রসাদি গুণ দ্বারাই আমরা আমাদের জ্ঞানে বাহু অগ্নি জল প্রভৃতি জানিতে পারি । পরমাত্মা এই শব্দাদি গুণের আধার আকাশাদি-রূপে অভিব্যক্ত হন, এবং শব্দাদি দ্বারাই বাহু পাঞ্চভৌতিক বিষয় জ্ঞানে ও শক্তি-তে বিধৃত করেন । তাঁহার সৃষ্টি সত্য । সেই পরমাত্মার জ্ঞানের অংশী হইয়া বা তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, আমরা, শব্দাদি অমুভূতি হইতে, বাহু আকাশাদি জানিতে পারি । ইহাই বেদান্তের প্রকৃত বিজ্ঞানবাদ ।

ইহা ব্যক্তিগত বিজ্ঞানবাদ বা ক্রমিক বিজ্ঞানবাদ নহে । এ বিজ্ঞানবাদ বাহ্যস্তিবাদের বিরোধী নহে । সে যাহা হউক, আমরা বলিতে পারি যে, এই রূপরসাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় আমাদের বাহ্য বা জ্ঞেয় হইলেও, এই জ্ঞেয়রূপেই তাহারা এই শরীরের বা ক্ষেত্রের উপাদান । তাহারা আমাদের পাঞ্চ-কৌষিক শরীরের মধ্যে বিজ্ঞানময় ও মনোময় কোষের অন্তর্ভূত । আমরা আরও এক অর্থে বলিতে পারি যে, এই রূপরসাদি আমাদের স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরের উপাদান । সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদীতে আছে, “শরীরং তত্ত্ব পার্শ্ববাদি পাঞ্চভৌতিকং . শব্দাদীনাং পঞ্চানাং সমূহঃ পৃথিবীতি । তে চ দিব্যাদিব্যতরা দশেতি ।” (সাংখ্য-কারিকা ৩২ শ্লোকের ব্যাখ্যা) । অতএব পূর্বোক্ত কারণে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর রূপরসাদি তন্মাত্রকে স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরের উপাদানও বলা যায় ।

যাহা হউক, অধিকাংশ ব্যাখ্যাকাঙ্গণ সাংখ্যদর্শন হইতে এই শ্লোকোক্ততত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন । তাহারা বলেন, এই শ্লোকে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে । সেই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব কি, তাহা পূর্বে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বই যে ক্ষেত্রের উপাদান, ও ক্ষেত্রের স্বরূপ, তাহা অবশ্য এই শ্লোকে বুঝিতে পারা যায় । গিরি বলেন,—পূর্ব-শ্লোকে “তৎ ক্ষেত্রং ষষ্ঠ যাদৃক্ চ” ইহা বলিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্ এই শ্লোকে সেই ক্ষেত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।” এই ক্ষেত্র “ষতশ্চ” অর্থাৎ ইহার উপাদান কি, এবং ইহার স্বরূপ কি (৪৭), তাহা পরের শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে ।

এই ক্ষেত্রের স্বরূপ ও উপাদান যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, তাহা কেবল সাংখ্যদর্শন-সম্মত নহে, তাহা বেদান্তদর্শন-সম্মতও বটে । সাংখ্যদর্শন অনুসারে অর্থ করিতে হইলে, পঞ্চ মহাভূতকে পঞ্চ স্থূলভূত ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গোচরকে পঞ্চ তন্মাত্র বলিতে হয় । অথবা পঞ্চ মহাভূতকে পঞ্চ তন্মাত্র

ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচরকে পঞ্চ স্থূলভূত বলিতে হয় । গিরি তাহাই বলিয়াছেন । আর বেদান্ত-দর্শন অনুসারে অর্থ করিতে হইলে পঞ্চ মহাভূতকে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচরকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপরসাদি বুঝিতে হয় । বেদান্ত-মতে রূপরসাদি পঞ্চভূতের গুণ মাত্র, তাহার স্বতন্ত্র পদার্থ নহে । একত্র এ স্থলে বেদান্ত-মতে মহাভূত অর্থে সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত ভূত, আর পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর অর্থে রূপরসাদি ইন্দ্রিয়-বিষয় । এই অর্থে যে এই রূপরসাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়কে ক্ষেত্রের উপাদানরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা বলিয়াছি । আমরা এ স্থলে বেদান্ত ও সাংখ্য সমন্বয়পূর্বক গ্রহণ করিয়াছি, এবং তাহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । সমষ্টিভাবে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে ব্যক্ত এই জগৎ—ক্ষেত্র । এই জগৎই পরমাত্মা পরমপুরুষের শরীর । একত্র তিনি এ জগৎরূপ শরীরে ক্ষেত্রজ্ঞ । আর ব্যষ্টিভাবে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে প্রাণি-শরীর হইয়াছে । এই প্রাণি-শরীরে জীব সেই শরীরের ক্ষেত্রজ্ঞ । ভগবান্ যে সর্বক্ষেত্রজ্ঞ, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ—ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ । এই ক্ষেত্রের উপাদান যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, তাহার মধ্যে যাহা কারণ ও যাহা কার্য্য, তাহা সাংখ্য-দর্শন হইতে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । যাহা কারণ, তাহা কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আর যাহা কারণেরও অতীত, তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ । এ সবকে কঠোপনিষদে যাহা আছে, তাহা জানা উচিত । কঠোপনিষদের শ্লোক এই, (৩।১০।১১ ; ৩।৭-৮ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসশ্চ পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥”

*

*

*

*

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সৰ্বমুক্তমম্ ।

সৰ্বাদধি মহানায়া মহতোহব্যক্তমুক্তমম্ ॥

অব্যক্তাৎ পরঃ পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এবচ ।”

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

“ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥”

(গীতা, ৩।৪২) ।

উক্ত কঠ-শ্লোক ‘অর্থ’ = ইন্দ্রিয়-গোচর রূপরসাদি বিষয়, আর ‘মুক্তা’ = ‘বুদ্ধি’ = মহানায়া—ব্যষ্টিভাবে জীবায়া ও সমষ্টিভাবে হিরণ্যগর্ভ ।

ইহা হইতে অব্যক্ত, বুদ্ধি, মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়—ইহাদের লক্ষ্যার্থও জানা যায় । অহঙ্কারের কথা এ স্থলে উল্লিখিত নাই । কিন্তু সৰ্বকে এই অহঙ্কার ও মহানায়াকে বুদ্ধিতত্ত্ব বলা যায় ।

প্রকৃতি হইতে যে মহানের সৃষ্টি, ইহা সাংখ্যদর্শনে আছে । মহাত্ত্ব-সম্বন্ধে [এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচর-সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তমত পূর্বে উক্ত হইয়াছে । সে মতের পার্থক্য আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । কিন্তু এক অর্থে সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতই এ সম্বন্ধে এক । গীতার তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে । উভয় মতেই এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে । তবে সাংখ্য-দর্শনে মূল প্রকৃতি বা প্রধান, স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে গৃহীত এবং তাহা হইতে অপর ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত হইয়াছে । আর বেদান্তে ব্রহ্ম বা আত্মা হইতে ইহার উৎপত্তি সিদ্ধান্ত হইয়াছে । গীতার এই উভয় মতের সামঞ্জস্য আছে । গীতার অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতিকে পরমায়া পরমেশ্বরের প্রকৃতি বলা হইয়াছে । আরও এক কথা বুঝিতে হইবে,—এই তত্ত্ব ঋষিঃগণারা ছন্দে ও ব্রহ্মসূত্রপদেই বিস্তারিত হইয়াছে, পূর্ব-শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে । এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বিবরণ যে বেদান্তে আছে—উপনিষদে আছে, তাহাও আমরা দেখিয়াছি । সুতরাং ইহা

কেবল সাংখ্য-দর্শনোক্ত তত্ত্ব নহে । সেই দর্শন প্রচারের পূর্বেও সে তত্ত্ব প্রাচীন ঋষিগণ দর্শন করিয়াছিলেন, ইহা জানা যায় । গীতার এই অধ্যায়োক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-যোগ কেবল সাংখ্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত নহে । ইহা ছন্দে ও ব্রহ্মসূত্র-পদে ঋষিগণদ্বারা :স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ । গীতার অন্তত্ৰ সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে, সিদ্ধ-শ্রেষ্ঠ কপিলের উল্লেখ আছে । কিন্তু এ স্থলে সাংখ্যজ্ঞান উল্লিখিত হয় নাই । সুতরাং বেদান্ত হইতেই ইগা প্রধানতঃ বুদ্ধিতে হইবে ।

বাণী হউক, উপরে উক্ত উক্ত শ্রুতি হইতে এবং গীতার বচন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইন্দ্রিয়ের ‘অর্থ’ বা ‘বিষয়’ ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা ক্ষেত্র, এই ‘অর্থ’ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি (বা মন) শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহানায়া শ্রেষ্ঠ, মহানায়া হইতে অবাক্ত শ্রেষ্ঠ, আর এই অবাক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ । এই পুরুষই ক্ষেত্রজ্ঞ । এই পুরুষই ব্যাপক অলিঙ্গ । এই পুরুষই কাষ্ঠা (শ্রেষ্ঠ) ও পরা গতি । এই পুরুষ-স্বরূপ লাভ করিতে হইলে, যে শান্তি ক্ষুরের ধারের দ্বারা তর্কম হ্রস্বতি-ক্রমণীয় (যোগরূপ) পথে বাইতে হয় (কঠ, ৩।১৪), তাহার ক্ষম্ব বাক্ ণা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণকে মনে সংযত করিতে হয়, মনকে বিজ্ঞানাত্মায় সংযত করিতে হয়, বিজ্ঞানাত্মাকে মহানায়ায় সংযত করিতে হয়, ক্রমে মহানায়াকে সেই পরম শান্ত আত্মাতে বা পুরুষে সংযত করিতে হয়, (কঠ, ৩। ১৩) । ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয় ।—এইরূপে ‘অর্থ’ হইতে অবাক্ত পর্য্যন্ত উক্ত সমুদায় ক্ষেত্রকে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ হইতে পৃথকভাবে জানিয়া সেই পুরুষের স্বরূপ লাভ করিতে হয় । সেই তত্ত্ব প্রথমে জানিবার উপায়—“উত্তিষ্ঠ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।” (কঠ, ৩।১৪) । অর্থাৎ অজ্ঞান নিদ্রা হইতে উখিত ও জাগ্রত হইয়া শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের নিকট বাইয়া ইহা জানিতে হয় । গীতার এ স্থলে সেই উপদেশই দেওয়া হইতেছে । ইহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানোপদেশ ।

ইচ্ছা ঘেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধুতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬

ইচ্ছা, ঘেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা,

আর ধুতি,—সমুদায় বিকার সহিত

ক্ষেত্র ইহা, সংক্ষেপেতে হয় অভিহিত ॥ ৬

৬। ইচ্ছা ঘেষ—পূর্বে সুখের সাধন বলিয়া লোকে যে জাতীয় বস্তুকে অনুভব করিয়াছিল, পরে আবার সেই জাতীয় বস্তুকে দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য ইচ্ছা করে। এই ইচ্ছা অন্তঃকরণের ধর্ম। সুতরাং ইহা জ্ঞেয়। জ্ঞেয় বলিয়া ইহাও ক্ষেত্র। সেইরূপ পূর্বে যে প্রকার বস্তুকে দুঃখের কারণ বলিয়া অনুভব করা হইয়াছিল, সেই প্রকার বস্তুকে আবার দেখিতে পাইলে, লোকে তাহার প্রতি ঘেষ করে। এই ঘেষও অন্তঃকরণের ধর্ম—সুতরাং ইহা জ্ঞেয়। অতএব ইহাও ক্ষেত্র, বা ক্ষেত্রের ধর্ম, (শব্দ)। সুখজনক বিষয়ে ইচ্ছা এবং দুঃখহেতু বিষয়ে ঘেষ—ইহারা জ্ঞেয় বলিয়া ক্ষেত্রের ধর্ম (গিরি)। আমার সুখ-সাধন জন্য এ বস্তু আমার হটক, এই স্পৃহাশ্রমক চিন্তাবৃত্তিট ‘কাম’ বা ‘রাগ’ বা ইচ্ছা। আর ইহা আমার দুঃখসাধন, এ বস্তু আমার না হটক, এইরূপ যে স্পৃহাবিরোধী চিন্তাবৃত্তি, তাহা ক্রোধ, দ্বेष বা ঘেষ, (মধু)। সুখহেতু বলিয়া অভিমত বস্তুর ইচ্ছা = ইচ্ছা, আর প্রতিকূল বস্তুর নিরাশাস্রমক চিন্তাবৃত্তি = ঘেষ। ইহারা ক্ষেত্রের ধর্ম (কেশব)। কোনও সুখকর বস্তু উপস্থিত হইলে, তাহা পাইবার কামনা—ইচ্ছা, আর দুঃখকর বস্তু উপস্থিত হইলে, তাহা ত্যাগের প্রবৃত্তি—ঘেষ। যেমন সুখদ বস্তু পাইবার ইচ্ছা হয়, সেইরূপ দুঃখদ বস্তু ত্যাগের বা না পাইবার ইচ্ছা হয়। উত্তর সবন্ধেই ইহাকে সাধারণভাবে ইচ্ছা বলা যায়।

কিন্তু এ স্থলে কেবল সুখকর বস্তু পাইবার অশ্রু যে বাসনা, তাহাকেই বিশেষভাবে ইচ্ছা বলা হইয়াছে । ইচ্ছা অর্থাৎ পাইবার ইচ্ছা । ঘেষ অর্থাৎ ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি । তাহাকে ঠিক ইচ্ছা বলা যায় না । রাগহেতু ইচ্ছা, ঘেষহেতু অনিচ্ছা হয় । এই ইচ্ছা (রাগ) ও ঘেষ ইহারি বন্দ ।

সুখ দুঃখ—যাহা অনুকূল, প্রসাদময় ও সন্তোষের পরিণাম, তাহাই সুখ । সে সুখ ক্ষেত্র, একত্র তাহা ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রের ধর্ম । আর দুঃখ প্রতিকূলমতাব প্রমাদকর, ইহা রজোশুণের পরিণাম । দুঃখও ক্ষেত্র, একত্র ইহা ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রের ধর্ম (শকর) । নিক্রপাধি ইচ্ছাবিষয়ীভূত অসাধারণ কারুণিক ধর্মযুক্ত যে চিত্তবৃত্তি, যাহা পরমাত্ম-সুখব্যঞ্জক, তাহা সুখ । আর নিক্রপাধি ঘেষবিষয়ীভূত যে চিত্তবৃত্তি, তাহা দুঃখ (মধু) । পুণ্যপ্রসাদানুকূল বিষয়ানুভব = সুখ (কেশব) । এই সুখ-দুঃখও বন্দ । এই রাগ-ঘেষ সুখ-দুঃখ—বাসনারূপ সংসার-বীজ । ইহাই সংসারের বা ভবের কারণ ।

মধুসূদন সুখের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত । সুখ-দুঃখ, রাগ-ঘেষ—ইহারি নিক্রপাধিক হইতে পারে । ইহারি চিত্তের বা জ্ঞান-করণের ধর্ম । বিষয়গ্রহণকালে এই ধর্মের বিকাশ হয়, অশ্রু সময় ইহারি চিত্তে বীজভাবে থাকে । মন যখন কোন বিষয় অনুভব করে, এবং বুদ্ধি তাহা গ্রহণ করে, তখনই চিত্তের এই সুখ-দুঃখ রাগ-ঘেষাদিরূপ ক্রিষ্ট ও অক্রিষ্ট বৃত্তির বিকাশ হয় । সুখাত্মক চিত্তবৃত্তি স্বভাবতঃ সাত্বিক, তাহাতে বিষয়-প্রকাশ-কালে সুখ অনুভূত হয় । আর রাজসিক বৃত্তিতে দুঃখ অনুভূত হয় । ইহা সাধারণ নিয়ম । বিশেষ স্থলে রাজসিক চিত্তবৃত্তিতেও সুখ এবং সাত্বিক চিত্তবৃত্তিতে দুঃখ ও রাগঘেষের বিকাশ হয় । শ্রীমদর্শনে আছে, (১।১।২১) “বাধনালক্ষণং দুঃখম্ ।” যখন পীড়া-তাপাদি উৎপন্ন হয়, তখন পীড়া-তাপাদি লক্ষণ দুঃখ হয় । সুখ ও দুঃখ বন্দ, ইহারি পরস্পর

বিরোধী। বৈশেষিক দর্শনে আছে (১০।১।১)—“ইষ্টানিষ্টকারণ-
বিশেষাৎ বিরোধাত্ সুখদুঃখয়োর্থাস্তরভাবঃ।” সুখ ইষ্টকর ও দুঃখ
অনিষ্টকর। সুখের সময় দুঃখ অন্তঃকরণে লীন থাকে এবং দুঃখের সময়
সুখ লীন থাকে। এই সুখ-হেতু ‘রাগ’ বা অমুরাগ জন্মে, এবং
দুঃখ-হেতু ঘেব জন্মে। পাতঞ্জল-দর্শনে (২।৩-৮) আছে—

“সুখানুশয়ী রাগঃ। দুঃখানুশয়ী ঘেবঃ ॥”

চিত্তবৃত্তি মাত্রেই প্রায় সুখকর, না হয় দুঃখকর। পাতঞ্জল-দর্শনে
আছে—“বৃত্তয়ঃ পঞ্চতন্ত ‘ক্লষ্টা অক্লিষ্টাঃ।”

এ স্থলে কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, গীতার উক্ত হইয়াছে—“পুরুষঃ
সুখদুঃখানাং ভোক্তৃষু হেতুরুচ্যতে।” এজন্য বলা যায় যে, ইচ্ছাঘেব
সুখদুঃখ আত্মারই ধর্ম। তথাপি অত্মার ক্ষেত্র-সম্বন্ধ প্রযুক্তই তাহা
হইতে উৎপন্ন হেতু ইহাদিগকে ক্ষেত্রাশ্রিত বলা যায়।

এই সুখদুঃখ ও রাগদেবত্ব আমরা পূর্বে বৃত্তিতে চেষ্টা করিয়াছি।
এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নপ্রায়জন।

এই সুখ-দুঃখ রাগদেব চিত্তেরই বিকার ; সুতরাং ক্ষেত্রের বিকার।
ইহাতে ক্ষেত্র যদি বিকারী, তাহা উক্ত হইয়াছে। ভগবান পূর্বে বলিয়া-
ছেন,—বুদ্ধি জ্ঞান ইচ্ছা ঘেব সুখ দুঃখ ভূতগণের যে পৃথগ্‌বিধ ভাব, তাহা
তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত হয় (গীতা, ৯।৫)। ক্ষেত্রেই এই বিবিধভাব
অভিব্যক্ত হয়।

সংঘাত—দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের সংহতি (শরীর)। দেহ ও ইন্দ্রিয়ে
আত্মাধ্যাস নিবারণ জন্ম ইহাদিগকে ক্ষেত্রাত্তর্গত বলা হইয়াছে (গিরি)।
শরীর (শরীর)। পঞ্চমহাভূত-পরিণাম ইন্দ্রিয় সহিত শরীর (মধু)। ভূত-
পরিণাম দেহ (বলদেব)। ভূত-সংঘাত, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ভূত প্রকৃতি—
এই পৃথিবী পর্য্যন্ত জব্য (রামানুজ)। সংঘাত = চেতন ভোগায়তনভূত
পঞ্চমহাভূত পরিণাম (কেশব)। সংঘাত অর্থে “অযুত সিদ্ধ অবয়ব”

পাতঞ্জল-দর্শনের ৩।৪৪ সূত্রের ব্যাস-ভাষ্য) । ইহা তিন প্রকার—
 দ্বীষ শরীর (animal organism) বৃক্ষ (vegetable organism, এবং
 পরমাণু । অতএব সংঘাত অর্থে, যাহা সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তরুকে সম্বি-
 লিত করিয়া এই স্থূল শরীর উৎপন্ন করে, সেই শরীর-গঠন-শক্তি (vital
 force) হইতে উৎপন্ন শরীর । ইহাকে organism বলা যায় । যাহা
 organised হয়—শরীররূপে সংহত হয়, তাহা সংঘাত । সূত্রত্রয় সংঘাত
 অর্থে স্থূল (organised) শরীর । পূর্বে যে প্রকৃতি ও প্রকৃতি-জাত
 ত্রয়োবিংশতি তরু উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতেও লিঙ্গ ও অধিষ্ঠান বা আতি-
 বাহিক শরীররূপ ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয় । সাংখ্যদর্শন অনুসারে বুদ্ধি,
 অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর হয় । পঞ্চ
 মহাভূত বা সূক্ষ্মভূতের সূক্ষ্মাংশ হইতে তাহার অধিষ্ঠান বা আতিবাহিক শরীর
 হয় । ইহা সূত্রের পরেও থাকে । 'সাংখ্য-সূত্র—“আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ”
 জ্ঞেয়্য । যখন আবার জন্ম হয়, তখন এই সূক্ষ্ম শরীর লীঙ্ঘরূপে সূক্ষ্মভূত
 আকর্ষণ করিয়া পিতৃমাতৃক পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর গঠিত হয় । অতএব
 পূর্ব-শ্লোকে স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরের কথা নাই । সেই শ্লোকোক্ত
 সূক্ষ্ম শরীরদ্বারা, তাহাতে সঞ্চিত বাসনা সংস্কার অর্থাৎ কাগ ঘেষ
 সূক্ষ্মতঃখাদি হইতে যে পারক কর্ম ফলোন্মুখ হয়, তাহা হইতে যে স্থূল
 শরীর বা পিতৃমাতৃক শরীর গঠিত (organised) হয়, তাহাই সংঘাত ।
 এই স্থূল শরীর যে ভূতগ্রাম বা বহুভূত-বিশেষের সমবारे উৎপন্ন, তাহা
 পরে ১৬।২৬-২৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।

পূর্বে যে ক্ষেত্র সম্বন্ধে “যতশ্চ যৎ” উক্ত হইয়াছে, এই স্থলে তাহারই
 উপদেশ দেওয়া হইয়াছে বলা যায় । এই ক্ষেত্র বা শরীরকে সাধারণতঃ
 আমরা এই দৃশ্যমান স্থূল শরীর বা অন্নময় শরীর বলিয়াই বুঝি । ইহাকেই
 সাধারণতঃ সংঘাত বলে । ইহা লিঙ্গশরীরের বিকার-রাগ-ঘেষ-সূক্ষ্ম-
 হঃখরূপ বাসনা বা সংস্কার-বীজ হইতে উৎপন্ন । ইহাই নানাবিধ স্থূল

শরীররূপে ব্যক্ত হয় । আমরা বলিযাছি যে, সংঘাতের মূল কারণ প্রাণ-শক্তি (vital energies) । ইহা ভগবানের সনাতন অংশ, এই জীবলোকে জীবভূত হয়, ও জীবভূত হইবার কালে প্রকৃতিই মন ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া সংহত করে । স্থূল শরীরের ধ্বংস বা উৎপত্তি-কালে ইহাই (চিত্ত বা) মন ও ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়া লইয়া যায় এবং লইয়া আসে, এই শক্তিই স্থূল শরীর সংযোগ করে । এজন্য এই স্থূল শরীরই সংঘাত-

চেতনা—প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নির স্তায় সেই সংঘাতে অভিব্যক্ত যে অস্তঃকরণের বৃত্তি, যাহা আত্মচৈতন্যের আভাসরূপ রসে আপ্প্রুত, সেই অভিব্যক্ত অস্তঃকরণ-বৃত্তিই চেতনা । এই চেতনা ক্ষেত্র বলিয়া ক্ষেত্র (শঙ্কর) । তপ্ত লৌহপিণ্ডে বহির অভিব্যক্তির স্তায়, সেই সংঘাতে বা শরীরে বুদ্ধিবৃত্তির অভিব্যক্তি হয়, এবং তাহাতে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে আত্মচৈতন্যেরও অভিব্যক্তি হয় । সেই আভাস-চৈতন্যকে আত্মা বলিয়া বোধ হয় । এই আভাস-চৈতন্যকেই চেতনা বলে । তাহা আত্মচৈতন্যের ক্ষেত্র । এজন্য তাহা ক্ষেত্র (গিরি) ।

চেতনা = জ্ঞানাত্মক মনোবৃত্তি (স্বামী) । চেতনা = চেতনধরূপ জ্ঞানব্যঞ্জক জ্ঞানাখ্য চিত্তবৃত্তি । (মধু) । ভূত পরিণাম দেহ সংঘাতই চেতনা (বলদেব) । চেতনা = বিষয় অনুভব-যোগ্য দেহেন্দ্রিয়ের অবৈকল্য অবস্থা (কেশব) ।

ধৃতি—দেহ ও ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইয়াও বাহার প্রভাবে বিধৃত হয়, সেই শক্তি-বিশেষকে ধৃতি বলে (শঙ্কর) । দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ অবসন্ন হইলে, তাহাদের ধারণ জন্ম প্রযত্ন (মধু) । ভোগ-মোগ হেতু যতমান চেতনাযুক্ত জীবের আধাররূপে উৎপন্ন (বলদেব) । দেহ ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য হেতু উপস্থিত হইলে, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অবষ্টান্তক ধর্ম বিশেষ (কেশব) । ধৈর্য্য (স্বামী) ।

রামানুজের পাঠ অন্তরূপ । তাঁহার পাঠ—“সংঘাত চেতনা

আধুতি” । আধুতিঃ অর্থে আধার । সুখহুঃখভোক্তা, ভোগ ও অপবর্গ-
সাধন জন্ত যত্ববান্ চেতনার আধাররূপে উৎপন্ন পঞ্চভূতের সংঘাত
শরীর ।” চেতনার আধার সংঘাত । ইচ্ছা বোঝা বিকারভূত সংঘাতে
চেতনের সুখহুঃখানি ভোগের এ আধার প্রয়োজন ।

বাহ্য হৃৎক, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি ইহারা পরস্পর বিভিন্ন । চেতনা
অর্থ শব্দেরই সঙ্গত । এই চেতনার অর্থ এ স্থলে আরও বিশেষভাবে
বুঝিতে হইবে । চেতনা, চৈতন্য, চিৎ প্রভৃতি শব্দের অর্থভেদ বুঝিতে
হইবে । চেতনের ইংরাজী প্রতিশব্দ “Consciousness । ইহা দুই
রূপ—এক আত্ম-চৈতন্য (Self-consciousness) আর এক ক্ষেত্রে
অভিব্যক্ত চেতনা (Phenomenal Consciousness) । আত্মা চিৎ-
স্বরূপ, ‘জ্ঞ’-স্বরূপ, নিত্য-বোধ-স্বরূপ । সাংখ্য কারিকায় আছে, “তস্মাৎ
ভৎসংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবৎ ইব লিঙ্গং” (কারিকা, ২০) । ‘জ্ঞ’-
স্বরূপ—চিৎস্বরূপ পুরুষের প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করিয়া—লিঙ্গ-শরীর চেতনবৎ
হয় । অতএব লিঙ্গ-শরীরে অভিব্যক্ত চৈতন্য—প্রতিবিশ্বিত আভাস
চৈতন্য । ইহাতেই জীবভাব হয় । ভগবান্ বলিয়াছেন—“ভূতানামস্মি
চেতনা ।” শ্রীচণ্ডীতে আছে—ব্রহ্মশক্তি “চিতিক্রপেণ বা কৃৎসন্ম এতৎ
ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ ।” সুতরাং এই ক্ষেত্রে প্রতিবিশ্বিত চৈতন্য ক্ষেত্রের ধর্ম ।
চিৎস্বরূপ আত্মার এই প্রতিবিশ্ব হেতু ক্ষেত্রে এই জীব-চৈতন্যের বিকাশ
হয় । পরমাত্মাই ‘চেতনশ্চেতনানাং’ (কঠ, ৫.১৩ ; শ্বেত শ্বঃর. ৫।১) ।

ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, সংঘাত (organised body)
মাত্রই চেতনা-বিশিষ্ট । কিন্তু এ চেতনা আমরা সর্বত্র বুঝিতে পারি না ।
বাহ্য জড় সংঘাত, তাহার মধ্যে আমরা এ চেতনার বিকাশ দেখিতে
পাই না । কিন্তু কোন সংঘাত যে চেতনা-বিশিষ্ট নহে, তাগা বলা যায় না ।
এ সম্বন্ধে জর্মান দার্শনিক প্রসিদ্ধ সপেনহয়র বলিয়াছেন, “Conscious-
ness that sleeps in stone dreams in animals and awakes

in man.” অতএব সর্বভূতে এই চেতনা আছে । তাঁহা ভগবানেরই অংশ বা তাঁহার বিশেষ ভাব,—ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত ভূতভাব ।

এক্ষণে ধৃতির অর্থ কি, তাহা বুঝিতে হইবে । গীতার পরে উক্ত হইয়াছে যে, ধৃতি তিন প্রকার,—সাধ্বিক, রাজসিক ও তামসিক । সাধ্বিক ধৃতি দ্বারা মন প্রাণ ইন্দ্রিয় ক্রিয়া অব্যভিচারিত যোগে ধৃত হয়, রাজসিক ধৃতি দ্বারা তাহা ধর্ম্য কাম ও অর্থের প্রীতি ধৃত হয় । আর তামসিক ধৃত দ্বারা, স্বপ্ন ভয় প্রভৃতিতে ধৃত হয় । সুতরাং ধৃতিই ধারণশক্তি । ইহা বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়া দকে কোন বিশেষ ব্যাপারে বিধৃত করে । (গীতা ১৮।৩০-৩৫) । বেদান্ত অনুসারে ধৃতি অধৃতি মনই বা মনের ধর্ম্য (বুঃ আঃ ১৫) । সাংখ্যদর্শন অনুসারে এই ধারণ বা ধার্য্য কর্ম্ম, বুদ্ধি অহঙ্কার মন দশ ইন্দ্রিয়—এই ত্রয়োদশ করণের সামান্ত্র বৃত্তি মাত্র । সাংখ্যদর্শনে আছে—

“করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণং ধারণং প্রকাশকরম্ ।

কার্য্যঞ্চ তস্ত দশধা ধার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশঞ্চ ॥

(কারিকা, ৩২)

অতএব বুদ্ধি মন অহঙ্কার ও দশ ইন্দ্রিয়—এই ত্রয়োদশ করণের এক বৃত্তি—ধারণ বা ধারণ শক্তিই ধৃতি । প্রাণ ও সাংখ্যমতে সামান্ত্র করণ-বৃত্তি । “সামান্ত্র করণ-বৃত্তিঃ প্রাণাত্মা পঞ্চবায়বঃ ।” এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু দ্বারা এই ধারণ কার্য্য হয় ।

উক্ত কারিকার ব্যাখ্যায় সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীতে আছে,—“বুদ্ধ্যহঙ্কার-মনাংসি তু স্ব-বৃত্ত্যা প্রাণাদিলক্ষণয়া ধারয়ন্তি ।” • • • ধার্য্য-মপ্যন্তঃকরণত্রয়স্ত প্রাণাদিলক্ষণয়া বৃত্ত্যা শরীরম্ । তত্ত্ব পার্থিব্যাদি পঞ্চ-ভৌতিকম্ । • • • তে চ পঞ্চ দিব্যাদিব্যতয়া দশোত, ধার্য্যমপি দশধা ।”

এতদনুসারে বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ যে পঞ্চভৌতিক শরীরকে ধারণ করে—অর্থাৎ রক্ষণ পোষণ ও বর্দ্ধন করে, তাহা তাহাদের এই প্রাণ-বৃত্তির দ্বারাই সম্ভব । এই তত্ত্ব বলিতে পারা যায় যে, ধৃতি প্রাণেরই

ধারণ-শক্তি । আর ইহাই প্রাণের পঞ্চবিধ প্রাণনাদি ক্রিয়াকে নিয়মিত করে । প্রাণ সাংখ্যমতে উক্ত ত্রয়োদশ করণে সামান্ত্য বৃত্তি হইলেও (কারিকা ২৯) বেদান্তমতে প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি ত্রয়োদশ করণ অপেক্ষা স্নেহ ও শ্রেষ্ঠ । প্রাণ হিরণ্যগর্ভ হইতে প্রথম উৎপন্ন । (পূর্বে ৭।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । এই প্রাণ হইতে সমুদায় জগতের অভিব্যক্তি হয় । (প্রাণে একতি নিঃসৃতম্—ইতি শ্রুতিঃ) । প্রাণে সমুদায় জগৎ বিধৃত হয় । প্রাণই এ সমুদায় ('প্রাণ এব ইদং সর্বম্—ইতি শ্রুতিঃ । অতএব এই ধৃতিই মুখ্য প্রাণেরই মূল বৃত্তি, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু এই প্রাণেরই কার্যরূপ, এই প্রাণই শরীর-ধারণশক্তি ও তাহাই বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর ক্রিয়ার ধারণ ও নিয়মন শক্তি ।

এ স্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্ত-মতের সামঞ্জস্য করিতে হইলে বেনাস্তোক্ত প্রাণ ও সাংখ্যোক্ত প্রাণবায়ু বতন্য ভাবে বৃদ্ধিতে হইবে । প্রাণ—ধারণ, শক্তি পঞ্চপ্রাণ বায়ু তাহা কার্য (function) । প্রাণ,—মূল শক্তি, পঞ্চপ্রাণ-ক্রিয়া তাহা হইতে অভিব্যক্তি । প্রাণ বুদ্ধি মন প্রভৃতি 'করণ' হইতে শ্রেষ্ঠ, প্রাণ তাহাদিগকে ধৃতি-শক্তিরূপে বিধারণ করে । তাহা হইতে এই বুদ্ধি প্রভৃতি ত্রয়োদশ করণের সামান্ত্য বৃত্তিরূপে এই প্রাণাদি পঞ্চ (পরিচালক) বায়ুর অভিব্যক্তি হয় । এই পঞ্চপ্রাণ-ক্রিয়াকে মূল প্রাণ ধৃতিরূপেই ধারণ করে । গীতা অনুসারে এই প্রাণই জীবভূত হইয়া জীবজগৎ ধারণ করে ।

সমুদায় বিকার সহিত—(সবিকারঃ)—বিকার বা পরিণামের সহিত সম্বন্ধ মহত্ত্ব প্রভৃতি ষাটটির জের বস্তু মাত্রই ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে (শব্দ) । ক্ষেত্র ভেদজাত বাষ্টি দেহ বিভাগ সমুদায়ও ক্ষেত্র । তাহারই সংহতি সমষ্টি শরীর (গিরি) । বিকার সহিত অর্থাৎ কার্য সহিত (রামানুজ) । ইন্দ্রিয়াদি বিকার সহিত (স্বামী) । জন্ম-মরণাদি পরিণামযুক্ত (কেশব) ।

এই ইচ্ছা ঘেষ সুখদুঃখ ভূতগণের ভাব, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।
এই ভাব স্বর ভাব--বিকারী ভাব। ইহারা ক্ষেত্রেরই বিকার।

মধুসূদন বলেন,—“এই মহাভূত হইতে আরম্ভ করিয়া ধৃতি পর্যন্ত
জড়। ইহারা সাক্ষী ক্ষেত্রজের অবভাস্তমান হেতু অনাস্ত্র। ক্ষেত্র
ভাস্তমান চেতন। ক্ষেত্রের সহায়েই চেতনের অভিবাঙ্কি। লোকায়তিক-
গণের মতে শরীর ইন্দ্রিয়ের সংঘাতেই চৈতন্য—তাহাই ক্ষেত্রজ। সৌগত
বা বৌদ্ধগণের মতে, ক্ষণিক বিজ্ঞান-সংহতিই আত্মা। অন্ত্র, আত্মা নাই।
আর, ইচ্ছা ঘেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ চেতনা আত্মারই লিঙ্গ বা পরিচায়ক—ইহা
নৈসর্গিকগণের মত। অতএব এ সকলকে কিরূপে ক্ষেত্র বলা যায়?
উহারই উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ইহারা ক্ষেত্রের বিকার। নিকল্লমতে যথা
জন্মাদি বড়ভাব বিকারযুক্ত, তাহাই বিকারী। এই মহাভূত হইতে ধৃতি
পর্যন্ত সমুদায় সেই বিকারযুক্ত। ক্ষেত্রজ অবিকারী। যিনি দ্রষ্টা বা
জ্ঞাতা, তিনি স্বয়ং নিজের উৎপত্তি-বিনাশের দ্রষ্টা হইতে পারেন না।
তিনি দর্শনের কর্তা, তিনি দর্শনের কর্ম্য হইতে পারেন না। আত্মা
নির্বিচার, তিনি সর্ববিচারের সাক্ষী মাত্র। অতএব বিকারই
ক্ষেত্রের চিহ্ন”।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, যাহা জ্ঞেয়, তাহাই ক্ষেত্র। এই দুই শ্লোকে,
যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার জ্ঞেয়—একত্র ক্ষেত্র। পূর্বে দ্বিতীয় শ্লোকের
ব্যাখ্যায় শঙ্করের এই মত বিবৃত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন যে, “বৈশেষিক দর্শন অনুসারে ইচ্ছা-ঘেষাদি
আত্মার গুণ। তাহার যে ক্ষেত্রেরই ধর্ম্য, আত্মার নহে, তাহার
সাবিকারী, সুতরাং নির্বিচার আত্মার ধর্ম্য হইতে পারে না, তাহা এই
শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।” বৈশেষিক দর্শনে আছে—

“ইচ্ছা-ঘেষ-সুখ-দুঃখ-প্রযত্নাশ্চ আত্মনো লিঙ্গানি ।”

(বৈশেষিক দর্শন, ৩.২।৪)।

জ্ঞানদর্শনেও এই কথা আছে ; যথা—

“ইচ্ছা-দেহ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখজ্ঞানানি আত্মনো লিঙ্গম্ ।”

(জ্ঞান-দর্শন, ১।১।১০) ।

জ্ঞান-মতে মন আত্মা হইতে স্বতন্ত্র ও সুখদুঃখাদি মনের ধর্ম বটে ; কিন্তু মনের বিভিন্ন আকার সংযোগেই আত্মা চৈতন্যযুক্ত, এবং সুখদুঃখাদি-ধর্মযুক্ত হয় ।

প্রসিদ্ধ আছে,—আত্মা ‘সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ’ ইত্যাদি । গীতার আদেশ,—“পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্ণে হেতুরুচ্যতে ।” (গীতা, ১৩।২০) । কিন্তু মন । তাহাই সুখ দুঃখ, ইচ্ছা দেহ, কাম, সংকল্প ইত্যাদির অভিব্যক্তি হয় । প্রকৃতি অনুসারে ভোগীবা মনই—বা মনের ধর্ম ; ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এজন্য তাহা ক্ষেত্রের অন্তর্গত (বলদেব) ।

আমি এই শরীরের বেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ । আমার যাহা বেত্ত বা জ্ঞেয়, তাহাই এই শরীর বা ক্ষেত্র । ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই তত্ত্ব আরও বিশেষ ভাবে এস্থলে পরিস্ফুট হইয়াছে । মহাভূত হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টি পর্যন্ত সমুদায়ই ক্ষেত্রজ্ঞ আমার বেত্ত, আমার জ্ঞেয়, এজন্য ইহাই ক্ষেত্র । ইহা অর্পেক্ষা আরও বিশেষ ভাবে এ তত্ত্ব জানিতে হইবে । এই কল্পটির মধ্যে কোন্গুলি কিরূপ, কোন্গুলি ক্ষেত্রের উপাদান, কোন্গুলি তাহার বিকার, কোন্গুলি ক্ষেত্রের উৎপাদক কারণ, কোন্গুলি বা তাহার কার্য, তাহা আরও বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে । ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি, ইহাদের লক্ষণ কি, কার্য কি, স্বরূপ কি, তাহাও জানিতে হইবে । এই দুই শ্লোকে তাহার ইঙ্গিত আছে মাত্র ।

পূর্ব-শ্লোকে ক্ষেত্রের স্বরূপ কি, তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে । তাহা “বচ্চ বাদৃক্চ”—ইহা বিবৃত হইয়াছে । এ শ্লোকে ক্ষেত্রের বিকার ‘বদ্বিকারী’, তাহা নিরূপিত হইয়াছে, (গিরি) । এই শ্লোকে আরও ‘বতশ্চ যৎ’ ইহাও বিবৃত হইয়াছে বলিতে হইবে । নতুবা ভগবানের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় । ‘যতঃ’

অর্থাৎ যাহা হইতে, অথবা যাহা কারণ । কারণ সাধারণতঃ দুইরূপ,—
উপাদান কারণ, ও নিমিত্ত কারণ । মহাভূতাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ক্ষেত্রের
উপাদান কারণ । ইচ্ছা ঘেষ সুখ দুঃখ ইহার নিমিত্ত কারণ (‘যতঃ’) । সংঘাত
ইহাদের কার্য (‘যৎ’) । আর চেতনা ও ধৃতি তাহার প্রকাশক ও ধারক
শক্তি । বেদান্ত, সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে অজ্ঞান বা অবিজ্ঞান
শরীর-সংযোগের প্রকৃত নিমিত্ত কারণ । এই অজ্ঞান বা অবিজ্ঞান হইতে
ইচ্ছা, ঘেষ, সুখ, দুঃখাদি চিত্তধর্মের বিকাশ হয়, এবং তাহা আত্মার ধর্ম
বলিয়া ভ্রম হয় । এই ইচ্ছা ঘেষ প্রভৃতির বশে আমরা কর্ম করি । সেই কর্ম
হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয় । এইরূপে ইচ্ছা ঘেষ, সুখ দুঃখ, এবং তদনু-
সারী কর্মপ্রবৃত্তি বীজ-ভাবে অন্তঃকরণে থাকিয়া যায় । তাহাই সংস্কার ।
এই সংস্কারের মূল বাসনা । বাসনা বা ‘কাম’ দ্বারা প্রবর্তিত স্ফুটনোন্মুখ
এই সংস্কার হইতেই স্থূলশরীর গঠিত হয় । “সতি মূলে তদ্বিপাকো
জাত্যায়ুর্ভোগঃ ।” (পাতঞ্জল সূত্র, ৪।২) । সূত্রাং এই সংস্কারই স্থূল শরীর
সংযোগের নিমিত্ত কারণ । পূর্বপূর্ব জন্মকৃত কর্ম হইতে যে সংস্কারাণি
সঞ্চিত হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা ফলোন্মুখ হয়, তাহা হইতেই জন্ম হয়,
এবং পশু পক্ষী মানুষ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় শরীরমধ্যে সেই সকল সংস্কার
বিকাশের উপযুক্ত শরীর গ্রহণ হয় । উদ্ভিজ্জাদি নিম্ন জীবে সূক্ষ্ম শরীর অবি-
কাশিত, তাহা বীজভাবে থাকে । এজগৎ নিম্নশ্রেণীর জীবে বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়
প্রভৃতির বিশেষ বিকাশ থাকে না । তাহাদের স্থূল শরীরই বিকাশ হয় ।
তাহার পর কর্ম দ্বারা যে সংস্কার সঞ্চিত হয়, জন্মের পর জন্ম-গ্রহণ দ্বারা
সেই সংস্কারের উন্নতি হয় । তাহা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম শরীরের ক্রমো-
ন্নতি হয় । প্রথম প্রাণ শরীরের বিকাশ হয় । প্রকৃতির আপূরণে সংস্কার
সঞ্চয়ে জাত্যন্তর পরিণাম হয় । অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর জীবে সেই
সংস্কার হইতে মনোময় শরীরের বিকাশ হয় । তখন ইচ্ছা, ঘেষ, সুখ, দুঃখ
অনুভূতির আরম্ভ হয় । কামমানস শরীর এইরূপে ক্রমোন্নত হয় ।

এইরূপে এই দুই শ্লোকে সংক্ষেপে ক্ষেত্র যাহা, যে প্রকার, যাহা হইতে উৎপন্ন, যেরূপ ও যে বিকারযুক্ত, তাহা অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । আমরা তাহা বিস্তারিত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । যাহা হউক, এই ক্ষেত্রতত্ত্ব বুঝা বড় কঠিন । ভগবান্ বলিয়াছেন,—এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান । ক্ষেত্রকে জানিলে, তাহার বিপরীতধর্মযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞকেও জানা যায় ; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জ্ঞান বা সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিপুরুষবিবেক জ্ঞান লাভ হয় এবং সে জ্ঞান হইতে মুক্তি হয় । অতএব ক্ষেত্র সম্বন্ধে ষথার্থ জ্ঞান লাভ করা একরূপ দুঃসাধ্য । আমাদের শাস্ত্রে নানাস্থানে, নানারূপে ইহা বুঝান আছে । আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে, বিশেষতঃ মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে, বুদ্ধি অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয়াদি—যাহাকে সমষ্টিভাবে অহুঃকরণ বা (mind) বলা হইয়াছে—তাহা যে ক্ষেত্র বা দেহের, অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরের অন্তর্গত, তাহা বুঝান হয় নাই, বরং তাহার আত্মার ধর্ম বা আত্মার স্বরূপ,—তাহারা শরীরের অন্তর্গত নহে, ইহাই বুঝান হইয়াছে । মন, বুদ্ধি, চেতনা প্রভৃতি যে আত্মার ধর্ম নহে, আত্মা যে তাহা হইতে ভিন্ন, ইহা বুঝান হয় নাই । এজন্য আধুনিক দর্শনের Psychology শাস্ত্রের সাহায্যে, এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব বুঝিবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই । এতদ্ব্যতীত আমাদের শাস্ত্র হইতে, বিশেষতঃ সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শন হইতেই আমরা জানিতে পারি ।

সাংখ্য-দর্শন অনুসারে, শরীর যে, কারণ শরীর, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর, স্থূল শরীর এবং অধিষ্ঠান (বা আতিবাহিক) শরীর ভেদে চারি প্রকার, এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র—এই সপ্তদশ প্রকৃতির পরিণাম মিলিয়া যে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর তাহা পূর্বে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে ।

বেদান্ত-দর্শন ও উপনিষদ্ অনুসারেও শরীর পাঁচ প্রকার । তাহাদের

কোষ বলে । তাহা অন্নময় কোষ (স্থূল শরীর), প্রাণময় কোষ, মনো-
ময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ (এই তিন মিলিয়া সাংখ্যোক্ত লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম
শরীর), আর আনন্দময় কোষ (কারণ শরীর) । ইহা ব্যতীত বেদান্তে সূক্ষ্ম
ভূতময় আতিবাহিক দেহ (সাংখ্যোক্ত অধিষ্ঠান শরীর) ও উক্ত হইয়াছে ।
(আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ,—এই বেদান্ত সূত্র দ্রষ্টব্য) । অতএব আমাদের
শাস্ত্র হইতেই এই ক্ষেত্র বা দেহতত্ত্ব প্রকৃত রূপে জানিতে পারা যায় ।
ইহা ব্যতীত, শরীরের উৎপত্তির কারণ কি, কি উপাদানে ইহা গঠিত,
কোন্ নিমিত্ত কারণ দ্বারা ইহার পরিবর্তন হয়, কিরূপে সূক্ষ্ম শরীর-
গ্রহণ হয়, কিরূপে স্থূল দেহ নাশে সূক্ষ্ম শরীর থাকিয়া যায়, এবং কি জন্ম
আবার স্থূল শরীর-গ্রহণ হয়, কিরূপে প্রকৃতির আপুরণে জাতাস্তর
পরিণাম হয়, কি কারণে জাতি আরু ও ভোগ নিদ্রিষ্ট হয়, ইত্যাদি সমুদায়
জ্ঞাতব্য বিষয়, আমাদের উপনিষদ, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে ।
এ তত্ত্ব যাহারা বিস্তারিত ভাবে জানিতে চাহেন, তাহারা অবশ্য এ সকল
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন ।

কিন্তু এই অধ্যয়নের জন্ম প্রস্তুত হইবার পূর্বে, আর একটি কথা
বুঝিতে হইবে । আমরা সাধারণতঃ দেহাত্মবাদী । এজন্য এই স্থূল দেহ হইতে
ভিন্ন করিয়া আত্মাকে বুঝিতে পারি না । আর বুঝিতে পারিলেও আমরা
প্রাণাত্মবাদী, মনাত্মবাদী বা বিজ্ঞানাত্মবাদী হইয়া পড়ি । আত্মাকে প্রাণ
হইতে, মন হইতে, ইন্দ্রিয় হইতে বা বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন করিয়া আত্মাকে
ধারণা করিতে পারি না । এই স্থূল দেহ, প্রাণ, মন বুদ্ধি হইতে ভিন্ন
ভাবে আত্মাকে জানিতে হইলে বিশেষ সাধনার প্রয়োজন । চিত্তকে
স্বচ্ছ নিশ্চল শুদ্ধ সাত্বিক না করিতে পারিলে, তাহাতে আত্মার স্বরূপ
প্রতিবিম্বিত হয় না,—এই ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ ভাবে আত্মদর্শন হয়
না,—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিবেক-বিজ্ঞানও হয় না ।

সে যাহা হউক, ক্ষেত্র কি, তাহা বিচার পূর্বক প্রথমে আমাদের

বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কোন্টি ক্ষেত্র এবং কোন্টি ক্ষেত্র নহে, তাহা বিচার করিয়া স্থির করিবার সেই মূল সূত্র কি, তাহা অঙ্কে বুঝিতে হইবে।

আমাদের এই স্থূল পাঞ্চভৌতিক জড় শরীর যে আত্মা নহে, তাহা নিতান্ত জড়বাদী পণ্ডিত ব্যতীত, সকল পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু বলিয়াছি ত, বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার এবং চিত্তের ধর্ম সুখ দুঃখ রাগ ঘেঁষাদি যে আত্মা বা আত্মার ধর্ম নহে, চিত্তে অভিব্যক্ত চেতনা ও ধৃতি যে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা বা আত্মার ধর্ম নহে, তাহা অনেকে, বিশেষতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। অতএব বুদ্ধি প্রভৃতি (যাহাকে এক কথায় mind বলে) তাহা যে আত্মা নহে, বা সুখ-দুঃখাদি যে আত্মার ধর্ম নহে, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? ভগবান্ এই স্থলে তাহার মূল সূত্র দিয়াছেন। যিনি আত্মা বা পুরুষ—তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, যিনি ক্ষেত্রকে জানেন, ক্ষেত্রের বেত্তা, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। আর তাহার জ্ঞানের বিষয় যাহা, যাহা “ইদং শরীরং” রূপে জ্ঞেয়, তাহা ক্ষেত্র। শঙ্করাচার্য্য ঠাণ্ডা বুঝাইয়াছেন। যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হইতে পারে না। যাহা Object, তাহা Subject হইতে পারে না। আর যাহা ‘জ্ঞাতা’, তাহাও জ্ঞেয় হইতে পারে না। Subject কখন Object হয় না। অতএব যাহা কিছু জ্ঞেয়, তাহা ক্ষেত্র। যাহা জ্ঞাতার অপরোক্ভাবে জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতার নিজের শরীর, তাহাই তাহার ক্ষেত্র। সে তাহারই বেত্তা। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয়, ইচ্ছা, ঘেঁষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি যাহা এই দুই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহার সকলেই জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞেয়। অতএব তাহার জ্ঞাতা হইতে পারেন না। তাহার জড়। ‘জ্ঞাতা’ ও ‘জ্ঞেয়’র ধর্ম পরস্পর বিরোধী। যাহা একের ধর্ম, তাহা অপরের হইতে পারে না। এই তত্ত্ব সাংখ্য-দর্শনেও বিবৃত হইয়াছে।

যাহা হউক, যাহা জ্ঞাতা, তাহা জ্ঞেয় হইতে পারে না, যাহা জ্ঞাতার

ধর্ম, তাহা কখনই জ্ঞেয়ের ধর্ম হইতে পারে না, ইহার 'তাৎপর্য্য কি ? ইহা অতি দুর্কোধ্য দার্শনিকতত্ত্ব । দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ প্রবেশ না থাকিলে ইহা বুঝা যাইবে না । জ্ঞাতা যদি জ্ঞেয় হইতে না পারেন, তবে আমি আপনাকে জানি কিরূপে ? তাহা হইলে 'আত্মাকে জান' "know thy self" এ উপদেশ ব্যর্থ হয় । তাহা নহে । জ্ঞাতা জ্ঞেয়-রূপে আপনাকে জানেন না, জ্ঞাতরূপে জ্ঞেয় হইতে পৃথক্ করিয়াই আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন । জ্ঞাতরূপেই আমার প্রকৃত আত্ম-প্রত্যয় হয় । তবে আমি জ্ঞাতা, আমি কর্তা ও আমি ভোক্তা রূপে,— আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি কৃগ্ণ ইত্যাদি নানা ভাবে আপনাকে যে জানি বলিয়া বোধ হয়, ইহার কারণ এই যে, সে জ্ঞান প্রকৃত আত্মজ্ঞান নহে । তাহা চিত্তে অধ্যস্ত আত্মার (Phenomenal self এর) জ্ঞান । পরমার্থতঃ জ্ঞাতার জ্ঞাতা কেহ থাকিতে পারে না । জ্ঞাতার আত্মসম্বন্ধে এই ব্যবহারিক জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান নহে । তাহাকেই শাস্ত্রে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলে । পরমার্থতঃ আমি এ জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা নহি । আমি এ জ্ঞাতারও জ্ঞাতা, জ্ঞানস্বরূপ । তাহা Absolute self । আর আমাকে আমি জ্ঞাতা কর্তা বা ভোক্তা বলিয়া যে জানি, যে আমি আমার জ্ঞেয়, তাহা আমার এই জ্ঞাতার জ্ঞাতা বা বিজ্ঞাতা নহেন । সে বিজ্ঞাতা জ্ঞেয় নহেন (বৃঃ আঃ উপঃ ৩।৭।২৩) । তিনিই প্রকৃত আত্মা । তিনিই পরমাত্মা, আমি তাহারই জ্ঞেয়, সেই phenominal ego বা phenomenal selfই জ্ঞাতা ভোক্তা ও কর্তা । তাহা Absolute বা Noumenal self নহে । তাহাই জীব । তাহাকে প্রকৃত জ্ঞাতা মনে করাই ভ্রম বা অধ্যাস মাত্র ।

অতএব যে 'জ্ঞেয়'তে জ্ঞাতা আপনার অধ্যাস হয়,—যে বন্ধ অহঙ্কার মন প্রভৃতি—এই দুই শ্লোক উক্ত তত্ত্বে জ্ঞাতার এইরূপ আত্মাধ্যাস হয়, তাহা সে 'আমি' বা 'আত্মা' নহে, তাহা জানিবার উপায় কি ? তাহার

যে কেবল জ্ঞেয়, তাহারা জ্ঞাতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, ইহা জানিবার উপায় কি ? বাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা নহে,—এ কথা স্বীকার করিলেও, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে এই সীমা রেখা কোথায়, তাহা স্থির করা বড় কঠিন। জ্ঞাতা জ্ঞেয় মধ্যে এই ভেদজ্ঞানকেই বিবেকজ্ঞান বলে। সাংখ্য শাস্ত্র অনুসারে এই বিবেকজ্ঞানই মুক্তিহেতু, তাহা উক্ত হইয়াছে। এই বিবেক জ্ঞানলাভ না হইলে এই দুই শ্লোকোক্ত তত্ত্বগুলি যে জ্ঞেয় বা বেগু ক্ষেত্রের অন্তর্গত ও ইহাদের জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ হইতে যে ইহারা পৃথক্, তাহা জানা যায় না।

যাহা হউক, আমাদের জ্ঞানে এই যে জ্ঞাত-জ্ঞেয়-ভেদ নিত্যসিদ্ধ, ইহাই কি পরমার্থ সত্য ! তাহা হইলে ত অদ্বৈত-সিদ্ধি হয় না। অথবা অদ্বৈত-সিদ্ধি জ্ঞাত এই জ্ঞেয়কে মায়িক মিথ্যা—কেবল কল্পনা, কেবল বিজ্ঞানের অভিব্যক্তির বাহ্যরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি, আমাদের জ্ঞানের উপর এই জ্ঞেয় জগৎ প্রতিষ্ঠিত নহে। আমাদের এ জ্ঞান নিত্য জ্ঞান নহে, তাহা বৃত্তি-জ্ঞান মাত্র। জড়চিত্তে আত্মজ্ঞান প্রতিবিশ্লিত হইলে চিত্ত চেতনবৎ হয়, তাহাতে বৃত্তি-জ্ঞানের প্রকাশ হয়।

আমাদের চিত্তে অভিব্যক্ত জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এই দ্বন্দ্ব ভাবও (Phenomenal) ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক। আমাদের জ্ঞানে জ্ঞাতা ব্যতীত জ্ঞেয় থাকিতে পারে না, আর জ্ঞেয় ব্যতীত জ্ঞাতাও থাকিতে পারে না,—অথচ উভয়ে এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধ হইয়াও পরস্পর বিরোধী। তবে যিনি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বা পরমব্রহ্ম—যিনি Absolute Reason তাহার নির্বিকল্প, নির্বিশেষ জ্ঞানে কখন এই দ্বৈতভাব এই বিরোধ থাকিতে পারে না। সেই জ্ঞান যখন সবিকল্প হয়, তখন তাহা হইতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বৈতত্বের বিকাশ হয় সত্য, কিন্তু সে জ্ঞানে এইরূপে : পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব অভিব্যক্ত হইয়াও একীভূত থাকে।

আর অজ্ঞানযুক্ত জীব জ্ঞানে এই পরস্পর বিরোধী জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাব কখন একীভূত ও অদ্বৈতীভূত হয় না। এই বৈভীভূতজ্ঞান হেতু আমাদের জ্ঞানে এ ভেদ থাকে, জ্ঞাতা কখন জ্ঞেয় হইতে পারে না, বা ‘জ্ঞেয়’ ধর্মযুক্ত হয়েন না। জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন করিয়াই জ্ঞাতা আপনাকে জানিতে পারে।

ব্রহ্ম জ্ঞান অনাদি মায়াশক্তি যুক্ত বলিয়া, সেই জ্ঞানের প্রকট অবস্থায়, তাহা পরম জ্ঞাতরূপে প্রকাশিত হন। তাহা Absolute Ego বা Self। সেই জ্ঞাতা তখন আপনার জ্ঞানমধ্যেই জ্ঞানের জ্ঞেয় কল্পনা করেন, এবং স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা সেই কল্পনাকে সৎরূপে ব্যাকৃত করেন। ‘আমি বহু হইব’ এই কল্পনা বা ঈক্ষণরূপ জ্ঞানক্রিয়া হেতু, সে জ্ঞান বৈভীভূত হইয়া, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে বা Absolute Subject ও Absolute Object রূপে প্রথম বিবর্তিত হয় বটে, কিন্তু তাহা অজ্ঞানদোষহীন বলিয়া এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এ বিরোধভাব থাকে না। সে ‘জ্ঞেয়’ মধ্যে জ্ঞাতা অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। এই পরম জ্ঞাতাই ঈশ্বর। তাঁহার অনন্ত জ্ঞানশক্তি হইতে অভিব্যক্ত সকল জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাব তাহার অনন্ত জ্ঞানের অন্তর্ভূত, তাহার পরম ‘অহং’ বা পরমাত্মা স্বরূপে বিধৃত। তিনি সকল জ্ঞেয়েরই “আমি” সকল জ্ঞেয়েই সে জ্ঞাতার বিশেষ রূপ, এবং সকল জ্ঞেয় মধ্যেই সে ‘আমি’ জ্ঞাতরূপে অবস্থিত, ইহা জানেন। সে জ্ঞানে অজ্ঞান নাই, এজন্য তাহাতে এই জ্ঞাতজ্ঞেয় ভেদ নাই। সে ভেদ তাঁহার জ্ঞানের কল্পনা মাত্র। তিনি সকলই ‘আমি’ ও সকলই আমার বলিয়া জানেন। কিন্তু জীব জ্ঞান চিত্তে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান বলিয়া, তাহার পরিচ্ছেদ অবশ্যস্তাবী। আরও অবিচা বা অজ্ঞান হইতেই জ্ঞেয় দেহে জ্ঞাতার অধ্যাস হয়। দেহাত্মজ্ঞান, সত্ত্বাত্মজ্ঞান বিজ্ঞানাত্মজ্ঞান আসিয়া পড়ে। এইরূপে আমাদের জ্ঞানে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দেহ মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অভেদ জ্ঞান অজ্ঞান-মূলক।

এই জ্ঞেয় দেহ হইতে জ্ঞাতা আপনাকে পৃথকরূপে জানিতে পারিলে

এ অধ্যায় বা° অজ্ঞান দূর হয়। দেহমধ্যে আপনাকে ভিন্নরূপে দেখিলে, জ্ঞাতার স্বরূপ-সিদ্ধি হয়। তাহার ফলে সর্বাশুভতাত্মা হওয়া যায়। তখন সমুদায় জ্ঞাতার আশ্রয় সহিত, আপনার অভেদ জ্ঞান হয়, জ্ঞাতা আপনার সমুদায় ক্ষেত্রमध्ये সেই পরম জ্ঞাতাকে অনুভব করে, ও সেই পরম জ্ঞাতাকে জানিতে পারিয়া, সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। প্রথমে নিজ দেহ বা ক্ষেত্র হইতে আপনাকে পৃথক্ জানিতে হয়। পরে জানে, সকল ক্ষেত্রক্ষেত্র সহিত আপনার একত্ব ধারণা করিতে হয়। তাহার পর সকল ক্ষেত্রে পরম ক্ষেত্রকে দেখিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ ইহা পরমার্থত অভেদ জানিয়া, জ্ঞাতা ক্ষেত্র—এই দ্বৈতহীন প্রকৃত ‘অদ্বয়’ জ্ঞান-স্বরূপ পরমব্রাহ্মের ধারণা করিতে হয়। ইহাই গীতা ও বেদান্তের উপদেশ। গৌড়পাদ কারিকায় আছে—যে ব্রহ্ম ‘অকল্পকং অঙ্গং জ্ঞান-ক্ষেত্রাভিন্নং’ (৩৩১)। মৈত্রায়ণ উপনিষদে আছে, “দ্বৈত অদ্বৈতীভূতং বিজ্ঞানং .. দ্বৈত দ্বৈতীভূতবিজ্ঞানম্” (৬।৭)। জ্ঞাতা ও ক্ষেত্র ভেদ বা দ্বৈতীভূত বিজ্ঞান দূর না হইলে, অদ্বৈতীভূত বিজ্ঞান লাভ হয় না। আর জ্ঞাতাও ক্ষেত্র ভেদ প্রথমে না জানিলে, সে ভেদও দূর হয় না। তাই বিশেষভাবে প্রথমে ক্ষেত্রস্বরূপ ও তাহা হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রজ-স্বরূপ জানিতে হয়। ক্ষেত্রের স্বরূপ ইত্যাদি জানিয়া তাহা হইতে পৃথক্ ভাবে তাহার জ্ঞাতরূপে ক্ষেত্রকে জানিতে হয়। তাহার পর সর্বক্ষেত্রজ পরমেশ্বরকে জানিয়া প্রকৃত ক্ষেত্রক্ষেত্রের স্বরূপ জানিতে হয়, এবং সেই পরম ব্রহ্মতবে এই সর্বক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজত্ব—একীভূত ইহা দর্শন করিতে হয়। সমষ্টিভাবে এই সমুদয় ক্ষেত্র—সেই ভগবানের শরীর, তাহার বিরাট বিশ্বরূপের অন্তর্গত, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ; সর্বক্ষেত্রকে সেই ভাবেই দেখিতে হইবে। তবে এই দ্বৈত ও অদ্বৈত তত্ত্বের অত্যন্ত প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান এই অদ্বৈতীভূত বিজ্ঞান লাভ হইবে—তখন জ্ঞান ক্ষেত্র জ্ঞাতা অভিন্ন হইবে। ‘ভেদ’ জ্ঞানের মধ্য দিয়াই এই ‘অভেদ’ জ্ঞান লাভ হয়। তাই প্রথমে ক্ষেত্রকে

ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন করিয়া লইয়া তাহা জ্ঞেয়রূপে জানিতে হইবে ।
জ্ঞান না হইলে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের অধৈতীভূত ব্রহ্মস্বরূপ জানা যায় না ।

অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংসাক্ৰান্তিরাজ্জবম্ ।

আচার্যোপাসনং শৌচং স্বেৰ্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭

মানহীন দস্তুহীন হিংসাহীন ভাব—

ক্রান্তি সরলতা আচার্যের উপাসনা,—

শৌচ, স্থিরভাব আর আত্মবিনিগ্রহ,—৭

৭ । মানহীনভাব (অমানিত্ব)—মানীর ভাব আত্মশ্লাঘা, তাহার
অভাব অমানিত্ব (শঙ্কর) । উৎকৃষ্টরূপে অবধারণা বা অবজ্ঞারহিত ভাব
(রামানুজ) । স্বগুণশ্লাঘা-রহিত (স্বামী) । গুণ থাকুক বা না থাকুক
তাহা আমার আছে জ্ঞান করিয়া যে আত্মশ্লাঘা—তাহা মানিত্ব, তাহার
অভাব অমানিত্ব (মধু) । স্ব সৎকার অনপেক্ষিত (বলদেব) । আপনাতে
উৎকর্ষ আরোপ = মান, তাহার অভাব (গিরি) ।

দস্তুহীনভাব (অদস্তিত্ব)—নিজের ধার্মিকতাকে প্রকাশ করার
নাম দস্ত । তাহার অভাব (শঙ্কর) । লোকে ধার্মিক বলিবে, এই যশের
অন্ত ধর্মালুষ্ঠান দস্ত । সেই দস্তরহিত ভাব (রামানুজ, বলদেব) ।
লাভ ও পূজার্থ স্বধর্ম প্রকটীকরণ দস্ত, তাহার অভাব (মধু) ।

হিংসাহীন ভাব—(অহিংসা)—প্রাণিষাত্ত্বেরই অপীড়ন (শঙ্কর) ।
কায়মনোবাক্য দ্বারা কাহারও পীড়া না দেওয়া (রামানুজ, গিরি) । পর-
পীড়া-বর্জন (স্বামী, মধু) । পাতঞ্জল দর্শনে আছে—এই অহিংসা—
“জাকিদেশকাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্কভৌমা মহাব্রতম্ ।” (২।৩১ সূত্র) ।

ক্ষান্তি—পরের অপরাধ দেখিয়াও মনে কোনরূপ বিকার আসিতে না দেওয়া (শঙ্কর, গিরি) । পরের দ্বারা পীড়াপ্রাপ্ত হইয়াও তাহার প্রতি অবিকৃতচিত্ত্ব (রামানুজ) । পরপীড়াবর্জন (স্বামী) । পরের অপরাধ সহন (মধু) । অপমান-সহিষ্ণুতা (বলদেব) ।

সরলতা (আর্জ্জবং)—ঋজুভাব, অবক্রতা (শঙ্কর) । পরাপরাধে মনের কার্যবৃত্তির একরূপতা (রামানুজ) । পরের সহিত ব্যবহারে প্রতারণারাহিত্য, অকুটিল ভাব ; (মধু) । সরলতা (বলদেব) । সদা একরূপ ব্যবহার (গিরি) । বাক্ মনঃ কায়ের সমস্ত একোটিল্য (কেশব) ।

আচার্যের উপাসনা—মোক্ষ-সাধনের উপদেষ্টা আচার্যকে শুশ্রূষা দ্বারা সেবা (শঙ্কর) । আত্মজ্ঞান-প্রদাতা আচার্যকে প্রণিপাত, পরি-প্রশ্ন সেবা দ্বারা তুষ্ট করা (রামানুজ) । সৎগুরু উপাসনা বা সেবা (স্বামী) এস্থলে আচার্য অর্থে মোক্ষ-সাধনের উপদেষ্টা, মনু-উক্ত “উপনীয় অধ্যাপক” নহে (মধু) । গীতা, ৪।৩৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

শোচ—মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা দেহের মল প্রক্ষালন ও প্রতিকূল ভাবনা দ্বারা আভ্যন্তর বা মনের মল রাগ-দেষাদি অপনয়ন (শঙ্কর, মধু, স্বামী) । কায়, মন ও বাক্যকে আত্মজ্ঞান-সাধনযোগ্য করা (রামানুজ) । বাহ্যভ্যন্তর শোচ (স্বামী, কেশব) ।

স্থির ভাব—(ঠৈর্য্যং)—স্থির ভাব, মোক্ষনার্গে দৃঢ়তর অধ্যবসায়-যুক্ত হওয়া (শঙ্কর) । অধ্যাত্ম-শাস্ত্রোদ্ভাষিত বিষয়ে নিশ্চয় ভাব (রামানুজ) । সন্মার্গে একনিষ্ঠতা (স্বামী, বলদেব) । মোক্ষ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও, তাহাতে পুনঃ পুনঃ অধিক বহুপূর্বক অবলম্বন (মধু, কেশব) ।

আত্ম-বিনিগ্রহ—আত্মার উপকরণ যে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি, তাহাই এস্থলে আত্মা । তাহা চিত্ত প্রভৃতি । তাহীদের স্বভাবতঃ কার্য্যে কল দিকেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । সেই প্রবৃত্তি নিরোধ করিয়া,

সন্ন্যাসার্থে প্রবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদন (শঙ্কর) । আত্মস্বরূপ ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে মনকে নিবর্তন (স্বামী, বলদেব) । দেহ ইন্দ্রিয় সংঘাত স্বভাব প্রাপ্ত আত্মার মোক্ষ প্রতিকূল প্রবৃত্তি নিরোধ পূর্বক মোক্ষ সাধনে ব্যবস্থাপন (মধু) । দেহ ও ইন্দ্রিয় সকলের শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসংপ্রযুক্তির সংঘম (কেশব) । চিত্তের অধঃস্রোতীবৃত্তির নিরোধকরণ ।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।

জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম্ ॥ ৮

রাগহীন ভাব—সব ইন্দ্রিয় বিষয়ে,

অহঙ্কারহীন ভাব, দোষদৃষ্টি আর

জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ সমুদায়ে,—৮

৮ । রাগহীন...ইন্দ্রিয় বিষয়ে (ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং) —ঐহিক পারত্রিক শব্দাদি সমুদায় ভোগ্য বস্তু সম্বন্ধে বিরাগ ভাব (শঙ্কর) । আত্মব্যতিরিক্ত সমুদায় বিষয়ে দোষ অনুসন্ধানপূর্বক তাহাদের উদ্বেজন (রামানুজ) । দৃষ্ট ও অনুশ্রাবিক শব্দাদি ভোগ্য বিষয়ে—রাগ বিরোধী, অস্পৃহাত্মক চিত্তবৃত্তি (মধু) । শব্দাদি বিষয়ে রুচির অভাব (বলদেব) । শব্দাদি বিষয়ে দোষদৃষ্টি উৎপাদন দ্বারা, তাহাতে রাগরাহিত্য (কেশব) ।

অহঙ্কারহীন ভাব—(অনহঙ্কার)—মনাত্মদেহে আত্মাভিমান-রাহিত্য (রামানুজ, বলদেব) । আত্ম-শ্লাঘা অভাবেও আমি সর্বশ্রেষ্ঠ এইরূপ গর্ব মনে প্রাধুভূত হইতে পারে,—সেই ভাববিরহিত (মধু) । অহঙ্কারের অভাব (শঙ্কর) । অভিজ্ঞান জ্ঞাতি ক্রিয়া প্রভৃতিতে আপনার উৎকৃষ্টত্ব, অভিমান বা গর্বরাহিত্য (কেশব) ।

দোষ-দৃষ্টি...সমুদায়ে—জন্ম, মরণ, জরা, ব্যাধিসমূহে ও অজ্ঞান হুঃখ সমূহে প্রত্যেকেই দোষ দেখা । জন্ম-লাভে দোষ অর্থাৎ গর্ভবাস, ও গর্ভ হইতে জন্ম ইহাতে যে যন্ত্রণা বা দোষ, তাহার অনুদর্শন বা আলোচনা । সেইরূপ সর্বমর্চ্ছদনরূপ মৃত্যুতেও দোষদর্শন । সেইরূপ জরাতে বা বার্দ্ধিকো দোষদর্শন । বার্দ্ধিকো প্রজ্ঞাশক্তি ও তেজের হ্রাস হয়, সকলের নিকট পরিভব ভোগ করিতে হয়, জরায় ইত্যাদি রূপ দোষদর্শন । সেইরূপ ব্যাধিতে যে যন্ত্রণা হয়, তাহার দোষ দর্শন । সেইরূপ আনাদেরু দৃষ্টবিয়োগ ও অনিষ্টসংযোগরূপ হুঃখসমূহে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ হুঃখের দোষ অনুদর্শন । জন্ম বা হুঃখ মাত্রই দোষ । এই অর্থে হুঃখ-দোষ । জন্মে বেরূপ হুঃখ-দোষ আছে, সেইরূপ মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রত্যেকেই হুঃখ-দোষ আছে । এই জন্মাদিই হুঃখের কারণ । একত্র জন্মাদিই হুঃখ । স্বরূপতঃ তাহারা হুঃখ নহে । এইরূপ হুঃখ দোষানুদর্শন দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভোগে বৈরাগ্য উপন্ন হয় । তাহার পর আনুদর্শনার্থ প্রবৃত্তি হয় । অতএব ইহারা জ্ঞানের সাধন । (শঙ্কর, মধু, গিরি) । শরীর থাকিলেই, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, হুঃখরূপ দোষ অবর্জনীয়, ইহার অনুসন্ধান (রামানুজ, কেশব) । জন্মাদিতে হুঃখরূপ দোষ দর্শন (বলদেব) । অনুদর্শন = পুনঃ পুনঃ আলোচনা (স্বামী, মধু, কেশব) । পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—

“পরিণামতাপসংস্কারহুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ হুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ ।” (পাঃ সূঃ ২।১৫) ।

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।

নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯

অনাসক্তি, পুত্রদারাগৃহাদি বিষয়ে—

সঙ্গহীন ভাব, সদা চিন্তে সমভাব—

ইচ্ছ বা অনিচ্ছ কিছু হলে উপস্থিত ॥ ৯

৯ । অনাসক্তি—(অসক্তিঃ) = সঙ্গ হেতু শব্দাদি বিষয়ে যে প্রীতি
ভক্তি, তাহার অভাব অসক্তি (শঙ্কর) । আত্মব্যতিরিক্ত বিষয়ে সঙ্গ-
রাহিত্য, (রামানুজ) । পুত্রদারা প্রভৃতিতে প্রীতিত্যাগ (স্বামী) । ইহা
আমার, এই মমতা হেতু সে বিষয়ে আসক্তি বা প্রীতি (মধু) । পরমার্থ
জ্ঞান বিরোধী বলিয়া পুত্রাদিতে প্রীতিত্যাগ (বলদেব) । ইহা আমার,
এইরূপ যে অতিশয় প্রীতি, তাহার রাহিত্য (কেশব) ।

পুত্র দারা...সঙ্গভাবহীন (অনভিষঙ্গঃ...)—অভিষঙ্গ = আসক্তি ।
যাহা আত্মা নহে, তাহাকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া যে ভাবনা, তাহা
অভিষঙ্গ । পুত্র, দারা, মিত্র প্রভৃতির সুখ হইলে আমি সুখী হইব, তাহাদের
দুঃখ হইলে আমি দুঃখী হইব, তাহাদের কাহারও মৃত্যুতে আমি মরিলাম,
—পুত্র, দারা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে এইরূপ ভাবনা—অথবা যে কোন অত্যন্ত
ইচ্ছ বস্তু সম্বন্ধে এরূপ ভাবনা, তাহাই অভিষঙ্গ । সেই অভিষঙ্গবিরহিত
ভাব । এই অসক্তি ও অনভিষঙ্গও জ্ঞানের সাধন (শঙ্কর) । পুত্র, দারা,
গৃহাদিতে শাস্ত্রীয় কর্ম সাধনের উপকরণ এইরূপ ভাবনা ব্যতিরিক্ত অশু-
রূপ ভাবনা শ্রেয়োরহিত বলিয়া, তাহাতে আসক্তিরহিত ভাব (রামানুজ) ।
পুত্রাদির সুখে আমি সুখী, পুত্রাদির দুঃখে আমি দুঃখী ইত্যাদি অধ্যাস-
রাহিত্য (স্বামী) । পুত্র দারা গৃহাদি এ সমুদায়ে “সক্তি” ও অভিষঙ্গ
উভয়ই বর্জনীয় (মধু) । পুত্রাদির সুখ-দুঃখে আসক্তি-নিরোধ (বলদেব) ।
অনাত্ম বিষয়ে আত্মাভিমানরাহিত্য (কেশব) ।।

এই শ্লোকে শঙ্কর প্রভৃতি অসক্তির স্বতন্ত্র অর্থ করিয়াছেন, আর
অনভিষঙ্গ পুত্রদারাগৃহাদির সহিত অন্বয় পূর্বক অর্থ করিয়াছেন।

কেশবাচার্য্য বলেন; যে, এস্থলে অসক্তি ও অনভিষদের বিষয়—পুত্রদারা গৃহাদি । প্রথমে যে বিস্ত পণ্ড ভৃত্যাদির সহিত সম্বন্ধ গ্রহণ হয়, তাহাতে স্নেহ বর্জনীয় । কিন্তু শঙ্করের অর্থ অধিক সঙ্গত ।

সদা চিন্তে সমভাব...উপস্থিত—নিত্য বা সৰ্বদা তুল্যচিত্ততা । অনভিলষিত বিষয় লাভে হর্ষ-রাহিত্য, এবং অনিষ্টকর অনভিলষিত বিষয়-প্রাপ্তিতে বিষাদ-রাহিত্য । উভয় অবস্থাতেই তুল্যচিত্ততা । ইহা জ্ঞানের সাধন (শঙ্কর) । সংকল্প-প্রভব ইষ্ট উপস্থিত হইলে তাহাতে হর্ষ-রাহিত্য,—এবং অনিষ্ট উপস্থিত হইলে, তাহাতে উদ্বেগরাহিত্য (রামানুজ, মধু) । অমুকুল বা প্রতিকুল বিষয় উপস্থিত হইলে, তাহাতে সৰ্বদা সমচিত্ততা বা হর্ষবিষাদবিরহিত ভাব (বলদেব, কেশব) । (পূর্বে ১২ ১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।



ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০



অনন্যযোগেতে ভক্তি অব্যভিচারিণী
আমা প্রতি, রুচি শুদ্ধ জনহীন দেশে
বহুজন সমাগমে বিরতি সেরূপ,—১০

১০ । অনন্যযোগেতে ভক্তি...আমা প্রতি—আমাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে অনন্যযোগের সহিত অব্যভিচারিণী ভক্তি । ভগবান্ বাসুদেব হইতে শ্রেষ্ঠ অন্ত কেহ নাই—ইহা দৃঢ় নিশ্চয়—অর্থাৎ যে নিশ্চয়ের ব্যতিক্রম হয় না, তাহাই অনন্যযোগ, সেই অনন্যযোগের সহিত যে ভক্তি,

যাহার কোন কালে অন্তথাভাব বা অভাব হয় না । এই ভক্তি জ্ঞানের উপায় বা সাধন (শঙ্কর) । সর্বেশ্বর আমাতে একান্ত যোগে স্থির ভক্তি (রামানুজ, বলদেব) । অনন্তযোগে অর্থাৎ সর্বাঙ্গদৃষ্টিতে ; অব্যভিচারিণী ভক্তি, অর্থাৎ একাগ্র ভক্তি (স্বামী) । বাসুদেব পরমেশ্বর আমাতে, সর্বাংকুষ্ঠ জ্ঞানপূর্বক প্রীতি, সর্বাঙ্গ আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, আমিই পরম গতি, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যে ভক্তি, যাহা কোন প্রতিকূল হেতু দ্বারা নিবারিত হয় না, যাবৎ দেহ থাকে, তাবৎ যে প্রীতির অভাব হয় না, তাহাই এই ভক্তি (মধু) ।

আমাতে—অর্থাৎ সর্বেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবে, অনন্তযোগে—অর্থাৎ অনন্ত সম্বন্ধের দ্বারা—আমা হইতে অন্ত দেবাদি ভজনীয় নহে । এই ভাবে ভক্তি অর্থাৎ সেবনাত্মিকা বাহ্যস্তঃকরণ-বৃত্তি, অব্যভিচারিণী—অর্থাৎ কোন রূপ কামনা দ্বারা বা ব্যক্তি দ্বারা যাহা প্রতিহত হয় না (কেশব) ।

কুচি শুদ্ধ জনহীন দেশে—(বিবিক্তদেশসেবিহং) = যে স্থান স্বভাবতঃ বা কৃত্রিম উপায়ে অশুচিবর্জিত, যে স্থানে ব্যাঘ্রাদি শিশু জন্তু বিচরণ করে না,—তাহাই বিবিক্ত দেশ । যেমন অরণ্য, মদী-পুলিন, দেবগৃহ ইত্যাদি । সেই দেশ সেবাকারীর ভাব । বিবিক্ত বা নির্জন ও পবিত্র দেশে বাস করিলে চিত্ত প্রশান্ত হয়, আত্মজ্ঞান স্বতই উদ্ভিত হয় । ইহাও জ্ঞানের সাধন, এজন্য ইহাকে জ্ঞান বলা হইয়াছে । (শঙ্কর, গিরি, মধু) ।

শাস্ত্রে আছে—

“সমে শুচৌ শঙ্করবহ্নিবালুকৌ

বিবর্জিতে শঙ্ক-জনাশ্রয়াদিভিঃ ।

মনোহমুকুলে ন চ চক্ষুঃ-পীড়নে

তদ্বানি বাস্তাশ্রয়ে প্রয়োজয়েৎ ॥”

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ২।১০) ।

জনবর্জিতদেশবাসিন্দ (রামানুজ) । শুদ্ধ ও চিত্তপ্রসাদকর স্থান সেবা-
করিবার ভাব (স্বামী) । বিবিধ—অর্থাৎ ভগবদারাধনবিরোধী
জনসংসর্গবর্জিত, একরূপ দেশসেবনশীলত্ব (কেশব) । নির্জনস্থান-
প্রিয়তা (বলদেব) । পূর্বে গীতার ৬।১১ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা
দ্রষ্টব্য । এস্থলে শঙ্কর প্রভৃতির অর্থ অনুসারে অনুবাদ করা হইয়াছে ।
তাহাই অধিক সঙ্গত । জ্ঞানসাধনের উপযুক্ত—জ্ঞানসাধনের বিঘ্ন-
বিরহিত কে স্থান, সেই স্থানকে বিবিধ দেশ বলা যায় । তাহা অবশ্য
জন-সমাগম-বর্জিত, শুদ্ধ ও বিঘ্নহীন হওয়া উচিত ।

বিরতি বহুজন-সমাগমে—যাচারে অশিক্ষিত, অবিদিত, অসংস্কৃত-
হৃদয়, সেই সকল সাধারণ লোক-সমাগমকে এস্থলে জনসংসদ বলা
হইয়াছে । বর্জিত, বিনীত, শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সংসদকে এস্থলে জন-
সংসদ বলা হয় নাই । কারণ, সাধুসঙ্গ জ্ঞানসাধনের উপায় । এস্থলে
প্রাকৃত জনের সংসদ বা সভাই উক্ত হইয়াছে । স্মরণ্যং সেই প্রাকৃত
জনসংসদ প্রতি যাহার প্রীতি বা আকর্ষণ নাই, তাহার ভাব (শঙ্কর) ।
প্রাকৃত জনের সভায় অপ্রীতি (স্বামী) । আত্মজ্ঞান-বিমূঢ় বিষয়-ভোগা-
সক্ত লোকের সমবায়ে, তাহা তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রতিকূল বলিয়া রুচিহীন
(মধু) । ভগবদভক্তি-জ্ঞানহীন বিষয়প্রবণ জনগণের সমাজে প্রীতির
অভাব অর্থাৎ অসঙ্গতি (কেশব) । শাস্ত্রে আছে—

“সঙ্গঃ সর্বাশ্বনা ত্যাজ্যঃ স চেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে ।

বিষডিঃ সহ কর্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্ ॥”

(মধুসূদনোক্ত বচন) ।

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ ১১

—:~:—

আত্মজ্ঞানে নিত্যস্থিতি, তত্ত্বজ্ঞানার্থেতে
সদা দৃষ্টি,—জ্ঞান ইহা আছেয়ে কথিত,
ইহার অন্যথা যাহা, তাহাই অজ্ঞান ॥ ১১

১১ । আত্মজ্ঞানে নিত্যস্থিতি—(অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্)—
আত্মা সন্থক্বে জ্ঞানই অধ্যাত্মজ্ঞান । তাহাতে নিত্যভাব । সেই জ্ঞান
সর্বদা অনুশীলন (শব্দ) । আত্মা ও অনাত্মা-বিষয়ক বিবেক-জ্ঞানে নিষ্ঠা
(গিরি) । আত্মাতে জ্ঞান = অধ্যাত্মজ্ঞান (রামানুজ, বলদেব) ।
আত্মাকে অধিকরণ করিয়া বর্তমান যে জ্ঞান, তাহাতে নিত্যভাব ।
তৎ ৭ ত্বম্-পদার্থ-গুণ-নিষ্ঠত্ব (স্বামী) । আত্মাকে অধিকরণ করিয়া—
বা অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত যে আত্মজ্ঞান ও অনাত্মবিষয় বিবিক্তি যে
আত্মজ্ঞান, তাহাতে সদা নিষ্ঠত্ব (মধু, কেশব) ।

আত্মা সন্থক্বে যে জ্ঞান, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ আত্মাকেই
কেবল জ্ঞানের বিষয় করিয়া, নিয়ত স্থিতি । সর্বদা অনাত্ম-ক্সয়
বিবিক্ত আত্মার অনুসন্ধান আত্মতত্ত্ব আলোচনা আত্মস্বরূপ অবধারণ করা
গুণ জ্ঞানের যে প্রবৃত্তি, তাহাই অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব ।

অধ্যাত্ম শাস্ত্রের ইংরাজী নাম Psychology । কিন্তু তাহাতে
আত্মতত্ত্ব বিশদ ভাবে বিবৃত হয় নাই । তাহা মনোবিজ্ঞান (mental
philosophy) মাত্র । কেহ কেহ এই অধ্যাত্ম শাস্ত্রকে philosophy of
the spirit বলেন ।

তত্ত্বজ্ঞানার্থেতে সদা দৃষ্টি ।—অমানিষাদি (এই পঞ্চ শ্লোকোক্ত
যে জ্ঞানের সাধন, তাহাদিগের সন্থক্বে ভাবনা পরিপাক নিমিত্ত যে তত্ত্বজ্ঞান,
তাহারই অর্থ (বিষয় বা লক্ষ্য) যে মোক্ষ বা সংসার-উপরতি তাহার
আলোচনা । তত্ত্বজ্ঞান ফলের আলোচনা, তাহার সাধনে প্রবৃত্তি হয় ।
এতদ্ব ইহাও জ্ঞান (শব্দ) । ভাবনা পরিপাক—অর্থাৎ বহু সাধিত

এই অমানিষাদির প্রকর্ষ পর্য্যন্ত (পূর্ণরূপে) লাভ হইলে, তাহার ফলে তত্ত্বজ্ঞান পরিপাকে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, ঐক্য জ্ঞান হয়,—সেই ফলের আলোচনা (গিরি) । “অহং ব্রহ্ম” এই তত্ত্বজ্ঞান অমানিষাদি সর্বসাধন পরিপাকের ফল, বেদান্ত বাক্যার্থ সাক্ষাৎ করণ বা প্রত্যক্ষ করণের ফল । সেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন অবিদ্যা ও তাহার কার্য নিখিল হুঃখনিবৃত্তি-রূপ ও পরমানন্দলাভরূপ মোক্ষ, তাহার দর্শন অর্থাৎ আলোচনা । এই আলোচনাকালে হিতসাধনে প্রবৃত্তি হয় (মধু) । তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন যে তত্ত্ব, তাহাতে নিরতভাব (রামানুজ) । তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন যে মোক্ষ, তাহা যে সর্বোৎকৃষ্ট, ইহার আলোচনা (স্বামী) । তত্ত্বজ্ঞানের যে অর্থ, তাহা প্রাপ্তি লক্ষণ যাহা, তাহা হৃদয়ে স্মরণ, ভগবৎ-ইত্যাদি চিন্তন (বলদেব) । তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ বা প্রয়োজন এই যে, তাহা নিঃশেষে অবিদ্যা নিবৃত্তি পূর্বক নিরতিশয় আনন্দ ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি লক্ষণ মোক্ষ হয় । তাহার দর্শন বা আলোচনা ইত্যাদি (কেশব) ।

গ্রাম দর্শন অনুসারে প্রমাণ-প্রমেরাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ । বৈশেষিক দর্শন অনুসারে দ্রব্যগুণ প্রভৃতি ছয় বা সাত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ । সাংখ্য দর্শন অনুসারে তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি (পুরুষ প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকৃতি ত্রয়োবিংশতি) । পাতঞ্জল দর্শনে তত্ত্ব ত্রিত্য ঈশ্বর সহিত এই পঁচিশটি, মোট ছাব্বিশটি ।

এই তত্ত্বের অর্থ মূলতত্ত্ব । বেদান্ত অনুসারে এই মূলতত্ত্ব এক, বহু নহে । সে তত্ত্ব ব্রহ্ম । গীতানুসারে এই মূলতত্ত্ব পরম ব্রহ্ম । ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র, বা পুরুষ ও প্রকৃতি এই ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত । ঈশ্বর সগুণ ব্রহ্ম । এই অধ্যায়ে সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব ও তদন্তর্গত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব পুরুষপ্রকৃতি-তত্ত্ব পরমাত্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব ভূতপ্রকৃতি মোক্ষ-তত্ত্ব প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে । এই তত্ত্বের জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান । এই তত্ত্বজ্ঞানের ‘অর্থ’—সেই জ্ঞানের বিষয় বা লক্ষ্যার্থ—যাহা সেই জ্ঞান

প্রকাশ করে . তাহা । যেমন ইন্দ্রিয়ার্থ=ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশিত শব্দাদি, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানার্থ=সেই জ্ঞানের -দ্বারা প্রকাশিত জ্ঞের ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি । সেই তত্ত্বজ্ঞানার্থের মনন বা অনুশীলনই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন ।

জ্ঞান ইহা—অমানিষ হইতে আরম্ভ : করিয়া তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন পর্য্যন্ত যে বিংশতি পদার্থ এই পাঁচ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহা জ্ঞানের সাধন, এই হেতু 'জ্ঞান' নামে উক্ত হইয়াছে । এই সূক্ষ্ম সাধন জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় । এই সাধন দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞানের অধিকারী সাধক সেই জ্ঞানলাভের যোগ্য হয় । সন্ন্যাসীরা যে সকল উপায়ের অনুষ্ঠানে জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হন, অমানিষাদি সেই জ্ঞানসাধন বা সেই জ্ঞান-প্রাপ্তির উপায়, একত্র তাহারা জ্ঞান । এই স্থলে 'জ্ঞানের' অর্থ জ্ঞান নহে, জ্ঞানের সাধন মাত্র । অমানিষাদি যম বা নিয়মের অন্তর্গত । তাহারা জ্ঞানের সহকারী কারণ মাত্র । ইহাদের দ্বারা কোন বস্তু জ্ঞাত হওয়া যায় না । ইহারা কোন বিষয়ের প্রকাশকও নহে । অথচ জ্ঞানই তাহার (জ্ঞের) বিষয়ের প্রকাশক । অতএব ইহারা জ্ঞানের সাধন বা সহকারী কারণ মাত্র (শঙ্কর) । 'জ্ঞায়তে অনেন আত্মা ইতি জ্ঞানম্,'—যাহা দ্বারা আত্মাকে জানা যায়, যাহা আত্মজ্ঞানের সাধন, তাহা জ্ঞান । ক্ষেত্রসম্বন্ধযুক্ত পুরুষের অমানিষাদি গুণসমূহই আত্মজ্ঞানের উপযোগী । এ সকল ক্ষেত্রের কার্য্যাস্তর্গত, আত্মজ্ঞান সাধন পক্ষে উপায়ের গুণ (রামানুজ) । ইহারা জ্ঞানের সাধন, একত্র জ্ঞান নামে উক্ত (স্বামী) । জ্ঞানের জন্ম প্রয়োজন বলিয়া ইহারা জ্ঞান (হনু) । যে জ্ঞান দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজীবকে লাভ হয়, সেই জ্ঞান-লাভের যোগ্যতা কিরূপে হয়, তাহাই অমানিষাদি দ্বারা উক্ত হইয়াছে (মধু) । ইহা দ্বারা তত্ত্ব জানা যায় ; একত্র ইহারা জ্ঞান (কেশব) । এই অমানিষাদি—পরম্পরারূপে এবং সাক্ষাৎভাবে সেই জ্ঞানের

উপলব্ধির কারণ বা সাধন—একমাত্র তাহারা জ্ঞান । “জ্ঞানতে উপলভ্যতে
অনেন ইতি জ্ঞানম্ ।” (বলদেব) ।

ইহার অন্তর্থা যাহা...অজ্ঞান—এই অমানিষাদি বিংশতিটির অন্তর্থা
বা বিপরীত যে মানিষ, দম্বিষ, অক্ষান্তি, কুটিলতা প্রভৃতি, তাহাই অজ্ঞান ।
তাহা জ্ঞান-সাধনের বিরোধী (শঙ্কর) । ইহা ব্যতিরিক্ত সমুদায় ক্ষেত্র
কার্য আত্মজ্ঞান-বিরোধী বলিয়া অজ্ঞান (রামানুজ) । ইহাদের যাহা
বিপরীত, তাহা জ্ঞান-বিরোধী বলিয়া অজ্ঞান (শ্রামী, মধু কেশব,) ।
অজ্ঞান ঠিক জ্ঞানের বিপরীত কিছু নহে । উহা মনের অপ্রকাশিত
জ্ঞান । যেমন অত্রাঙ্কণ পতিত ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণরূপ, সেইরূপ জ্ঞানের
রাজসিক ও তামসিকরূপই অজ্ঞান (বলদেব) ।

এই অমানিষ হইতে তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন পর্য্যন্ত এই পাঁচটি শ্লোকে উক্ত
বিংশতিটি জ্ঞানের সাধন হেতু জ্ঞান এবং তাহাদের বিপরীত যাহা, তাহা
অজ্ঞান ; ইহাই সকল ব্যাখ্যাকারগণের সিদ্ধান্ত । মধুসূদন বলিয়াছেন,
অমানিষাদি এই বিংশতিটি এক সঙ্গে থাকিলে, তবে তাহাদিগকে জ্ঞান
বলা যায় ; ইহাদের একটিরও অভাব হইলে জ্ঞান হয় না । ‘এই অর্থ
সঙ্গত ।’ বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, “ইহাদের মধ্যে প্রথম আঠারটি ভুক্ত ও
জ্ঞানীর সাধারণ, শেষ দুইটি অর্থাৎ ‘অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব’ ও ‘তত্ত্বজ্ঞানার্থ-
দর্শন’, ইহা জ্ঞানিগণের অসাধারণ । পূর্বের অষ্টাদশটির মধ্যে অনন্ত-
যোগে আমাতে অব্যভিচারিণী ভুক্তিই, ভুক্তগণ যত্নে সাধন করেন ।
এবং তাহা হইতেই অবশিষ্ট সতেরটি আপনা হইতেই উৎপন্ন হয় ।
তাহার অন্ত স্বতন্ত্র বস্তু করিতে হয় না ।” কিন্তু ইহা সঙ্গত অর্থ নহে ।
তখন হইতে নীচ হইয়া, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া এবং অমানীকে মান
দিয়া ভুক্তি সাধন করিতে হয় ; ইহা শ্রীচৈতন্যেরই উপদেশ । চিত্ত
নির্মল না হইলে, তাহাতে জ্ঞান বা ভুক্তি কিছুই সৃষ্টি হয় না ।
অমানিষাদি চিত্তকে পবিত্র করে । আর চিত্ত নির্মল হইলে অমানিষা-

দির বিকাশ হয় । যাহা কার্য, তাহাই কারণ হইতে পারে । অমানিষাদি চিত্তকে পবিত্র করিয়া, তাহাতে ভক্তি ও জ্ঞান বিকাশের কারণ হয় । আবার ভক্তি বা জ্ঞান বিকাশ হইলে, চিত্ত আপনিই নির্মল হয়, তাহাতে অমানিষাদি ধর্ম বা গুণ আপনিই প্রতিষ্ঠিত হয় ।

এই অমানিষাদি দ্রব্য নহে । তাহারা গুণ বা ধর্ম । তাহারা জ্ঞানের সাধন হইলে, তাহাদিগকে কর্ম বলা যাইতে পারে । প্রামাণ্য বলিয়াছেন, এগুলি ক্ষেত্র-কার্য্য । কিন্তু তাহারা কর্ম হইতে পারে না । অমানিষাদি শব্দ ভাববাচক । তাহারা দ্রব্যবিশেষের অবস্থাজ্ঞাপক । সুতরাং তাহাদিগকে গুণ বা ধর্ম বলিতে পারা যায় । তাহারা অস্তঃকরণ বা চিত্তের ধর্ম অথবা গুণ । চিত্ত এই অমানিষাদি গুণ বা ধর্মযুক্ত হইলে, তাহাতে জ্ঞান প্রকাশিত হইতে পারে । (গীতা ৫।১৬ শ্লোক) । এই জ্ঞান ব্যাধ্যাকারগণ ইহাদিগকে জ্ঞানের সাধন বলিয়াছেন । মনু-সংহিতায় এইরূপ গুণগুলিকে ধর্ম বলা হইয়াছে । তাহাতে যে দশ লক্ষণ ধর্মের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা এই :—

“ধৃতিঃ ক্রমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥” (মনু, ৬।২২)

এইগুলিকে অষ্ট ধর্মশাস্ত্রেও ধর্ম বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে । যজ্ঞ-বক্ষ্য-সংহিতা, ১।১১২ ও বিষ্ণু সংহিতা ৬৭-৮ দ্রষ্টব্য ।

অতএব এই কয় শ্লোকে যে অমানিষাদিকে জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এই জ্ঞান—ক্ষেত্রেরই ধর্ম; ইহা ক্ষেত্রান্তর্গত চিত্তের বিশেষ ধর্ম বা অবস্থা-বিশেষ । এ জ্ঞান ক্ষেত্রজের নহে । ইহা ক্ষেত্রজের জ্ঞেয় । ক্ষেত্রজ “জ্ঞ”-স্বরূপ (সাংখ্য-কারিকা, ২ দ্রষ্টব্য) । আত্মা বা পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ অথবা জাতৃস্বরূপ । তিনি সাক্ষী-দ্রষ্টা মাত্র । ব্রহ্ম “সত্যং জ্ঞানমস্তম্” (তৈত্তিরীয় উপঃ ২।১।১) । এই জ্ঞানস্বরূপ বা ‘জ্ঞ’-স্বরূপ পুরুষের, অথবা ‘চিৎ’ বা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের যে জ্ঞান, সে জ্ঞান এই হলে উক্ত হয় নাই ।

সে জ্ঞানের স্বরূপ আমাদের জ্ঞেয় নহে । আমাদের যে জ্ঞান, তাহা চিত্তবৃত্তি মাত্র, তাহাকে বৃত্তিজ্ঞান বলে । সে জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন । তাহা দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞান আমরা ধারণা করিতে পারি না । তবে চিত্ত নির্মল হইলে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্বক—এই বৃত্তিজ্ঞান নিরোধপূর্বক সমাধিস্থ হইলে, যে প্রকার আলোক প্রকাশিত হয়, যে ভাস্কর জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত হয়, তাহাতে এই ব্রহ্মজ্ঞান আত্মাতে অভিব্যক্ত হয় । বিশেষ সাধনা দ্বারা যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত নির্মল হইয়াছে, তাঁহারা ব্যুখিত বা জাগ্রদবস্থায়,—সেই সমাধি বা নিদ্রা অবস্থার নির্মিকল্প জ্ঞান কিরূপে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়রূপে ভিন্ন হয়—তাহা অনুভব করিয়াছেন, বিশেষতঃ যাহারা নির্মিকল্প সমাধি দ্বারা দ্রষ্টৃ বা জ্ঞাতৃস্বরূপে অবস্থানপূর্বক, অপরোক্ষ ভাবে ইহা আত্মাতে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা এই ব্রহ্মজ্ঞানের যে আভাস দিয়াছেন ও শ্রুতি তাহা যেভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা হইতেই সে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের স্বরূপ কতকটা জানিতে পারা যায় । আমরা পূর্বে (দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায়) ইহার অর্থ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি । ব্রহ্ম বা আত্মা সেই জ্ঞানস্বভাব হেতু বিজ্ঞাতা হন । সেই জ্ঞান হইতে ‘জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়’ এই দ্বৈত ভাব বিবর্তিত হইয়া জগতের অভিব্যক্তি হয় । সে জ্ঞান নিত্য জ্ঞান, তাহা অজ্ঞানমিশ্রিত নহে । তাহাতে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-ভাব অভিব্যক্ত হইলেও জ্ঞাতৃজ্ঞেয় (Subject-Object) ভেদ থাকে না । সে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে চিত্ত বা অন্তঃকরণ ব্যবধান নাই । হিরণ্যগর্ভাখ্য সগুণ ব্রহ্মে, সেই অন্তঃকরণ বা সূক্ষ্ম শরীরাত্মিক ব্যবধান থাকিলেও নিগুণ ব্রহ্মে সে ব্যবধান নাই । অন্তঃকরণই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে । জীবের—বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর জীবের এই অন্তঃকরণ অভিব্যক্ত হয় । অন্তঃকরণ অর্থাৎ বুদ্ধি মন ও অহঙ্কার বা চিত্ত, অঙ্ক, তাহা জ্ঞেয় । তাহাতে জ্ঞাতার জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয়, এমনই অন্তঃকরণে জ্ঞানের প্রকাশ হয় । সেইরূপ আত্মচৈতন্য চিত্তে প্রতিকলিত

হওয়ার চিত্ত চেতনাব্যুক্ত হয়। তাই চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ হয়। চেতনাব্যুক্ত চিত্তে যেমন এক দিকে জ্ঞাতা প্রতিবিম্বিত হন, সেইরূপ অন্যদিকে জ্ঞেয় (অগৎ) প্রতিফলিত হয়। বাহ্য বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারে অন্তঃকরণে ক্রিয়া উৎপাদন করিলে, তাহার ফলে জ্ঞেয় বিষয় চিত্তে অভিব্যক্ত হয়, এবং সেই জ্ঞাতার প্রতিবিম্বিত জ্ঞান দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়। এইরূপে অন্তঃকরণে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া বৃত্তিজ্ঞান উৎপাদন করে। এই বৃত্তিজ্ঞান হেতু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পরস্পর গ্রাহক-গ্রাহ্যরূপে ভিন্ন হইয়া যায়। আর এই জ্ঞাতা জ্ঞেয়রূপে ভিন্ন হইয়া জ্ঞাতার ব্যক্তিত্ব (Principium individuationis) তাহার ভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে দেশ কাল ও নিमित্ত দ্বারা সেই জ্ঞান আরও পরিচ্ছিন্ন ও সঙ্কীর্ণ হয়। চিত্তে কর্তা ও ভোক্তার ভাব প্রকাশ দ্বারা সে জ্ঞান আরও মলিন হইয়া যায়।

অতএব আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান (Absolute Self-consciousness) এই বৃত্তিজ্ঞান (pheno-menal consciousness) হইতে স্বতন্ত্র। চিত্তে আত্মজ্ঞানের প্রতিবিম্ব হইতেই বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আত্মজ্ঞান চিত্তে কেবল বিজ্ঞাতরূপে প্রকাশিত হইলেও সে বৃত্তিজ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই বৈতন্ড্যাব বদ্ধ, 'অহং'-'ইদং' রূপে পরিচ্ছিন্ন হয়। আত্মজ্ঞান—নিত্য, অবিদ্যাবিরহিত, আর বৃত্তিজ্ঞান অশুদ্ধ, কণিক ও অবিদ্যা-জড়িত। আত্মজ্ঞান 'জ্ঞাতা'ই থাকেন, কখনও জ্ঞেয় হন না। বৃত্তিজ্ঞান সেই জ্ঞাতার জ্ঞেয়ই থাকে, কখন জ্ঞাতা হইতে পারে না, তবে অবিদ্যাবশে তাহাতে জ্ঞাতাভাবেরও বিকাশ হয়। তাহাতে জ্ঞাতার অধ্যাস হয়।

বাহ্য হউক, যখন আত্মজ্ঞান চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন করে, তখন চিত্ত যত নির্মল হয়, ততই আত্মজ্ঞান তাহাতে স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। চিত্ত নির্মল হইলে, সাত্বিক হইলে তবেই সে প্রতিবিম্ব পরিষ্কার হয়। চিত্ত যত নির্মল হয়, বুদ্ধি যত সাত্বিক

হয়, মন বতই কামক্রোধাদিহীন হয়, ততই এই জ্ঞান চিত্তে পরিষ্কৃত হইতে থাকে । চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল হইলে, অবিজ্ঞানতা সম্পূর্ণ দূর হইলে, অজ্ঞানত্ব তমঃ সম্পূর্ণ নষ্ট হইলে, তবে চিত্তে প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হয়,— চিত্তই জ্ঞানস্বরূপ হয় । যেমন নির্মল দর্পণে মুখ স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু দর্পণ মলিন হইলে, মুখের প্রতিবিম্ব ভাল করিয়া দেখা যায় না, চিত্তে জ্ঞানের প্রতিবিম্ব সঙ্কোচ সেই নিয়ম । নির্মলচিত্তে এইরূপে আত্ম-জ্ঞানের প্রতিবিম্ব পড়িলে, তাহাতে যে ভাবের বিকাশ হয়, তাহার স্বরূপ এই করুণ্যোকে উক্ত হইয়াছে । গীতার অনেক স্থলে এই জ্ঞানের—এই চিত্তে অভিব্যক্ত জ্ঞানের কথাই উক্ত হইয়াছে । এই জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া বুঝিলে গীতার মূল তত্ত্ব বুঝা যায় না । যাহারা নিত্য আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান মানেন না, কেবল বুদ্ধিজ্ঞানই স্বীকার করেন, তাহারা ত কণিক বিজ্ঞানবাদী । বেদান্তে এই কণিক বিজ্ঞানবাদ বা কেবল বুদ্ধিজ্ঞানবাদ গৃহীত হয় নাই । নিত্যবিজ্ঞানবাদের উপরই বেদান্তশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত ।

গীতারও এই নিত্য বিজ্ঞানবাদ প্রতিষ্ঠিত । গীতোকৃত জ্ঞান প্রধানতঃ নিত্য ব্রহ্মজ্ঞান । সে যাহা হউক, গীতার জ্ঞান বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । তাহা পূর্বে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে । (১) গীতার কোথাও জ্ঞানকে 'পরম জ্ঞান' বলা হইয়াছে । এই জ্ঞানই নিত্যজ্ঞান—ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান । এই জ্ঞান ব্রহ্মের বা আত্মার স্বরূপ বা স্বভাব ; একমুখ এই পরম জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলা হয় । ব্রহ্মই 'বিজ্ঞান ঘন'— চিত্তস্বরূপ । (২) কোথাও জ্ঞানের অর্থ নির্মল শুদ্ধ সাধিক চিত্তের-তাব বা অবস্থা বা স্বরূপ । ইহা বুদ্ধিরই বিশেষ অবস্থা । বিশেষ সাধনা দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে, বুদ্ধির এই জ্ঞানতাব বা জ্ঞানরূপ লাভ হয় । (৩) কোথাও জ্ঞানের অর্থ এই জ্ঞান-স্বরূপ নির্মল চিত্তে প্রতি-

বিশিষ্ট আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান । নিশ্চল চিত্ত আত্মভাবে বা ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইলে, সেই ভাবনা সিদ্ধিতে ব্রহ্মভূত হওয়া যায় । এই নিশ্চল শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞেয় ও ধ্যেয় ঈশ্বর বা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান যে প্রকাশ হয়, তাহাকেই এই জ্ঞান জ্ঞান বলা যায় । এই জ্ঞানকেই মুক্তিহেতু বলে । (৪) আমাদের অন্তঃকরণ বা চিত্ত জড় । পুরুষের বা আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া তাহা চেতনবৎ হয় । তাহাতে বুদ্ধির অভিব্যক্তি হয় । এই বুদ্ধিতে যে বাহ্য বিষয়-গ্রহণ হয় ও তাহার যে জ্ঞান হয়, তাহাকেও গৌণ অর্থে অনেক স্থলে জ্ঞান বলা হয় । এ জ্ঞানকে বৃত্তিজ্ঞান বলে । চিত্তবৃত্তির ক্রিয়াকালে এই জ্ঞানের দ্বারা যে বিষয়-জ্ঞান হয়, তাহা অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান-যুক্ত । এজন্ত ইহাকে সাধারণতঃ অজ্ঞান বলে । চিত্ত অশুদ্ধ, মগ্ন, রজস্তম-মলাযুক্ত থাকিলে, তাহাতে যে বিষয়জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহাকে সাধারণতঃ জ্ঞান বলিলেও তাহা অজ্ঞান । চিত্ত যখন সাধনা দ্বারা নিশ্চল শুদ্ধ হয়, তখন চিত্ত জ্ঞানরূপ বা জ্ঞানভাববিশিষ্ট হয়, তখন এই অজ্ঞান দূর হইয়া যায় । যখন চিত্তের এই অজ্ঞানরূপ মলা বা তমঃ বিনষ্ট হয়, তখন চিত্ত প্রকৃত জ্ঞানভাব লাভ করে, সম্পূর্ণ নিশ্চল হয় । তখন তাহার বাহ্য পরম জ্ঞেয়, তাহার পরম আদর্শ, তাহার ভাবে ভাবিত হইয়া চিত্ত সেই আকারে আকারিত হয় । তখন জ্ঞেয় সেই নিশ্চল জ্ঞান-স্বরূপ চিত্তে 'জ্ঞান'রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় । অতএব এই জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, জ্ঞান কি, তাহা জানিতে হয় ; সে জ্ঞানলাভ জন্ত চিত্তকে নিশ্চল করিতে হয়, তাহার অজ্ঞানজ তমঃ নষ্ট করিতে হয়, এবং এই অজ্ঞান দূর করিয়া চিত্তের যে 'জ্ঞানভাব' বা জ্ঞানরূপ, তাহা জানিতে হয় ও লাভ করিতে হয় । এই জ্ঞানভাব লাভ করিবার জন্ত কঠোর সাধনা করিতে হয় ।

(৫) ইহার জন্ত অর্থাৎ বুদ্ধির এই অজ্ঞান দূর করিয়া 'জ্ঞান'ভাব লাভ করিবার জন্ত যে সাধনা, ব্যাখ্যাকারগণ তাহাকেও জ্ঞান বলিয়াছেন ।

গীতার উক্ত হইয়াছে যে, চিত্তকে অজ্ঞান হইতে মুক্ত ও জ্ঞানভাবযুক্ত করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয় । এই জ্ঞান কি, তাহা জানিবার জন্য প্রথমে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী আচার্য্যের উপাসনা করিয়া তাঁহার নিকট এই জ্ঞানের উপদেশ লইতে হয় ।

“তদ্বিক্তি প্রণিপাতেন পরিশ্রমেন সেবয়া ।

উপদেক্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥”

(গীতা, ৪।৩৪) ।

চিত্তকে এই জ্ঞানভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ‘জ্ঞানযজ্ঞ’ করিতে হয় । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরমুপ ।

সৰ্ব্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥”

(গীতা, ৪।৩৩) ।

এইরূপ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা চিত্তকে নিৰ্ম্মল করিতে হয়, বুদ্ধির যাহা জ্ঞানভাব, তাহা লাভ করিতে হয় । তাহা হইলে চিত্ত পবিত্র হয়—সৰ্ব্বপাপ যলা দূর হইয়া যায় । তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রামহ বিদ্বতে ।”

(গীতা, ৪।৩৮) ।

চিত্ত যতই সাধনা দ্বারা নিৰ্ম্মল হইতে থাকে, বুদ্ধির এই ‘জ্ঞান’-ভাব ততই অভিব্যক্ত হইতে থাকে, ততই তাহাতে আত্মার প্রতিবিম্ব স্পষ্টতর হইতে থাকে । যোগ-সংসিদ্ধিতে চিত্তের এই জ্ঞানভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়, তাহার আত্মস্বরূপে অবস্থান হয় । তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, এই জ্ঞান—

“তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ।”

(গীতা, ৪।৩৮) ।

এই জ্ঞান লাভ হইলে আর অজ্ঞান বা মোহ থাকে না । এ জ্ঞান লাভ হইলে সৰ্ব্বত্র আত্মদর্শন হয় ।

“বজ্ জ্ঞানং ন পুনর্মোহমেবং বাস্তসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতান্ত্রশেষেণ দ্রক্ষ্যস্তান্মুখ্যে ময়ি ॥”

(গীতা, ৪।৩৫) ।

অতএব কঠোর সাধনা দ্বারা চিত্তকে নিশ্চল জ্ঞানস্বরূপ করিতে হয় । চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ হইলে তাহা দ্বারা সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন হয়, ও সমুদায় পরমাত্মা ঈশ্বরে দর্শন হয় । এই জ্ঞানস্বরূপ চিত্তেই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় ।

বলিয়াছি ত, আমাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তাহা জ্ঞান-স্বরূপ হয় । কিন্তু চিত্ত নিশ্চল না হইলে এই প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয় না । সে অবস্থায় চিত্তের যে জ্ঞানভাব, তাহা রজস্তমোমলিনতা হেতু অজ্ঞান মাত্র । জ্ঞান-সাধন দ্বারা এই অজ্ঞান দূর করিতে হয় । তবে চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ হয় । তবে চিত্তে উক্ত পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয় ।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি অস্তবঃ ।”

(গীতা, ৫।১৫) ।

পূর্বোক্ত জ্ঞানসাধন দ্বারা এই অজ্ঞান দূর করিতে হয়, তাহাও গীতার আরও উক্ত হইয়াছে,—

“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং বেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥”

(গীতা, ৫।১৬) ।

উক্ত আত্মজ্ঞান-সাধন দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ হইলে, তাহা দ্বারাই অজ্ঞান বিনষ্ট হয় । আর অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই সেই পরম জ্ঞান আদিত্যবৎ প্রকাশিত হয়, অথবা সেই জ্ঞান তখন সেই পরম তৎ প্রকাশ করিয়া থাকে । এ সম্বন্ধে এই শ্লোকের ব্যাখ্যাও পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে দ্রষ্টব্য ।

যাহা হউক, জ্ঞানসাধন দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে চিত্তে পরম জ্ঞান-
স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় । গীতার পরে দশম অধ্যায়ে ভগবান্
বলিয়াছেন যে, ভুক্তিযোগে সাধনা করিলেও এই জ্ঞান লাভ হয় ।

“তেষাং সততযুক্তানাং ভক্ততাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবন্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥”

(গীতা, ১০।১০-১১) ।

ভগবান্ যখন ভক্ত সাধকের আত্মভাবস্থ হন, তখন তাঁহার চিত্তে
ভাস্বৎ জ্ঞানদীপ প্রজ্জলিত হয়, তাঁহার অজ্ঞানজ অন্ধকার দূর হইয়া
যায় । এই জ্ঞানদীপ দ্বারাই তত্ত্বদর্শন হয় ।

ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পরম জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান । চিত্ত
নির্মল শুদ্ধ স্বচ্ছ জ্ঞানস্বরূপ হইলে, তাহাতে পরম জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয়,
আদিত্যবৎ সে পরম জ্ঞান তাহাতে প্রকাশিত হয় । তাহা যতক্ষণ না
হয়, ততক্ষণ আমাদের চিত্তে অভিব্যক্ত জ্ঞান অজ্ঞান-আবরিত থাকে ।

এই পাঁচ শ্লোকে এই জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে । জ্ঞান-
সাধনা দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে তাহার যে ভাব বা অবস্থা হয়, তাহাই
চিত্তের জ্ঞানাবস্থা জ্ঞাননিষ্ঠা । সেই জ্ঞানাবস্থাই চিত্তে পরম জ্ঞান
প্রকাশিত হয়,—তাহার যাহা পরম ‘জ্ঞেয়’, তাহা অভিব্যক্ত হয় । শুদ্ধ
সাধিক নির্মল চিত্তের এই জ্ঞানাবস্থা বা যে জ্ঞানভাব, তাহাই এই কয়
শ্লোকে ‘জ্ঞান’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । তাহার জ্ঞানের সাধন নহে,
তাহারা শুদ্ধ চিত্তের ‘জ্ঞান’-ভাব মাত্র । চিত্তের সেই শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ সাধিক
ভাব—অমানিষ, অদস্তিষ, অহিংসা, ক্রান্তি প্রভৃতি এই বিংশতি
প্রকার । এই ভাব সাধনা দ্বারা সিদ্ধ হইলে চিত্তের যে রাজস ও তামস

মলিন অজ্ঞান ভাব—মানিষ, মস্তিষ, হিংসা, অক্ষান্তি, কুটিলতা প্রভৃতি, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় । তখন সেই নির্মল জ্ঞান স্বরূপ চিত্তে যাহা প্রকৃত জ্ঞান, বা তাহার পরম জ্ঞেয়ত্ব, তাহা প্রকাশিত হয় । তখন চিত্তে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাকে ভগবান্ পূৰ্ব্ব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান বলিয়াছেন । তাহাতে জ্ঞেয়রূপে পরম ব্রহ্মত্ব, পুরুষপ্রকৃতিত্ব, জীব-ঐশ্বর্যত্ব যে প্রকাশিত হয়—তাহাও জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।

এইরূপে গীতা হইতে আমরা জ্ঞানের বিভিন্ন অর্থ বুঝিতে পারি । উপনিষদ্ হইতেও জ্ঞানের এই বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায় । এ স্থলে তাহা উল্লেখের আবশ্যক নাই । কেবল এ স্থলে সাংখ্যদর্শনের কথা বলিব । সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ 'জ্ঞ'-স্বরূপ । তাহারই সংযোগে প্রকৃতির পরিণাম হইয়া বুদ্ধি-তত্ত্বের অভিব্যক্তি হয় ।

সুতরাং সাংখ্য-দর্শন অনুসারে "জ্ঞ"-স্বরূপ পুরুষের জ্ঞান, বুদ্ধিতে অবিভ্যক্ত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র । সাধ্বিক বুদ্ধির এক ভাব বা রূপ যে জ্ঞান, তাহার সম্বন্ধে সাংখ্য-দর্শনে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে । সাংখ্য-দর্শনে আছে,—

“অধ্যবসায়ো বুদ্ধিধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যাম্ ।

সাধ্বিকং এতদ্রূপং তামসং অস্মাৎ বিপর্য্যস্তম্ ॥ (কারিকা, ২৩) ।

সাংখ্য-দর্শনমতে এই বুদ্ধি ত্রিবিধ ;—সাধ্বিক, রাজসিক ও তামসিক । সাধ্বিক বুদ্ধির রূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য । তামসিক বুদ্ধির রূপ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য । এই জ্ঞানের অর্থ কি ? তৎ-কৌমুদীতে আছে—“সত্ত্ব-পুরুষাণ্ডাখ্যাতিজ্ঞানম্ ।” অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকারকে জ্ঞান বলে । “মোক্ষে ধীজ্ঞানম্”—মোক্ষ-বিষয়িনী বুদ্ধিকে জ্ঞান বলে ।

এই যে বুদ্ধির আট প্রকার রূপ বা ভাব,—এই যে জ্ঞান-ধর্ম্ম বৈরাগ্য

ঐশ্বর্য ও তাহার বিপরীত অজ্ঞান অধর্ম অবৈরাগ্য অনৈশ্বর্য, ইহাদের মধ্যে সাতটি ভাব বন্ধন করেন, কেবল একমাত্র ভাব. জ্ঞানই মুক্তি-হেতু । কারিকার আছে,—

“রূপৈঃ সপ্তভিরেব বধ্যাত্যাঙ্গানম্ আঙ্গনা প্রকৃতিঃ ।

সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥”

(কারিকা, ৬৩) ।

বুদ্ধির এই একরূপই ‘বিবেকখ্যাত তত্ত্বজ্ঞান’ । ইহাই প্রকৃত-জ্ঞান । ইহা সাত্ত্বিক শুদ্ধ নিৰ্ম্মল বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠ ভাব । সাত্ত্বিক বুদ্ধি এই ‘জ্ঞান-ভাবে’ ভাবিত হইলে, বুদ্ধির অমানিষাদি এই অবস্থা হয় ।

অতএব জ্ঞান সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ বা ভাব । গীতাতেও এই কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে । গীতার আছে—

“সর্বাং সঞ্জায়তে জ্ঞানম্ ।” (১৪।৭)

অর্থাৎ সর্বশুণ হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি । অত্র আছে—

“সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাৎ বিবুদ্ধং সর্বমিত্যত ॥” (গীতা, ১৪।১১)

বুদ্ধিতেই এই জ্ঞানের বিকাশ হয়, অথবা বুদ্ধি জ্ঞানস্বরূপ হয় । গীতার এই বুদ্ধির সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অবস্থাভেদে জ্ঞানের ত্রিবিধ অবস্থা উক্ত হইয়াছে । যথা—

“সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমবায়মীকতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥

পৃথক্‌স্বেন তু বজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্ ।

বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥

যন্তু কুৎসবৎ একস্মিন্ কার্য্যে সঙ্কমটৈতুকম্ ।

অতদ্বার্বদল্পক তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥” (গীতা ১৮।২০-২২) ।

অতএব জ্ঞান বাহা, তাহা এই সাত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ, তাব অথবা তাহার অবস্থা বিশেষ । বুদ্ধির বিরূপ অবস্থা বা ভাবকে জ্ঞান বলে, তাহা এ স্থলে এই পাঁচ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । বুদ্ধিতে যখন এই অমানিত্ব প্রভৃতি উক্ত বিংশতি প্রকার ভাব প্রকাশিত হয়, তখন তাহাকে জ্ঞান বলা যায় । যখন বুদ্ধিতে ইহার বিপরীত ভাব—মানিত্ব, দস্তিৎ প্রভৃতি প্রকাশ হয়, অথবা বুদ্ধি যখন এই সকল ভাবযুক্ত থাকে, তখন তাহাকে অজ্ঞান বলিতে হইবে । অতএব এই জ্ঞান ও অজ্ঞান বুদ্ধির স্বরূপ বা চিত্তের ধর্ম । ইহা জ্ঞাতার জ্ঞেয় । চিত্ত নির্মল হইলেই এই অমানিত্ব প্রভৃতির বিকাশ হয়, এবং তখন নির্মল চিত্তের এই প্রকাশ অবস্থাকে ‘জ্ঞান’ বলে । শ্রুতি অনুসারেও জ্ঞান—বুদ্ধিরই স্বরূপ । শ্রুতিতে আছে যথা—“যচ্ছেৎ বাঙ্‌মনসি প্রাজ্ঞঃ তৎ যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি । জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি...” (কঠ, ৩।১৩) । এ স্থলে জ্ঞানাত্মা অর্থ শঙ্করাচার্য্যমতে “প্রকাশস্বরূপ বুদ্ধি ।”

বেদান্ত-শাস্ত্রে আছে যে, আমাদের চিত্তে প্রতিফলিত চৈতন্য জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ, দ্রষ্টা, দৃষ্ট, দর্শন—এই প্রকার ‘ত্রি-পুট’ যুক্ত । ইহার মধ্যে জ্ঞাতা—দ্রষ্টা বা [প্রমাতা অস্তঃকরণে প্রতিফলিত আত্মস্বরূপ । জ্ঞান এই চিত্ত বা অস্তঃকরণ । আর জ্ঞেয়—অস্তঃকরণে প্রকাশিত বাহ্য বিষয় । আর ‘জ্ঞ’-স্বরূপ আত্মা চিত্তে প্রতি-বিম্বিত হইয়া এই জ্ঞান প্রকাশ করে । “জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়ানাম্ আবির্ভাবতিরোভাবজ্ঞাতা ।” (সর্বোপনিষদ্-সার, ৩) ।

অস্তঃকরণে এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সংযুক্ত হইয়া জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । অস্তঃকরণ নির্মল হইলেই এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়, এবং তৎসংযোগে জ্ঞান প্রকাশ হয় । সেই জ্ঞান—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-স্বরূপ প্রকাশ করে । অস্তঃকরণ যে পরিমাণে মলিন হয়, রজঃ ও তমঃ যুক্ত হয়, সেই পরিমাণে জ্ঞান অজ্ঞানমূড়িত হয়, এবং ‘জ্ঞাতা ও

জ্ঞেয়'র প্রতিবিম্ব অপরিষ্কৃত হয় । চিত্তের বা অন্তঃকরণের একদিকে (অন্তরে) জ্ঞাত্বরূপ আত্মা, আর একদিকে (বাহ্যে) জ্ঞেয় জগৎ । চিত্তে উভয়েরই ছায়া পড়ে, উভয়ই চিত্তে প্রতিফলিত হয় । চিত্ত নিৰ্ম্মল হইলে, তবে আত্মার প্রতিবিম্ব স্পষ্ট গ্রহণ করিতে পারে, নতুবা পারে না । চিত্ত নিৰ্ম্মল হইলে, আত্মা তাহার অতি সন্নিকট বলিয়া আত্মার প্রতিবিম্ব অন্যদিকে সহজে গ্রহণ করিতে পারে । পরন্তু চিত্ত নিৰ্ম্মল হইলেও ইন্দ্রিয়াদি যদি বিকল হয়, তবে তাহা বাহ্যবিষয় স্পষ্ট গ্রহণ করিতে পারে না । সে যাহা হউক, নিৰ্ম্মল চিত্তেই আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ পাইতে পারে । নিৰ্ম্মল চিত্তই জ্ঞানস্বরূপ । সেই জ্ঞানেই আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয় ।

অতএব এই জ্ঞান অন্তঃমুখ হইলে, অন্তরাত্মার দর্শন হয় । কাহাকেও জ্ঞানী বলিলে, তাঁহার চিত্ত যে এই অমানিত্ব-প্রভৃতি গুণ বা ধর্মযুক্ত, ইহাই বুঝিতে হইবে । কেবল তত্ত্ব হইলে অথবা কেবল অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যস্থিত হইলে, এমন কি, কেবল তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শী হইলেও, তাঁহাকে জ্ঞানী বলা যায় না । যাঁহাতে অমানিত্ব-প্রভৃতি এই বিংশতি ভাব বিশেষরূপে অভিব্যক্ত—তিনিই জ্ঞানী । অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য অবস্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন—ইহাই প্রধানতঃ জ্ঞান বলিয়া উক্ত হয় বটে, কিন্তু অমানিত্বাদি না থাকিলে, বুদ্ধি এই অধ্যাত্মজ্ঞানে অবস্থিত বা অবিচলিত ভাবে স্থিত হইতে পারে না ; তত্ত্বজ্ঞানার্থও তাহার দর্শনের বিষয়ীভূত হয় না । সেইরূপ ঈশ্বরে অনন্তভক্তি যে এই জ্ঞানের লক্ষণ,—যাহাকে জ্ঞানের প্রধান লক্ষণও বলা যায়, তাহাও চিত্তের অমানিত্বাদি ভাব ব্যতীত লাভ করা যায় না ।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে ।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২

জ্ঞেয় যাহা—কহি এবে জানি, যাহা হয়
অমৃতত্ব লাভ,—তাহা সে পরমব্রহ্ম
আদিহীন, নহে বাচ্য সৎ বা অসৎ ॥ ১২

১২। জ্ঞেয় যাহা কহিতেছি—পূর্বে যে জ্ঞানের নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা জ্ঞাতব্য কি, এই প্রশ্ন আকাজক্ষা করিয়া ভগবান্ তাহার উত্তর দিতেছেন—জ্ঞাতব্য যাহা, তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে বলিতেছি (শঙ্কর)। বেদিত্ব-লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাতুলক্ষণ ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ যাহা, তাহাই জ্ঞেয়, ইহা বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে (রামানুজ)। যাহার জ্ঞাত উক্ত অমানিষাদি সাধন উক্ত হইয়াছে, তাহাই জ্ঞেয়, তাহাই প্রকৃতি-বিবিক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ, তাহাই জ্ঞেয় (কেশব)। উক্ত অমানিষাদি সাধন দ্বারা কি জ্ঞেয়, তাহাই এই ছয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (বধু)। এই জ্ঞানরূপ চিন্তে যাহা জ্ঞেয়, প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক পণ্ডিত ক্যান্টের (Kant) ভাষায় তাহা “Ideal of Reason” ।

পূর্বে ব্রহ্মযোগ-যুক্তাত্মা জ্ঞানীর কথা উক্ত হইয়াছে (৫, ২১)। এবং তিনি ব্রহ্মভূত ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ করেন, তাহাও উক্ত হইয়াছে, (গীতা, ৫।২৪—২৬)। অন্তরিক—সর্বভূতের সুহৃদ, সর্বলোকমহেশ্বর ভগবান্কে, জানিয়া শান্তিলাভ হয় (গীতা, ৫।২৯), শঙ্কর সহিত ভগবানে যোগযুক্ত যোগীই শ্রেষ্ঠ (গীতা, ৬।৪৭) এবং ভক্তিপূর্বক ভগবানে যোগযুক্ত হইলে, সমগ্ররূপে তাহাকে জানা যায় (গীতা, ৭।১), ইহাও উক্ত হইয়াছে। অথচ এ স্থলে জ্ঞেয় কি, তাহার উত্তরে ব্রহ্মই জ্ঞেয়, ইহা বলা হইয়াছে। তবে কি পরমেশ্বর জ্ঞেয় নহেন ? ইহার উত্তর পূর্বে এই অধ্যায়ের দশম শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে অমানিষাদি গুণযুক্ত নির্মল চিন্তে ভগবানে অনন্ত অব্যভিচারিণী ভক্তিরূপ জ্ঞান হইলে—এবং তাহা দ্বারা সমগ্ররূপে ভগবান্কে জানিলে, এবং অধ্যাত্ম-জ্ঞানে নিত্য স্থিত হইলে ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ

দর্শনরূপ জ্ঞান হইলে, তবে সেই জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন,—সেই জ্ঞানে ব্রহ্মকে জানিবার অধিকার হয় । ভগবান্‌ই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা । সর্বভূতাত্মভূতাত্মা ভগবান্‌কে বা সগুণ ব্রহ্মকে জানিলে, তবে তাহা দ্বারা নিগুণ শাস্ত অচল ধ্রুব অক্ষর ব্রহ্মের ও অনির্বাচ্য অনির্দেশ্য নির্বিশেষ পরমব্রহ্মের জ্ঞান সম্ভব হয়, পরমব্রহ্ম সেই নির্মল জ্ঞানে জ্ঞেয় হন । তিনিই পরম বেদিতব্য । ব্রহ্মকে জানিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না । শ্রুতিতে আছে—

“নাতঃ পরং বেদিতব্যং. হি কিঞ্চিৎ ।” (শ্বেতাশ্বতর । ১২) ।

ব্রহ্মই পরং বেদিতব্য, কেননা—

“তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি” (মুণ্ডক, ১।১।৩)

“আত্মনো বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্ ।” (বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫)

এই শ্লোকে ‘ব্রহ্ম’ই জ্ঞেয়রূপে উক্ত হইয়াছেন । এই ব্রহ্ম কি, এবং কিরূপে তিনি পূর্বের কয় শ্লোকোক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় হন, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে । এই ব্রহ্মতত্ত্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে প্রকৃতি-বিবিক্ত আত্মা বা ক্ষেত্রজ । আর শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ ব্যাখ্যাকার-গণের মতে এই ব্রহ্মই পরম ব্রহ্ম, বেদান্তোক্ত ‘একমেবাদ্বিতীয়’ ব্রহ্মতত্ত্ব । এ মতভেদ পরে বিবৃত হইবে ।

পূর্বোক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম কিরূপে জ্ঞেয় হন, সে সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন,—এক্ৰণে শঙ্কা হইতে পারে যে, পূর্বে যে অমানিত্বাদি বলা হইয়াছে, সে সমুদায় ‘যম-নিয়মের’ অন্তর্নিবিষ্ট । ইহাদের দ্বারা কোন বস্তু ত জ্ঞাত হওয়া যায় না । অমানিত্বাদি কখন কোন বস্তুর প্রকাশক হইতে পারে না । সর্বত্র দেখা যায় যে, যে জ্ঞানের যাহা বিষয়, সেই জ্ঞানই তাহার প্রকাশক হইয়া থাকে ; এক-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অন্ত-বিষয় বা বস্তু জ্ঞানে কখনই প্রকাশিত হইতে পারে না,—ঘট-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অগ্নি কখন প্রকাশিত হয় না । কিন্তু এইরূপ শঙ্কাদোষ হইতে পারে না । কারণ, পূর্ব-শ্লোকে যে অমানিত্বাদি জ্ঞান বলা হইয়াছে,

উহার অর্থ জ্ঞান নহে—জ্ঞানের সাধন মাত্র । উহারা জ্ঞানের সহকারী কারণ ।”

আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই অমানিষাদি জ্ঞানের সাধন নহে । ইহারা শুদ্ধ সাংখ্যিক নিশ্চল চিত্তের বা বুদ্ধিতত্ত্বের ‘জ্ঞানভাব’ বা ‘জ্ঞানরূপ ।’ চিত্ত এইরূপ জ্ঞানাকার হইলে, তাহাতে এই ‘জ্ঞেয়’ তত্ত্ব প্রকাশিত হয় । সুতরাং উক্তরূপ কোন শঙ্কাই হইতে পারে না ।

এ স্থলে আরও এক শঙ্কা হইতে পারে যে, যিনি ব্রহ্ম—যিনি বিজ্ঞাতা—যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ—তিনি কিরূপে জ্ঞেয় হন ? জ্ঞাতা ত কখন জ্ঞেয় হয় না । সুতরাং এ স্থলে তাঁহাকে জ্ঞেয় বলা হইল কেন ? এই ব্রহ্মকে যদি জ্ঞাত হইতে ভিন্ন পরা ও অপরা প্রকৃতি বা মূল প্রকৃতি, অথবা ভগবানের যৌনি ‘মহদ্ব্রহ্ম’ বলা যায়, তবে অবশ্য এ বিরোধ হয় না । কিন্তু কেহই তাহা বলেন নাই । সকল ব্যাখ্যাকারই এই জ্ঞেয়কে জ্ঞান-স্বরূপ ‘পরম ব্রহ্ম’ বা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা বলিয়াছেন । সুতরাং তিনিই জ্ঞাতা । যাহা হউক, ‘জ্ঞাতা’ কিরূপে জ্ঞেয় হন, তাহা আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । পরেও ইহা বিবৃত হইবে । সুতরাং এ স্থলে তাহার আলোচনা নিশ্চয়ো-

জন । শঙ্কর বলেন,—এ স্থলে জ্ঞেয় অর্থ জ্ঞাতব্য । যাহা জানা কর্তব্য, যাহা (অতঃ) চতুর্বর্গ-সাধন-সম্পন্ন হইলে, বিজ্ঞাত,—তাহা এই জ্ঞেয় । জানি যাহা হয় অমৃতত্ব লাভ—এই তত্ত্ব শ্রবণ-প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে যে, এই জ্ঞেয়-স্বরূপ জানিলে অমরত্ব লাভ হয়—মৃত্যু সংসারসাগর হইতে পার হওয়া যায় (শঙ্কর) ।

শ্রোতার আদর সিদ্ধি জন্য—অর্থাৎ যাহাতে শ্রোতার এই তত্ত্ব শ্রবণ জন্য আগ্রহ হয়, সে কারণ বলা হইয়াছে যে, এই ‘জ্ঞেয়’কে জানিলে মোক্ষ হয়, (স্বামী) ।

যে প্রকৃতিবিবিক্ত আত্মস্বরূপ জানিলে জন্ম জরা-মরণাদি প্রাকৃত-ধর্ম-বিযুক্ত শুদ্ধ আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, (কেশব) ।

ইহা মুমুকুদ্বিগের জ্ঞেয়, একমাত্র তাহা বিশেষ ভাবে বলিতেছি যে, সেই জ্ঞানে সংসার হইতে মুক্তি হয় (মধু) ।

ইহা দ্বারা এই জ্ঞানের প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে (বল্লভ) ।

‘যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নতে’—ইহা ‘জ্ঞেয়’ শব্দের বিশেষণ। অর্থ এই যে, যে জ্ঞেয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হইলে অমৃতত্ব লাভ হয়, সেই ‘জ্ঞেয়’র বিষয় তোমাকে বলিতেছি। ‘জ্ঞেয়’ অনেক হইতে পারে, কিন্তু সকল জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞানে মুক্তি হয় না ; কেবল একমাত্র এই ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। এই জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব জানিলে যে মুক্তি হয়, মুক্তির অন্য উপায় নাই, তাহাই উপদিষ্ট হয়। স্মৃতিতে আছে,—

“তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি, নাশ্চ পশ্বা বিত্ততেহন্নরায় ॥”

(শ্বেতাশ্বতর, ৩।৮।৬-১৫ দ্রষ্টব্য) ।

সুতরাং এ কথা যে শ্রোতার চিত্তাকর্ষণ জন্য বলা হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা ঠিক সঙ্গত নহে ।

তাহা সে পরম ব্রহ্ম আদিহীন—(তৎ অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম)—মূল অনুসারে দুইরূপ পাঠ হয় ; যথা (১) ‘অনাদিমৎ’ ‘পরংব্রহ্ম’ আর (২) ‘অনাদি’ ‘মৎপরং’ ‘ব্রহ্ম’ । শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন প্রভৃতি প্রথম পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। অনুবাদে সেই পাঠ গৃহীত হইয়াছে। আর রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ দ্বিতীয় পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুইরূপ পাঠের অর্থভেদ নিয়ে প্রসঙ্গ হইল।

প্রথম পাঠ অনুসারে অর্থ এই যে, বাহার আদি আছে, তাহা আদিমৎ। বাহা আদিমৎ নহে, তাহা অনাদিমৎ। সেই অনাদিমৎ বস্তুই ‘পরং’ বা নিরতিশয় ব্রহ্ম। তাহাই ‘জ্ঞেয়রূপে’ এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। (শঙ্কর, গিরি, মধু, স্বামী ।) দ্বিতীয় পাঠ অনুসারে অর্থ এই যে, আদি বা উৎপত্তি বাহার নাই, তাহাই ‘অনাদি’, ‘মৎপরং’ অর্থাৎ আমিই বাহার পরম্, বাহা আমার স্থানভূত, সেই ব্রহ্ম (রামানুজ, কেশব, বলদেব, হনু, বল্লভ, বিশ্বনাথ) ।

রামানুজ, বলদেব প্রভৃতি বলেন যে, ‘অনাদি’ শব্দের যে অর্থ, অনাদিমৎ শব্দেরও সেই অর্থ। অতএব এ স্থলে ‘অনাদি’ অর্থে ‘অনাদিমৎ’ ব্যবহার নিরর্থক হয়। এই জন্ম ‘অনাদি’ ও ‘মৎপর’—এইরূপ পাঠই সঙ্গত। তাঁহাদের মতে এই ব্রহ্ম—জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা। ভগবান্ জ্ঞেয় বাহা, তাহাই বলিতেছেন। সেই জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞ—তাহা দ্বিবিধ—ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ও ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর। এই শ্লোকে প্রকৃতি-বিযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের কথা উক্ত হইয়াছে। পরের কল্প শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, জ্ঞেয় দুই রূপ ;—জীবাত্মা ও পরমাত্মা, অর্থাৎ প্রতি-ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা আর সর্বক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা, এই শ্লোকে ব্রহ্ম অর্থে জীবাত্মা, আর পরের কল্প শ্লোকে ব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর। রামানুজ বলেন, ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ভগবানের পরা প্রকৃতি। (গীতা, ৭।৫)। অপরা প্রকৃতি জড়, ও পরা প্রকৃতি জীব। উভয়েই ভগবানের শরীর, এবং ভগবানের সহিত একরস হেতু : জীব তাঁহার আত্মস্বরূপ। জীবের উৎপত্তি নাশ নাই—এজন্ম জীব অনাদি, ভগবান্ই জীবগণের স্বামী, এজন্ম ভগবান্ বলিয়াছেন, তাহার ‘মৎপর’ বা ভগবৎপরায়ণ। ভগবান্ই ‘প্রধানঃ ক্ষেত্রজ্ঞপতি-শূন্যশঃ।’ আর জীবাত্মা ব্রহ্ম—বৃহৎ হেতু তাহা ব্রহ্ম, তাহা স্বভাবতঃ শরীরাদি দ্বারা পরিচ্ছেদরহিত—সর্বগত। তাহার শরীরের দ্বারা যে পরিচ্ছিন্নতা, তাহা কৰ্ম্মবন্ধনজনিত। নতুবা জীবাত্মা বৃহৎ অষ্টগুণবিশিষ্ট। শ্রুতিতে আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। “আত্মা—অপহতপাপা, বিজয়ো বিমৃত্যুর্বিশোকঃ—সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোহবেষ্টব্যঃ স আত্মা।” ইতি শ্রুতিঃ। অতএব আছে—“বিজ্ঞানং ব্রহ্ম।” গীতাতেও আছে—

“স গুণান্ সমতীত্যান্ ব্রহ্মভূয় কল্পতে ।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ॥”

কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন, “বাহার জন্ম নাই, সেই অনাদি, আর আমি বাহার ‘পর’ বা গুণশক্তিপ্রভৃতি দ্বারা বাহা হইতে উৎকৃষ্ট, তাহা

‘মৎপর’ । তাহা প্রকৃতিবিষুক্ত ক্ষেত্রজ - জীব । শ্রুতিতে আছে, “স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষম্ ঈক্ষতে ।” শ্রুতিতে আছে,—“প্রধানপুরুষব্যক্তকালানাং কারণং পরমং হি যৎ পশুস্তি সুরয়ঃ তদ্বিশেষাঃ পরমং পদম্ ।” অতএব যাহার অধিল-অবিষ্টা নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই প্রত্যগাত্মার শুদ্ধাবস্থাই ব্রহ্ম । আবরণ অভাবে বৃহৎ ঞ্চয়োগে তাহার ব্রহ্মত্ব । ‘বৃহতো ঞ্চ গা অগ্নিন্ ইতি ব্রহ্ম ।’

এইরূপ যুক্তিধারা রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ এ শ্লোকে ব্রহ্ম অর্থে জীবাত্মা, বা প্রত্যগাত্মা বুঝিয়াছেন, এবং জীবই অনাদি ও ‘মৎপর’ বা ভগবৎপরায়ণ এবং তাহাই জ্ঞেয়, ইহা বুঝাইয়াছেন ।

শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন প্রভৃতি বলেন যে, যিনি এই জ্ঞেয়, তিনি ‘পরমব্রহ্ম’ । জীব ব্রহ্ম বটে, কিন্তু এ স্থলে সেই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্রহ্ম উক্ত হয় নাই । পরের কয় শ্লোকেও যে ব্রহ্মের “সর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ” প্রভৃতি বিশেষণ যে উক্ত হইয়াছে, তাহা জীবাত্মা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না । অতএব এ স্থলে ‘অনাদিমৎ’ ও ‘পরংব্রহ্ম’ এইরূপ পাঠই ধরিতে হইবে । আর, যাহারা অনাদি ও ‘মৎপর’ এইরূপ পাঠ ধরেন, তাহারা বলেন যে, বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা যে অর্থ বুঝান যায়, তাহাই বুঝাইবার জ্ঞ ‘দভূন্’ প্রত্যয় করিলে তাহা বৃথা হয় । অনাদি অর্থে যাহার আদি নাই—তিনি, (এই বহুব্রীহি সমাস) । অনাদিমৎ বলিলেও সেই অর্থই হয় । সূত্রাৎ মতুপ্ প্রত্যয় নিষ্ফল । এ অতিরিক্ত প্রয়োগে লাভ কি ? এরূপ বৃথা পদপ্রয়োগ হইতে পারে না । উক্তরে শঙ্কর বলেন, ‘অনাদি’ ও ‘মৎপর’ এই প্রকার পদদ্বয় কল্পনা করিলে, পুনরুক্তিরূপ দোষ পরিহার হয় সত্য, কিন্তু তদনুসারে ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না । কেন না, এ স্থলে যে জ্ঞেয় ব্রহ্মকে প্রতিপাদিত করা হইয়াছে, তাহাকে সৎ নহে ও অসৎ নহে বলার তাহা সকলপ্রকার উপাধিবর্জিত নির্বিশেষ ব্রহ্ম । তাহা যদি ভগবানের পরা শক্তি হয়, তবে সে ব্রহ্ম শক্তিবিশিষ্ট হন । অর্থাৎ তাহা হইলে

তাহাকে সং বা অসং বলা যায় না, একরূপ বলা সম্ভব হয় না । যাহা বিশিষ্ট-শক্তিবৃত্ত, তাহার বিশেষত্ব প্রতিবেদনসম্ভব হয় না ।

শঙ্করাচার্য্য এ আপত্তির অগ্র মীমাংসা করেন নাই । স্বামী বলেন,—
ছন্দের অনুরোধে এ স্থলে মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া ‘অনাদিমৎ’ পদ সিদ্ধ হইয়াছে । মধুসূদন ও স্বামী উভয়ে ‘অনাদি’ ও ‘মৎপর’ একরূপ পাঠ ধরিয়াও অর্থ করিয়াছেন । তদনুসারে ‘মৎপর’ অর্থে ‘আমি বিষ্ণু—আমার যে পরম বা নির্বিশেষ রূপ—সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম । অথবা আমি হইতে অর্থাৎ সমগ্ৰ ব্রহ্ম হইতে পরম বা নির্বিশেষ রূপ যে ব্রহ্ম । অথবা পরব্রহ্ম আদিমৎ বিশ্ব হইতে ভিন্ন । এতদ্ব্যতীত অনাদিমৎ ।’

যাহা হউক, এ স্থলে ‘অনাদিমৎ’ পাঠই সম্ভব । উপনিষদে ‘অনাদি-মৎ’ শব্দ পাওয়া যায় । যথা—

‘অনাদিমৎঃ বিভূত্বেন বর্তসে যতো জাতানি;ভুবনানি বিশ্বাঃ ॥’

(খেতাশ্বতর ৪।৪)

যাহা হইতে বিশ্ব-ভুবনের উৎপত্তি, সেই ব্রহ্মই বিভূ অনাদিমৎ । উপনিষদে অত্র ‘আদিমৎ’ শব্দ আছে, যথা—‘আদিমৎবাং বা’ (মণ্ডুক্য, ৯) । গৌড়পাদের কারিকা ভাষ্যে আছে—“অনন্ততা চ আদিমতো মোক্ষস্য ন ভবিষ্যতি ।” সাংখ্য-কারিকায় (১০) আছে যে, ‘লিঙ্গং হেতুমৎ’ । অতএব যাহা আদিমৎ নহে, যাহা কোন কারণ হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা অনাদিমৎ । প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি, (গীতা ১৩।১৯) প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই ব্রহ্মের বিশেষ ভাব বলিয়াই অনাদি । এ উভয়ের অনাদিত্ব অপেক্ষার ব্রহ্মের অনাদিত্ব বিশেষভাবে লক্ষিত বলিয়া, এ স্থলে ‘মতুপ্’ প্রত্যয়ের সার্থকতা আছে । প্রকৃতি পুরুষ অনাদি হইলেও তাহাদের মূল ব্রহ্ম । যেহেতু, মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি । পুরুষও তাহার ভাব-বিশেষ । কিন্তু ব্রহ্ম হইতে আর কোন পরম তত্ত্ব নাই, এতদ্ব্যতীত তাহা অনাদিমৎ । পরব্রহ্ম সর্ব ‘আদিমৎ’ হইতে ভিন্ন,—এতদ্ব্যতীত অনাদিমৎ ।

আমরা পূর্বে গীতার ষাটশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা, এই গীতোক্ত অক্ষর পরম ব্রহ্মত্ব বৃত্তিতে চেষ্টা করিয়াছি । ব্রহ্ম অর্থে যে জীবাশ্মা বা প্রত্যগাত্মা হইতে পারে না, তাহা সে স্থলে দেখান হইয়াছে । অতএব রামানুজ, বলদেব প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা এ স্থলে সঙ্গত নহে । তবে ‘অনাদি’ ও ‘মৎপর’ এইরূপ পাঠ ধরিলেও যে এ শ্লোকের সঙ্গত অর্থ হইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্ম অর্থে যে পরমব্রহ্ম হইতে পারে, তাহা স্বামী ও মধুসূদন দেখাইয়াছেন । তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । ব্রহ্ম অর্থে এ স্থলে পরম ব্রহ্ম । উপনিষদে অনেক স্থলে ব্রহ্মকে পরমব্রহ্ম বলা হইয়াছে ; যথা—

“এতদৈ সত্যকাম পরম্ অপরঞ্চ ব্রহ্ম” (শ্রুত উপনিষদ্ ৫।২১)

“যৎ পরংব্রহ্ম সর্বাশ্মা ।” (কৈবল্য উপনিষদ্, ১৩)

* * * *

“দে বাব ব্রহ্মণী অভিধেয়ে শব্দশ্চ অশব্দশ্চ ।”

“পরে অশব্দে অব্যক্তে ব্রহ্মণি অন্তংগতা... ।”

“দে বাব বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ ।”

“...পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ।” (মৈত্রায়ণী উপঃ ৩।২২) ।

“অক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্ ।” (কঠ উপনিষদ্ ৩।১) ।

“ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহস্তুম্ ।” (খেতাশ্বতর উপঃ, ৩।৭) ।

“উদগীতমেতৎ পরমং তু ব্রহ্ম ।” (ঐ ১।৭) । ইত্যাদি ।

এইরূপে শ্রুতিতে ‘ব্রহ্ম’ ও পরংব্রহ্ম উভয়ই উক্ত হইয়াছে । শ্রুতিতে ব্রহ্ম যে স্থলে পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত, সে স্থলে ব্রহ্ম অর্থ সগুণ ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ । আর যেখানে ব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত, সেখানে ব্রহ্ম নির্কিংশেষ নিগুণ ব্রহ্ম । তিনি পরংব্রহ্ম—তিনি তৎ-শব্দ-বাচ্য । গীতার এ স্থলে ব্রহ্ম ‘তৎ’—অতএব তাহা পরমব্রহ্ম । গীতার ব্রহ্ম শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত । যথা—শব্দ-ব্রহ্ম, অক্ষর-ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, মহদ্ব্রহ্ম ইত্যাদি । অতএব এ স্থলে কোন্ ব্রহ্ম উদ্দিষ্ট

হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিবার জন্তু সেই 'তৎ' শব্দ-বাচ্য পরমব্রহ্ম উক্ত হইয়াছে । কেবল 'ব্রহ্ম' বলিলে তাহা বুঝা যাইত না ।

'ব্রহ্ম' বেদের 'মন্ত্র', এজন্তু বেদ ব্রহ্ম । ইহাই ব্রহ্ম শব্দের প্রাচীন অর্থ । উপনিষদে 'ব্রহ্ম' জগতের জন্মাদি কারণ হইলেও আকাশকে ব্রহ্ম, অগ্নিকে ব্রহ্ম, মনকে ব্রহ্ম—এইরূপ নানা স্থলে উক্ত হইয়াছে । ব্রহ্ম এইরূপ নানার্থে ব্যবহৃত । কিন্তু এ সমুদায় অর্থ সমন্বয় করিয়া বেদান্ত-দর্শন আকাশাদি সমুদায় সেই জগতের কারণ ব্রহ্মেরই নির্দেশক বলিয়াছেন । যাহা হউক, পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন অর্থবিরোধ নাই । পরমব্রহ্ম বলিলে সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে বুঝায় । এজন্তু এ স্থলে 'অনাদি-মৎ' 'পরং ব্রহ্ম' এই পাঠই সঙ্গত ।

গীতার কোন স্থানেই ব্রহ্মকে জীবাত্মা বলা হয় নাই, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । গীতার নানা স্থলে 'পরং ব্রহ্ম'ই উক্ত হইয়াছে ।

আমরা এ স্থলে, তাহার কয়েকটি উদ্ধৃত করিব ।

ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন, যাহারা ঈশ্বরযোগী, তাহারা তদ্ব্রহ্মকে জানিতে পারেন । তাহাতে অর্জুন প্রশ্ন করেন—'তদ্ব্রহ্ম কি ?' (গীতা, ৮।১) । তাহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম” । (গীতা, ৮।৩)

অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া স্তুতি করিতে করিতে ভগবান্কে বলিয়াছেন,—

“পরং ব্রহ্ম পরং ধাম ।” (গীতা, ১০।১২)

সেই পরমব্রহ্ম অক্ষর অব্যক্ত ভগবানের পরম ধাম ।

“তদ্ধাম পরমং মম ।” (গীতা, ৮।২১)

উপনিষদেও কোথাও ব্রহ্ম যে জীব, তাহা বলা হয় নাই । জীব যে ব্রহ্ম তাহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । ব্রহ্মই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' । সূত্রটি তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কোন সত্তা থাকিতে পারে না । অতএব জীব

পৃথক্ সত্তা নাই । ব্রহ্ম-সত্তাতেই জীবের সত্তা, ব্রহ্ম-জ্ঞানেই জীবের জ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ হইতেই জীবের আনন্দ অনুভূতি । জীবের জ্ঞান ও আনন্দ পরিচ্ছিন্ন । সেই পরিচ্ছেদ দূর করিয়া জীবের ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তির উপদেশ উপনিষদে আছে । জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবাদের এ অর্থ নহে যে, জীবাত্মাই ব্রহ্ম । ব্রহ্ম জীবাত্মা হইলেও জীবাত্মা ব্রহ্ম নহেন । জীবাত্মার জগৎসৃষ্টি উপনিষদে কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই ।

শ্রুতিতে আছে—“সর্বং খলিদং ব্রহ্ম ।” (বৃহদারণ্যক উপঃ ৩।১৪।১) । তাঁহা হইতেই এ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয় ; তিনিই সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন ।

তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ধারণ করেন, তাহাকে শাসন করেন । তাঁহাতে ভূত সকল প্রতিষ্ঠিত । (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৫।৫।১ ; ৪।৮।৯ দ্রষ্টব্য) । শঙ্কর জীব-ব্রহ্মে অভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু জীব যে জগৎ-স্রষ্টা হইতে পারে না, তাহা স্বীকার করিয়াছেন । বেদান্ত-দর্শনেও তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব ব্রহ্ম জীবাত্মা নহেন । ‘অহং ব্রহ্মস্মি’—এই মহাবাক্যের অর্থ ‘আমি ব্রহ্ম’ এরূপ নহে । ইহার অর্থ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আমার স্বতন্ত্র সত্তা নাই । তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র ভাব—পরিচ্ছিন্ন ভাব আমার অজ্ঞান বা ভ্রম মাত্র । যদি ‘আমি ব্রহ্ম’ ইহার অর্থ এইরূপ হইত যে, ‘একা আমি আছি, আর কিছু নাই—আমিই ব্রহ্ম, আমি জ্ঞাতা, আমি জ্ঞেয়রূপে সমুদায় জগৎ, আমার জ্ঞানে ব্যক্ত ও বিধৃত’, তাহা হইলে কণিক বিজ্ঞানবাদ Subjective বা Individual Idealism বা Egoism আসিয়া পড়িত । উপনিষদে কোথাও সে উপদেশ নাই । অতএব ব্রহ্ম অর্থে এ স্থলে জীবাত্মা হইতে পারে না । ব্রহ্ম—পরম ব্রহ্ম নিক্রপাধিক নির্কিশেষ পরম তত্ত্ব । সেই ব্রহ্ম সত্ত্ব ও নিঃসত্ত্ব ভাবে দ্বিবিধ । ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । যিনি পরম ব্রহ্ম, তিনি নির্কিশেষ, অবাঙ্ মনসগোচর, অচিন্ত্য, ও এক অর্থে অজ্ঞেয়, তিনি

প্রপঞ্চোপশম,—তাঁহাকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না । এই শ্লোকে সেই নির্কিশেষ ব্রহ্মই নির্দিষ্ট হইয়াছেন । আর সগুণ ব্রহ্ম বাহা, যিনি পরমেশ্বর বিশ্বরূপ সর্বভূতাস্বর্যামী সকলের নিয়ন্তা পরম পুরুষ, তাঁহার তত্ত্ব পরে ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । এই সগুণ ব্রহ্ম ও নিগুণ ব্রহ্ম উভয়ই জ্ঞেয় । কিন্তু এ উক্তয় ভাবাতীত পরম ব্রহ্ম অবাচ্য, অনির্দেশ্য, অজ্ঞেয় । সগুণ ব্রহ্মরূপে, পরমাত্মা পরমেশ্বররূপেই তিনি জ্ঞেয় হন । বেদান্তদর্শনে ; ও তাহার শাকরভাষা এই সকল তত্ত্ব বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে । জীব-ব্রহ্ম এক হইলেও জীব যে সগুণ ব্রহ্ম নহে, জীব-যে অগৎ-স্রষ্টা নহে, তাহা বেদান্ত-দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের কয়েকটি সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে । এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিম্নরোজন ।

এ স্থলে একটি কথা মনে হয় । চিত্তের বা বুদ্ধির অমানিহাদি জ্ঞানভাব স্থায়ী হইলে, তাহাতে যে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞেয় হয়, তাহা ভগবান্ এ স্থলে প্রকৃষ্টরূপে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন । সে ব্রহ্মতত্ত্ব যে কি, তাহা গীতায় এই কয় শ্লোকের বিবরণ হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যাইবে, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায় । কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণের বিভিন্ন বাদ অনুসারে ব্যাখ্যা হইতে আমাদের এই গীতোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিবার বিশেষ বাধা হয় । যাহারা কোন মতের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা এ স্থলে অবশ্য শব্দের অর্থই গ্রাহ্য করিবেন । সেই অর্থই উপনিষদ ও বেদান্ত-সম্মত । আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি ।

রামানুজ বিশিষ্টাষ্টৈতবাদী ; তিনি ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের এই তিন ভাব স্বীকার করেন । তাঁহার মতে চিৎ-স্বরূপ সগুণ ঈশ্বরই পরম ব্রহ্ম । জীব ও অড়ময় জগৎ তাঁহার শরীর-রূপে তাঁহা হইতে অভিন্ন । বিশেষতঃ জীব চিদচিৎস্বরূপে, চিদংশে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন । রামানুজ নিগুণ অক্ষর ব্রহ্ম স্বীকার করেন না । এ স্থলে যে অনাদি অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাঁহাকে সে অল্প তিনি জীবাত্মা

বলিয়াই বুঝিয়াছেন । কিন্তু এ অর্থে তাঁহার বিশিষ্টাধৈতবাদ স্থাপিত হয় না । এ অর্থে ব্রহ্ম ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হন । এ শ্লোকে জীবাত্মা ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও পরের কয় শ্লোকে পরমেশ্বর ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে,—এ অর্থ করিলেও, তাঁহার মতের সামঞ্জস্য হয় না । বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কথা স্মরণ । তাঁহাদের মতে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব । তিনি ব্রহ্মেরও পর, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব । ব্রহ্ম অর্থে আত্মা বা জীবাত্মা । উপনিষদ হইতে তাঁহারা ব্রহ্মের এই অর্থই গ্রহণ করেন । মুক্ত জীবই স্বরূপতঃ, ব্রহ্ম—নির্গুণ অক্ষর কূটস্থ তত্ত্ব । মুক্ত না হইলে, জীব এই ব্রহ্মতাব লাভ করিতে পারে না । এই মুক্ত জীবের পরম ধ্যেয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ । এজন্য ভগবান্ ব্রহ্মকে ‘মৎপর’ বলিয়াছেন । কিন্তু ইহাদের মতে জীব বহু । সুতরাং ব্রহ্মও বহু ; অতএব ইহাতে বহু ব্রহ্মবাদ আসিয়া পড়ে । এ মতের অন্য দোষ এ স্থলে নির্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই । ভগবান্ই ‘পরম ব্রহ্ম’, ‘পরম ধাম’ না স্বীকার করিলে, বেদান্তের বা গীতার ব্রহ্ম-বাদের কোন সঙ্গত অর্থ হয় না । বরং ব্রহ্মকে মহদ্ব্রহ্ম বা মূল প্রকৃতি বলিলে, ইহা অপেক্ষা সঙ্গত অর্থ হইত ।

যাহা হউক, পুরুষতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব বা ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রতত্ত্ব সমুদায়ই এই পরমব্রহ্ম-তত্ত্বের অন্তর্গত । ব্রহ্মই সর্ব ও সর্বাধীত । ক্রতি বলিয়াছেন, এই এক ব্রহ্ম-বিজ্ঞানেই সর্ববিজ্ঞান লাভ হয়, সমুদায় বিদিত হয় । সেই ব্রহ্ম—কখনও জীবাত্মা হইতে পারেন না । চিত্ত নির্মল জ্ঞানস্বরূপ হইলে, চিত্তে ঈশ্বরে একান্ত অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য স্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনরূপ জ্ঞান হইলে, তবে সে জ্ঞানে এই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন । সে ব্রহ্ম কখন প্রত্যগাত্মা হইতে পারেন না । ঈশ্বরে পরাভক্তি সাধনে সিদ্ধ হইয়া, সেই ভক্তি দ্বারা সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিয়া, সে ভক্তিরূপ জ্ঞান দ্বারা কি জীবাত্মা জ্ঞেয় হন ? অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য স্থিত হইলে কি সে জ্ঞানে সেই আত্মাই জ্ঞেয়

হন ? তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনরূপ জ্ঞান দ্বারা কি এই প্রত্যগাত্মাই জ্ঞেয় হন ? সুতরাং এই জ্ঞান দ্বারা জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা জ্ঞেয়—এই সিদ্ধান্ত কখনও সমীচীন হইতে পারে না । বলিয়াছি ত, যখন উক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞান লাভ দ্বারা সেই জ্ঞাননিষ্ঠা হেতু প্রকৃত অধিকারী হইয়া, সেই জ্ঞানে জ্ঞেয় কি তাহার অনুভব হইয়া, সেই জ্ঞেয় কি তাহার জিজ্ঞাসা উদয় হয়—যখন স্বতঃই “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” হয়, তখন সে জ্ঞানের জ্ঞেয় বা জিজ্ঞাসার বিষয় সেই ব্রহ্ম যিনি—

“জন্মাশ্চ যতঃ।” (বেদান্তদর্শন, ১।২)

বলিয়াছি ত যে ব্রহ্ম হইতে এ বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি নিয়মন বিধারণ ও লয় হয়, তিনি জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা হইতে পারেন না । তিনি জগৎ-কারণ ব্রহ্ম । তিনিই নির্বিশেষ পরম ব্রহ্ম, নিগুণ ও সগুণ ব্রহ্ম । গীতার এই শ্লোকে ও পরের শ্লোকে সেই ব্রহ্মতত্ত্বেরই মীমাংসা হইয়াছে ।

যাহা হউক, বিভিন্ন মতবাদের জন্ত আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারি না । বাস্তবিক চিন্তা শুদ্ধ সাংখ্যিক নিষ্ফল না হইলে, বুদ্ধি অমানিত্বাদি জ্ঞানভাবে স্থিত না হইলে এবং ধ্যানযোগে সিদ্ধি না হইলে, কখনই ঐ জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানে প্রতিষ্ঠাত হইতে পারে না । ততদিন এই বাদবিবাদই থাকিয়া যায় ।

নহে বাচ্য সৎ বা অসৎ—(ন সৎ তন্নাসচ্চ্যতে)।—অর্থাৎ তৎ ব্রহ্মকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না । এ সম্বন্ধেও অধৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য, গিরি ও মধুসূদন একরূপ অর্থ করেন, এবং রামানুজ-প্রমুখ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ ভিন্ন অর্থ করেন । শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজের অর্থ এস্থলে বিস্তারিত ও বিবৃত হইল ।

শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা এইরূপ,—

“এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্মকে যদি ‘সৎ’, ইহা বলিতে পারা না যায়, এবং ‘অসৎ’ ইহাও বলিতে পারা না যায়, তবে ব্রহ্ম ‘জ্ঞেয়’,

হইবেন কিরূপে,—উপনিষদে তাহা বিবৃত হইয়াছে । সকল উপনিষদেই ষধনই পরব্রহ্মের নির্দেশ করা হইয়াছে, তখনই ‘তাহা স্থূল নহে, তাহা অণু নহে’—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সকল প্রকার উপাধির নিষেধমুখে ‘নেতি নেতি’ বাক্যে তাহার স্বরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে । * ইহা তাহা নহে— অর্থাৎ বাচ্যবস্তুসমূহের নিষেধ দ্বারাই তাহা বুঝান সম্ভব । কারণ, সাক্ষাৎ-ভাবে কোন বাক্য দ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করা যায় না । এ ক্ষণ্ত তাঁহাকে ‘সৎ’ বা ‘অসৎ’ ইহাও বলা যায় না । শ্রুতিতেই আছে—

“ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলম্ ।” (ষ্ঠোতাশ্বতর ৪।১৮)

আশঙ্কা হইতে পারে, যে বস্তুকে ‘সৎ’ বলা যায় না, যাহা ‘অস্তি’ এই শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না, সেরূপ কোন বস্তু থাকিতেই পারে না । যদি ‘অস্তি’ শব্দ দ্বারা সেই ‘ক্ষেয়’ নির্দিষ্ট না হয়, তবে বলিতে হইবে যে, তাহা

* শব্দর যে শ্রুতিগুলির ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল । নিগূর্ণ ব্রহ্ম “নেতি নেতি” এই নিষেধমুখেই নির্দেশ । ব্রহ্ম ইহা বা এই প্রকার, এরূপ বলিতে পারা যায় না । তিনি অবাঙ্মনসগোচর । শ্রুতি যথা—

“স এষ নেতি নেতি আস্মা ।”—(বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২)

“অথাত আদেশো নেতি নেতি, ন হেতস্যা অস্মাৎ অন্তঃ পরম্ অস্তি ।”

(বৃহদারণ্যক, ২।৩।৬) ।

“অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্ ।” (বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৯ কঠ, ৩।১৫) ।

“বস্তুৎ অদ্রেশুম্ অগ্রাহম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃশ্রোত্রম্, তদপাণিপদম্ ।”

(যুগুৎ, ১।৬) ।

“অকারম্, অত্রণম্, অস্নাবিষয়ং, অপাপবিদ্ধম্ ।” (ঈশ উপনিষদ, ৮) ।

“তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—অস্থূলম্ অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্, অলোহিতম্, অশ্বেহম্, অচ্ছায়ম্, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশম্, অসঙ্গম্, অরসম্, অগন্ধম্, অচক্ষুবম্, অশ্রোত্রম্, অবাক্, অমনো, অতেজস্বম্, অপ্রাণম্, অস্থম্, অমাত্রম্, অনস্তরম্, অবাহম্ ।” (বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮) ।

“নাস্তঃ প্রজ্ঞং, ন বহিঃ প্রজ্ঞং, নোত্তরতঃ প্রজ্ঞং, ন প্রজ্ঞানঘনং, ন প্রজ্ঞং, ন অপ্রজ্ঞম্, অদৃষ্টম্, অব্যবহার্যম্, অগ্রাহম্, অলক্ষ্যম্, অচিন্ত্যম্, অবাগদেশম্, একাস্ম্যপ্রত্যয়সারং প্রণকোপশমং, শাস্তং, শিবম্, অদ্বৈতম্ । স আস্মা স বিজ্ঞেরঃ ।” ইত্যাদি শ্রুতিঃ । (যাতুক্য উপঃ ৭) ।

নাই । এ শব্দাও নিরর্থক । যে হেতু, ইহা দ্বারা সেই 'জ্ঞেয়' নাই—এরূপ বলা হয় নাই,—কেবল, তাহা 'নাই' এইরূপ জ্ঞানের বিষয়ও নহে, ইহাই বলা হইয়াছে । অর্থাৎ তাঁহাকে যেমন 'অস্তি' বলা যায় না, সেইরূপ 'নাস্তি'ও বলা যায় না ।

“ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যত প্রকার জ্ঞান আছে, সকল জ্ঞানই হয় 'অস্তি' এই বুদ্ধির সহিত মিলিত, না হয় 'ন অস্তি'—'নাই'—এই বুদ্ধির সহিত মিলিত । অতএব সে জ্ঞেয় 'ব্রহ্ম'—হয় 'অস্তি' এই প্রকার বুদ্ধির সহিত মিলিত যে জ্ঞান, তাহার বিষয় হইবে ; না হয় ত, 'নাস্তি' এই প্রকার বুদ্ধির সহিত মিলিত যে জ্ঞান, তাহার বিষয় হইবে” । কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ জ্ঞান হয় । ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, এ জ্ঞাত ব্রহ্ম এই উভয় প্রকার বুদ্ধির মধ্যে কোন বুদ্ধির বিষয় হইতে পারেন না । এই ব্রহ্মের স্বরূপ যে জ্ঞেয়, তাহা অতীন্দ্রিয় ; সুতরাং একমাত্র বেদরূপ শব্দপ্রমাণ দ্বারা তাহা জ্ঞেয়—তাহা কেবল সেই শব্দ-প্রমাণেরই বিষয় ।* এই জ্ঞাত সে প্রমাণ দ্বারাও ব্রহ্ম ঘটাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞান 'অস্তি' বা 'নাস্তি' এই দুই প্রকার বুদ্ধির মধ্যে কোন একটি বুদ্ধিরও বিষয় হইতে পারেন না । এই জ্ঞাতই বলা হইয়াছে যে, পরব্রহ্মকে সৎও বলা যায় না, বা অসৎও বলা যায় না ।

“ব্রহ্ম যদি সৎও নহেন, এবং অসৎও নহেন, তবে তিনি 'জ্ঞেয়' হন কিরূপে ? এরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় নহেন বটে, কিন্তু ব্রহ্ম অজ্ঞেয়ও নহেন । সেই জ্ঞাত শ্রুতি বলিয়াছেন,

“অজ্ঞাৎ এব তৎ বিদিতাৎ অথ অবিদিতাৎ অধি ।” .(কেন, ৩) ।

“অর্থাৎ তিনি বিদিতও নহেন, অবিদিতও নহেন । ইহা বিরুদ্ধার্থ শ্রুতি

* এই নির্বিশেষ নিরূপাধিক অনির্বাচ্য পরম ব্রহ্মই; 'নেতি নেতি' এই নিষেধমুখে নির্দেশ । তাই তাঁহাকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না ।

নহে । অতএব ব্রহ্ম 'সৎ'ও নহেন, 'অসৎ'ও নহেন, 'সৎ' বা 'অসৎ'—
কোন বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম বাচ্য হন না । এ সম্বন্ধে অশ্রু শ্রুতি যথা—

“নৈব বাচা, ন মনসা, প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুশা ।” (কঠ, ৬।১২) ।

“ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাক্ গচ্ছতি, ন মনো

ন বিদ্যো ন বিজানীমো যথৈতদমুশিষ্যাৎ ।” (কেন, ৩) ।

“শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, যে বলে তাঁহাকে জানিয়াছি, সে তাঁহাকে
জানে না, বরং যে বলে যে তাঁহাকে জানি না, সে তাঁহাকে জানে,—

“যস্মামতং তস্ত মতং মতং যশ্চ ন বেদ সঃ ।

অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং, বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্ ॥ (কেন, ১১) ।

“শ্রুতিতে আরও উক্ত হইয়াছে যে, তিনি বিদিত ও অবিদিত সকল
বস্তু হইতে বিভিন্ন,—

“অন্যদেব অবিদিতাদধো অবিদিতাদধি ।” (কেন, ৩) ।

শ্রুতিতে আরও উক্ত হইয়াছে,—

“বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ ।” (বৃহদারণ্যক ২।৪।১৫) ।

“যেনেদং সক্ষং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ ।”

(বৃহদারণ্যক, ২।৪।১৫, ৪।৫।১৫) ।

“অথচ ব্রহ্ম বা আত্মাই একমাত্র জ্ঞেয় । তিনিই একমাত্র জিজ্ঞাসার
বিষয় । “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, (বেদান্ত-দর্শন, ১।১।১) । “তদ্ বিজিজ্ঞা-
নম্ব তদ্ ব্রহ্ম ।” (তৈত্তিরীয় ৩।১।১:) । অর্থাৎ এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-
লয়ের কারণ যে ব্রহ্ম—তিনিই জ্ঞেয় বা জিজ্ঞাসার বিষয় । সেই ব্রহ্মই
আত্মা । “স আত্মা তদ্বিজ্ঞেয়ম্ ।” ইহাই শ্রুতি । অতএব যিনি শিব শাস্ত্র
অদ্বৈত তুরীয় আত্মা বা ব্রহ্ম—তিনিই জ্ঞাতব্য । এইরূপে শ্রুতি ব্রহ্মকে
অজ্ঞেয় ও বিজ্ঞেয় উভয়ই বলিয়াছেন । তিনি যে জ্ঞেয়, তাহাও শ্রুতি
বিশেষভাবে বলিয়াছেন ।

‘সৎ’ বা ‘অসৎ’ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা যে পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশিত

হইতে পারে না, এই প্রকার সিদ্ধান্ত যুক্তিবদ্ধ । অর্থবোধ করাইবার জন্ম প্রযুক্ত সকল শব্দই শ্রোতৃগণ শ্রবণ করিয়াই ‘জ্ঞাতি’ ‘গুণ’ ‘ক্রিয়া’ ও ‘সদক’—এই কয়টির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন-শক্তি জ্ঞানের সাহায্যে অর্থ প্রতিপাদন করাইয়া থাকেন । অতঃ কোন প্রকারে অর্থবোধ হয় না । যেমন, ‘গে’, ‘অশ্ব’—এই সকল শব্দ জ্ঞাতিবিশিষ্ট বস্তুকে বোধ করাইয়া থাকে ; ‘পাক করিতেছে’, ‘পাঠ করিতেছে’—এই প্রকার শব্দ ক্রিয়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বস্তুকে বোধ করায় ; ‘শুক্ল’ বা ‘কৃষ্ণ’—ইত্যাদি শব্দ গুণযুক্ত বস্তুকে বোধ করায় ; ধনী, গোমান্—ইত্যাদি শব্দ সম্বন্ধযুক্ত বস্তুকে বোধ করায় বস্তুকে এরূপ কোন জ্ঞাতি, গুণ প্রভৃতি বাচক শব্দ দ্বারা জানা যায় না । ব্রহ্ম এক, এজন্য ব্রহ্মের কোন জ্ঞাতি নাই ; সুতরাং ইহা ‘সৎ’ প্রভৃতি জ্ঞাতিবাচক শব্দের দ্বারা বাচ্য নহে । ব্রহ্ম গুণবিশিষ্ট নহেন, সুতরাং গুণবাচক শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম বাচ্য নহেন । কারণ, ব্রহ্ম নিগুণ । কোন প্রকার পরিণামাদি ক্রিয়া ব্রহ্মের নাই । সুতরাং কোন ক্রিয়াবাচক শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম নিদ্দিষ্ট হইতে পারেন না । শ্রুতিতে আছে—“ব্রহ্ম নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ও শাস্ত ।” কাহারও সহিত ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ আছে, তাহাও নহে, কারণ, ব্রহ্ম এক, অদ্বয়, অবিষয়, প্রপঞ্চাতীত । সুতরাং কোন সম্বন্ধবাচক শব্দ দ্বারাও ব্রহ্ম নিদ্দিষ্ট হইতে পারেন না । ‘যত্র বাচ্য নিবর্তন্তে’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় ।

রামানুজ অর্থ করেন,—“কার্যাবস্থা—‘সৎ’, আর কারণাবস্থা—‘অসৎ’ । কার্যাবস্থা—দেবাদি নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত অবস্থা—তাহা সৎ । আর অসৎ—অব্যাকৃত কারণাবস্থা । তাহা হইতে নামরূপ সকল ব্যাকৃত হয় । এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—“অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত ইতি” । আর আত্মা (জীবাত্মা) এই কার্যকারণরূপ অবস্থা-হীন । আত্মার সহিত যে কার্য ও কারণাবস্থার অবয়ব, তাহা কৰ্ম্মজন্য, তাহা স্বরূপতঃ নহে ।

“যদি বলা যায় যে, এই সদসৎ শব্দ দ্বারা আত্মস্বরূপ উক্ত হয় নাই, ‘অসৎ’ বা ইদমগ্র আসীৎ’—ইহা দ্বারা কারণাবস্থায়ুক্ত পরব্রহ্মই উক্ত হইয়াছেন, সেই নামরূপ বিভাগের অযোগ্য, সূক্ষ্ম, চিদচিৎ শরীরযুক্ত পরব্রহ্মকেই কারণাবস্থা বলিতে হয় ; আর এই কারণাবস্থায়ও ইহা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ স্বরূপ,—তবে তাহাই ‘অসৎ’ পদ বাচ্য । ক্ষেত্রজের সৎ অবস্থা কশ্চজ্ঞ । তাহা পরিশুদ্ধস্বরূপে সৎ বা অসৎ শব্দ দ্বারা নির্দেশ্য নহে ।”

স্বামী বলেন, “বিধিমুখে প্রমাণের বিষয়ই ‘সৎ’ শব্দ দ্বারা নির্দেশ্য হয়, আর নিষেধ বিষয় ‘অসৎ’ শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট হয় । এই ব্রহ্ম সেই উভয় হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন । তিনি বিষয় নহেন ।”

কেশব বলেন, “এই প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মের স্বরূপ সৎও নহে, অসৎও নহে । ইহাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । কার্যাবস্থায় নামরূপ বিভাগ যোগ্য বস্তুই ‘সৎ’ শব্দের দ্বারা উক্ত হয় । কারণাবস্থায় নামরূপ বিভাগের অযোগ্য বস্তুই ‘অসৎ’ শব্দ দ্বারা উক্ত হয় । প্রত্যগাত্মা এ উভয় অবস্থার অতীত ।”

পূর্বে একাদশ অধ্যায়ের ৩৭শ শ্লোকে ‘সৎ অসৎ’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া স্তুতি করিতে করিতে বলিয়াছেন, “ভ্রমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ ।” অর্থাৎ হে ভগবন ! তুমি অক্ষর, ‘তুমি সৎ’, তুমি অসৎ এবং যাহা সদসৎ হইতে অতীত, তাহাও তুমি । এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’এর অর্থ বিবৃত হইয়াছে । তাহা এ স্থলে দেখিতে হইবে । সে স্থলে শ্রুতি অবলম্বন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ দুইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় । এক অর্থ,—সৎ=যাহা ‘অস্তিত্ব’ বা যাহার ‘অস্তিত্ব’ আছে, আর অসৎ=যাহা নাই—‘নাস্তিত্ব’ বা যাহার অস্তিত্ব নাই—যাহা শূন্য । আর এক অর্থ,—সৎ=যাহার ‘অস্তিত্ব’ প্রতিভাত, যাহা ব্যক্ত (manifest) মূর্ত । আর অসৎ=যাহা অব্যক্ত (unmanifest) অমূর্ত ; যাহার সত্তা প্রতিভাত

বা ইন্দ্রিয়গোচর হয় না । এই অমূর্ত অব্যক্ত অবস্থাকে কারণ, এবং মূর্ত ব্যক্ত অবস্থাকে কার্য্য বলে । প্রথম অর্থ শঙ্কর ও দ্বিতীয় অর্থ রামানুজ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু যে শ্রুতি অবলম্বন করিয়া রামানুজ এই অর্থ করিয়াছেন, তাহার এ অর্থ স্পষ্ট বোধ হয় না । শ্রুতিতে যে ‘সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ’ ও ‘অসদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ’ উক্ত আছে, সে স্থলে ‘অসৎ’ অর্থে অব্যক্ত কারণাবস্থা, এবং ‘সৎ’ অর্থে ব্যক্ত কার্য্যাবস্থা হইতে পারে না । ‘ইদং’ অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যখন ছিল না, তখন কি ছিল,—ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে যে, আদিতে ‘অসৎ’ ছিল, অথবা আদিতে ‘সৎ’ ছিল । এই উভয় মত নির্দেশ করিয়া শ্রুতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সৃষ্টির আদিতে ‘সৎ’ই ছিল । জগতের আদি বা বীজাবস্থা, যাহা কারণাবস্থা, তাহা উক্ত অর্থে ‘অসৎ’ই হয়, তাহা এ অর্থে ‘সৎ’ নহে । সুতরাং জগতের উৎপত্তির পূর্বে তাহার কি অবস্থা ছিল,—এ স্থলে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নাই । এই জগতের অগ্রে, তাহার কারণ বা কার্য্যাবস্থার পূর্বে কি ছিল, তাহাই জিজ্ঞাস্ত । তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব । যাহা হউক, এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, অগ্রে যে অবস্থা ছিল, সে অবস্থা অব্যক্ত, অমূর্ত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর । একত্র তাহা ‘অসৎ’ বা অনভিব্যক্ত । সেই অনভিব্যক্ত বীজাবস্থা হইতে অভিব্যক্তির উন্মুখ অবস্থা—তাহাই সৎ । কেন না, তাহাও অমূর্ত, অব্যক্ত বটে ; কিন্তু তাহা বীজের অঙ্কুরের গায় কতকটা ব্যক্তও বলা যায় । অবশ্য এ অর্থে ‘অসৎ’কে জগতের কারণাবস্থা ও ‘সৎ’কে জগতের প্রথম কার্য্যাবস্থা বা কার্য্যোন্মুখ অবস্থা বলা যায় । কিন্তু তাহা হইলে, সে অবস্থা ‘সৎ’ কি ‘অসৎ’ এ প্রশ্ন হয় না । আদি অবস্থা অবশ্য কারণ অবস্থা । এ অর্থে সে কারণ অবস্থা ‘অসৎ’ই । অথচ সে অবস্থাকে শ্রুতি ‘অসৎ’ বলেন নাই ; বরং ‘সৎ’ই বলিয়াছেন । জগতের আদিম অবস্থা সৎ । কারণাবস্থার এই জগৎ—ব্রহ্মেরই অমূর্তরূপ । এ ব্যক্ত জগৎ এই কার্য্যাবস্থা তাহারই মূর্তরূপ । ‘সর্কং

‘ব্রহ্ম’ । যাহা হউক, এই জগতের অগ্রে যাহা ছিল, তাহা ‘সৎ’ হউক বা অসৎ হউক—তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব । শ্রুতি বলেন—

“ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ ।” (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০)

‘ইহা’ ব্রহ্মের সোপাধিক অবস্থা, জগৎকারণরূপ । সে সঞ্জন অবস্থায় ব্রহ্মকে কারণরূপে ‘অসৎ’ বলা যায় না । তিনি সৎ । পরম ব্রহ্ম এই সৎ বা অসৎ-বাচ্য অবস্থার অতীত । “সদসৎ তৎ পরমং যৎ” ।

অতএব এই ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ বা জগতের কারণরূপ সঞ্জন ব্রহ্মে প্রযোজ্য হইলেও, প্রপঞ্চাভীত নিষ্করণ পরব্রহ্মে প্রযোজ্য হইতে পারে না ।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রহ্ম অর্থে জীবাত্মা বুঝিয়াছেন । সে অর্থে এইরূপ সৎ ও অসতের ব্যাখ্যা কিছুতেই সম্ভব হয় না । আরও আমাদের আত্মার অস্তিত্ব ‘আমি আছি’ এ বোধ নিত্যসিদ্ধ । এই আত্ম-প্রত্যয়ের উপরই পমাণ প্রমের সর্বব্যবহার সিদ্ধ হয় । সুতরাং আত্মাকে ‘সৎ’ বলিতেই হয় । তাহা সৎ নহে বা অসৎও নহে—ইহা কিছুতেই বলা যায় না । এজন্য তাঁহারা সৎ ও অসতের উক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ।

অতএব যাহা ‘আছে’, যাহা ‘অস্তি’ বা-যাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা সৎ । যাহার সম্বন্ধে দ্রব্যগুণ বা কর্ম্যভাব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাহাকে সৎ বলা যায়, ‘সৎ’পদার্থই সম্ভাব্যুক্ত । ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দ্বারাই সে অস্তিত্ব জানা যায় । আর যাহার অস্তিত্ব এইরূপে প্রতিভাত হয় না বলিয়া, যাহার সম্ভা নাই বা অভাব জ্ঞান হয়, যাহাকে নাই বলা যায়—যাহা ‘ন-অস্তি’, বা ‘নাস্তি’—তাহা অসৎ, তাহা অভাবাত্মক । যাহাকে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না,—তাহা অসৎ । এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্ম সৎ নহেন—ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই, আবার ব্রহ্ম অসৎও নহেন, তাহার অস্তিত্ব আছে—এই দুইটি কথা পরস্পর বিরুদ্ধ । ব্রহ্মকে ‘নাই’ বলিব কিরূপে ? তাহা হইলে ত সকলই মিথ্যা হয়,—শূন্যবাদ

আসে। আর ইহার পরের কয়েক শ্লোকে যে জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তাহাও নিরর্থক হয়। ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবস্তু যেক্রপ সৎ বা অসৎ এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, ব্রহ্ম সেক্রপে 'সৎ' বা 'অসৎ' এইরূপ জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহেন। প্রমাণজ্ঞ রুত্তি জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। শঙ্কর ইহাই বুঝাইয়াছেন। আমরা শ্রুতি হইতে এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম 'ন সৎ তৎ ন অসৎ উচ্যতে'। 'উচ্যতে' শব্দের এক অর্থ কথিত হয় বা উক্ত হয়, আর এক অর্থ এইরূপে বাচ্য হয়। প্রথম অর্থ অনুসারে জিজ্ঞাসা হইতে পারে—ব্রহ্ম কাহার দ্বারা 'সৎ নহেন এবং অসৎও নহেন' এইরূপে কথিত হইয়াছেন। ইহার একমাত্র উত্তর হইতে পারে যে, তিনি 'ঋষিভিঃ ছন্দোভিঃ ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ' এরূপ কথিত হন। ঋষিগণ ছন্দে বা বেদে এবং ব্রহ্মসূত্র পদে বা উপনিষদে ব্রহ্ম সৎ বা অসৎ বাচ্য নহেন, এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা এ স্থলে দেখিতে হইবে।

ঋগ্বেদসংহিতার প্রসিদ্ধ 'নাসদাদৌ' সূক্তে (ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত) এই 'সদসৎ' উক্ত হইয়াছে।—

“নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং

নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো যৎ ।

কিমাৱরীবং কুহকস্ত শশ্বন্

অন্তঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্ ॥’

অর্থাৎ এই সৃষ্টি ষখন ছিল না, তখন অসৎও ছিল না, সৎও ছিল না। পৃথিবী ব্যোম কিছুই ছিল না। তখন কোন আবরণ ছিল কি? কোন আধারস্থান ছিল কি? তখন কোন সুখাদির ভোগাদি ছিল কি? তখন তুর্গম গভীর জল (কারণবারি) ছিল কি?

অতএব এ স্থলে ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ কিছুই না থাকিলেও, আর কিছু ছিল কিনা, এ প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে, এবং ইহার উত্তরে উক্ত হইয়াছে,—

‘তম আসৌতমসা গূঢ়মগ্রে

প্রকেতঃ সলিলং সৰ্ব্বমাসৌৎ ।’

এই তমঃ দ্বারা গূঢ় তমঃ ও প্রলয়কালে বিশ্বের ‘অপ্রকেত’ বীজাবস্থা কার্য-কারণরূপে অবিভক্ত অবস্থা ছিল । তাহা তপশ্চার মহিমারই সৃষ্টিকালে বিশ্বরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল । কাহার তপশ্চার অর্থাৎ—কাহার জ্ঞানময় তপ দ্বারা এ বিশ্বের অভিব্যক্তি হইয়াছে ? সে সম্বন্ধে এই সূক্তে উক্ত হইয়াছে,—

‘আনৌদবাতং স্বধমা তদেকং

তস্মাদ্ধ অত্রং ন পরং কিঞ্চন আস ।’

শারণাচার্য্য ইহার অর্থ করেন যে, “এ স্থলে সৃষ্টির প্রাগবস্থা নিরূপিত হইয়াছে । প্রলয় অবস্থায় যাহা জগতের মূল কারণ, তাহা শশবিধাণবৎ ‘অসৎ’ নহে । তাদৃশ অসৎ কারণ হইতে জগতের উৎপত্তি সম্ভব নহে । আর তাহা আশ্রুবৎ সৎ বা ‘সৎ’ শব্দ দ্বারা নির্দার্য্য নহে, অসৎ শব্দ দ্বারাও নির্দার্য্য নহে । তাহা সদসৎ উভয় হইতে বিলক্ষণ ‘এক’ । তাহা হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই ।” অতএব তাহা জগতের কার্য্যাবস্থা বা তাহার কারণাবস্থা—এতদুভয়ের অতীত তত্ত্ব । যখন এ জগৎ থাকে না, এ সৃষ্টি থাকে না, তখন এই ‘এক’—নিরূপাধিক নির্বিশেষ ব্রহ্ম ‘স্বধা’ বা স্বীয় মায়ামুক্তি সহ বিদ্যমান থাকেন । তিনি তমদ্বারা—গূঢ়তম দ্বারা আবৃত থাকেন । জগৎ বীজ তাহাতে নিহিত থাকে । এ অর্থে নিরূপাধিক প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্ম ‘সৎ’ নহেন, ‘অসৎ’ও নহেন । কারণ, তখন ‘সৎ’ বা ‘অসৎ’ ছিল না ।

উপনিষদে এই ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । তবে রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবচার্য্যগণ উপনিষদের

যে মন্ত্ৰের উপর নির্ভর করিয়া এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন, সে মন্ত্ৰ পূর্বে সমুদায় উদ্ধৃত হয় নাই, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র । তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল । তাহা এই—

“সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ । তদৈক্য আছঃ
অসদেব ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ । তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত ইতি ।

কুতস্ত ধনু সোম্য এবং স্মাৎ ইতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়ত ইতি ।
সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।

তদৈক্যত বহু স্মাৎ প্রজায়ের ইতি ।” (ছান্দোগ্য উপঃ, ৬৬-১-৩) ।
আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, ইহা দ্বারা সং-কারণবাদ প্রতিষ্ঠিত এবং অসং-
কারণবাদ নিরাকৃত হইয়াছে । এই জগতের অভিব্যক্তির পূর্বে যাহা ছিল,
তাহা ‘সং’ বা সত্তা । তাহা অসং নহে । যাহারা বলেন, ‘অসং’ অগ্রে
ছিল, এবং অসং হইতে সতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহাদের এ কথা ঠিক
নহে । অসং হইতে কিরূপে সতের উৎপত্তি হইবে ?

এ স্থলে এইরূপে অসংকারণবাদ নিরাকৃত হইয়া সংকারণবাদ স্থাপিত
হইয়াছে । সেই সংকারণই ব্রহ্ম ; এজন্য অন্ততঃ শ্রুতি বলিয়াছেন,—
“ব্রহ্ম এব ইদমগ্র আসীৎ ।”

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে,—

“অসদেব ইদমগ্র আসীৎ । ততো বৈ সদজায়ত ।” (২।৭।১) ।

এ স্থলে শঙ্করও অর্থ করিয়াছেন যে, অসং অর্থে প্রকাশিত-নামরূপবিশেষ
বিপর্যায়িত অবিকৃত ব্রহ্ম । আর সং নামরূপবিশেষ দ্বারা প্রকাশিত
জগৎ । এ অর্থ স্বতন্ত্র । এ শ্লোকে এই অর্থ গ্রাহ্য নহে ।

অতএব এ স্থলে ‘সং’ অর্থে জগতের কার্যাবস্থা ও ‘অসং’ অর্থে তাহার
কারণাবস্থা হইতে পারে না । এ অর্থে ব্রহ্ম সং বা অসং শব্দ বাচ্য নহেন,
ইহা বলা যায় না । ইহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে ।

যাহা হউক, এইরূপ শ্রুতি-প্রমাণ হইতে বলা যায়, ঋষিগণ দ্বারা

বিবিধ ছন্দে ও ব্রহ্মসূত্রপদে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন । অতএব 'উচ্যতে' অর্থ - শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে । বাস্তবিক আমরা শ্রুতি হইতে জানিতে পারি যে, 'সৎ' বা জগতের কার্য্যাবস্থা এবং 'অসৎ' বা জগতের কারণাবস্থা—এ উভয়ের অতীত সেই (তৎ) 'এক' তত্ত্ব—“স্বধমা তদেকম্” । তাহা অসৎ, অভাব বা শূন্য নহে । কিন্তু সেই 'এক' সঞ্জ্ঞা ... স্বশক্তি মায়াযুক্ত ও জগদ্বীজ তমঃ দ্বারা আবৃত । তাহা দ্বারা নিগূর্ণ নিরূপাধিক ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন না । শঙ্করের মতে সেই নিগূর্ণ নিরূপাধিক নির্বিশেষ প্রপঞ্চোপশম পরম ব্রহ্মই সৎ (অস্তি) বা অসৎ (নাস্তি) বাচ্য নহে । এখানে সৎ অর্থে জগতের কার্য্যাবস্থা ও অসৎ অর্থে কারণাবস্থা হয় না ।

এইজন্য শঙ্করের মতে এই শ্লোকে 'ন উচ্যতে' অর্থ বাচ্য নহে । ব্রহ্মকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না । ব্রহ্ম 'সৎ' বহেন, কিন্তু 'সৎ' শব্দ দ্বারা বাচ্য নহেন । শব্দার্থ বা শব্দ দ্বারা বুদ্ধিগ্রাহ্য যে বিষয়, তাহা ব্রহ্ম নহেন । কেননা, ব্রহ্ম 'অবাঙ্মনসগোচর' । কোন বাচ্য দ্বারা তাঁহাকে ব্যক্ত বা পরিচ্ছিন্ন করা যায় না । ইহাই শ্রুতির উপদেশ । ইহা দ্বারা সমস্ত বাক্যার্থ হইতে ব্রহ্মকে ভিন্ন করা হইয়াছে । বলিতে পারা যায় যে, শব্দও অনেক আছে,—বাক্যার্থও অনেক আছে । তাহার মধ্যে কেবল 'সৎ' ও 'অসৎ' এই দুই শব্দ কেন এ স্থলে ব্যবহৃত হইল ? ইহার উত্তর এই যে,—যত কিছু বাক্যের বিষয় আছে, তাহা 'সৎ' বা 'অসৎ' এই দুই ভাগে বিভক্ত । তাহা 'আছে' অথবা 'নাই' । ইহার অতিরিক্ত আর কোন শব্দার্থ থাকিতে পারে না । বৈশেষিক দর্শন মতে 'সৎ' বা সত্ত্বাই পরা জ্ঞাতি—বা পর সামান্য । * অতএব 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দ দ্বারা সমূদায় বাক্যার্থ বা বাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত বিষয় উক্ত

* "ভাবোহনুবৃত্তেরেব হেতুর্ভাৎ সামান্যমেব ।"—বৈশেষিক দর্শন, ২।২।৪

হইয়া থাকে । ব্রহ্ম তাহার কোন বিষয় নহে । এজ্ঞ তিনি সৎ বা অসৎ শব্দ দ্বারা বাচ্য নহেন ।

আরও এক কথা শঙ্কর বলিয়াছেন ;—জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ দ্বারাই বা ক্যার্থ প্রতিপাদিত হয় । ব্রহ্ম এক বলিয়া কোন জাতিবাচক শব্দ দ্বারা তিনি প্রকাশ্য নহেন । তিনি নিগুণ নিষ্ক্রিয়—এজ্ঞ কোন গুণ বা ক্রিয়াবাচক শব্দ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না । তাহার পর সম্বন্ধের কথা । ইহা আমাদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে । ব্রহ্ম যদি একেবারে সম্বন্ধ-বিরহিত হন, তবে কোন সম্বন্ধ-বাচক শব্দই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না । প্রপঞ্চাতীত (Transcendent) ব্রহ্মই সকল সম্বন্ধ-বিহীন, তিনি নিরূপাধি, নির্বিশেষ । ‘নেতি নেতি’ শব্দের দ্বারা তিনি উদ্দিষ্ট হইতে পারেন মাত্র । কিন্তু সগুণ ভাবে ব্রহ্ম সম্বন্ধবিহীন নহেন । এই সগুণ (Immanent) ভাব হেতুই ব্রহ্ম জ্ঞেয়, আর সেই সগুণ ভাব হইতেই কেবল তাঁহার পরম অক্ষর স্বরূপের আভাস পাওয়া যায় । এই সম্বন্ধ হেতুই ব্রহ্ম জগৎকারণ, জগতের ঈশ্বর । সেইরূপ আমার সহিত সম্বন্ধ হেতু তিনি আমার আত্মার আত্মস্বরূপে জ্ঞেয় । ব্রহ্ম আমার আত্মার পরমাত্মা । এইরূপে আমার আত্মার সহিত এবং জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতেই ব্রহ্মকে ধারণা করা যায় । তবে জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ জানা যায় না, তাহা পরে উল্লিখিত হইয়াছে । আত্মার সহিত সম্বন্ধ হইতেই তাঁহার স্বরূপ জ্ঞেয় । যাহা হউক, জগতের সহিত সম্বন্ধ হেতু ব্রহ্ম সগুণ, সোপাধিক । শঙ্করাচার্য্য সেই সগুণ রূপকে পারমার্থিক সত্য বলেন না । কিন্তু তাহা পারমার্থিক ভাবে সত্য না হইলে, কোন সম্বন্ধবাচক শব্দ দ্বারা বা কোনরূপে তাঁহাকে ধারণা করা যাইত না । তাহা হইলে তাঁহার ‘সত্য’ বা অসত্য কিছুই জানা যাইত না । তাহা হইলে শূন্যবাদ খণ্ডন করা যাইত না । মূলে যে বিরোধ

(জর্মান্ দার্শনিক ক্যাণ্টের কথায়—যে Antinomy) তাহা থাকিয়া যাইত, তাহার সিদ্ধান্ত হইত না। সুতরাং সঞ্জন সোপাধিক ভাবে জগতের সচিহ্ন সম্বন্ধ হইতে জগতের মূল কারণরূপে তিনি জ্ঞেয়। জগতের সংকারণরূপে তিনি 'সৎ'। কিন্তু নির্বিশেষ নিক্রপাধিক নিস্প্রপঞ্চ-ভাবে, সর্বসম্বন্ধ-বিরহিতরূপে পরম ব্রহ্ম অবাচ্য অস্তিত্য অজ্ঞেয়। অতএব 'সৎ' বা 'অসৎ' এই বাক্য দ্বারা নিক্রপাধিক নির্বিশেষব্রহ্ম বাচ্য নহেন। তিনি সকল সম্বন্ধ-বিরহিত সত্য। কিন্তু সঞ্জনভাবে, এই সম্বন্ধ হইতেই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন। *

* এই সদসৎ সম্বন্ধে বিখ্যাত জর্মান্ দার্শনিক পণ্ডিত Paul Deussen তাঁহার Philosophy of the Upanishads নামক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

As early as Rigveda X. 129.1 * * * it is said of primeval condition of things, the primeval substance, therefore of Brahman in the later sense, that at that time there was *na asad na u sad*. 'neither not-being nor yet being'. Not the former, for a non-being neither is nor has been. not the latter, because empirical reality, and with it the abstract idea of "being" derived from it, must be denied of the primeval substance. Since however metaphysics has to borrow all its ideas and expressions from the reality of experience, to which the circle of our conceptions is limited, and to remodel them solely in conformity with its needs, it is natural that in process of time we should find the first principle of things defined now as the (non empirical being) : now as the (empirical) not-being. The latter already occurred in the two myths of creation :—

The universe in truth in the beginning was not-being (Sata p. Br. 6.2.1.3.). and "This universe in truth in the beginning was nothing at all.....(Taitt. Br. 2.7.1). Similarly in some passages of the Upanishad :—"This universe was in the beginning not-being : this (not-being) was being. It arose, (Chhand. 3.19.1). And in Taitt 2.7—
Not-being was this in the beginning.
From it being arose.....

ব্রহ্ম কিরূপে জেয়—নির্কিশেষ নিক্রপাধি (Transcendental) পরম ব্রহ্ম আমাদের জেয় হয় না, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার সগুণ নিগুণ ভাব আমাদের ধারণা হইলে সেই সকল ভাবের অতীত সৰ্ব্ব ভাবের অতীত 'ওঁ' আমরা ইন্দ্ৰিতে 'নেতি নেতি' দ্বারা নির্দেশ করিতে পারি মাত্র। তাহা অবাচ্য হইলেও এইরূপে নির্দেশ

(Then) it is further explained how Brahman created the universeafter he had created it he entered into it ; after he had entered into it, he was :

“The being and the beyond (*sat* and *tyat*)
Expressible and inexpressible,
Founded and foundationless,
Consciousness and unconsciousness,
Reality and unreality.

As reality he became everything that existed : for this men call reality (*tat satyam iti achakshate*)’.

A similar distinction is drawn as early as Brih. 2.3.1.,—“In truth there are two forms of Brahman, that is to say :—

‘The formed and the unformed
The mortal and the immortal
The abiding and the fleeting
The being and the beyond’.

This passage...gives an impression of greater age...and develops the thought further by more clearly contrasting Brahman as the beyond, inexpressible foundationless, unconscious, unreal, with the ‘universe as the being, expressible, founded, conscious, real.

At the same time, this decides the question...whether the universe originated from the being or not-being, at which question the passage, Chhand. 6.2.1 glance :—

“Being only, my good sir, this was in the beginning, one only without a second : from this not-being being was born. Both how my good sir, could this be so ? How can being be born from not-being ? Being therefore rather, my good sir, this was in the be-

হইয়া, তাহা জ্ঞেয় হয় । আর যাহা সঙ্গুণ ব্রহ্মভাব, তাহা জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে ‘সর্বং খল্বিদঃ’ রূপে আমাদের জ্ঞেয় হইতে পারেন । আর যাহা ব্রহ্মের অক্ষর কূটস্থ অব্যক্ত ধ্রুব, তাহা আমাদের অধ্যাত্মজ্ঞানে আমার আত্মরূপে জ্ঞেয় হয় । ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’, ‘সোহহং’ এই মহাবাক্যের অর্থ দ্বারা আমাদের নির্মূল জ্ঞানে তাহা জ্ঞেয় হয় । এইরূপে এই জগতের ও আমার সহিত সম্বন্ধ হইতে, ব্রহ্ম আমাদের নির্মূল অমানিহাদি জ্ঞান-রূপ চিন্তে জ্ঞেয়রূপে অভিব্যক্ত হন ।

এই সম্বন্ধ হইতে কিরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন ? কিরূপে তাঁহাকে নির্মূল জ্ঞানে জানা যায়, ইহা আরও বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে । আমাদের

ginning, one only and in that a second". In harmony with the position thus taken...Brahman is usually named *sat* "being" or 'satyam' reality (in its empirical sense).

* * * *

For the later Upanishads the question whether Braman is (non-empirical) being, or (empirical) non being has no farther significance. These, like all other pairs of opposites, are transcended by Brahman, "He neither being, nor non-being (1) higher than that which is, and that which is not (2); "he comprehends in himself empirical reality, the realm of ignorance, and eternal reality, the kingdom of knowlege" (3).

Philosophy of the Upanishads p. 128-31

- (1) 'ন সন্ ন চ অসন্ শিব এব কেবলঃ
তদক্ষরং...।' (বেতাখতর, ৪।১৮)
- (2) 'যৎ সদসৎ বরোণাৎ, বরিষ্ঠং, প্রজ্ঞানাম্ বিজ্ঞানাৎ পরম্ ।'
(মুণ্ডক, ২।২।১) ।
- (3) 'যে অক্ষরে ব্রহ্ম পরে তনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গুঢ়ে ।
করত্ববিদ্যাভ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যত্র সোহহং ।'
(বেতাখতর, ৪।১) ।

‘আত্মার বোধের সহিত আত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ সম্বন্ধ অনুভব হইতে আত্ম-জ্ঞানের সহিত ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয় । ‘আমি’ আছি—আমাদের এ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ । সামান্য ভাবে এই আত্মজ্ঞান ‘প্রাণবোধ-বিদিত’ (কেন, ১২) এই আত্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়াই আমার আমিত্ব ও সত্তা স্বতঃসিদ্ধ হয় । আমি কে—তাহা আমি বিশেষ ভাবে জানি না বটে, কিন্তু আমি যে আছি—তাহা জানি । এই আত্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়াই আমার আমিত্ব ও সত্তা স্বতঃসিদ্ধ হয়, এই আত্মজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত জগৎ আমার জ্ঞেয় হয় । এই আত্মজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই আত্মস্বরূপে ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয় হন । সেই আত্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্ম আছেন, ইহা সিদ্ধ হয় । কেবল আমি আছি—সামান্যভাবে এই আত্মজ্ঞান দ্বারা আত্মার প্রকৃতস্বরূপ জানা যায় না—আমি কে, তাহার প্রকৃত পরিচয় হয় না । এই জগৎ আত্মা কিরূপ, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, এবং দেহাত্মবাদ প্রভৃতি নানা বাদ উপস্থাপিত হইয়াছে । (গীতা, ৬৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । আত্মস্বরূপ না জানিলে ব্রহ্মস্বরূপও জানা যায় না । আমি আছি—এই জ্ঞানের সহিত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আছেন, এই মাত্র জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ সত্য, কিন্তু বুদ্ধি নিম্নল না হইলে আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ জানা যায় না, ও আত্মা ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মতভেদ উপস্থিত হয় । যাহার আত্মজ্ঞান যেরূপ, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার ধারণাও সেইরূপ হয় । পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধি যখন সাধনাবলে নিম্নল হয়, তাহার সকল মলা, তাহার অজ্ঞানজ তমঃ দূর হয়, তখন তাহাতে আত্মজ্যোতিঃ প্রকাশিত হয় । আত্মস্বরূপের প্রতিবিম্ব-যুক্ত সেই নিম্নল বুদ্ধিকেই জ্ঞান বলে, তাহা ‘বোধলক্ষণা’বুদ্ধি (ইতি শ্রীচণ্ডী) । সেই জ্ঞানেই আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে ‘জ্ঞেয়’ রূপেই ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান বিকাশিত হয় । ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান লাভের আর অন্য উপায় নাই । সেই জ্ঞান লাভ হইলেই—জাতরূপে আমার মধ্যেও

জ্ঞেয়রূপে এই জগতের অন্তরালে ব্রহ্ম-দর্শন হয় । জগৎ বা এই Phenomenal world সেই জ্ঞানে যতই লীন হইতে থাকে, 'ব্রহ্ম-জ্ঞান, ততই উজ্জলরূপে প্রকাশিত হয় । ভগবান্‌ও এ স্থলে এই জ্ঞানের ও এই জ্ঞানে জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলিয়াছেন । সে জ্ঞান সদসদাস্থক বস্তুজ্ঞান নচে । ব্রহ্মই সে জ্ঞানের সংকল্প—সে জ্ঞানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় একীভূত, অহং ইদং একীভূত । সে জ্ঞানে দ্রষ্টা-দৃষ্ট ভোক্তা-ভোগ্য সর্বদ্বৈত একীভূত 'অবৈতীভূত' হয় । সে জ্ঞান অদ্বয়ব্রহ্মজ্ঞান । সেই জ্ঞানে জ্ঞেয় ব্রহ্ম 'সৎ' বা 'অসৎ' এইরূপ বাক্যার্থ দ্বারা প্রকাশিত হন না । তাঁহাকে 'Being' বা 'Naught' কিছুই বলা যায় না । তাঁহাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কোন স্থানবাচক শব্দদ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করা যায় না । সেইরূপ ক্ষণ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি কোন কালবাচক শব্দদ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করা যায় না । পরম ব্রহ্ম স্থান-কালের অতীত, স্থান-কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন । তাঁহাকে কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারাও নির্দেশ করা যায় না । কেন না, তিনি 'নিমিত্তের' বা 'কার্যকারণ' সম্বন্ধের (Causation এর) অতীত,—তাহার দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন । শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তিনি জ্ঞাতার জ্ঞাতা । এজন্য এ পরমাত্মরূপে আত্মজ্ঞানে তাঁহাকে একরস, নিষ্কল, ক্রব, নিন্দ্য, নিগুণ, অবিক্রিয় ভাবেই ধারণা হয়, এবং সচ্চিদানন্দময়-স্বরূপেও তাঁহাকে অনুভূত হয় ।

পরম ব্রহ্ম যে জ্ঞেয় হন, তাহা বলা যায় না । তাঁহার সগুণভাব এই বিশ্বরূপ বিশ্বকারণরূপ ও বিশ্বনিরন্তরূপ ভাব যেমন সবিশেষ সোপাধিক, তাঁহার এই আত্মাতে অনুভূত নিগুণ ভাবও সোপাধিক সবিশেষ । তাঁহাকে আমরা কৃষ্ণ অব্যয় অক্ষর নিগুণ শাস্ত শিব ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা সবিশেষভাবেই জানিতে পারি । ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়া যে শ্রুতি তাঁহাকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেও ব্রহ্মের পরম স্বরূপ জানা যায় না । পরম ব্রহ্মের বাহা নির্বিশেষ

নিরুপাধিক অপ্রমেয় ভাব, যাহা সঞ্জন নিঞ্জন ভাবের অতীত—সদসদ্-
ভাবের অতীত সেই পরম ভাব জানা যায় না। অতএব বলিতে হয়
যে, পরম ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞেয় হইয়াও অজ্ঞেয় ।

ব্রহ্ম ‘জ্ঞেয়’ হইয়াও যে ‘অবিজ্ঞেয়’, তাহা শ্রুতি বার বার উপদেশ
করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ব্রহ্ম “অনুদেব
তং বিদিতাং অথ অবিদিতাং অধি” (কেন, ৩)। ধীর যতিগণ তাঁহাকে
‘আত্মস্ব’ অনুদর্শন করেন সত্য (কঠ, ৫:১৩), কিন্তু সে দর্শন কিরূপ,
তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

“তদেতদিতি মনুস্তেহনির্দেশ্যং পরমং সুখম্ ।

কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥”

(কঠ, ৫:১৫)

* এ সম্বন্ধে জার্মান দার্শনিক পণ্ডিত, Paul Deussen¹ তাঁহার কৃত (Philosophy
of the Upanishads) গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল :—

“.....in his essential nature Brahman is and remains unknow-
able. Neither as the (metaphysical) being (*sat*), nor as the know-
ing subject within us (*chit*), nor as the bliss (*ananda*) that holds us
in deep sleep when the opposition of subject and object is destroy-
ed, is Brahman accessible to knowledge. No character or action of
Him therefore is possible otherwise than by the denial to Him of
all empirical attributes, definitions and relations—‘*neti neti*’—it is
not thus, it is not so. Specially he is independent, as we have shown,
of all imitations of space, time and cause, which rule all that is
objectively presented, and therefore the entire empirical universe”.

“This exclusion is already implied.....in the thought mainly, of
the essential unity of things : For this unity excludes all plurality,
and therefore a proximity in space, all succession in time, all inter-
dependence as cause and effect, and all opposition as subject
and object”.—Philosophy of Upanishads p. 156.

এ সম্বন্ধে অল্প ঋতি পূর্বে উক্ত হইয়াছে । অতএব পরমব্রহ্ম অবাচ্য, অনির্দেশ্য, অচিন্ত্য, অবিজ্ঞেয় । গীতার পরে উক্ত হইয়াছে—তিনি হৃদ্য হেতু অবিজ্ঞেয় (১৩।১৫) ।

অতএব এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে এই ব্রহ্ম কিরূপে এই জ্ঞানের জ্ঞেয় হন ? শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন যে, যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হন না, এবং যাহা জ্ঞাতা, তাহাও জ্ঞেয় হন না । ঋতি বলিয়াছেন, —‘অরে বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ ।’ অতএব বিজ্ঞাতরূপে তিনি জ্ঞেয় হন না । তাহা হইলে ব্রহ্ম যদি জ্ঞেয় হন, তবে তিনি জ্ঞাতা নহেন, ইহা অসম্ভব বলিতে হইবে । অথচ ঋতি অনুসারে তিনি ‘বিজ্ঞাতা’ । তিনি ব্যতীত আর কেহ বিজ্ঞাতা নাই । তিনি বিজ্ঞাতা বলিয়াই আমরা জ্ঞাতা । তিনি জ্ঞাতার জ্ঞাতা ; অতএব যদি ব্রহ্ম জ্ঞাতাই হন, তবে তিনি ‘জ্ঞেয়’ নহেন । আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ । বিজ্ঞানস্বরূপে তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই হইতে পারেন । মৈত্রায়ণী উপনিষদে (৩।৭) আছে যে, সেই ব্রহ্মে “অদ্বৈতীভূতবিজ্ঞানং...দ্বৈতীভূতম্ ।” গৌড়পাদ কারিকায় আছে—

“অকল্পকমজং বিজ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নম্ ।” (৩।৩১)

এজন্ত ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত হইয়াও বিজ্ঞাত । “বিজ্ঞাতং বিজ্ঞিজ্ঞাস্তম্ অবিজ্ঞাত এত এব” (বৃহদারণ্যক, ১।৫।৮) । যাহা তউক, জীবের পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞানব্রহ্ম জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একীভূত হয় না বটে, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন নিত্য জ্ঞান সম্বন্ধে যে সেই নিয়ম, ইহা বলা যায় না । এই জন্ত ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত হইলেও আমাদের জ্ঞানের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে জানা যায়, তিনি বিজ্ঞাত হন । পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ হইতে নিত্য জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত থাকিয়াও কতক বিজ্ঞাত হন ।

এ স্থলে আমাদের এ জ্ঞানের কথা বুঝিতে হইবে । ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ

কি, তাহা জানিতে পারা যায় না সত্য, কিন্তু আমাদের নির্মল জ্ঞানে ব্রহ্ম
 কিরূপে জ্ঞেয়, তাহাই বুঝিতে হইবে । শঙ্কর পূর্বে বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র-
 জ্ঞেয় নিকট ক্ষেত্র জ্ঞেয় । আমাদের যে শরীর সম্বন্ধে 'আমি' বা 'আমার'
 বলিয়া অভিমান হয়, সেই শরীরই আমার জ্ঞেয় ক্ষেত্র । শরীরান্তর্গত
 বাহ্য কিছু জানা:যায়—তাহাই ক্ষেত্র । এজন্ত বুদ্ধি, মন প্রভৃতি সকলই
 আমার ক্ষেত্র । আমি সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা । সেইরূপ যিনি সমষ্টিভাবে সর্ব-
 ক্ষেত্রাভিমানী জ্ঞাতা, যিনি সর্বক্ষেত্রকে আমার বলিয়া জানেন, তিনিই
 হিরণ্যগর্ভ পরমেশ্বর । এ জগৎ তাঁহার বিরাট শরীর । এজন্ত সেই ঈশ্বর
 সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ । এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জন্তই শঙ্কর বলিয়াছেন যে,
 বাহ্য জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা নহে, আর বাহ্য জ্ঞাতা, তাহা জ্ঞেয় নহে । সে
 স্থলে এ কথা উক্ত হয় নাই যে, এই শরীর ব্যতীত আর কিছু জ্ঞেয় নাই :
 যেমন শরীর আমাদের জ্ঞেয়, সেইরূপ বাহ্য জগৎও জ্ঞেয় । শরীর সেই
 জগতের অংশ । তবে যে শরীরে 'আমি আমার' অভিমান হয়, তাহাকে
 জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়াই আমি সেই আমার শরীরকে ক্ষেত্র
 বলি । তাহা বিশেষভাবে আমার জ্ঞেয় । পূর্বে বলিয়াছি যে, আমার
 শরীর অপরোক্ষভাবে আমার জ্ঞেয়-ক্ষেত্র, আর তাহার বাহ্য বাহ্য কিছু
 তাহা পরোক্ষ ভাবে আমার জ্ঞেয়—এই প্রভেদ ।

এই আমার শরীর ও আমার এই বাহ্য জগৎ যে ভাবে আমার নিকট জ্ঞেয়,
 সে ভাবে ব্রহ্ম আমার জ্ঞানে জ্ঞেয় হইতে পারেন না । আমাদের শরীরের
 জ্ঞান আমাদের অনুভূতি-সাপেক্ষ, আর জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান 'প্রত্যক্ষাদি
 প্রমাণজ । ব্রহ্মজ্ঞান সেরূপ অনুভূতি বা প্রমাণজ নহে । ব্রহ্ম অপ্রমের ।
 ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান । বলিয়াছি'ত, তাহা স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় মাত্র । জ্ঞাতার
 বাহ্য জগৎও শরীর যেরূপ জ্ঞেয়, জ্ঞাতা সেরূপ জ্ঞেয় না হইয়াও যেরূপে
 সে আপনাকে জানে, সেইরূপেই সে ব্রহ্মকে জানে । সেইরূপে ব্রহ্ম তাহার
 জ্ঞেয় হয় । বুদ্ধি নির্মল হইলে অমানিত্ব প্রভৃতি যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানে

ব্রহ্মস্বরূপ স্বতঃ প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞানেই ব্রহ্ম প্রকৃত জ্ঞেয় হন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ভগবান্ অমুকম্পাপূর্বক বা কৃপা করিয়া, যাহার অজ্ঞানতমঃ দূর করিয়া দিয়া তাহার আত্মভাবস্থ হন, তাহারই ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রকাশিত হয় । গীতা (১৩।১১) ।

আমরা এ তত্ত্ব আরও বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব । আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে; আত্মার প্রতিষ্ঠাহেতু চিন্তে যে, সেই 'জ্ঞ'-স্বরূপ আত্মার জ্ঞানের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাতেই চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ হয় । কিন্তু চিন্তে বা বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত এই জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান মাত্র । সেই বুদ্ধি-বৃত্তির জ্ঞানক্রিয়াকালে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই ভেদ হয় । তখন সে জ্ঞাতা জ্ঞেয়কে জানে । কিন্তু সে 'জ্ঞেয়' জ্ঞানের সহিত 'জ্ঞাতা' আপনাকেও তখন জানে । আমি এইহা জানিতেছি, তখন তাহার এই প্রত্যয় হয় । এই স্থলে জ্ঞানে জ্ঞাতাই 'জ্ঞেয়' হন । এই আত্মজ্ঞানের সহিত, এই একায়প্রত্যয়ের সহিতই ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হন । এইরূপেই ব্রহ্ম নির্মল জ্ঞানে জ্ঞেয় হন । চিত্ত নির্মল না হইলে, যেমন আমরা আত্মস্বরূপ জানিতে পারি না, সেইরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মস্বরূপও জানিতে পারি না ।

এজন্য আমরা বলিতে পারি যে, কেবল নির্মল জ্ঞানস্বরূপ চিন্তেই ব্রহ্ম অমুভূত ও জ্ঞেয় হন । সে জ্ঞেয় স্বাহ্য জ্ঞেয় নহে । সেখানে জ্ঞাতা জ্ঞেয়ে ভেদ নাই ; এজন্য সে স্থলে ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলা যায় । এইরূপে কেবল অমানিত্বাদি জ্ঞানভাবযুক্ত চিন্তেই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন ।

এখন কথা চাইতে পারে যে, বুদ্ধি নির্মল মার্জিত না হইলে, উক্তরূপ অমানিত্বাদি জ্ঞান বিকাশিত না হইলে কি ব্রহ্মকে জানা যায় না ? তাহা নহে । এ জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম বা বুদ্ধির স্বরূপ । চিন্তে আত্মা নিয়তই প্রতিবিম্বিত থাকেন । এজন্য বুদ্ধিতে এ জ্ঞান নিয়তই থাকে । বলিয়াছি ত, চিত্ত নির্মল না হইলে এ জ্ঞান উপযুক্তরূপে প্রকাশিত হয় না । দর্পণের মলিনতা অনুসারে যেমন তাহাতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা মলিন হয়, সেইরূপ

মলিন জ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞানের যে ছায়া পড়ে, তাহাও মলিন হয় । বুদ্ধি যত নিশ্চল হইতে থাকে, জ্ঞান ততই প্রকাশিত হইতে থাকে, (গীতা ৫।১৬); এবং ব্রহ্মতত্ত্ব তাহাতে ততই প্রস্ফুটিত হইতে থাকে । বুদ্ধিকে যখন আর কোন মলা থাকে না, তখনই ব্রহ্মতত্ত্ব তাহাতে আপনিই পূর্ণ প্রকাশিত হয় । তখন তাহার জ্ঞানে যে জ্ঞাতা আত্মা ও জ্ঞেয় জগৎ প্রকাশিত হয়, ইহাদের অস্তরালে উভয়ের মধ্যে সে কেবল সেই ব্রহ্মতত্ত্বই অনুভব করে । সেই অনুভূতিমধ্যে ক্রমে এই জ্ঞেয় জগৎ লীন হইয়া যায় । এইরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন ।

এইরূপ ব্রহ্ম 'জ্ঞেয়' । জ্ঞানে ব্রহ্ম পরমাত্মস্বরূপে 'সৎ'রূপেই প্রতিভাত । সে 'সৎ' জ্ঞানের অনুভূতির বিষয় । তাহা বাচ্য নহে । তিনি একমাত্র সত্তা-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ । তাঁহার সত্তাতেই আমার সত্তা, তাঁহার জ্ঞানেই আমার জ্ঞান । তাঁহার সত্তাতে এ জগৎ সত্তাবুদ্ধি । যাহা হউক, জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে ব্রহ্ম প্রকৃতরূপে জ্ঞেয় হন না । এ সম্বন্ধ হইতে কোনরূপ অনুমান দ্বারা ব্রহ্ম প্রমেয় হন না । তাঁহাকে জগতের 'সৎ-কারণ' বলা হয় সত্য, অথচ কেবল জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে জগতের কারণভাবেও তিনি 'সৎ' শব্দবাচ্য নহেন । এ জগৎ সৃষ্টি-

* পরমব্রহ্ম যে বাচ্য নহেন, কোন শব্দের দ্বারা নির্দেশ্য নহেন, তাহা জাৰ্মান দার্শনিক Kant-প্রমুখ অনেক দার্শনিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।

Le Roy বলিয়াছেন,—

“Kant has conclusively established that what lies beyond language can only be attained by direct vision, not by dialective progress.”

‘A New philosophy Henri Bergson’—p 157.

সে যাহা হউক, ব্রহ্ম অনির্বাচ্য হইয়াও কেবল প্রণবের দ্বারা বাচ্য হ'ন । তাহা আমরা অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-পেবে একাক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছি, এ স্থলে তাহা উল্লেখের প্রয়োজন নাই ।

লয়ের অধীন । জগতের সকল বস্তুই অনিত্য । সকল বস্তুই বড় ভাব-
 বিকারযুক্ত, জন্মস্থিতিলয়ের অধীন । সকল বস্তুই আদিতে অব্যক্ত
 হেতু অসৎ, মধ্যকালে ব্যক্ত হেতু সৎ, এবং লয়কালে পুনঃ অব্যক্ত হয়
 বলিয়া অসৎরূপে প্রতীয়মান হয় । সকলই ব্যক্তাবস্থাতেও (Becom-
 ing)—সৎ (Being) এবং অসৎ (Naught)—এই দুই ভাবে অনুস্থাত
 থাকে । তাহা হইতে নিত্য সত্তার জ্ঞান হয় না । আমার জ্ঞানে জ্ঞেয়
 জগৎ সৎ কি অসৎ মায়াময় স্বপ্ন মাত্র, তাহাই বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত করা
 কঠিন ; • এবং সে জগতের কারণ ‘সৎ’ কি ‘অসৎ’, তাহাও সিদ্ধান্ত করা
 দুঃসাধ্য । আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতেই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকৃত অনুভব হয় ।
 সুতরাং যাহারা কেবল জগৎকারণরূপে ব্রহ্মসত্তা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত
 করিতে যান, অথবা এ জগৎ কার্য, অতএব তাহার কর্তা নিয়ন্তা বিধাতা
 অবশ্য কেহ কেহ আছেন, জগৎ সাস্ত, সসীম (finite) বিকারী, সদ-
 সদাশ্রয়, নিত্য পরিবর্তনশীল, অতএব অবশ্য তাহার অনন্ত অসীম
 (infinite) নির্বিকার ‘সৎ’ আধার আছে, আর এই ‘আমি’—জীব,
 আমিও ক্ষুদ্র, সাস্ত, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানযুক্ত, আমারও অবশ্য অসীম, অনন্ত,
 অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ স্থির আধার আছেন--এই অনুমান-প্রমাণ দ্বারা
 যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করিতে যান, তাঁহারা পরম্পর বিরুদ্ধবাদে
 উপনীত হন । কেহ সে জগতের মূল কারণকে জড় বলেন, কেহ চৈতন্য
 বলেন, কেহ শক্তিমাত্র বলেন । কেহ তাঁহাকে ‘সৎ’ (Being, Subst-
 ance) বলেন, কেহ বা অসৎ, (Naught) বা শূন্য বলেন । কেহ
 বলেন, ইহার কোন একটি মূল কারণ নাই । কেহ বা এট পরম্পর-
 বিরোধী তত্ত্বের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করেন । কেহ এই চেষ্টায় বিফল
 হইয়া তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলেন । কেহ বা জ্ঞেয় বলেন ! যাহা হউক,
 এইরূপে তিনি জ্ঞেয় নহেন,—অজ্ঞেয়ও নহেন, তিনি সৎ নহেন, অসৎও
 নহেন । বাক্য দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিতে গেলে এইরূপ নানা মত-

বিরোধ হয়, কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না। একান্ত শ্রুতি বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম ‘অবাণ্‌মনসগোচর’ তিনি মন বা বাক্য দ্বারা নির্দেশ্য নহেন। তিনি কেবল আত্মাতে অনুভাবের বিষয় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়কে একীভূত করিয়া দিয়া, সৰ্বভেদ দূর করিয়া দিয়া নির্মল জ্ঞানে অধ্যাত্মযোগে সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপে তিনি অধিগম্য হন। তিনি পরমাশ্বরূপে প্রত্যেকের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া জ্ঞেয় হন। শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্ম “অধ্যাত্মযোগাধিগম্য (কঠ, ২।১২) ব্রহ্ম একাত্মপ্রত্যয় সার (মাণ্ড্য, ৭), তিনি প্রতিবোধবিদিত (কেন উপঃ ২২)। তিনি হৃদয়ে সংসারহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন।” (কঠ ৩।২)। “জ্ঞানপ্রসাদে যিনি বিগুহচিত্ত, ধ্যানযোগে তিনি নির্মল পরমাশ্বাকে দর্শন করেন।” (যুগুৎ, ৩।১৮), নির্মল চিত্তেই তিনি বিদিত হন (যুগুৎ)। “এই সূক্ষ্মদর্শীরা সূতীক্স বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন।” (কঠ, ৩।২২)। অতএব শ্রুতি অনুসারে নির্মল বুদ্ধিপ্রসাদে ব্রহ্ম অন্তরে জ্ঞেয় ও অনুভূত হন। সে অনুভব কোন বাক্য দ্বারা নির্দেশ করা যায় না। একান্ত এ স্থলে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ নির্মল বুদ্ধিতে, অমানিষাদিরূপ জ্ঞানে তিনি ধারণার বিষয়। তিনি জ্ঞেয়। নতুবা তিনি সৎ বা অসৎ কোন বাক্য দ্বারা বাচ্য নহেন, কোন ‘নাম’ বা ‘রূপের’ দ্বারা তিনি জ্ঞেয় হন না। তাঁহার কোন প্রতিমা নাই, (খেতাখতর, ৪।১২)। তিনি অপ্রত্যক, অপ্রমেয়। কঠ ৩।২, ৪।১৭)। ব্রহ্ম কি প্রকারে বা কিরূপে নির্মল জ্ঞানে জ্ঞেয় হন, তাহা পরবর্তী পাঁচ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

সৰ্বতঃ পাণিপাদং তৎ সৰ্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সৰ্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সৰ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩

সর্বদিকে হস্ত পদ চক্ষু শির মুখ
হন তিনি শ্রুতিমান্ তিনি সর্বলোকে
সর্ব আবরিয়া তিনি হন অবস্থিত ॥ ১৩

১৩। সর্বদিকে...হন তিনি—শঙ্কর বলেন, ‘সৎ’ এই শব্দের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের বিষয় না হওয়ার ব্রহ্ম নাই—এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে। এইজন্য সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়-সমূহরূপ উপাধি দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া সেই আশঙ্কা নিবৃত্তি করা হইতেছে। স্বামী বলেন, ব্রহ্ম যদি ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন হন, তবে “সর্বং ঋষিঃ ব্রহ্ম” “ব্রহ্মৈবেদং সর্বং” ইত্যাদি শ্রুতির সহিত সে বাক্যের বিরোধ হয়। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। এই জন্য শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রুতিতে আছে—

পরাস্ত শক্তিবিবৈধেব শ্রয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ । (শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮) ।

মধুসূদন বলেন, “নিরূপাধিক ব্রহ্ম ‘সৎ’ শব্দ-প্রত্যয়বিষয় নহে বলিয়া তিনি ‘অসৎ’,—এরূপ আশঙ্কা নিরসন জন্য সর্বপ্রাণীর ‘কারণ’ (অর্থাৎ চিত্ত ও ইন্দ্রিয়) উপাধি দ্বারে চেতন ক্ষেত্ররূপে, তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন জন্য এইরূপ উক্ত হইয়াছে।”

গিরি বলেন, সর্ববিশেষণরহিত অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্ম অদৃষ্ট হইলেও শ্রুতি জীবাশ্রিতে সর্ব ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি হেতু কল্পিতবৈতসস্তার কৃতি হেতু ব্রহ্ম সর্ব হস্তপদাদি দ্বারা দৃষ্টবৎ প্রতীয়মান হন। প্রত্যক্-চেতনাধিষ্ঠিত ব্রহ্ম চৈতন্য-প্রবর্তিত হস্ত-পদাদিবুক্ বলিয়া অনুমান হয়।

কেশবাচার্য্য বলেন,—পূর্ব-শ্লোকে যে ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে—

“অপানিপাদো যবনো গৃহীতা পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ।”

ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম অনিচ্ছিয় হইলেও সর্বদিকে দর্শন করেন, শ্রবণ করেন, গ্রহণ করেন। পরমাত্মা সর্ব পানিপাদবিরহিত হইলেও গ্রহণ, গমন, দর্শন, শ্রবণ আদি সর্বকার্য্যে তাঁহার কর্তৃত্ব তাঁহার অনন্ত শক্তিব্যোগে নিরূপিত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, “তথা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি”। গীতাতেও আছে,—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্যমাগতাঃ।”

এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতিতে জীবাত্মার সহিত ব্রহ্মের সাম্য উক্ত হইয়াছে। এই সাম্যভাবাপন্ন প্রত্যগাত্মার ইচ্ছিয়নিরপেক্ষ হইয়াও গ্রহণ, গমন, দর্শন প্রভৃতি ক্রিয়া সম্ভব হয়। সেই পরিশুদ্ধস্বরূপ প্রত্যগাত্মা এই সর্বত্র সর্বত্র পানিপাদ-চক্ষু-শিরোমুখ-শ্রোত্র হন।

বল্লভ সম্প্রদায় অনুসারে ব্যাখ্যা এইরূপ, এই শ্লোকে যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, যিনি ‘মৎপর বা মৎস্থানভূত’ ব্রহ্ম, তিনি ‘সর্বত্রঃ পানিপাদ’ শব্দ দ্বারা সর্ব ক্রিয়াশক্তি ও সর্ব-সেব্যত্ব (সর্বরূপে ভগবান্কে সেবা করিবার শক্তি) নিরূপিত হইয়াছে। ‘সর্বতোহক্ষিণিরোমুখম্’ এই বিশেষণের দ্বারা সর্বজ্ঞানত্ব ও সর্বমুখত্ব উক্ত হইয়াছে। সর্বত্র শ্রুতিমৎ এই বিশেষণ দ্বারা সকল ভক্তের স্তুতি-শ্রবণের যোগ্যত্ব উক্ত হইয়াছে।

এই পাঁচ শ্লোকে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, শঙ্করপ্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ তাহা সেই জ্ঞেয় অনাদিমৎ পরম ধর্মের স্বরূপ বলিয়াই বুঝিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে ষ্ট্রামানুজ বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ অনুসারে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম যে ঈশ্বর জীব ও জগৎ বা প্রেরয়িতা, ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে নিত্য প্রকাশিত থাকেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ এই কয় শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। আর পূর্ব-শ্লোকে মুক্ত জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা

স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে । অত্র বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, এস্থলেও ব্রহ্মই প্রত্যগায়স্বরূপ । কেশবাচার্য্য এইরূপ বুঝাইয়াছেন, কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত নহে ।

এই শ্লোক হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত জেয় পরব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং পরব্রহ্ম “তৎ”-শব্দবাচ্য ক্রীবলিঙ্গে নির্দিষ্ট হইয়াছে । উপনিষদে নিষ্কর্গ, নিরূপাধিক ব্রহ্মই তৎশব্দবাচ্য ক্রীবলিঙ্গ । সগুণ ব্রহ্ম ‘সঃ’ শব্দ-বাচ্য পুংলিঙ্গ । এ কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে বলিয়াছেন ।

“ব্রহ্ম বিষয়ে দুই প্রকার শ্রুতি দেখা যায়—এক স বিশেষ লিঙ্গশ্রুতি, যেমন তিনি ‘সর্বকর্মা, সর্বকাল, সর্বগন্ধ, সর্বরস’ ইত্যাদি । অপর নির্কি-শেষ লিঙ্গশ্রুতি ; যথা তিনি স্থূলও নাশন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন ইত্যাদি ।”

শ্রুতি এই নির্কি-শেষ লিঙ্গ-ব্রহ্মকে ক্রীবলিঙ্গে নির্দেশ করেন, স বিশেষ ভাবে পুংলিঙ্গে নির্দেশ করেন । কিন্তু কোন কোন স্থলে একই শ্রুতি-মন্ত্রে ক্রীবলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয়ের প্রয়োগই আছে । পরব্রহ্মে ও অপর-ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই—ভাবের প্রভেদ মাত্র । দৃষ্টান্তস্বরূপ মুণ্ডক উপনিষদের (১।১।৬) মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—

“তৎ অচেতনম্ অদ্রেশম্ অগ্রাহম্ অগোত্রম্ অচলম্ অচকুঃ
অশ্রোত্রম্ অপানিপাদম্ নিত্যং বিভূং সর্বগতং সূক্ষ্মং তৎ অব্যয়ং যৎ
ভূয়োনিম্ ।”

এ স্থলে নিরূপাধিক ও সোপাধিক ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ও নিষ্কর্গ ব্রহ্ম-ভাব এই উভয় ভাবে ‘ক্রীবলিঙ্গে’ উক্ত হইয়াছে । সেইরূপ গীতারও এই স্থলে ক্রীবলিঙ্গেই ‘সোপাধিক ও নিরূপাধিক উভয় ব্রহ্মভাবই’ উক্ত হইয়াছে । পূর্ব-শ্লোকে ‘তৎ ন সৎ তৎ ন অসৎ উচ্যতে’ এই বাক্য দ্বারা কেবল নিরূপাধিক ব্রহ্মের ইঙ্গিত করা হইয়াছে । আর পরবর্তী পাঁচ

শ্লোকে “সৰ্ব্বতঃ পানিপাদংতং” ইত্যাদি বাক্যে এক অর্থে ব্রহ্মের নিগূর্ণ-
ভাবে সত্ত্বিত সগুণ ভাবেই নির্দেশ করা হইয়াছে ।

ব্রহ্মের এই সগুণ ভাব ক্রীবলিজে নির্দেশ করার, তাহা “পরমপুরুষ
পরমেশ্বর” হইতে ভিন্ন ভাবে ধারণা করা হইয়াছে । পরমেশ্বর পুংলিঙ্গশব্দ-
বাচ্য, তিনি পরম পুরুষ Personal God আর ব্রহ্ম—সগুণ ও নিগূর্ণ
উভয় ভাবেই ক্রীবলিঙ্গ শব্দ দ্বারা বাচ্য হওয়ার, তিনি “অপুরুষ”
Impersonal । সগুণ ব্রহ্ম ও পরমেশ্বর ভাবের এই প্রভেদ ।

পূর্বে একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ-বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান্কে ‘অনেক-
বাহুদরবক্ষুনেত্রং’ প্রভৃতি যে বলা হইয়াছে, তাহা এ স্থলে মিলাইয়া
দেখিতে হইবে এবং এই একাদশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যা
দেখিতে হইবে । সে স্থলে “অনেক” বাহু প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে, এ স্থলে
“সৰ্ব্বতঃ” বাহু প্রভৃতি বলা হইয়াছে । সে স্থলে ভগবানের বিশ্বরূপ
বর্ণিত, এ স্থলে ব্রহ্মের সৰ্ব্বরূপত্ব বর্ণিত ; ‘সৰ্ব্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম’ এই তত্ত্ব
প্রকটিত । এই বিশ্ব—সাস্ত, সীমাবদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন । সূত্রং বিশ্বরূপও
সাস্ত, সীমাবদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন । ভগবান্ একাংশেই এই জগৎ ব্যাপিয়া
স্থিত ; বিশ্বরূপ তাঁহার একাংশ । তিনি জগতের বাহিরে থাকিয়াও
জগতের মধ্যে ওতপ্রোত । কিন্তু: ব্রহ্ম সগুণ হইলেও সাস্ত, সসীম
নহেন । ব্রহ্ম অনস্ত, অপরিচ্ছিন্ন, সৰ্ব্বব্যাপী । আমাদের জ্ঞেয় জগতের
বাহিরে যাহা কিছু আছে, ব্রহ্ম তাহাও ব্যাপিয়া অবস্থিত । এই সৰ্ব্বত্ব—
এই সৰ্ব্বব্যাপকত্ব নির্দেশ করিবার জন্য এ স্থলে “সৰ্ব্বতঃ পানিপাদ”
প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে ।

এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে ভিন্ন ভাবে এবং ঈশ্বরতত্ত্বকে
ব্রহ্মতত্ত্বেরই অন্তর্গত ভাবে বুঝিতে হইবে । এইরূপে একাদশ অধ্যায়ের
বিশ্বরূপ-বর্ণনার সহিত এ স্থলে বর্ণিত সগুণ ও নিগূর্ণ ব্রহ্মের সৰ্ব্বত্ব-
বর্ণনার সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে । নতুবা ভগবান্ স্বয়ং যে পরমেশ্বরে অনন্ত

যোগে অব্যভিচারী ভক্তিরূপ, এবং অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য স্থিতিরূপ ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনরূপ পরিপূর্ণ নিৰ্মল জ্ঞানে ব্রহ্মই জ্ঞেয় বলিয়াছেন, এবং যে ব্রহ্মতত্ত্ব, এই জ্ঞানে জ্ঞেয়রূপে প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় বলিতেছেন, 'ঐহ্যার যে পরম ধাম' (৮।২১) ব্রহ্ম, তিনি যে 'ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' (১৪।২৭) এ সকল কথা কিছুই বুঝা যাইবে না ।

ব্রহ্ম যেরূপে জ্ঞেয় হন, তাহাই এই কয় শ্লোকে বুঝান হইয়াছে । ঐহ্যার প্রকৃত স্বরূপ—প্রকৃত তত্ত্ব অবাচ্য, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য,—তাহা এ স্থলে বুঝান হয় নাই । যে 'তটস্থ' লক্ষণ দ্বারা সপ্তম ভাবে ব্রহ্ম জ্ঞেয়, তাহাই এ স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে । ব্রহ্ম নিরূপাধিক হইয়াও, যে উপাধি দ্বারা জ্ঞেয় হন, তাহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন,—

“সকল প্রকার জীবগণের ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা আমরা সর্বত্র জীবভাবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব বুঝিয়া থাকি । ক্ষেত্রস্বরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধ হয় বলিয়াই ত ব্রহ্মকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যায় । পানিপাদ প্রভৃতি নানা অবয়বভেদ প্রযুক্ত ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন । এষ্ট ক্ষেত্ররূপ অনির্কচনীর উপাধির ভেদ প্রযুক্ত আত্মাতে যে ভেদ কল্পনা করা যায়, তাহা মিথ্যা । 'সেই ক্ষেত্ররূপ উপাধিকে অপনোত করিয়া জ্ঞেয় ব্রহ্মের স্বরূপ দেখান হইতেছে ।

যিনি 'সৎ' বা 'অসৎ' বাচ্য নহেন, সেই ব্রহ্ম কেবল উপাধি দ্বারা কোনরূপে তাহার স্বরূপকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবার জন্যই এ স্থলে ঐহ্যাকে 'সর্বতঃ পানিপাদ' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা সেই নির্কিশেষ ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হইয়াছে । সম্প্রদায়বিৎ আচার্য্যগণ বলেন যে, সেই সর্বোপাধিশূন্য নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম 'অধ্যারোপ ও অপবাদ'রূপ শ্রায়েয় সাহায্যে কোন প্রকারে নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন । সকল দেশে সকল কালে সকল দেহের অবয়ব বলিয়া যত কিছু হস্ত, পদ, চক্ষু, মুখ, মস্তক, কর্ণ প্রভৃতি আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, সেই সকল হস্ত-পদ প্রভৃতির

যাহা কিছু ধারণ ও বিচরণাদি ব্যাপার, সে সমুদায়ই সেই জীবভাবে দেহপ্রবিষ্ট ব্রহ্মের 'সৎ' ভাবে সূচনা করিয়া থাকে । এই কারণে এই ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞেয় ব্রহ্মের সত্তার জ্ঞাপক বলিয়া উক্ত হয় । এই প্রকার প্রয়োগকে উপচার বলা যায় । অর্থাৎ ইহা দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মকে নির্দেশ না করিয়া গৌণভাবে নির্দেশ করা হয় ।

'সর্বত্রঃ হস্তশদ' যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইল, সেই ভাবে এই শ্লোকের অর্থ বিশেষণও ব্যাখ্যা করিতে হইবে । অর্থাৎ, এই ভাবে সর্বপ্রাণীর মুখ, চক্ষু, শির ও কণ-যুক্ত সেই এক ব্রহ্ম—ইহা বুঝিতে হইবে ।"

শঙ্কর অদ্বৈতবাদ অনুসারে এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের একত্ববাদ বা অভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তদনুসারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অবশ্য জীবব্রহ্মের ভেদবাদ দ্বারা এই শ্লোকের সঙ্গত অর্থ হয় না । জীবব্রহ্ম-ভেদবাদে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না । কেবল জগৎকারণরূপে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞেয় হন না, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । আত্মাটি আমাদের অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয় । সেই আত্মজ্ঞান যখন পরিপূর্ণ হয়, উপাধি-রূপ পরিচ্ছেদশূন্য হয়, তখন সেই আত্মজ্ঞানেই ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় । আত্মা দ্বারাই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন । প্রতিশব্দে ক্ষেত্রজ্ঞাত্মা হস্তপদাদি উপাধি-যুক্ত । আর উপাধিযুক্ত আত্মা অপাণিপাদ । ইহা হইতে সর্বাত্মরূপ ব্রহ্ম সর্বত্রঃ হস্তপদাদি উপাধিযুক্ত জ্ঞান হয় । আবার সর্বোপাধিশূন্য আত্মস্বরূপ জ্ঞান হইতে ব্রহ্মও যে সর্বোপাধিশূন্য, ইহাও জানিতে পারা যায় । একত্র গীতায় পরব্রহ্মকে কেবল "সর্বত্রঃ পাণিপাদ" ইত্যাদি যে বলা হইয়াছে, তাহা নহে । পরবর্তী শ্লোকে আছে, তিনি "সর্বৈন্দ্রিয়বিবর্জিত ।" অর্থাৎ পাণি, পাদ, মুখ, শিরঃ, চক্ষু, শ্রোত্র এ সব কিছুই ব্রহ্মের নাই; ব্রহ্মে এ সব উপাধি কিছুই আরোপিত হইতে পারে না । অতএব গীতা অনুসারে পরব্রহ্ম সর্বত্রঃ পাণিপাদাদি বা সর্বৈন্দ্রিয়যুক্তও বটেন, তিনি সর্ব-ইন্দ্রিয়-বিবর্জিতও বটেন । "আছে" ও 'নাই' ইহার পরস্পর বিরোধী শব্দ ।

ব্রহ্মকে সৎ বা অসৎও বলা যায় না, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে ।
সেইরূপ এখানেও পরস্পর-বিরোধী ধর্ম ব্রহ্মে সমঞ্জসীভূত (synthesis)
হইয়াছে । শ্রুতিও পরব্রহ্মকে এইরূপে বুঝাইয়াছেন ।

প্রথমে শ্রুতি ব্রহ্মকে অপানিপাদ বলিয়াছেন, যথা—

“তৎ অচক্ষুঃ-শ্রোত্রং তৎ অপানিপাদম্” (মুণ্ডক ১।১।৬) ।

* * *
অপানিপাদো জ্বনো গ্রহীতা

পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্মাস্তি বেত্তা

- তমাহুরগ্রাম্যম্ পুরুষং মহাস্তম্ ॥” (শ্বেতাশ্বতর, ৩।১২) ।

আবার শ্রুতিই ব্রহ্মকে “সর্বতঃ পানিপাদ” ইত্যাদি বলিয়াছেন ।

“সর্বতঃ পানিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিণিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥” (শ্বেতাশ্বতরঃ ৩।১৬ ।*

অতএব শ্রুতি অনুসারেও ব্রহ্ম “অপানিপাদ...” অথচ তিনি “সর্বতঃ
পানিপাদ...” । এই পরস্পর-বিরোধী বাদ কিরূপে ব্রহ্মে সমঞ্জসীভূত
হইতে পারে ? ইহার একমাত্র উত্তর—নিক্রপাধিকভাবে ব্রহ্মকে অপানি-
পাদ বলা হইয়াছে, আর সোপাধিক সঙ্গুণ ভাবে ব্রহ্মকে ‘সর্বতঃ পানিপাদ’
ইত্যাদি বলা হইয়াছে । নিক্রপাধিক ভাবে তিনি ‘তৎ’, সোপাধিকভাবে

* গীতার এই শ্লোক ও পরবর্তী শ্লোক, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত ৩।১৬ শ্লোকের,
এবং তাহার পরবর্তী শ্লোকের অনুরূপ । ইহা হইতে বলা যাইতে পারে যে গীতার
এই শ্লোক শ্রুতি হইতে উদ্ধৃত । কিন্তু এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—দশখানি প্রামাণ্য
ও প্রাচীন উপনিষদের অন্তর্গত নহে । বেদান্ত দর্শনে কোন নত্রে হহার উল্লেখ
করা হয় নাই । অথচ শ্রুতেশ্চ প্রভৃতি সূত্রে গীতার উল্লেখ আছে, এবং গীতা
প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে । অতএব গীতা যদি বেদব্যাস কর্তৃক মহাভারতের
অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে স্বীকার করা যায়, তবে তাহার পরবর্তী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে
এই শ্লোক গীতা হইতে গৃহীত সিদ্ধান্ত করিতে হয় । পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৯, ২০
শ্লোকের ব্যাখ্যা জটব্য ।

তিনি 'সঃ'—তিনি মহান পুরুষ (খেতামতরোক্ত ৩।১২ মন্ত্র) । গীতার এ স্থলে ব্রহ্ম 'সর্বতঃ পাণিপাদ' ইত্যাদিরূপে বিশিষ্ট হইলেও তিনি 'তৎ' শব্দবাচ্য । এ স্থলে নিক্রপাধিক অক্ষর পরম ব্রহ্মই সোপাধিক সগুণরূপে জ্ঞেয়, ইহা উক্ত হইয়াছে । অতএব সোপাধিক ভাব হইতেই ব্রহ্মের সোপাধিক ও নিক্রপাধিক উভয় ভাব জ্ঞেয় । সোপাধিক সগুণ ভাবেই ব্রহ্ম ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিন প্রকারে অভিব্যক্ত । তন্মধ্যে জীব .ভগবানেরই পরা প্রকৃতি এবং জড় জগৎ ও জীবদেহ তাঁহার অপরা প্রকৃতি । অতএব ঈশ্বরও জীবরূপে (ক্ষেত্রজরূপে) সোপাধিক ব্রহ্ম "সর্বতঃ পাণিপাদ..."

গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ ঈশ্বরকে 'অনেকবাহুদরবক্ত্রনেত্র' (১১।১৬), "অনন্তবাহু" (১১।১৯) এবং "বহুবক্ত্রনেত্র-বহুবাহুরূপাদঃ" বলা হইয়াছে । আর এ স্থলে ব্রহ্মকে 'সর্বতঃ পাণিপাদ' বলা হইয়াছে । তাহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না, তাহা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে হইবে । ঈশ্বরের জগৎ কর্তা, জগৎশাস্তা, জগৎনিয়ন্তা ভাবে 'আমি' 'আমার' এ 'অভিমান' আছে । সর্বজীব, এবং সর্বক্ষেত্র সম্বন্ধে ঈশ্বরের এই 'আমি' 'আমার' ভাব আছে । এজন্ত তিনি সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্থলশরীরে যে সমুদায় বাহু, উরু, পাদ প্রভৃতি অবয়ব আছে, সে সমুদায় তাঁহারই ; তিনি সর্বজীবে অন্তর্যামিরূপে এ সকলের নিয়ন্তা, এই ভাব আছে । এজন্ত তিনি অনেকবাহুদরবক্ত্রনেত্র...। এ সম্বন্ধে পূর্বে ১১শ অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এ স্থলে দেখিতে হইবে । ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ পুরুষসুক্ত হইতে ঈশ্বরের এই অনন্ত বাহুদরবক্ত্রনেত্রযুক্ত বিশ্বরূপের তত্ত্ব জানা যায় । ব্রহ্ম এই পরমপুরুষরূপেই পরমেশ্বর ।

যাহা হউক, এ স্থলে যে 'সর্বতঃ পাণিপাদ' ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, ইহাতে ঈশ্বরের স্থায় 'আমি' ও 'আমার' এরূপ কোন অভিমান হেতু সর্ব

জীব ও জীবদেহ সকলকে 'আমার' এইরূপ কোন জ্ঞান হেতু ব্রহ্ম সর্বতঃ পাণিপাদ হন না । জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে কোন পরিচ্ছেদ নাই, তাহা একরসভাবেই আত্মাতে প্রতিভাত । কিন্তু তিনিই গ্রাহ্যভাবে সর্ব-গন্ধ, সর্বরস ইত্যাদি সর্ববিষয়, আর অন্তদিকে সর্বস্ব-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়রূপে তাহাদের গ্রাহক । কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে এ ভেদ নাই ।

যাহা হউক, শক্তির উপদেশ এই যে, ব্রহ্ম সগুণ ভাবে জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-ময়ের কারণ হন । প্রলয়ের পরে তিনি কোন সৃষ্টির আরম্ভে পূর্ব-সৃষ্টি অনুসারে জগতের বীজভূত 'বহুভাব' কল্পনা করেন বা ঈক্ষণ করেন এবং নাম ও রূপের দ্বারা সেই 'বহু' সকলকে সংরূপে পরিণত করিয়া এই জগতের বিকাশ করেন এবং সেই সকল 'বহু' এইরূপে নিজ পরাশক্তি-বলে আপনার সত্তা হইতে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন, এ কথা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে । এইরূপে ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি (অন্যাদ্যন্ত যতঃ ইতি বেদান্তদর্শন, ১।২ ।) এই বহু কল্পনা নামরূপে ব্যাকৃত হইয়া বহু জীবজাতির সৃষ্টি হয়, এবং সেই সকল জীবজাতির রূপ (form) বহু বাহুপাদ প্রভৃতি যুক্ত ক্ষেত্র কল্পিত ও সৃষ্ট হয় । ব্রহ্ম তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন বলিয়া, তিনি এইরূপে 'সর্বতঃ পাণিপাদ' হন ।

নিগুণ নিরূপাধিক ব্রহ্ম 'মায়া'শক্তিদ্বারা সগুণ সোপাধিক হইয়া এইরূপে জড়-জীবময় জগৎ সৃষ্টি করেন ও তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন । এই মায়া ব্রহ্মের পরাশক্তি, ইহা শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পূর্বে ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে । ব্রহ্ম এই অনন্ত শক্তিমান্ বলিয়া সগুণ হন । সেই শক্তি হেতুই ব্রহ্ম জগৎকারণ, এবং এ জগৎও সেই অনন্তশক্তি হেতু কার্যরূপে পরিণত হয় । সেই শক্তি বা প্রকৃতি হইতে সর্বক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, এবং সর্বক্ষেত্রের ইন্দ্রিয়াদি ও সর্ব অবয়বের বিকাশ হয় । অতএব এই অচিন্ত্য ব্রহ্মশক্তি হইতে উৎপন্ন সর্ব-পাণিপাদ ব্রহ্মেরই । কার্য কারণেরই অন্তভূত । তথাপি ব্রহ্মমায়া

হইতে এই যে সৃষ্টি হয়, ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান, অজ্ঞানযুক্ত হয় না। পরব্রহ্মে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-রূপ বৈতন্ড্য হইত হইত না। সগুণ ব্রহ্মে সেই বৈতন্ড্য প্রতীয়মান হইলেও, ব্রহ্ম নিত্য সে ভাবের অতীত নিত্যজ্ঞানস্বরূপে থাকেন। তবে সগুণ ব্রহ্মে যে হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বরভাব, তাহাতেই এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ভাব, এই “আমি আমার” ভাব অনুসৃত থাকে। এজন্ত ব্রহ্ম সর্বতঃ পানিপাদ হইয়াও তিনি অপানিপাদ। আর বিশ্বরূপ ঈশ্বর ‘অনন্ত পানিপাদ জ্ঞানযুক্ত।’ নিগুণ ব্রহ্ম মায়াশক্তি হেতু সগুণ হন বলিয়া তাহাতে ঈশ্বর জীব ও জগৎ ভাব অভিব্যক্ত হয়। সর্বজীব জড়ময় জগৎ ঈশ্বর-রূপ সগুণব্রহ্মে অবস্থিত বলিয়া, ব্রহ্ম সর্বতঃ পানিপাদযুক্ত হন। তিনি সর্বভূতের সর্ব-পানিপাদাদি ইন্দ্রিয়ের কারণ এবং কার্যকারণ অভিন্ন বলিয়া তিনি সর্বতঃ পানিপাদ, সর্বতঃ চক্ষুকর্ণশির-মুখাদিযুক্ত। প্রতিতে আছে—

“এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি।চ ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বশ্চ ধারিণী ।” (যুগুৎ, ২।১।৩)।

অতএব ব্রহ্ম জগতের মূল কারণ, অর্থাৎ নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। বলিয়াই ব্রহ্মের মধ্যে জগৎ অভিব্যক্ত ও অবস্থিত, ব্রহ্ম জগতে ওতপ্রোত। জগতের প্রতি ক্ষেত্রে হস্তপদাদির অবয়ব ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কার্যরূপে প্রকাশিত। তাহার কারণ ‘ব্রহ্ম’। এ জন্ত কারণরূপে ব্রহ্ম সর্বতঃ পানিপাদ নহে, তিনি অপানিপাদ। এই সকল পানিপাদাদির কারণরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয়। নতুবা নীরূপ নিগুণ ব্রহ্মে কোন পানিপাদ নাই—তিনি অপানিপাদ। রামানুজ বলিয়াছেন, “পরব্রহ্ম অপানিপাদ হইলেও সর্বতঃ পানিপাদাদি কার্যকৃত্য প্রতিতে উক্ত হইয়াছে। প্রত্যগাত্মাও যখন পরিশুদ্ধ হইয়া পরম ব্রহ্মস্বরূপ হন, তখন তিনি ‘সর্বতঃ পানিপাদাদি-কার্যকৃত্য’ হন, ইহাও প্রতিতে উক্ত হইয়াছে।” এ স্থলে শব্দের অর্থের সহিত রামানুজের অর্থের বিশেষ তেদ নাই।

সর্ব আবরিয়া তিনি হন অবস্থিত ।—লোকে অর্থাৎ সর্বপ্রাণীতে তিনি সমুদায় ব্যাপিয়া অবস্থিত (শঙ্কর) । ইহা দ্বারা ত্রক্ষের সর্বতঃ পানিপাদস্থ সাধিত হইয়াছে (গিরি) । লোকে অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা কিছু বস্তুজাত, সে সমুদায় ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিত । পরিপূর্ণ-স্বরূপ ত্রক্ষ দেশকালাদি-পরিচ্ছেদশূন্য বলিয়া সর্বগত (রামানুজ) । সর্বপ্রাণীর প্রবৃত্তি দ্বারা পানিপাদ প্রভৃতি উপাধি দ্বারা সর্ব ব্যবহারসম্পন্ন হইয়া তিনি অবস্থিত । (স্বামী) । এক নিত্য বিভূ ত্রক্ষ সমুদায় অচেতনবর্গকে আবৃত করিয়া স্বসত্ত্বাশুভি দ্বারা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে ব্যাপিয়া অবস্থান করেন ; নির্বিকাররূপে স্থিত হন ; এই অধ্যাস হেতু জড় প্রাণের গুণ বা দোষের সহিত অণুবাৎ সম্বন্ধগুক্ত হন না । সর্বদেহে একই চৈতন্য নিত্য ও বিভূ, তাহা দেহভেদে ভিন্ন হয় না (মধু) । লোকে যা কিছু বস্তু আছে, সমুদায়কে সেই প্রত্যগাত্মা জ্ঞানগোচরীভূত করিয়া অবস্থান করে । তখন অবিদ্যা সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হওয়ায় ধর্মভূত জ্ঞানের ব্যাপকত্ব হেতু প্রত্যগাত্মার ব্যাপক ধর্ম যোগ হয় এবং সেই জন্ত বিভূত্ব-স্বরূপ হয় । তাহাই উক্ত হইয়াছে । (কেশব) সর্ব ইন্দ্রিয়গুক্ত হইয়া অবস্থান করেন (বল্লভ) । সর্ব ইন্দ্রিয়াদিযুক্তের আয় অবস্থান করেন (হনু) ।

“ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।”—

(ইতি ঈশ উপনিষদ, ১) ।

আবার তাঁহা হইতেই সমুদায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় প্রবর্তিত হয় । তিনি গ্রাহ-গ্রাহকরূপে অন্ন-অন্নাদরূপে, ত্রক্ষ সর্বদেহে পানিপাদ, মুখ, শির, চক্ষু প্রভৃতির প্রবর্তকরূপে, এ সকলকে আবৃত করিয়া অবস্থান করেন ও আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান রহেন । ইন্দ্রিয়াদির ধারণ, আহরণ ও প্রকাশ প্রভৃতি প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রা প্রেরয়িতা হইয়া অবস্থিত রহেন । তিনি ক্ষেত্রজপতি গুণেশ । তাঁহার প্রেরণায়, তাঁহার

শক্তির বিচিত্রতা অনুসারে, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিভিন্নরূপ হস্তপদাদি বিভিন্নরূপ ক্রিয়ায় প্রবর্তিত হয় । এজন্য তিনি সমুদায়কে আবৃত করিয়া, আচ্ছাদিত করিয়া, অবস্থিত আছেন বলা যায় ।

সর্বেन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

असक्तं सर्वभूच्चैव निगुणं गुणभोक्तृ च ॥ ১৪

তিনিই আভাস সর্ব ইন্দ্রিয় গুণের,

সর্ব ইন্দ্রিয়-বর্জিত । অসক্ত হইয়া—

ভূতভর্তা, গুণভোক্তা—নিগুণ হইয়া ॥ ১৪

১৪ । সর্বেन्द्रिय গুণের আভাস ।—জ্ঞেয় আত্মা বা ব্রহ্ম দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপাধির সহিত সংযুক্ত বা উপাধিবিশিষ্ট হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন—ইহাই এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে (শঙ্কর) । শঙ্কর আরও বলিয়াছেন—

“সর্বেन्द्रिय—অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেन्द्रিয়, হস্ত, পদ প্রভৃতি পঞ্চ কার্মেन्द्रিয়, এবং মন ও বুদ্ধিরূপ দুই অন্তঃকরণ—এই ষাটটি কেন্দ্রস্থলকে ‘ইন্দ্রিয়’ বলা হইয়াছে । কারণ, এই কয়টি করণ—(অর্থাৎ দুই অন্তঃকরণ ও বাহ্য দশ ইন্দ্রিয়রূপ করণ) সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মের উপাধি । বিশেষতঃ বহিরিन्द्रিয়গুলি মন ও বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণের সহিত সংযুক্ত হেতু গৌণভাবে—আত্মার উপাধি । ইহাদের সহিত সাক্ষাৎভাবে আত্মার কোন সংযুক্ত নাই । অন্তঃকরণ দ্বারাই ইহার আত্মার উপাধি বলিয়া পরিগণিত হয় । অন্তঃকরণই সাক্ষাৎভাবে আত্মার উপাধি .”

“সেই সর্ব ইন্দ্রিয়ের ঘাঁহা কিছু গুণ—অর্থাৎ অধ্যবসার, শঙ্কর,

দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি, তাহাদের দ্বারা ব্যবহার-ভূমিতে আত্মা প্রকাশিত হন। ইহাতে আমাদের বোধ হয় যে, আত্মা সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন ; ইহা আমাদের প্রতীতি মাত্র ।”

রামানুজ বলেন,—সর্ব ইন্দ্রিয়-গুণ—অর্থে সর্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তি । ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারাই বিষয় (রূপরসাদি) আনিবার সামর্থ্য হয় ।

স্বামী বলেন, “চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যে রূপাদি আকার বৃত্তি, সেই আকারে আভাসিত । অথবা ইন্দ্রিয় সকল এবং ইন্দ্রিয়-গুণসকল ও তাহাদের স্তম্ভ বিষয়ের সকল প্রকাশক যিনি, তিনি ব্রহ্ম ।”

মধুসূদন বলেন,—“অধ্যারোপ ও অপবাদ—এই দ্বয় দ্বারাই প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্ম নিদ্দিষ্ট হইয়াছেন । সর্ব প্রপঞ্চ ‘অধ্যারোপ’ দ্বারা তাঁহাকে পূর্বে ‘অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম’রূপে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে । এক্ষণে সেই প্রপঞ্চ ‘অপবাদ’ দ্বারা তিনি সৎ বা অসৎবাচ্য নহেন—ইহারই ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে । নিরূপাধিক ব্রহ্মস্বরূপ-বিজ্ঞানার্থ তাঁহাকে সর্বৈন্দ্রিয়গুণাভাস প্রভৃতি বলা হইয়াছে । পরমার্থতঃ সর্বৈন্দ্রিয়-বজ্জিত হইয়াও তিনি সর্বৈন্দ্রিয়গুণাভাস । মধুসূদন শব্দের অর্থবর্তী হইয়া—সর্বৈন্দ্রিয় অর্থে বহিঃকরণ দশৈন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ মন ও বুদ্ধি এবং ইহাদের গুণ ‘অধ্যবসায়’ প্রভৃতি এইরূপ অর্থ করিয়াছেন । ইন্দ্রিয়গুণ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের স্তম্ভ বিষয়রূপে অবভাসযুক্ত, সর্ব ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে ব্যাপ্ত-রূপে তিনি স্তম্ভ ।”

বলদেব বলেন,—সকল ইন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণ অর্থাৎ বৃত্তি দ্বারা আভাস বা দীপ্তিযুক্ত ।

গিরি বলেন —বহিঃকরণ (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়) ও অন্তঃকরণ (মন ও বুদ্ধি) রূপ উপাধিত্ব সর্বৈন্দ্রিয়গুণ—অধ্যবসায়, সংকল্প, দর্শনশ্রবণাদি দ্বারা অবভাসিত, সর্ব ইন্দ্রিয়ব্যাপারে ব্যাপ্তের দ্বায় ব্রহ্ম প্রতীয়মান হন ।

কেশব বলেন—সর্ব কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় বা বাহ্য করণ ও অন্তঃ-
করণ মন ও বুদ্ধি ইহাদের গুণ বা বিষয় শব্দাদি তাহার আভাস বা প্রকাশ
যাহাতে হয়। আত্মা বিনা ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ সম্ভব হয় না। অথচ আত্মা
অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বিনাও আত্মা
সমুদায় জানিতে পারে।

ব্রহ্মকে ‘সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাস’ কেন বলা হইয়াছে, এবং সর্বেন্দ্রিয়
ও সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাস দ্বারা ব্রহ্ম কিরূপে জ্ঞেয় হন, তাহা বুঝিতে
হইবে। প্রথম সর্বেন্দ্রিয় কি এবং সর্বেন্দ্রিয়গুণ কি, তাহা দেখিতে
হইবে। ইন্দ্রিয় অর্থে সাধারণতঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়,
এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধিকে
কোথাও ইন্দ্রিয় বলা হয় নাই। অথচ শব্দর প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ
এ স্থলে বুদ্ধিকেও ইন্দ্রিয়মধ্যে ধরিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বাহ্য
আমাদের জ্ঞানের করণ বা বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের যন্ত্র, তাহা
ইন্দ্রিয়। করণ দুই প্রকার—(১) বাহ্যকরণ, ইহারা দশ ইন্দ্রিয়, এবং (২)
অন্তঃকরণ—ইহারা মন ও বুদ্ধি। এ উভয়কেই উপাধি বলে। অন্তঃকরণ-
কেই বিশেষভাবে উপাধি বলে, দশ ইন্দ্রিয় গৌণভাবে উপাধি। আত্মা
এই সকল করণে উপহিত হইয়া, ইহাদের দ্বারাই বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে,
বাহ্যবিষয়কে আহরণ করিয়া প্রকাশ করে, এজন্য ইহারা উপাধি।
সাংখ্যদর্শন অনুসারে, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই তিনই অন্তঃকরণ।
শঙ্করাচার্য্য অহঙ্কারতত্ত্বকে অন্তঃকরণমধ্যে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার
মতে অহঙ্কার মনের অন্তর্গত ; অতএব যদি সর্বেন্দ্রিয় অর্থে “করণ”
হয়, তবে তাহা ত্রয়োদশটি। সাংখ্যদর্শনে আছে—

“করণং ত্রয়োদশবিধং ধার্য্যং হার্য্যং প্রকাশকঞ্চ ।” (কারিকা)

এক্ষণে ইন্দ্রিয়গুণ কি—তাহা বুঝিতে হইবে। এই সকল ইন্দ্রিয়গুণকে
ব্যাখ্যাকারগণ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বলিয়াছেন। সাধারণভাবে বৃত্তি

অর্ধ কার্য্য বুঝায় । যাহা গুণ, তাহাকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম বা কার্য্য বলা যায় না । তবে যাহা অধিকার করিয়া কোন দ্রব্য বর্ত্তমান থাকে বা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে তাহার বৃত্তি বলা যাইতে পারে ; এবং তাহাকে গুণ বা ধর্ম্মও বলা যাইতে পারে । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গুণ, ধর্ম্ম বা বৃত্তি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ ইহাদিগকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় বলে । মনের প্রেরণায় বাহ্যবস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়া চক্ষু তাহার রূপ গ্রহণ করে, কর্ণ তাহার শব্দ গ্রহণ করে, রসনা তাহার রস গ্রহণ করে, নাসিকা তাহার গন্ধ গ্রহণ করে এবং ত্বক্ তাহার ‘স্পর্শ’ করে । এইরূপ রসাদি গ্রহণই ইন্দ্রিয়ের গুণ বা বৃত্তি । রূপরসাদি গ্রহণ করিয়া, সেই রূপরসাদি গুণযুক্ত বাহ্য দ্রব্যকে প্রকাশ করাই ইন্দ্রিয়ের গুণ বা বৃত্তি । কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ নিজে তাহাদের প্রকাশ করিতে পারে না । তাহারা রূপরসাদি গ্রহণ করিয়া মনকে উপহার দেয় । মন তাগ গ্রহণ করিয়া সেই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং পরে বুদ্ধির সাহায্যে সেই অনুভূত রূপরসাদির বাহ্য কারণ কি, তাহা স্থির করে । অতএব অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ উভয়ই বাহ্যবিষয় বা বস্তু প্রকাশের সচায় । যেমন ত্রিকোণ কাচের মধ্য দিয়া আসিতে সূর্যালোক লাল নীল প্রভৃতি বর্ণে রঞ্জিত হয়, সেইরূপ বাহ্যবস্তুজ্ঞান বাহ্য ও অন্তঃকরণ দিয়া অন্তরে পবেশ করিয়া প্রকাশিত হইতে গিয়া রঞ্জিত হয়, অন্তঃকরণধর্ম্মযুক্ত হয় । কর্ম্মেন্দ্রিয় সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম । জ্ঞানেন্দ্রিয়গাহ্য বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে তাগ, গ্রহণ ইত্যাদিরূপ কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়েব বৃত্তি বা গুণ । বুদ্ধি ও মনের প্রেরণায় তাহাদের এই গুণ বা বৃত্তির বিকাশ হয় । এই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া দ্বারা বাহ্যবস্তুজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হয় ।

অতএব ইন্দ্রিয়ের গুণদ্বারা বাহ্যজগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ হয় । জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদি গ্রহণ হেতু এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার উপর ক্রিয়ার হেতু বাহ্যজগতের সহিত যে সম্বন্ধ হয়, তাহা বাহ্য । ইহা

বাহ্যজগৎকে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করে । কর্ম্মেচ্ছিন্ন দ্বারা সেই জগৎকে ত্যাগ বা গ্রহণ ইত্যাদি রূপ কর্ম্মের অধীন করিতে পারা যায় এবং বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত হয় । বাহ্য জগৎ যে কাল্পনিক নহে,—সত্য, তাহার ধারণা এইরূপে স্বতঃসিদ্ধ হয় ।

ইন্দ্রিয়গণের এই গুণ বা বৃত্তি হইতে তাহার অন্তরালে কারণরূপে শক্তির ধারণা হয় । কেন না, কারণের অন্তর্ভূত শক্তি ও শক্তির অন্তর্ভূত কার্য্য, ইহা স্বতঃসিদ্ধ । যেখানে কার্য্য—সেখানে তাহার মূলশক্তি, এবং এই শক্তির আধার যে কারণ আছে, তাহা আমরা সিদ্ধান্ত করি । অতএব যে শক্তিবলে এই ইন্দ্রিয়বৃত্তি :এইরূপে কার্য্যকরী হয়, ইন্দ্রিয়গণ যে বাহ্য বস্তু সকল গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করে,—বাহ্য জগতের জ্ঞান উৎপাদন করায়, এ শক্তি কোন্ কারণের অন্তর্ভূত ? এ শক্তি কাহার ? কাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত ? কোথা হইতে এ শক্তি আসিল ? কোন্ শক্তি বা কাহার শক্তি এইরূপ ইন্দ্রিয় হইয়া, এবং এই সকল ইন্দ্রিয়-বৃত্তি হইয়া জ্ঞাতার নিকট বাহ্য জ্ঞেয় বিষয় প্রকাশ করে ? এই ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বৃত্তি না থাকিলে ত বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান বা কর্ম্ম সম্ভব হইত না ।

সকল জীবের ইন্দ্রিয় একরূপ । সকল জীবের সর্বেচ্ছিন্নগুণ একরূপ । ইন্দ্রিয় বিকল বা অশক্ত হইলে বা উপযুক্তরূপে বিকাশিত না হওয়ায় বিভিন্ন হইলেও সকল জীবের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গুণ যে একরূপ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি ; এবং সকল জীবের ইন্দ্রিয়গুণ দ্বারা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু একই প্রকার রূপ-রসাদিব্যক্ত হইয়া একইরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাও দেখিতে পাই । বিজ্ঞান যাহাকে ভৌতিক আকাশের (Ether এর) সূক্ষ্ম তরঙ্গবিশেষের ক্রিয়া বলে, তাহা তোমার আমার সকলের চক্ষু ইন্দ্রিয় সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেও একই প্রকারে লাল বা নীলবর্ণরূপে প্রতিভাত হয়, তাহা আমরা জানি । একত্র বাহ্য-

জগৎ তোমার নিকট যেভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা প্রত্যক্ষ হয়, আমার নিকটও সেইরূপই হয় । সকলের নিকট সমান ভাবেই বাহ্যজগৎ জ্ঞেয়-রূপে জ্ঞানে প্রকাশিত হয় ।

কেন এরূপ হয় ? ইহার একই উত্তর—সকল জীবের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গুণ সেই একই শক্তির কার্য্য, সকল ইন্দ্রিয়ে সেই একই শক্তি নিহিত থাকিয়া একইরূপে কার্য্যকরী হয় । অস্তঃকরণের পাথক্য হেতু বাহ্য-বস্তু বিভিন্ন ভাবে গৃহীত হয় সত্য, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ তাহা একই রূপে মনের নিকট প্রকাশ করে । অতএব বলিতে হইবে যে, সেই একই শক্তি বিভিন্ন জীবে এই সকল ইন্দ্রিয়রূপে, এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা গুণরূপে বা দর্শন-গ্রহণাদি ব্যাপাররূপে প্রকাশিত হয় । এমন কি, ইহাও বলা যায় যে, সেই শক্তিই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য রূপরসাদি বিষয়রূপে বাহ্য বস্তুকে আবরিত করিয়া প্রকাশ করে । এই রূপ-রসাদি বাহ্য বস্তুর গুণ, কি আমাদের ইন্দ্রিয়ের গুণ, কিংবা বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন গুণ, তাহা সিদ্ধান্ত করা কঠিন । ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ হইলে, বা সে সম্বন্ধ স্বরণ হইলে তবে এই রূপ-রসাদি বিষয় আমরা অনুভব করি, ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি । সুতরাং রূপরসাদি যে বাহ্য বস্তুর গুণ, তাহা বলিতে পারি না । ধ্বংস আকাশোখিত তরঙ্গ লাল নীল ইন্দ্রিয়ের গুণসাপেক্ষ, তাহা বলিতে পারা যায় । অতএব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগতের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা হয় ত আমরা জানিতে পারি না । ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে যে প্রকার রূপ, আকৃতি, বর্ণ, শব্দ প্রভৃতি দিয়া এবং নানারূপ সম্বন্ধযুক্ত করিয়া তাহাকে প্রকাশ করে, সেইরূপেই তাহা আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, সেইরূপেই আমরা তাহাকে জানিতে পারি, সেইরূপেই তাহা আমার জ্ঞানে 'জ্ঞেয়' হয় । বাহ্য জগৎ এইরূপে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা রূপরসাদিযুক্ত হইয়া বিষয়রূপে জ্ঞেয় হয় । সেই রূপরসাদি ইন্দ্রিয়-

আরোপিত গুণ বাদ দিলে বাহু জগতে কি থাকে, আমরা জানিতে পারি না। শাস্ত্র বলেন, তিনিই 'ব্রহ্ম'—পরম ব্রহ্ম। জগতের এই মাত্র আবরণ দূর করিতে পারিলে, তাহার অন্তরালে এই ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন জগৎ সেই ব্রহ্মমধ্যে লীন হইয়া যায়। যাহা হউক, সকল জীবের জ্ঞান-ইন্দ্রিয়গণ একই প্রকার বাহু জগৎ প্রকাশ করে কেন? তাহার একই উত্তর এই যে, সকল জীবের সকল ইন্দ্রিয় সেই একই মূল শক্তি হইতে উৎপন্ন, সেই একই শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সেই একই শক্তি দ্বারা ধৃত, সেই একই শক্তি দ্বারা ক্রিয়ামূল। ইন্দ্রিয়গণ সেই একই শক্তির বিভিন্ন কার্যরূপ। সে সকল ইন্দ্রিয়গুণও সেই শক্তিরই কার্যরূপ। সেই একই শক্তি একই রূপে বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গুণরূপে ব্যক্ত হইয়া কার্য করে বলিয়া সকল জীবই কোন একই দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে একই প্রকার রূপ, একই প্রকার রস, একই প্রকার গন্ধ ইত্যাদি অনুভব করিতে পারে। যে বাহু বস্তু ইন্দ্রিয়দ্বারা দিয়া আমার জ্ঞানে বিশেষ রূপরসাদিযুক্ত 'কমলানবু' রূপে প্রত্যক্ষ হয়, তোমার জ্ঞানে তাহা সেই একই প্রকার রূপরসাদিযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। এ জন্ত বাহু 'জগৎ সম্বন্ধে আমাদের সকলের প্রতীতি ও ব্যবহার প্রায় একই রূপ হইয়া থাকে। এই জন্ত তোমার ও আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ একই। ইন্দ্রিয়গণ বাহু জগৎকে আমাদের সকলের নিকট যেরূপে প্রত্যক্ষ করায়, আমরা সকলে তাহাকে সেইরূপেই গ্রহণ করি। কাহারও ইন্দ্রিয় বিকল, বিকৃত বা অশক্ত না হইলে, ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় না।

যে শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হইয়া, বাহুজগৎকে এই প্রকারে জ্ঞাতার নিকট জ্ঞেয়রূপে প্রকাশ করে, সেই শক্তির ধিনি আধার, ধিনি সেই শক্তিমান, তিনিই ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয়। যে কারণের অন্তর্ভূত সে শক্তি, সেই কারণকে 'মায়া' বলা হয়, প্রকৃতি বলা হয়, কখন পরাশক্তিও বলা হয়। আর সেই কারণের ধিনি কারণ বা আধার, তিনিই ব্রহ্মরূপে

জ্ঞেয় । অভ্যেব সর্বভূতের এই সকল ইন্দ্রিয়রূপে যিনি তাঁহার মায়াধা পরাশক্তি দ্বারা প্রকাশিত, সর্বেন্দ্রিয়গুণরূপে যিনি অভিব্যক্ত, এবং যিনি সেই শক্তি দ্বারা এই ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্ত্রা ও প্রেরয়িতা, তিনি ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয় । এই সর্বেন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণ দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে নির্দেশ করিতে পারি । এই শ্লোকে ইহাই উক্ত হইয়াছে । সর্বত্র সর্বজীবে সর্বেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গুণ-বিকাশ বাহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয় । তিনি স্বীয় মায়া দ্বারা বা পরাশক্তি-বলে সর্বেন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণ ও কার্যরূপে অভিব্যক্ত । তিনি তাহাদের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ ।

সকল জীবের সকল ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গুণ ও কর্ম একরূপ । এজন্য সকল ইন্দ্রিয়-প্রকাশক শক্তি এক অনন্ত, তাহা ব্রহ্মশক্তি । পতি জীবের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গুণ বিভিন্ন হইলে, জীবকেই তাহার ইন্দ্রিয় ও গুণ-বিকাশের কারণ বলা যাইতে পারিত । কিন্তু তাহারা ভিন্ন নহে । তাহারা একরূপ, একই নিয়মবদ্ধ । এজন্য সর্বজীবের সর্বেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গুণ—একই মূল শক্তির বিকাশভাৱ । এই এক আদি অনন্ত ইন্দ্রিয়-বিকাশশক্তির যিনি আধার, যিনি সেই শক্তিমান এবং সেই শক্তিজন্য ইন্দ্রিয়াদিরূপে তাহাদের অন্তরালে বিদ্যমান—তিনিই ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয় । তাহাকে এই সমুদায় ইন্দ্রিয়রূপ উপাধিযুক্ত ও সর্বেন্দ্রিয়গুণ-রূপে ভাসমান বলা যায় । তিনিই ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইয়া শব্দাদি বিষয়ের আধার আকাশাদি পঞ্চভূতরূপে এবং এই পঞ্চভৌতিক মূল বাহ্যজগৎরূপে ভাসমান আমাদের জ্ঞানে প্রত্যক্ষ গোচর হন, ইহাও বলা যায় । কিন্তু সে অতি দুর্জ্ঞেয় ও স্ব এ স্থলে বিচার্য্য নহে ।

আরও এক কথা । বাহ্য-জগৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের জ্ঞানে বেক্রপে প্রতিভাত হয়, তাহাতে তাহা আগাদের আত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বোধ হয় । বাহ্যজগৎ মূল । তাহা দেশকালে বিস্তৃত, দিক্, কাল ও

নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহা জড় ও পরিণামী । আর আমাদের আত্মা চেতন, দেশকালনিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সূক্ষ্ম, অপরিণামী । আত্মার যদি কোন ধর্ম থাকে, তবে তাহা জড়বর্গের ধর্মের বিপরীত । এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধধর্মী বস্তুদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ বা সংযোগ কিরূপে সম্ভব ? আত্মার স্থানকালে কোন বিস্তৃতি নাই, আত্মা দেশকাল-পরিচ্ছেদশূন্য । আত্মা সূক্ষ্ম । তাহাতে এই স্থূল দেশকালে বিস্তারিত জড়জগতের জ্ঞান কিরূপে হয় ? ইহার উত্তর সহজে দেওয়া যায় না । কেহ বলেন,—এই বাহু-জগতের সত্তা নাই, ইহা আমাদের আন্তরানুভূতির কারণরূপে বাহু-ভাবে কল্পনা মাত্র । এ জগৎ মনঃকল্পিত । কেহ বলেন,—আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । চৈতন্য-জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম জড়েরই, তাহা পরমাণুবিশেষের বিশেষ সমবায়সংযোগফল মাত্র । কেহ বা অণুরূপে এই আত্মা ও জড়ের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনা করিতে চেষ্টা করেন । পরন্তু যাহারা পণ্ডিত, তাঁহারা এই সম্বন্ধ হইতে উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া উভয়ের মধ্যে আদি পরমাণুপুঞ্জের নর্তন, অথবা এক আদি মহাশক্তির ক্রীড়া অথবা ভগবানের লীলা দেখিতে পান । আর যাহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা এই সম্বন্ধমধ্যে, এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধ ভিতরে পরব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ বা আভাস দেখিতে পান, এবং ব্রহ্মকে অনুভব করেন । এই ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই এবং এই ব্রহ্মশক্তিদ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় উপাধিবৃত্ত, পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং এই ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই নির্মল পরিপূর্ণ জ্ঞানে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়মধ্যে প্রতীয়মান যে ভেদ, তাহা দূর হইয়া উভয়ে একীভূত হইয়া জ্ঞানস্বরূপ সং-স্বরূপ ব্রহ্মত্ব প্রতিভাত হয় ।

বলিয়াছি ত, জীবজ্ঞানে প্রথমে এই অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণরূপ উপাধিদ্বারা জ্ঞাতা আত্মার সহিত জ্ঞেয় বাহু-জগতের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ; এবং এই সকল করণ দ্বারাই সেই বাহু-জগতের ব্যাপার আমাদের জ্ঞানে

প্রতিভাত হয় । এই সকল করণ যিনি নিজ পরাশক্তিবলে প্রকাশিত করিয়া দিয়া, বাহ্যজগৎকে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করেন, তিনিই সেই সকল করণকে যেকোন ধর্ম বা শক্তিবৃত্ত করেন, যেকোন ভাবে রূপাদি-গ্রহণশক্তি এই সকল করণে বিকাশিত করেন, তদনুসারে বাহ্যজগৎ রঞ্জিত হইয়া আমাদের জ্ঞেয় হয় । তদনুসারে বাহ্যজগতের রূপাদি বিষয় আমরা গ্রহণ করিয়া তাহাদের ভোগ্য করিয়া লইতে পারি ।

এইরূপে বাহ্য-জগৎ আমাদের জ্ঞেয় ও ভোগ্য হইয়া ক্রমশঃ জ্ঞান বিকাশিত হইতে থাকে, বুদ্ধি ক্রমে পরিপূর্ণ হইতে থাকে ; এবং সেই বুদ্ধি-জ্ঞানের ক্রম আপূরণ হেতু জাত্যন্তর-পরিণাম দ্বারা জীবের ক্রমোন্নতি হয় । মানুষে যখন এই জ্ঞান পূর্ণ বিকাশিত হইয়া চিত্তকে বাহির হইতে অন্তরে লইয়া যায়, আত্ম-চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ইন্দ্রিয়-জয় হয়, অশ্রুৎকরণ নিশ্চল হয় । তখন চিত্তবৃত্তি সমুদায় নিরোধ করিয়া তিনি জ্ঞাতৃস্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন, তিনি সাধনাবলে নিশ্চল জ্ঞান-স্বরূপে স্থিত হইতে পারেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয়াদিরূপ সর্ব-উপাধিশূন্য হইতে পারেন ; এবং তখনই তিনি এই জ্ঞেয়ের স্বরূপ অনুভব করেন, তখন 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়'কে একীভূত করিয়া তিনি এক ভূমা জ্ঞানসাগরে অবস্থান করিতে পারেন, তখন তাঁহার এই ব্রহ্ম-স্বরূপ অনুভব হয় । তখন তিনি জ্ঞেয় জগতের মধ্যে ও আপনার আত্মার মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করেন । আত্মা এইরূপে অজ্ঞানবৃত্ত হইয়া শুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন ।

সে যাহা হউক, এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, যিনি স্বশক্তিবলে সর্বজীবের মধ্যে ইন্দ্রিয়গণকে বিকাশ করিয়া দিয়া স্বয়ং সেই ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া, রূপরসাদিগ্রহণরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া এইরূপ রসাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে গ্রহণ করিয়া সর্বজীবজ্ঞানে বাহ্য-জগতের বিকাশ করেন, যিনি ইন্দ্রিয়-গণকে বহিমুখ করেন, যাহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—

“পরাঞ্চি ধানি ব্যতৃণৎ স্বয়ন্তু

তস্মাৎ পরাং পশুতি ন অন্তরায়া ।” (কঠ, ৪:১) ।

যিনি এইরূপে ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বজীবের সহিত বাহ্য-জগতের সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তিনি এই জ্ঞেয় ব্রহ্ম ।

সর্ব-ইন্দ্রিয়-বর্জিত (সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিতং)—সাক্ষাৎভাবে আত্মার সহিত করণ বা ইন্দ্রিয় সকলের কোন সম্বন্ধ নাই । আত্মা সর্বকরণ-বিরহিত । সুতরাং আত্মা সর্ব ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে ব্যবহারিকভাবে ব্যাপ্তের ন্যায় বোধ হইলেও পারমার্থিকভাবে আত্মার সহিত এই ইন্দ্রিয় সকলের কোন সম্বন্ধ নাই । এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

“আত্মা...ধ্যায়তি ইব লেলায়তি ইব ।”

বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩) ।

অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধির সহিত কীভূত হইয়া যেন চিন্তা করিতেছেন, বিচলিত হইতেছেন, এইরূপ বোধ হয় । আত্মা যেন ‘ধ্যায়তি’—অর্থাৎ সমুদায় জ্ঞানেন্দ্রিয়-ব্যাপার নির্বাহ করিতেছেন, এবং ‘লেলায়তি’—অর্থাৎ সমুদায় কর্মেন্দ্রিয়ব্যাপারে প্রবর্তিত হইতেছেন, এইরূপ বোধ হয় । বাস্তবিক তাহা নহে ।

শ্রুতিতে অত্র আছে—

“অপানিপাদো জ্বনো গ্রহীতা

পশুতাচক্ষুঃ স শৃণোতঃকর্ণঃ ॥”

(শ্বেতাশ্বতর, ৩।১২)

অর্থাৎ তাঁহার হস্ত বা পাদ নাই অথচ তিনি জ্ঞানবান্ এবং গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহার চক্ষু নাই, কিন্তু দেখিয়া থাকেন, তাঁহার কণ্ঠ নাই, তিনি শ্রবণ করেন । ইহার ভাব এই যে, আত্মাতে যে বাস্তবিক গতি প্রভৃতি ক্রিয়া আছে, তাহা নহে, ক্রিয়াবান্ উপাধির সহিত অধ্যাস হেতু সম্বন্ধ হয় বলিয়া তাহাকে ক্রিয়াবানের ন্যায় ব্যবহারিক জগতে

প্রতীয়মান হইতে হয় । “অন্ধ মণি দেখিতেছে” বলিলে ‘অন্ধ যে মণি দেখিতেছে’ বুঝিতে হয় ; সেইরূপ ব্রহ্ম ‘সর্বেশ্বরহীন অথচ সর্বেশ্বরযুক্ত ও সর্বেশ্বরগুণযুক্ত বলিলে সেইরূপ বুঝিতে হয় । উক্ত শ্রুতিমন্ত্রের অর্থও এইভাবে গ্রাহ্য (শঙ্কর) ।

সর্বেশ্বরবিবর্জিত অর্থে ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিনাও তিনি সমুদায় জানিতে পারেন, (রামানুজ) ।

ব্রহ্ম সর্বেশ্বরবিবর্জিত, ইহার অর্থ কি, তাহা পূর্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্চয়োজন । ব্রহ্ম নিগুণ নিরূপাধিক ভাবেই সর্বেশ্বরবিবর্জিত, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । শঙ্কর এই অর্থেই বলিয়াছেন যে, সোপাধিকভাবে ব্রহ্ম সর্বতঃ পানিপাদ মুখ শির চক্ষু শ্রোত্র ইত্যাদি যুক্তরূপে প্রতীয়মান হইলেও, নিরূপাধিকভাবে তিনি এ সকল ইন্দ্রিয়বিহীন । রামানুজ এইরূপ সোপাধিক ও নিরূপাধিক ভাবের প্রভেদ করেন নাই । তিনি অর্থ করেন যে, ব্রহ্মের চক্ষু নাই অথচ তিনি দেখিতে পান, কর্ণ নাই অথচ তিনি শুনিতে পান ইত্যাদি । এ অর্থও শ্রুতিসঙ্গত । “পশুতি অচক্ষুঃ, শৃণোতি অকর্ণঃ” এই যে শ্রুতি শঙ্কর উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে এই অর্থ প্রতীতি হয় । কিন্তু ঐ শ্রুতি পরমপুরুষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য :—

“তমাহুরগ্রাং পুরুষং মহাস্তম্”—উক্ত মন্ত্রে এই কথা উক্ত হইয়াছে । অতএব যিনি পরমেশ্বর পরমপুরুষ, তাহার সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে যে, তিনি চক্ষু না থাকিলেও দেখেন, কর্ণ না থাকিলেও শুনেন, অর্থাৎ তাহার কোন ইন্দ্রিয় না থাকিলেও সর্বেশ্বর-ব্যাপার তিনি নিরীহ করেন । তাহার কোন জ্ঞানেশ্বর না থাকিলেও তিনি সর্বজ্ঞ, এবং কোন কর্মেশ্বর না থাকিলেও সর্বকর্তা ।

“তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবোজম্ ।” (পাতঞ্জল দর্শন, ১।২৫) ।

“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ ।” (মুণ্ডক, ১।১।৯) ।

আত্মার ইন্দ্রিয় না থাকিলেও যে ইন্দ্রিয়গুণের আভাস থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। যোগবলে যোগদৃষ্টি (Clairvoyance) দ্বারা যোগী অতিদূরস্থ ব্যাপারও দেখিতে পান, ঋষিগণ ত্রিকালদর্শী হন। সেইরূপ যোগী অতি দূরের শব্দ কর্ণ দ্বারা না শুনিয়াও শুনিতে পান (Clairvoyance)। এই যোগ দর্শন ও শ্রবণ জন্ম চক্ষু বা কর্ণেন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক করে না। অন্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই কথা। ইন্দ্রিয়-সাহায্য ব্যতীত বধন আমাদের পক্ষেই এইরূপ দর্শনাদি সম্ভব হয়, আমরা বধন নিদ্রার বিশেষ অবস্থায় (Somnambulism) মুদ্রিত চক্ষে বাহ্য বিষয় স্পষ্ট দেখিতে পাই, তখন পরমেশ্বর যে সর্কেন্দ্রিয়বর্জিত হইয়াও সর্কেন্দ্রিয়ব্যাপার নির্বাহ করিতে পারেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আত্মস্বরূপে যোগবলে অবাস্থিত হইয়া সর্কচিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়াও আমরা যাহা পারি, সর্কাত্মস্বরূপ পরমেশ্বর যে তাহা পারেন না, তাহা কখন বলিতে পারা যায় না। সাধারণতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়-সাহায্যেই প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু সে প্রত্যক্ষ যোগজ প্রত্যক্ষ ও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হইতে ভিন্ন।

অতএব পরমপুরুষ পরমেশ্বর সম্বন্ধে “পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ” এই মন্ত্রের অর্থ আমরা বুঝিতে পারি। তিনি প্রতি জীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের সকলকে দর্শন-গমনাদি কর্ণে নিয়োজিত করেন, আমাদের দ্বারা এই সকল কর্ম সম্পাদন করান, এবং আমাদের দর্শন দ্বারা তিনিও দর্শন করেন, আমাদের গমনের দ্বারা তিনিও গমন করেন, এ কথা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু গীতার এ স্থলে যে পরমব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে যে এ ভাবে এ কথা প্রযোজ্য হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ভেদ নাই। এজন্য নিকৃপাধিক ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বলা যায় না, সর্কজ্ঞ বলা যায় না। একরূপ সর্কজ্ঞ হইতে হইলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়মধ্যে ভেদ-স্থাপন করিয়া সর্কজ্ঞের বস্তুর জ্ঞাতা হইতে হয়। অতএব এই সর্কজ্ঞত্ব—নিরূ-

পাধিক ব্রহ্মের নহে, ইহা সোপাধিক সগুণ ব্রহ্মের পরমেশ্বরতাবের শক্তি । অতএব এ স্থলে অর্থ—পরব্রহ্ম নিক্রপাধিক, নিগুণ ভাবে সর্বে-
শ্রিয়-বিবর্জিত, আর সোপাধিক ভাবে সর্বেশ্রিয় ও সর্বেশ্রিয়গুণ-
যুক্ত । ইহা আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । অতএব এ স্থলে
শব্দের অর্থই গ্রাহ্য ।

এই ইশ্রিয় ও ইশ্রিয়-ব্যাপারের সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে
অনেক শ্রুতি আছে । পূর্বে তাহার কতক উদ্ধৃত হইয়াছে । এ স্থলে
আরও দুই একটি শ্রুতি মাত্র উদ্ধৃত হইল ।

“শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসো মনো, যৎ বাচো হ বাচং স উ

প্রাণশ্চ প্রাণঃ, চক্ষুষ্চক্ষুঃ... ।” (কেন ২)

“ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনঃ ।” (কেন ৩)

“যৎ বাচানভ্যাদিতং যেন বাক্ অভ্যাত্ততে ।

তদেব ব্রহ্ম যৎ বিদ্ধি... ॥ (কেন ৪)

যন্মনসা ন মনুতে, যেনাহম'নো মতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম যৎ বিদ্ধি... ॥ (কেন, ৫)

যৎ চক্ষুর্বা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি ।

তদেব ব্রহ্ম যৎ বিদ্ধি... ॥ (কেন, ৬) ।

যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রম্ ইদং শ্রুতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম যৎ বিদ্ধি... ॥ (কেন ৭)

“যঃ বাচি...চক্ষুষি...শ্রোত্রে...মনসি...শ্ৰুচি...বিজ্ঞানে...রেতসি...
তিষ্ঠন (এতেষাম্... অন্তরং, যস্য...(এতে) শরীরং, যঃ (এতান্... অন্তরো
যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ ।” (বৃহদারণ্যক, ৩।৭।১৭-২২)

“যঃ অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতো মন্তু', অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা,
নাগ্নতোহস্তি দ্রষ্টা, নাগ্নতোহস্তি শ্রোতা, নাগ্নতোহস্তি মন্তা, নাগ্নতোহস্তি
বিজ্ঞাতা, এষ ত আত্মা... ।” (বৃহদারণ্যক, ৩।৭।২৩) ।

ব্রহ্মের অন্তর্গামী পরমাত্মস্বরূপ সশব্দে এই সকল শ্রুতি উক্ত হইয়াছে । তিনিই সর্বজীবের সকল চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন, সকল শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করেন, সকল মনের দ্বারা মনন করেন, সকলের বিজ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞাতা হন । তিনি সকলের অন্তরে অবস্থিত, সকলের অন্তর্গামী, সকল জীবের শরীর, সমুদায় জগৎরূপ শরীর যাহার শরীর, যিনি সর্বাস্তুরাত্মা, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না ; জানিতে পারে না । ইহা ব্রহ্মের সোপাধিক স্বরূপ । নিরূপাধিক প্রপঞ্চাতাতরূপে তিনি এ সকলের অতীত ।

অসক্ত হইয়া সর্ববর্ত্তা ।—“সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম সর্বকরণবর্জিত বলিয়া অসক্ত—অর্থাৎ সর্বপ্রকার সংশ্লেষরূপে সংযোগ-বিরহিত । যদিও ব্রহ্ম সর্বসঙ্গবর্জিত, তথাপি তিনি সকল পদার্থের একমাত্র আশ্রয়, তিনি সকল বস্তুকে ধারণ করিয়া আছেন । এ জগতের সকল বস্তু সেই ‘সং’কে বা ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । কারণ, সকল বুদ্ধির সহিত সংবুদ্ধি সর্বদা অনুগত আছে । যুগতৃষ্ণিকা ‘অসং’ হইলেও একেবারে অসং বুদ্ধির বিষয় নহে, তাহাতেও সংবুদ্ধি অনুগত থাকে । সত্তাহীন কোন বস্তুই ধারণা করা যায় না । সুতরাং সংস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা, সকল বস্তুই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । এজন্ত ব্রহ্ম সর্বভূৎ । (শঙ্কর) ।”

* বলা যাইতে পারে যে, যে হেতু, ব্রহ্ম সর্বভূৎ এ জন্ত এ জগৎ যে সত্তায়ুক্ত, বাস্তব তাহা প্রমাণিত হয় । আমি বহু হইব—ব্রহ্মের এই ঐক্য বা সংকল্প হইতে যে ‘বহু’ কল্পনা নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত হইয়া এ জগতের সৃষ্টি হয়, ব্রহ্ম তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন বলিয়া তাহা তাঁহার সত্তায় সত্তায়ুক্ত হয় । জগতে যখন যেখানে যে বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, এই ব্রহ্মসত্তা হেতু তাহা সত্তায়ুক্ত ভাবে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, এই জন্ত ব্রহ্মকে সর্বভূৎ বলা যায় ; এজন্ত বালিতে হয় যে, এই ব্রহ্মকল্পিত জগৎ ব্রহ্মসত্তায় সত্তায়ুক্ত হইয়া আমাদের জ্ঞেয় হয় । তাহা অলৌকিক স্বপ্ন নয় । এই ব্রহ্মজ্ঞান (absolute Reason ও absolute power) সশব্দেই thought is being বলা যায় । আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও শক্তিহেতু আমাদের কল্পনা কদাচিৎ সত্তায়ুক্ত (realised) হইতে পারে ।

সর্বসঙ্গরহিত হইয়াও তিনি সর্বাধিষ্ঠান, তিনি নিজ সত্তামাত্র দ্বারা কেবল অধিষ্ঠান হইতেই সকলকে পোষণ করেন (গিরি) । যতাবতঃ ব্রহ্ম দেহাদিসঙ্গরহিত, অথচ তিনি দেবাদি-দেহ-ভরণ-সমর্থ (রামানুজ) “সঃ একধা ভবতি দ্বিধা ভবতি ত্রিধা ভবতি” ইত্যাদি শ্রুতিঃ (ছানোগ্য ৭।২৬।২) । ব্রহ্ম সঙ্গশূন্য, তথাপি সকলের আধারভূত (স্বামী) । ব্রহ্ম পরমার্থতঃ অসক্ত বা সর্বসঙ্গশূন্য অথচ দ্বারা দ্বারা তিনি সকলের ভরণকারী বা ধারয়িতা । সদাশ্রী দ্বারা সমুদায় কলিত জগৎ ধারণ করেন, পোষণ করেন । দ্বারা হেতু সর্বভূত তাঁহাতে অধিষ্ঠিত—ইহা ব্রহ্ম হয়, বাস্তবিক তাঁহা নহে, (মধু) । ব্রহ্ম সর্বতত্ত্বধারক হইয়াও অসক্ত । কেবল সংকল্প দ্বারা ধারণ করেন, অথচ তাঁহার স্পর্শ রহিত । (বলদেব) ।

গীতার অসক্ত হইয়া নিকামভাবে কর্তব্য কর্ম করিবার ও পরহিতার্থ কর্ম করিবার উপদেশ আছে । যথা—

“অসক্তঃ স বিশিষ্যতে ।” ৩।৭

“কর্ম...যুক্তসঙ্গঃ সমাচর ।” ৩।৯

“তস্মাৎ অসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর ।” ৩।১৬

“কুর্য্যাৎ বিদ্যাংস্তথাসক্তাশ্চকৌর্লোকসংগ্রহম্ । ৩।২৫

যাহুব এইরূপে অসক্ত হইয়া কার্য কর্ম করিতে পারে । ভগবান্ও বলিয়াছেন, তিনি অসক্ত হইয়া কর্ম করেন, তাঁহার জন্মও দিব্য— অলৌকিক । যথা—

“ন চ মাং তানি কর্মাণি নিব্রুন্তি ধনঞ্জয় ।

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মষু ॥” ৯।৯

অতএব ভগবান্ যথাক্রমিতে অধিষ্ঠান পূর্বক জগতের সৃষ্টিহিত, রক্ষাও লয় কার্য করেন, অবতীর্ণ হইয়া ধর্মরক্ষা ও অধর্মবিনাশ কর্ম করেন, অথচ সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে অসক্তভাবে অবস্থান করেন । ব্রহ্ম অসক্ত ।

হইয়াও সর্কভূৎ—সর্কধারণকর্তা হন । সঞ্জ্ঞা ঈশ্বররূপে ব্রহ্ম এইরূপ অসক্ত হইয়া সর্কভূৎ হন, ইহা বলা যাইতে পারে ।

কিন্তু এ স্থলে আরও এক অর্থ হইতে পারে । ভগবান্ অসক্ত হইয়াও কেন কৰ্ম্ম করেন, কেন লোক রক্ষা করেন, তাহা তিনিই বলিয়াছেন—

“ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তবাং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাপ্তুমবাপ্তবাং বৰ্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ।

যদি হুহং ন বৰ্ত্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মণ্যতঙ্গিতঃ ।

মম বৰ্ত্তানুবৰ্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্কশঃ ॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কৰ্ম্ম চেদচম্ ।”

(গীতা ৩।২২-২৪)

অতএব ভগবান্ বিক্রূপ অসক্ত হইয়া ‘কৰ্ম্ম’ দ্বারা সর্কভূৎ হন, তাহা এস্থলে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । কিন্তু পরমব্রহ্ম বিক্রূপে অসক্ত হইয়া সর্কভূৎ-রূপে জ্ঞেয়, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায় না । পরমব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞানরূপ ও মায়াধা পরাশক্তির আধার । এই অনন্ত জ্ঞান ও শক্তিস্বরূপে স্বভাবতঃই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় নিত্য তাঁহার স্থান-কাল-রূপ আধারে প্রকাশিত হয় । ইহাতে সেই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপের কোন প্রচ্যুতি হয় না । সার্ব জগৎ সে অনন্ত জ্ঞানে কোন বিক্ষোভ উৎপাদন করে না । তাঁহার প্রপঞ্চাতীত নির্বিশেষ ভাবের কোন ব্যত্যয় হয় না । সেই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপে তিনি অসক্ত । এ কথা আমাদের জ্ঞানের ক্রিয়া হইতেও বুঝা যাইতে পারে । আমাদের অনেক কৰ্ম্ম আছে, যাহা স্বাভাবিক, অনায়াস-সাধ্য । ইংরাজীতে তাহাকে Instinctive কৰ্ম্ম বলে । সে কৰ্ম্ম সম্পাদন অল্প জ্ঞানের কোন চেষ্টা বা আয়াস করিতে হয় না । জ্ঞানকে তাহার কৰ্ত্তব্য অকৰ্ত্তব্য স্থির করিতে হয় না, তাহা কি উপায়ে সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা বিচারপূর্কক স্থির করিতে হয় না । তাহা unconscious cerebration হইতে কৃত হয় । অনেক কৰ্ম্ম প্রথমে

আয়াসসাধা থাকে, তাহা সম্পাদন জন্য অনেক চেষ্টা করিতে হয় । পরে অভ্যাসের ফলে তাহা সহজ হইয়া যায় । আর তাহার জন্য আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধির কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না । ‘ক’ অক্ষর লেখা অভ্যাস করিতে বাগকের কত বড় কত আয়াসের প্রয়োজন হয় । পরে ‘ক’ লিখিতে আর কোন ভাবনা হয় না ।

এইরূপ অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ ব্রহ্মে যে জগৎ-সৃষ্টি-রক্ষাদি কৰ্ম বিবর্তিত হয়, তাহা তাঁহার স্বাভাবিক । তাহার জন্য ব্রহ্মের কোন আয়াসের প্রয়োজন হয় না, কোন বিচার বা চিন্তা করিতে হয় না । সে জ্ঞানে জগৎ কল্পনা স্বাভাবিক—স্বতঃসিদ্ধ ; এবং সে কল্পনাকে সংক্রমে বিবর্তিত করাও তাহার স্বভাবসিদ্ধ । আমরা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে গেলে, প্রথমে তাহা কিরূপে ও কি উপায়ে করিতে চাইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিয়া লই । আমাদের জ্ঞান ও শক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া এরূপ হয় । কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান—অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন । সে জ্ঞানে এ জগৎ-সৃষ্টি-রক্ষা কৰ্ম জন্য সেট অনন্ত জ্ঞানের কোন ক্রিয়া হয় না, জ্ঞানের ক্রিয়া না হইলে, তাহার বিচলন না হইলে, তাহার স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি না সত্য, কিন্তু আমাদের জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ অনুমেয় নহে । আমাদের জ্ঞান এইরূপ ক্রিয়াশীল হইলে, তাহা চেতনাবুদ্ধি—conscious হয় । জ্ঞান ক্রিয়াবহু্য না আসিলে তাহা unconscious থাকে । ব্রহ্মজ্ঞান—আমাদের জ্ঞানের দ্বারা conscious নহে । জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন না হইলে—দেশকালাদি সীমাবদ্ধ না হইলে, তাহা unconscious হয় না । **এজন্য** ব্রহ্মজ্ঞান—unconscious । * চেতনা ক্ষেত্রের ধর্ম, চেতনাবুদ্ধি জ্ঞান বুদ্ধিরই অবস্থা বিশেষ । তাহাও ক্ষেত্রের ধর্ম (গীতা, ১৩,১-৬) । এই চেতনাবুদ্ধি জ্ঞান ক্ষেত্রক্ষেত্রের ধর্ম নহে, সুতরাং তাহা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের ধর্ম

* ‘যাঁহারা এই তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা জর্জান দার্শনিক Hatan ইন্ড The Philosophy of the unconconscious’ পুস্তক পাঠ করিবেন ।

হইতে পারে না । ব্রহ্মজ্ঞানে যে কল্পনা বা ঈক্ষণ হইতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়, সে কল্পনা (Idea) ও চেতনায়ুক্ত নহে । তাহা unconscious । জ্ঞানের চেতনায়ুক্ত অবস্থার (conscious অবস্থার) তাহাতে 'সঙ্গ' সম্ভব হয় । যে জ্ঞান ক্রিয়াশীল নহে বা চেতনায়ুক্ত নহে (যাহা unconscious), যাহা আমাদের নিজীবস্থার কতক অনুরূপ ; তাহাতে কোনরূপ 'সঙ্গ' সম্ভব হয় না ।* যে কৰ্ম স্বাভাবিকভাবে আপনা আপনি সম্পাদিত হয়, তাহাতে কাহারও প্রয়োজন অপ্রয়োজন বোধ থাকে । নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি প্রাণকর্মে আমাদের কোন প্রয়োজনবোধ নাই, তাহাতে কোন আসক্তিও নাই ।

এইরূপে ব্রহ্ম সর্বভূৎ হইয়া—সমস্ত জগদব্যাপার-নির্বাহক হইয়াও 'অসক্ত ।' ব্রহ্মশক্তি অনন্ত আধারে স্থিত হইয়া স্বতঃই কার্যকরী হয় । সেই অনন্ত জ্ঞানে অবাস্থিতি হেতু সে শক্তির কার্য্যাবহার পরিণতিতে কোন ভুলভ্রান্তি নাই, কোথাও কোন ইতস্ততভাব নাই, কোথাও বিচার-বিতর্ক পূর্বক জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইতে হয় না । তাহা অভ্রান্ত । তাহা আমাদের আসক্তিয়ুক্ত সীমাবদ্ধ চেতনায়ুক্ত (conscious) জ্ঞানে পরিচালিত কর্মের স্থায় সীমাবদ্ধ, ভ্রমপূর্ণ বা খণ্ডিত নহে । ব্রহ্মশক্তি জগদ্রূপ কার্য্যবিকাশ হেতু সেই অনন্ত প্রজ্ঞা অপ্রজ্ঞার অতীত (unconscious) জ্ঞান স্বরূপে কোন বিচলন বা প্রচ্যুতি হয় না । যেখানে জ্ঞানের ক্রিয়া নাই, নিদ্রা বা তুরীর অবস্থার স্থায় জ্ঞান যেখানে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-রূপে পৃথক্ হইয়া প্রকাশিত না হয়, সেখানে জ্ঞাতার জ্ঞেয় বস্তু ভোগের জন্য কিছুমাত্র আসক্তি আসিতে পারে না । সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে কোন আসক্তি থাকিতে পারে না ।

গুণভোক্তা নিগুণ হইয়া (নিগুণং গুণভোক্তৃ চ)—ব্রহ্ম নিগুণ

* "সমাধিবুধির্মোক্ষেরূ ব্রহ্মরূপতা "সাংখ্যদর্শন ।"

অথচ গুণভোক্তারূপে জ্ঞেয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ। ব্রহ্ম এই গুণত্রয়-বিরহিত। তথাপি ব্রহ্ম গুণভোক্তা। অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি বিষয় দ্বারা সুখ-দুঃখ-মোহরূপে পরিণত এই সত্ত্ব রজঃ তম—ত্রিগুণের ভোক্তা আত্মারূপে অথবা তাচার উপলক্ষা বা প্রকাশয়িতারূপে জ্ঞেয়, (শঙ্কর)। নিগুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণ-রহিত, অথচ সত্ত্বাদি গুণের ভোগ-সমর্থ (রামানুজ)। গুণভোক্তা অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণের পালক (স্বামী)। পরমার্থতঃ ব্রহ্ম নিগুণ বা সত্ত্বরজস্তমোগুণরহিত ও শব্দাদি বিষয় দ্বারা সুখ-দুঃখ-মোহাকারে পরিণত ত্রিগুণের ভোক্তা বা উপলক্ষা (মধু)। নিগুণ—শ্রুতিতে আছে, “সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ।” (শ্বেতাশ্ব-তর, ৬।১১)। নিগুণ, অথচ মায়াগুণ দ্বারা অস্পৃষ্ট। গুণভোক্তা, অর্থাৎ সদৃশ-ভোক্তা (বসুদেব)।

ব্রহ্ম যে গুণভোক্তা, সে সত্ত্বকে শ্রুতি এই—

“ষষ্ঠ স্বভাবঃ পচতি বিশ্বযোনিঃ

• পচ্যাংশ সর্বান্ পরিণাময়েৎ যঃ।

সৰ্বমেতদ্বিশ্বং অধিতিষ্ঠত্যেকো

গুণাংশ সর্বান্ বিনিযোজয়েৎ যঃ ॥

• • • • •

গুণাবয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা

কৃতস্ত তস্মৈব স চোপভোক্তা।

স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ষা

প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ ॥”

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৫।৫, ৭)।

অতএব ব্রহ্ম গুণ সকলকে—এই প্রকৃতির ত্রিগুণকে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত করেন, তিনি এই ত্রিগুণের সহিত অস্থিত বা যুক্ত হইয়া ফল-বৎ (অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদি ফলবৎ) কর্ম করেন, এবং সেই কর্মের

ফলভোগ করেন, তিনি বিশ্বরূপ, ত্রিগুণ, ত্রিবিশ্ব, (ধর্ম্য ও অধর্ম্য এবং জ্ঞান-রূপ মার্গে বিচরণকারী) হইয়া প্রাণের আধিপতি হইয়া স্বকর্মরূপে সঞ্চরণ করেন । ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম জীবাশ্মরূপে এবং জীবাশ্মা হিরণ্যগর্ভরূপে এই প্রকারে গুণভোক্তা হন । নিগুণ ব্রহ্ম গুণভোক্তারূপে সগুণভাবে জ্ঞেয় হন ।

ব্রহ্ম নিগুণ, নিগুণরূপে তাঁহাতে কোন ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না । প্রকৃতির ত্রিগুণ হহতে সুখ-দুঃখ-মোহাশ্মক ভোগ হয় । ব্রহ্মে যে পরমা মায়াক্রম আছে—যাহা হইতে প্রকৃতিতে সখ্যঃ রজঃ ও তমঃ এই ত্রিভাবের বিকাশ হয়, সেই প্রকৃতি ব্রহ্মে স্থিত । ব্রহ্ম এই সখ্য, রজঃ তমোষুক্ত প্রকৃতির আধার বলিয়া, সেই প্রকৃতির গুণক্রিয়া হইতে যে সুখ-দুঃখাদি-ভোগ উপস্থিত হয়, তাহা ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মে আরোপিত হয় । অনন্ত জ্ঞান ও শক্তিরূপ ব্রহ্ম আধারে প্রকৃতির ক্রিয়া হইতে এই ভোক্তৃত্ব-ভাব বিকাশ হইলেও সেই অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানে কোন প্রচ্যুতি হয় না । এই জগৎসম্বন্ধ হেতু জগৎকারণ ব্রহ্মে ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা ভাব হয়, তাহা পরে উক্ত হইয়াছে । জীবাশ্মা—

“আশ্রয়িত্রয়মনোযুক্তং ভোক্তৃত্যাহম'নীষিণঃ ।”

(কঠ, ৩৪)

আশ্মাই ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত হইয়া ভোক্তা হয় বা প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া অজ্ঞান-বশে প্রকৃতির সুখ-দুঃখ-মোহাদি ভোগ করে । ব্রহ্ম সেরূপ গুণ-ভোক্তৃত্বভাবে জ্ঞেয় নহেন । জীবাশ্মাই সেইরূপ গুণভোক্তা ভাবে জ্ঞেয় । তবে ব্রহ্মের ফলভোক্তৃত্ব কিরূপ ? যে কারণে সর্বোত্তম-বিবর্জিত ব্রহ্ম সর্বতঃ পাণপাদাদি সর্বোত্তমযুক্ত, এবং সর্বোত্তম-গুণাভাসযুক্তরূপে জ্ঞেয় হন, সেই কারণে তিনি নিগুণ হইয়াও গুণ-ভোক্তারূপে জ্ঞেয় । সাগরে ফেন-তরঙ্গ-বরফত্বপূর্ণ আদি ভাসমান থাকিলে, সাগর সেই ফেন-তরঙ্গ-হীন হইয়াও ফেন-তরঙ্গ দ্বারা জ্ঞেয় হয় ।

ব্রহ্মও সেইরূপ প্রকৃতিজ গুণ ও গুণফলভোক্করূপে জ্ঞেয় হন । গুণ ও গুণক্রিয়া হেতু জ্ঞান ব্রহ্ম আধারে প্রকাশমান বলিয়া তাঁহাকে সর্ব গুণভোক্করূপে প্রতীয়মান করা হয় । এই প্রকৃতিজ গুণকোত্ত ব্রহ্ম কারণ হইতে প্রবর্ত্তিও হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান তাহাতে বিক্ষুব্ধ হয় না । ব্রহ্ম নিগুণ, অসক্তই থাকেন । তাঁহাতে অজ্ঞানের কোন ক্রিয়া বা আবরণ নাই । অবশ্য প্রত্যগাত্মার স্বরূপ অনুভব হইতে পরমাত্মা পরব্রহ্ম সম্বন্ধে এই জ্ঞান হয় । এই 'একাত্মপ্রত্যয়' হইতে পরিলক্ষ জ্ঞানে ব্রহ্ম নির্মল অথচ গুণভোক্করূপে জ্ঞেয় হন ।

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং চরং চরমেব চ ।

সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাস্তিকে চ তৎ ॥ ১৫

সর্বভূতদের তিনি বাহির অন্তর,

তিনিই চর তিনিই অচর ; অবিজ্ঞেয়—

সূক্ষ্ম হেতু, তিনি দূরে তিনিই নিকটে । ১৫

১৫ । সর্বভূতদের তিনি বাহির অন্তর (বহিরন্তশ্চ ভূতানাং;)—

অমানসাদিরূপ নির্মল জ্ঞানে আত্মরূপ অনুভূতির সহিত ব্রহ্ম কিরূপে জ্ঞেয় হন, তাহা পূর্বে দুই শ্লোকে যেরূপে উক্ত হইয়াছে; এ স্থলেও তাহা সেইরূপে উক্ত হইতেছে । আমাদের অজ্ঞানজড়িত জ্ঞানে স্বক্ পর্য্যন্ত দেহকে অবিচার করনার আত্মা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । সেই দেহকে অপেক্ষা করিয়া তাহাকে অবধিস্বরূপ ধরিয়া তাহার মধ্যে আত্মার প্রতীতি হয়, আর নির্মল জ্ঞানে আত্মাকে দেহ দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, দেহের অন্তরে ও দেহের বাহিরে সর্বগতরূপে ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয় হয় । আত্মভাবে প্রতীয়মান দেহের অন্তরে ও বাহিরে ব্রহ্ম অবস্থিত । এ স্থলে প্রত্যগাত্মাকে অপেক্ষা করিয়া সেই

দেহকে অবধি ধরিয়া ‘অন্তর’ ও ‘বহিঃ’ শব্দ এ স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে (শরীর)। বাহিরে অর্থাৎ সমুদায় বাহ্য বিষয়াদিস্বরূপে বিষয়াত্মক হইয়া আর অন্তরে (অন্তঃ) বা সর্বভূতমধ্যে প্রত্যগাত্মরূপে । আর বাহ্য বিষয় ও প্রত্যগাত্ম উভয়ের মধ্যে নানাবিধ দেহরূপে ভাসমান । (গিরি) । ব্রহ্ম পৃথিব্যাঙ্গি ভূত সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর হইতে বাহিরে, এবং তাঁহার অন্তরে অবস্থান করেন । ‘ব্রহ্ম ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা পানৈর্বা’ ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ (ছান্দোগ্য, ৮.১২।৩) । স্বচ্ছন্দ বৃত্তিতে বিচরণ করেন (রাধামুজ) ।

স্বকাৰ্য্য চরাচর ভূতগণের বাহির ও অন্তর । কটকি-কুণ্ডলাদির সুবর্ণই যেমন কারণরূপে তাহার বাহির অন্তর, জলতরঙ্গের যেমন জল অন্তর ও বাহির, সেইরূপ ব্রহ্ম চরাচর সর্বভূতের অন্তর ও বাহির (স্বামী) । ভবন বা উৎপত্তিধর্ম্মযুক্ত যাহারা, তাহারা ভূত ; কল্পিত সমুদায় ভূত ; কার্যের ব্রহ্মই অকল্পিত একমাত্র অধিষ্ঠান । একা তিনিই সকলের অন্তরে বাহিরে স্থিত । সর্পভ্রম যেমন রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া স্থিত, সেইরূপ এই মায়াকল্পিত সর্বভূত সেই ব্রহ্ম আধারে স্থিত । তিনি সর্বাঙ্গ-স্বরূপে সর্বব্যাপক (মধু) । চিৎ-জড়াত্মক সমুদায় জগতের বাহ্যে ও অন্তরে স্থিত, নারায়ণ সেই সমুদায় ব্যাপিয়া অবস্থিত (বলদেব) । ভূতগণের শরীরের মধ্যে ও শরীর হইতে বাহিরে স্থিত (হয়) । শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—“তৎ অন্তরস্থ সর্বস্থ তৎ সর্বশাস্ত্র বাহ্যতঃ” (ঈশ উপনিষদ্ ৫) । ভগবান্ যে সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত, তাহা পূর্বে বলিয়াছেন । গীতার পূর্বে উক্ত হইয়াছে—

“ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূৎ নচ ভূতহোঁ মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥” ৯।৪-৫ ।

ভগবানের বাহ্য অব্যক্ত মূর্তি—তাহা সগুণ ব্রহ্মরূপ । সেইরূপে তিনি সর্বজগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত । একত্র সর্বভূত ভগবানের অন্তরে অবস্থিত । ভূত—ব্যাপ্য আর ভগবানের এই অব্যক্ত মূর্তি—ব্যাপক । এই ব্যাপকরূপে তিনি যেমন জগতের সহিত—সর্বভূতের সহিত সংস্পৃষ্ট এবং সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত, সেইরূপ জগদতীত অব্যক্ত হইতেও অব্যক্তরূপে তিনি জীবগণমধ্যে জগৎমধ্যে অবস্থিত নহেন । ব্রহ্ম পরমেশ্বররূপে ‘ঐশ্বরীয়’ যোগবলে ভূতভর্তা ও ভূতস্থ এবং আত্মস্বরূপে ভূতভাবন চাইলেও নিগূর্ণরূপে জগদতীতরূপে তাঁহার মধ্যে ভূতগণ অবস্থান করেন না । এই কথাই অর্থ আমরা উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি : ভগবান্ এই তৎ পরবর্তী শ্লোকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন—

“বথাকাশস্থিতো নিতাং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।

তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধায় ॥” ৯।৬ ।

আকাশরূপ ব্যাপক আধারে যেমন সর্বত্রগামী মহান্ বায়ু নিত্য মাথেররূপে ব্যাপ্য ভাবে অবস্থিত, সর্বভূতও সেইরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত । আকাশের মধ্যে বায়ু অবস্থিত হইলেও আকাশ বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট নহে । সর্বভূতের সহিত ব্রহ্মও সেইরূপ সংশ্লিষ্ট নহে । আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের কথাই বলিতে পারি যে, ইথর (Ether) বা আকাশভূত যেমন সমুদায় স্থূলজড় (ponderable matter) ভৌতিক পদার্থের অন্তরে ও বাহিরে অসংশ্লিষ্টভাবে অবস্থিত এই আকাশের কারণ, আত্মাও সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত ।

স্মৃতিতে আছে,—

“তৎ অন্তরন্ত সর্বন্ত তচ্ সর্বস্তায় বাহতঃ ।”

(ঈশ উপনিষদ, ৫) ।

অন্তর আছে,—

“স বাহ্যাত্মস্তরো হৃদয়ঃ ।” (মুণ্ডক উপনিষদ, ২।১।২) ।

ভগবান্ যেরূপ সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, ব্রহ্মও সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত বটে । কিন্তু আরও কিছু বিশেষ আছে । ব্রহ্ম নিঃশূন্য নিক্রপাধিকরূপে প্রপঞ্চাতীত জগতের বাহিরে অবস্থিত । সগুণরূপে তিনি জগতের আধার ; জগতে সর্বত্র অল্পপ্রবিষ্ট । এই সগুণরূপে ব্রহ্ম সর্বভূতের—জীবজড়ময় সমুদায় জগতের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত । তিনি পরমেশ্বররূপে ঐশ্বরীয় যোগপ্রভাবে সকলের নিয়ন্তা হইয়া সর্বাস্তর্যামিরূপে সর্বভূতময় জগতের অন্তরে অবস্থিত । সর্বাশ্বরূপে সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত, অথচ তিনি সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত নহেন । সর্বকারণরূপে সর্বাধাররূপে তিনি সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত । ব্রহ্মই জগতের সংকারণ । সর্বভূত তাঁহাতে কল্পিত হইলেও তিনি সর্বভূতে আধিষ্ঠিত বলিয়া সর্বভূতের চিত্তে বা উপাধিতে তিনিই আশ্বরূপে প্রতিবাসিত হন বলিয়া, এই প্রতিবাস্বরূপে তিনি সর্বভূতের অন্তরে অবস্থান করেন এবং স্বরূপে তিনি সর্বভূতের বাহিরে থাকেন বলিতে পারা যায় । অথবা আপনার অংশরূপে, বিশ্বরূপে, ক্ষুণ্ণরূপে তিনি জীবাশ্রয়ী হইয়া, পরিচ্ছিন্ন হইয়া সর্বভূতের অন্তরে অবস্থান করেন । পূর্ণস্বরূপে তিনি সর্বভূতের বাহিরে অবস্থান করেন । এইরূপে তিনি সর্বভূতের বাহ্য ও অন্তর । বাহ্য হউক, জগৎ কল্পিত হইলেও তাহা মায়াময় অলৌকিক নহে । তাহা ব্রহ্মসত্তার সত্তাব্যক্ত । সেই সত্তাধিষ্ঠান হেতু ব্রহ্ম সর্বভূতের বাহিরে ও অন্তরে স্থিত । শব্দের অর্থ যেরূপ গিরি বুঝাইয়াছেন, তাহার মায়াবাদ ত্যাগ করিলে, সেই অর্থই বিশেষ সঙ্গত বোধ হয় । জীবাশ্রয়ী, জীবচিত্ত, জীবদেহ ও জীবের নিকট প্রতিভাত বাহ্যজগৎ এই করূপে সগুণ ব্রহ্ম জের, নিঃশূন্যরূপে তিনি সকলেরই বাহিরে, সর্বপ্রপঞ্চাতীত ।

তিনি চর—তিনিই অচর ।—(অচরং চরমেব চ)—ব্রহ্ম সর্ব-
ভূতের অন্তরে ও বাহিরে—তাহাদের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, ইহা বলা
হইয়াছে । প্রশ্ন হহতে পারে যে, তবে কি ‘মধ্যে’ অর্থাৎ উভয়ের মাঝ-
মাঝি দেশে তাঁহার অবস্থিতি নাই ? এই প্রশ্নকা দূর করিবার জন্য
বলা হইয়াছে যে, তিনি ‘চর’ও বটেন, অচরও বটেন । এ সংসারে
যাহা কিছু ‘চর’ (জঙ্গম) ও যাহা কিছু ‘অচর’ (স্থাবর)—এই চরাচর
সেই ব্রহ্মেই আত্মভাবে আরোপিত, তাহা সকলই আত্মা । ব্রহ্মভূতে
যেমন সর্পের আভাস, আত্মাতেও সেইরূপ ‘চরাচরের’ আভাস হয় ।
চরাচর সমুদায় ব্যবহারের বিষয় ব্যবহারিক ভাবে সত্য, পরমার্থতঃ
তাহা ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয় (শব্দর) । ব্রহ্ম স্বভাবতঃ অচর হইয়াও দেহরূপে
চর (রামানুজ) । অচর = স্থাবর, চর = জঙ্গম । চরাচর—সমুদায়
ভূতজাত পদার্থ । সেই চরাচর কার্যরূপের কারণস্বরূপ যিনি—তিনি
ব্রহ্ম (স্বামী) । এই স্থাবর-জঙ্গমের অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্ম । সকলই
ব্রহ্মে কল্পিত, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর কিছুই বা কোন সত্তাই নাই (মধু) ।
অচর অর্থাৎ অচল, চর অর্থাৎ চল । ব্রহ্ম স্থির, অচল আর তিনিই
অস্থির, গতিশীল । “আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যতি সর্বত্রঃ” ইতি
শ্রুতিঃ ।” (বলদেব) ।

পূর্বে “ভূতানাং বহিরন্তশ্চ” বলা হইয়াছে, সুতরাং আবার
‘চরাচর’ শব্দের দ্বারা সেই ভূতগণকে নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহা বলা
যায় না । সুতরাং এ স্থলে বলদেবের অর্থই অধিক সঙ্গত । শ্রুতিতে
আছে,—

অনেজৎ একং মনসো জবৌয়ো, নৈনন্দেবা আপ্নবন্ পূর্বমর্ষৎ ।

তদ্বাবতোহজ্ঞানতোতি তিষ্ঠৎ, তস্মিন্নাপা মাতরিখা নধাতি ॥

তৎ এজতি তন্নৈজতি তদ্রে তদ্বদস্তিকে ।

তদন্তরস্য সর্বস্য তদ্ সর্বস্যাসা বাহুতঃ ॥ (ঈশ উপনিষদ্, ৪।৫) ।

অর্থাৎ তিনি অচল, এক, মন হইতেও বেগবান্, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না ; তিনি তাহাদের অগ্রগামী, তিনি স্থির থাকিয়াও দ্রুতগামী অগ্র সকলকে অতিক্রম করেন, তাঁহাতেই অবস্থিত থাকিয়া বায়ু 'অপ্' বা প্রাণকর্ষ ধারণ করে । তিনি কম্পিত হন বা চলেন, তিনি কম্পিত হন না—বা চলেন না, অর্থাৎ অচল থাকিয়াও চলিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তিনি দূরে, তিনিই নিকটে, তিনিই এই সমুদায়ের অন্তরে, তিনিই সকলের বাহিরে । বোধ হয়, এই উপনিষদের শ্লোক হইতে গীতার এই শ্লোক গৃহীত হইয়াছে । * এই শ্লোকের অনুসারে গীতার এ স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে স্থিত, তিনি চর এবং তিনিই অচর, তিনি দূরে আর তিনিই অতি নিকটে । অতএব এই বেদমন্ত্র হইতে 'চর' ও 'অচর' শব্দের অর্থ গ্রহণ করাই সম্ভব । আত্মা অচল সনাতন (গীতা ২।২৩) ব্রহ্ম কূটস্থ অচল ঋব (গীতা ১২।৩) ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । চল ও স্থির—ইহা সমুদায় ব্রহ্মসম্বন্ধে বলা যায় । নিগূর্ণ ব্রহ্ম 'চল'ও নহেন, স্থিরও নহেন—

“চল স্থিরো ভয়াভাবৈরাবৃণোত্যোব বাশিশঃ ।”

(ইতি গোড়পাদকারিকা) ।

সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় ।—(সূক্ষ্মস্বাং ৩৭ অবিজ্ঞেয়ঃ)—যদি ব্রহ্ম চরাচর সকল বস্তুই হইলেন, তবে এই ভাবে সকলে তাঁহাকে বুঝিতে পারে না কেন ? ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে যে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা সকল প্রতিভাসেই স্ফুরিত হন বটে, কিন্তু আকাশ যেমন সর্বব্যাপী হইয়াও সূক্ষ্ম বলিয়া পতাক্ক হয় না, সেইরূপ সূক্ষ্ম বলিয়াই আত্মা

* এই ঈশোপনিষদ্ বা বাজসনেয়-সংহিতা উপনিষদ—শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত—যজুর্বেদ-সংহিতারই অংশ । সূত্রাং ইহা অল্প সকল উপনিষদ্ অপেক্ষা প্রাচীন ও সমধিক প্রামাণ্য । ইহা গীতোক 'ব্রহ্মসূত্র পদের' অন্তর্গত মনে হয় । সূত্রাং গীতার এই মন্ত্র গৃহীত হওয়াই সম্ভব ।

স্বরূপে জ্ঞেয় হইয়াও অজ্ঞেয় থাকেন । অবশ্য বাহারা অবিদ্বান্, তাহাদের নিকটেই আত্মা অবিজ্ঞেয়, বাহারা বিদ্বান্ তত্ত্বদর্শী, তাহাদের নিকট আত্মা আত্মভাবেই সর্বদা প্রকাশমান । ‘আত্মাই এ সমুদায়’ এইরূপ বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণের দ্বারা বিদ্বান্ আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে সর্বত্র সর্বস্বরূপে দেখিয়া থাকেন (শঙ্কর) । সূক্ষ্ম অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় (গিরি) । সেই আত্মতত্ত্ব সর্বশক্তিযুক্ত, সর্বজ্ঞ । আত্মা এই ক্ষেত্রে বর্তমান থাকিলেও অতি সূক্ষ্ম হেতু পৃথকরূপে সংসারী লোকের বিজ্ঞেয় নহেন (রামানুজ) । রূপাদিহীন হেতু তাহা অবিজ্ঞেয়, ইহাই সেই আত্মা, এরূপ স্পষ্টভাবে তিন জ্ঞানার্হ হন না (স্বামী) । তিনি সর্বাশ্রয় হইলেও সূক্ষ্ম বা রূপাদিবিহীন বলিয়া, ইহাই সেই—এরূপ স্পষ্ট জ্ঞানের যোগ্য নহেন । বাহারা আত্মজ্ঞানসাধনশূন্য, তাহারা বহু সহস্র কোটি বর্ষেও তাহাকে জানিতে পারে না (মধু) । ভগবানের চিৎসুখ সৃষ্টি সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় (বলদেব) ।

কথিত আছে,—

“বৃহৎ চ তৎ দিব্যম্ অচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাৎ চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি ।

দূরাৎ সুদূরে তাদিহাস্তকে চ পশুৎশ্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥”

(যুক্তকোপনিষৎ, ৩।৭) ।

অন্যত্র আছে,—

“সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্যমধ্যে

বিষম্ অষ্টায়ং অনেকরূপম্ ।

বিষমৈশ্বকং পরিবেষ্টিতায়ং

জ্ঞানী শিবং শাস্তিমত্যন্তমেতি ॥”

(বেতাশ্বতর, ৪।১৪) ।

অতএব আত্মা বৃহৎ, দিব্য, অচিন্ত্যরূপ অথচ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর-রূপে প্রকাশিত ; তিনি দূর হইতে সুদূরে এবং এখানে নিকটেও

আছেন, এবং জ্ঞানবানের হৃদয়গুহার তিনি নিহিত । আত্মাকে বা ব্রহ্মকে বেরূপ সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে, তেমনি অণুও বলা হইয়াছে ।

“এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো ।” (যুগু ক ৩।১৯) ।

“অণোরণীমান্ ।” (কঠ, ২।২০ ; খেতাখতর ৩২০) ।

যাণ্ডা হউক, এই ‘সূক্ষ্ম’ অণুরূপ ব্রহ্মের সঞ্জন রূপ । নিগুণরূপে তিনি অনণু, অহ্ম (বৃহদারণ্যক, ৩।১৮) । তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর (যুগু ক, ৩।৭) । তিনি সূক্ষ্ম হইয়া সঞ্জন হইতে শরীরে অধিষ্ঠান করেন—

“সূক্ষ্মো ভূত্বা শরীরানি অধিতিষ্ঠতে ।” (অথর্কশিরা: উপনিষদ, ৪)

অতএব শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্ম আত্মস্বরূপে সূক্ষ্ম । সূক্ষ্ম—অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় । জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে বাহ্যবস্তু জ্ঞান হয়, সে বস্তু সূক্ষ্ম । যাঁহা সূক্ষ্ম, তাঁহা ইন্দ্রিয়গোচর নহে । ব্রহ্ম আত্মস্বরূপে ইন্দ্রিয়গোচর নহেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের জ্ঞান জ্ঞেয় নহেন । যাঁহা হউক, নিগুণ ব্রহ্ম এই ‘সূক্ষ্ম’ শব্দ দ্বারাও নির্দেশ্য হইবেন না । নিগুণরূপে তিনি সূক্ষ্মও নহেন । ব্রহ্মের এই আত্মস্বরূপ সূক্ষ্মরূপে যে অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ বিশেষরূপে স্পষ্টভাবে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না, তাঁহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । যথা—

“বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্তম অবিজ্ঞাত এত এব” (বৃহদারণ্যক ১.৫।৮) ।

ব্রহ্ম যে অবিজ্ঞেয়, তাঁহার তত্ত্ব ইতিপূর্বে ১৩।১২ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

তিনি দূরে তিনিই নিকটে—যাহারা অবিদ্বান্, তাঁহাদের নিকট আত্মা দূরস্থ, অর্থাৎ বর্ষ সহস্র কোটিতেও তাঁহারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না ; কিন্তু বিদ্বান্গণের নিকট আত্মা অতি নিকটে ; কেন না, তাঁহারা আপনা-দ্বিগকেই সেই আত্মস্বরূপে অনুভব করেন (শঙ্কর) । অমানিষাদি পূর্বোক্ত গুণ সকল-রহিত পুরুষের স্বদেহে বর্তমান থাকিলেও আত্মা অতি দূরস্থ । যাহারা উক্ত অমানিষাদি গুণবৃত্ত, তাঁহাদের কাছে

আত্মা অতি নিকটে, অচরে বর্তমান বা প্রকাশিত থাকেন (ভাস্কর্য) ।
 আত্মা সর্বিকার প্রকৃতির অতীত—একত্র অজ্ঞানীর নিকট আত্মা
 লক্ষ্যবোধেরও অধিক দূরস্থ বোধ হয়। আর জ্ঞানীর নিকট
 প্রত্যগাত্ম-স্বরূপে আত্মা নিত্য সন্নিহিত জ্ঞান হয়, (স্বামী, মধু) ।
 অনন্তভক্তি দ্বারাই ভগবানকে ‘অস্তিকে’ বা অতি নিকটস্থ বোধ হয়, ভক্তি
 বিনা তিনি অতি দূরে স্থিত জ্ঞান হয় (বলদেব) গীতা । ১১।৫৪ দ্রষ্টব্য ।
 ব্রহ্ম যে দূরে ও অস্তিকে—তৎসম্বন্ধীয় শ্রুতি ইতিপূর্বে উল্লিখিত
 হয়েছে, যথা—

“তদূরে তদস্তিকে চ ।” (ঈশ উপঃ ৫) ।

“দূরাৎ স্তদূরে তদস্তিকে চ ।” (যুগুৎ, ৩৭) ।

ব্রহ্ম ও আমার মধ্যে ব্যবধান আছে, আমার দেহ আর এই বাহ্য
 গণ্য । যতক্ষণ এই ব্যবধান থাকে, ততক্ষণ তিনি অতি দূরে । যদি
 এই ব্যবধান কোনরূপে দূর করা যায়, তবে ‘ব্রহ্ম ও আমি’ ইহার মধ্যে
 কোন ভেদ থাকে না, তখন ব্রহ্ম অতি নিকটস্থ হন ; ব্রহ্মের সহিত আমি
 একীভূত হইয়া যাইতে পারি । আমার আত্মা আমার অন্তঃস্থ বটে, কিন্তু
 চাহা অন্তঃকরণ ও দেহাদি উপাধিতে অধাস হেতু ‘আত্মা এই দেহ’ এই-
 রূপ জ্ঞানযুক্ত থাকে, এবং দেহেচ্ছিন্নতার জ্ঞান হইতে বাহ্যবিষয়-জ্ঞানযুক্তও
 থাকে । ইচ্ছিন্নগণ বহির্মুখ বলিয়া অন্তরাত্মাকে দেখা যায় না—

“পরাক্ষি খানি ব্যতৃগাৎ স্বয়ন্তুঃ

তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্চতি নাস্তরাত্মম্ । (কঠ, ২।১।১) ।

সুতরাং আত্মার সহিতও আমার এই অন্তঃকরণযুক্ত দেহ ও বাহ্য
 লক্ষ্যরূপ ব্যবধান রহিয়া যায় । এ ব্যবধান যতক্ষণ থাকে, তখন আমার
 আত্মা বা ব্রহ্ম আত্মা হইতে অতি দূরে । যখন আমার অন্তরে ও বাহ্যে সর্বত্র ;
 ব্রহ্মদর্শন হয়, তখন সে ব্যবধান চলিয়া যায়, তখন আমার আত্মা বা ব্রহ্ম
 আমার অতি নিকটস্থ হন ।

“কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈকদাবৃত্তচক্ষুরমৃতস্বমিচ্ছন্ ॥” (কঠ ২।১।১)
 অর্থাৎ যে ধীর জ্ঞানী বিষয় হইতে নিবৃত্তচক্ষু, তিনি
 অমৃতের ইচ্ছুক হইয়া এই আত্মাকে দেখিয়া থাকেন । যখন
 এই আত্মস্বরূপ দর্শন হয়, তখন ‘আমি জ্ঞাতা ও আমার জ্ঞেয়, এ
 জগৎ ও দেহ,’ এ ভেদ দূর হওয়ার, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভেদ থাকে না ; তখন
 দেশ কাল নিমিত্ত পরিচ্ছেদ দূর হইয়া যায় ; তখন মায়ার আবরণ
 (principium individuationis) থাকে না ; আমি জ্ঞান সেই
 আত্মস্বরূপে বা ব্রহ্মস্বরূপে মিলাইয়া যায়, বাহা আমার স্মৃতি নিকট,
 তাহার সঙ্গে এক হইয়া যায় । এস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, শব্দ
 যে বলিয়াছেন, অজ্ঞানী আবিবেকীর নিকটই ব্রহ্ম সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় ও
 দূরে স্থিত, তাহা সঙ্গত বোধ হয় না । অমানিষাদি রূপ নির্মূল জ্ঞানে
 ব্রহ্ম বেরূপে জ্ঞেয় হন, ভগবান্ এ স্থলে তাহাই বলিতেছেন । অবিবেকীর
 কথা বলিতেছেন না । তাহার জ্ঞানে ত ব্রহ্মভব আদৌ প্রতিভাত হয়
 না । অতএব জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও ব্রহ্ম দূরে ও অস্বরে
 প্রতিভাত হয় । কেন এরূপ প্রতিভাত হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা
 হইয়াছে ।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
 ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রাসিষু প্রভবিষু চ ॥ ১৬

অবিভক্ত তিনি কিন্তু সর্বভূতে বেন
 বিভক্ত হইয়া স্থিত ; জ্ঞেয় তিনি আর
 ভূতভর্তা, গ্রাসকারী সৃষ্টিকারিরূপে ॥১৬

১৬। অবিভক্ত...বিভক্ত হইয়া স্থিত—সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম

আকাশের ন্যায় সর্বপ্রাণিদেহে এক অবিভক্তভাবে বিদ্যমান থাকিলেও
 যেন প্রতি দেহভেদে বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন, কেন না, দেহে-
 তেই তাঁহার বিভাব না অভিব্যক্তি হয় (শঙ্কর)। আত্মা প্রতিদেহে
 আকাশের ন্যায় এক, অথচ নানা ভাব হেতু প্রতিদেহে ভিন্ন বোধ হয় ।
 যেমন একই আকাশ ঘটমধ্যস্থ হইয়া ঘটাকাশ, মঠমধ্যস্থিত হইয়া মঠা-
 কাশ, ইত্যাদি রূপ উপাধিভেদে ভিন্ন বোধ হয়, আত্মাও সেইরূপ এক
 হইয়াও প্রতিদেহে অবস্থান হেতু ভিন্ন বোধ হয় (গিরি)। দেব-
 মানুষাদি ভূতে সর্বত্র হিত আত্মাবস্ত জ্ঞানীর নিকট একাকার প্রতীয়-
 মান হইলেও অজ্ঞানীর নিকট বিভক্ত—দেহাদি আকারে ভিন্নবৎ বোধ
 হয়। আমি দেব, আমি মানুষ, এই জ্ঞানমধ্যে দেহরূপ সমান অধিকরণ-
 রূপে এক আত্মা অনুসন্ধান । জাত্বরূপ আত্মাতে দেহ ও বাহ্য বিষয়
 যে জ্ঞেয় হয়, তাহার অন্তর্ভুক্ত আত্মাকে কেহ জানিতে সমর্থ হয় না,
 এজন্য আত্মাকে বিভক্ত বা বহু বোধ হয় (রামানুজ)। স্বাবয়ব-জড়-
 মাৎসর্যক বিভিন্ন ভূতে কারণরূপে অবিভক্ত, ও কার্যরূপে বিভক্ত বা ভিন্ন-

* এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক Paul Deussen তাঁহার "Elements of
 Metaphysics গ্রন্থে (p. 126) বাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ।
 'Like plurality, divisibility is also conditioned by space and time
 (and causality ?). The will as thing-in-itself is indivisible. We
 must not think of it as divided amongst its phenomena * * * the
 Bhagabatgita may answer—অবিভক্তক ভূতবু বিভক্তমিব চ হিতম্ (XIII, 6)
 —undivided he dwells in beings and yet, as it were, divided ; and
 Kant may furnish a key to this enigma, by his doctrine that
 space and time do indeed separate the *manifestation* but not
 the *manifested*.....and hence it is that the regenerate extends his
 ego to all reality ; he knows himself in everything."

রূপে স্থিত প্রতীক্ষমান হয় । সমুদ্রজাত কেন, তরঙ্গ প্রভৃতি সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ব্রহ্মসাগরে উদ্ভূত দেবমনুষ্যানি ভূতগণ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন (স্বামী)।

মধু বলেন, এই স্থলে প্রতিদেহে আত্মা ভিন্ন, এই যে বহু আত্মবাদ বহু পুরুষবাদ, তাহার এস্থলে স্পষ্ট নিরাস হইয়াছে । আত্মা বা ব্রহ্ম প্রতিদেহে এক অবিভক্ত অভিন্ন । প্রতিদেহভেদে আত্মা ভিন্ন নহে । আত্মা ব্যোমবৎ সৰ্বব্যাপী । তবে দেহে তাদাত্ম্য অধ্যাস হেতু প্রতিদেহে আত্মা ভিন্নরূপে প্রতীক্ষমান হয় । এ ভেদ উপাধিগত, এ ভেদ আভাস মাত্র । ইহা পারমাণ্বিক নহে । বিভিন্ন জীবে ব্রহ্ম এক অবিভক্ত, কিন্তু প্রতিজীবে বিভক্তের মত, বা ভিন্নরূপে স্থিত ।

শ্রুতিতে আছে,—

“একস্তথা সৰ্বভূতাস্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতিক্রমো বহিষ্চ ।” (কঠ, ৫।২, ১০)।

অর্থাৎ ‘এক সৰ্বভূতের অন্তরাত্মা নানা ভূতদেহে, সেই সেই ভূতগণ হইয়াছেন, এবং সে সমুদায়ের বাহিরেও আছেন ।’ অগ্নি যেমন সৰ্বভূতে প্রবিষ্ট হইয়া দাহবস্তুর রূপভেদে নানারূপ হয়, বায়ু যেমন ভূবনে অন্তপ্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশিত হয়, পরমাত্মাও সেইরূপ রূপভেদে বহুরূপে প্রতীক্ষমান হন ।

সৰ্বলোকচক্ষু সূর্য্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহুবস্তুতে লিপ্ত হন না, সেইরূপ সৰ্বভূতাস্তরাত্মাও বাহু হুঃখে লিপ্ত হন না—

“একস্তথা সৰ্বভূতাস্তরাত্মা

ন লিপ্যতে লোকহুঃখেন বাহুঃ ।” (কঠ, ৫।১১)।

আরও উক্ত হইয়াছে যে,—

একো বসী সৰ্বভূতাস্তরাত্মা, একং রূপং বহুধা বঃ কয়োতি ।

“একো বহুনাং বো বিনখাতি কামান্” (কঠ, ৫।১২, ১৩)।

তিনি এক অবিভক্ত সর্বভূতাত্মাত্মা, তিনি 'তৎ'শব্দবাচ্য অনির্দেশ—
তিনি নিগূর্ণ ব্রহ্ম,—

“তদেতৎ ইতি মন্ত্রস্তে অনির্দেশম্ ।” (কঠ, ৫।১৪) ।

তিনি এক দ্ব্যতিমান্ ও সর্বভূতমাধ্য গূঢ়ভাবে অবস্থিত ।

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ ।” (শ্বেতাশ্বতর ৬।১১) ।

ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন যে, “যখন অমানিষাদিস্বরূপ নির্মল সাত্বিক প্রকাশস্বরূপ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই ব্রহ্ম এইরূপে জ্ঞেয় হন ; তখন ব্রহ্ম সর্বভূতের অন্তরে বিভক্তরূপে প্রতীয়মান হইলেও তিনি অবিভক্তরূপে সে জ্ঞানে জ্ঞেয় হন ।” এ কথা সাত্বিক জ্ঞান সহজে পরেও উক্ত হইয়াছে—

“সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীকতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্ ॥”

(গীতা ১৮।২০) ।

অতএব ভূত বা স্রষ্টার পুরুষ বহু হইলেও, তাহাদের সকলের অন্তর্ভূত স্রষ্টার আত্মা বা ব্রহ্ম একই । সাংখ্যের বহু পুরুষবাদ পরম তর্ক নহে । জীবাশ্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্যবাদ গীতার প্রতিষ্ঠিত । যদুশ্বদন ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন । গীতার এ স্থলে আরও উক্ত হইয়াছে যে, অমানিষাদিস্বরূপ নির্মল সাত্বিক জ্ঞানের এই স্বভাব যে, তাহা বহুর মধ্যে একত্ব দর্শন করে, একেরই বহুরূপে বিকাশ বুঝিতে পারে । সে জ্ঞান Principle of contradiction এর মধ্যে Principle of Identity দেখিতে পার ; এবং সেই এক অদ্বিতীয় যে ব্রহ্ম, তাহা জানিতে পারে ।

জ্ঞেয় তিনি ভূতভর্তা, প্রাসকারী সৃষ্টিকারিরূপে ।—সেই ব্রহ্ম স্থিতিকালে প্রাণিগণকে ধারণ করিয়া থাকেন, প্রলয়কালে সকলকেই প্রাস করেন এবং সৃষ্টিকালে সকলকে সৃষ্টি করেন । এইরূপে তিনি জ্ঞেয় হন । প্রকৃত রজ্জুতে যেমন ভ্রম (illusion) হেতু সর্প-

জ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি ও ভ্রম দূর হইলে সে মিথ্যা জ্ঞানের লোপ হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় প্রতীয়মান হয় (শঙ্কর) । ব্রহ্ম অবিভক্তরূপে সর্বভূতে বিতক্তের স্থায় প্রতীয়মান হইলেও তিনি এই সকল ভূত হইতে পৃথক্ । তিনি দেহরূপে সংহত ভূতগণের ভর্তা বা ভরণকারী, ভৌতিক সকল গ্রন্যমান বস্তুরই গ্রাসকারী, এবং তিনি প্রভব বা উৎপত্তি প্রভৃতির হেতু । বাহ্য গ্রাস করা যায়, সেই অন্নাদি আকারে পরিণত সমুদায়ের প্রভব বা উৎপত্তি হেতু সেই ব্রহ্ম । এই প্রকারে ব্রহ্মকে সর্বভৌতিক পদার্থ হইতে পৃথক্ভাবে জ্ঞেয় । যুত শরীরে 'গ্রাসন' (আহার গ্রহণ) ও প্রভবন (স্থিতি বৃদ্ধি প্রভৃতি ভাববিকার) দেখা যায় না । অতএব ভূত-সংঘাতরূপ ক্ষেত্রেই ব্রহ্ম (জীবাত্মা) গ্রাসন, প্রভব ও ভরণ হেতু, ইহা বুঝিতে হইবে । (রামানুজ) ।

স্থিতিকালে ভূতগণের পোষক, প্রলয়কালে, গ্রাসনশীল ও সৃষ্টিকালে নানা কার্য্যাকারে প্রভবনশীলরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় (স্বামী) । ব্রহ্ম সর্বভূতে ক্ষেত্ররূপে এক হইতে পারেন—কিন্তু জগৎকারণরূপে ক্ষেত্ররূপে হইতে ভিন্ন বলা হইতে পারে না ? এই প্রশ্নের অপেক্ষার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, না, তাহা নহে । স্থিতিকালে তিনি সর্বভূতকে ভরণ করেন, প্রলয়কালে তিনি গ্রাসনশীল এবং উৎপত্তিকালে প্রভবনশীল হন । রক্ষুতে সর্পকল্পনার স্থায়, এ জগৎ তাহার উৎপত্তি, স্থিতি, লয়কারণ ব্রহ্মে যার হেতু কল্পিত । সেই ব্রহ্মই প্রতি দেহে একই ক্ষেত্ররূপে জ্ঞেয় (মধু) ।

ব্রহ্ম স্থিতিকালে ভূতগণের পালক, প্রলয়ে কালশক্তি দ্বারা তাহাদের গ্রাসকারী বা সংহারক, এবং সৃষ্টিকালে প্রধান ঐশ্বর্যশক্তি দ্বারা নানা কার্য্যাকারে প্রভবনশীল ।

এ স্থলে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপে ব্রহ্মকে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণরূপে বুঝিয়াছেন । কেবল রামানুজ ব্রহ্ম

অর্থে জীবাশ্মা বুঝাইতে গিয়া এ স্থলে ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। তাহা গ্রাহ্য নহে। ব্রহ্ম যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।—

“সর্কং খষিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ।” (ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১) ।

“বতো বা ইমানি সূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি
বৎ প্রয়ন্ত্যন্তিসংবিশন্তি তদ্বিজ্ঞাসস্ব—তৎ ব্রহ্ম ইতি ।”

(তৈত্তিরীয় উপঃ, ৩।১।১) ।

অতএব শ্রুতি অনুসারে এই সমুদায়ই ব্রহ্ম, তাহা হইতে এই সমুদায়ের জন্ম (জ) লয় (ল) ও স্থিতি (অন্) হয়। ব্রহ্ম হইতেই এই সমুদায় ভূতগণের জন্ম হয়, তাহা হইতেই জীবিত থাকে ও প্রাণ করিয়া তাহাতেই প্রবেশ করে।

এই শ্রুতি হইতেই জিজ্ঞাসিতব্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে বেদান্ত-দর্শনের সূত্র—

“জন্মান্তস্য যতঃ।” (শারীরক সূত্র, ১।২) ।

এই বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যাকারগণ ব্রহ্ম কিরূপে জগতের সৃষ্টি প্রভৃতির কারণ হন, সেই ব্রহ্মত্ব বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়াছেন। জিজ্ঞাস্য পাঠক তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন।

ব্রহ্ম নিঃশব্দ-স্বরূপে প্রপঞ্চাতীত। তিনি সগুণরূপে জগৎ-কারণ। এই উক্ত কারণরূপ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তিনি জ্ঞেয় হন, এবং তাহা হইতে তাঁহার নিঃশব্দ স্বরূপ জ্ঞেয় হয়। ব্রহ্ম সগুণরূপে কি প্রকারে জগৎ-কারণ হন? ইহার এক উত্তর—তাঁহাতেই এই জগৎ-কারণ-বীজ অবশ্য আছে। সে কারণ-বীজ কি? অদ্বৈতবাদ অনুসারে সে কারণ-বীজ ‘মায়া’। মায়া দ্বারাই জগৎ করিত হয়—জগতের বাস্তবিক সত্তা নাই। যাহা হউক, শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এই মায়া ব্রহ্মশক্তি। সে শক্তি বিহীন, তাহা শ্রুতি হইতে জানা যায় ;—

“পরাস্ত শক্তিবিবৈধেব শ্রমন্তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” ।

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬।৮)

ব্রহ্মের পরাশক্তি বিবিধ—সে শক্তি স্বাভাবিকী জ্ঞানক্রিয়া ও বল-ক্রিয়াস্বরূপ । এই জ্ঞানক্রিয়া হেতু ব্রহ্মে জগৎ-কল্পনা স্বভাবতঃই প্রকাশিত হয়, এবং সেই ব্রহ্মের ‘সত্তা’ হইতে বলক্রিয়া দ্বারা সেই কল্পনা সংরূপে পরিণত হয় । ইহা হইতেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয় ; সৰ্বভূতের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ হয় । এই শক্তি সংরূপা বলিয়াও জগৎ সেই ব্রহ্ম-সত্তার সত্তায়ুক্ত হয়, তাহা অলীক, স্বপ্নময়, কেবল কল্পনা মাত্র হয় না । এ কথা পূর্বে নানা স্থলে উক্ত হইয়াছে । সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতিই জগৎকারণ, ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে । শ্রুতিতে এই প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলা হয় নাই, তাহা ব্রহ্মেরই এই মায়ামুক্তি । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪।১০ শ্লোকে) আছে—

“মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ ।

তস্মাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সৰ্বমিদং জগৎ ॥”

অড় স্বতন্ত্রা প্রকৃতি যে জগৎ-কারণ হইতে পারে না, তাহা বেদান্ত-দর্শনের “ঈক্ষ্যতে না শব্দঃ” ইত্যাদি সূত্রে (১।৫) ও তাহার শব্দর ভাষ্যে বিবৃত হইয়াছে । শ্রুতি অনুসারে এ সৃষ্টি ঈক্ষণ—কল্পনামূলক । এ সৃষ্টির শৃঙ্খলা, নিয়ম, মঙ্গলময় বিধান প্রভৃতি সকলই জ্ঞানমূলক । কোন অড় কারণ হইতে এরূপ সৃষ্টির সম্ভব হয় না । অতএব এই অড়জগৎ ও ভূতগণে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতে ব্রহ্মই জ্ঞেয় হন ।

পূর্বে গীতার উক্ত হইয়াছে যে, অব্যক্তই জগৎ-কারণ ।

“অব্যক্তাৎ ব্যক্তরঃ সৰ্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

সাত্ব্যাগমে প্রলীয়েন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥” ৮।১৮

“অব্যক্তানীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র কা পরিদেবনা ॥” ২।২৮

এই অব্যক্তই প্রকৃতি (গীতা ১৩।৫) । সেই দুইরূপ প্রকৃতি—পরা-প্রকৃতি ও অপরাপ্রকৃতি ভগবানেরই (গীতা ৭।৪,৫) । এই অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত যে পরম সনাতন নিত্যভাব, তাহা ‘অব্যক্ত অক্ষর’ ; তাহা ভগবানের পরমধাম (গীতা ৮।২১) । ইহাই ব্রহ্ম । ইহাই জগৎ-কারণ । ব্রহ্মই মায়াশক্তি বা অব্যক্ত প্রকৃতি হেতু জগৎ-কারণ হন । ব্রহ্মই সত্ত্বগুণ পরমেধররূপে নিহ্ন জ্ঞান বা কল্পনা দ্বারা নিয়মিত করেন বসিরা তাঁহার অব্যক্ত প্রকৃতি জগৎ প্রদান করে । (গীতা ৯।১০) । অতএব গীতায় এ সম্বন্ধে পূর্বাপর কোন বিরোধ নাই । ব্রহ্মই যে এই জড় জীবময় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ, ইহাই সকলিতার্থ ।

এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সম্বন্ধে ব্রহ্মের মায়াশক্তি বা প্রকৃতিই কারণ । এই আধারে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্ম কার্যরূপে পরিণত হয় । এ সৃষ্টি কার্য । আমরা এই কার্য বাপার বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারি যে, ক্রিয়া মাত্রই কর্তৃকর্মদি কারকসাপেক্ষ । অতএব এক অর্থে আমরা প্রকৃতিকে কর্ম, করণ, অপাদান কারক ও একতাব্দে কর্তৃকারকও বলিতে পারি । আর ব্রহ্মকে অধিকরণ, সম্বন্ধ ও এক অর্থে সম্পাদান কারক বলিতে পারি । আর কর্মের যাহা কারণ, তাহা সাংখ্য-শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার (গীতা ১৮।১৩) । যথা—অধিষ্ঠান (অধিকরণ কারক) কর্তা (কর্তৃকারক) বিবিধকরণ (instrument — করণ কারক) বিবিধ চেষ্টা এবং দৈব । ভূতগণ যে কর্ম করে, ইহারা, তাহারই কারক । জগৎ-কারণকে ঠিক সেইরূপে বুঝা যায় না । জগৎ-কারণ সাধারণতঃ নিমিত্ত ও উপাদান-কার্যরূপে উক্ত হয় । জগৎ-কর্মের অন্ত কোন কারকের আবশ্যক না থাকিতে পারে । তাহাতে ‘বাহ্য্য দোষ’ হইতে পারে ।

একত্র ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণমাত্র বলা হয়।
যাহা হউক, এ কারণ-তত্ত্ব এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

এই শ্লোক হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্মই জগৎ ও
ভূতগণের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ। যাহা হউক, এ স্থলে এই কথা
আরও বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে। এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম
ভূতভক্তা, গ্রাসিষ্ণু ও প্রভাবিষ্ণুরূপে জ্ঞেয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তিনি
অসক্ত হইয়াও ভূতভক্তা। এ স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম অসক্ত
হইয়াও ভূতভক্তা, গ্রাসিষ্ণু ও প্রভাবিষ্ণু। অসক্ত হইয়াও ব্রহ্ম কিরূপে
প্রভাবিষ্ণু হন, তাহা পূর্বে ১৪শ শ্লোকে অসক্ত হইয়াও ভূতভক্তা এই কথার
ভূতভক্তা, গ্রাসিষ্ণু ও ব্যাধ্যা হইতে বুঝিতে হইবে। এ স্থলে গ্রাসিষ্ণু ও
প্রভাবিষ্ণু শব্দের একত অর্থ কি, তাহা চিন্তা করিতে হইবে। গ্রাসিষ্ণু অর্থে
গ্রাসনশীল অর্থাৎ নিয়ত গ্রাস করাই বাহার স্বভাব। ব্রহ্ম কালাধ্য পরমে-
শ্বররূপে নিয়ত লোকক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত। সেইরূপ তিনি প্রভাবিষ্ণু বা
প্রভাবনশীল অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে ভবন বা ভূতগণকে উৎপন্ন করিতে নিয়ত
নিয়ত। ভূতগণকে নিয়ত উৎপন্ন করাই যেন ব্রহ্মের স্বভাব। অর্থ এই
যে, ব্রহ্ম অসক্ত হইয়াও সর্বদা ভূতগণকে উৎপন্ন করিতে—উৎপত্তির পর
ভবন বা রক্ষা করিতে এবং ষথাকালে নাশ করিতে নিয়ত। ব্রহ্ম যে
কেবল প্রলয়ের পর জগৎকে সৃষ্টি করেন, সৃষ্টির পর রক্ষা করেন ও সৃষ্টি
অন্তে প্রলয়ারম্ভে লয় করেন, তাহা নহে। জগতে ব্রহ্মের সৃষ্টিরক্ষণ ও
লয় ব্যাপার নিয়ত চলিতেছে। সর্বস্থানে সর্বকালে এই ব্যাপার সর্বদা
চলিতেছে। ভূতগণ যে নিয়ত সৃষ্ট হইতেছে, রক্ষিত হইতেছে ও বিনষ্ট
হইতেছে—তাহার কারণ ব্রহ্ম। আর এই নিয়ম কেবল জীব সম্বন্ধেই
নহে, জীবের শরীর যেমন সৃষ্ট হইয়া নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে
ও শেষে নষ্ট হইতেছে, সেইরূপ জড়বস্তুর সংঘাত ও এই সৃষ্টি স্থিতি
পরিবর্তন ও লয় ব্যাপারের অধীন। জগতে সর্বত্র এই নিয়ম

জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল । শ্রোতস্থিনী নদীর জল যেমন আসিতেছে, ভাসিতেছে ও চলিয়া বাইতেছে, অথচ শ্রোতস্থিনীর রূপ একই প্রতীকমান হয়, সেইরূপ এ জগতের সূতাদি সৃষ্ট হইতেছে, সৃষ্ট হইয়া চালিত হইতেছে, পরিবর্তিত হইতেছে, ও শেষে বিনষ্ট হইতেছে, অথচ জগতের রূপ একই থাকে,—একই রূপে আমাদের নিকট প্রতি-
ভাত হয় । এই যে জগতে নিত্য পরিবর্তন, নিত্য সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপার আমরা দেখিয়া জগৎকে পুনঃপুনঃ গতিশীল বলিয়া জগৎ আখ্যা দিয়া থাকি, ইহার মূল আধার বাহা—ইহার নিত্য অপরিবর্তনীয় কারণ বাহা—তাহা ব্রহ্ম ।

ব্রহ্মই প্রভবিকু—প্রভবনশীল । প্রকৃষ্টরূপে যে ভবন বা যে হওয়া, তাহাতেই ভাবের আরম্ভ । সতেরই ভাব হইয়া থাকে । ‘নাসতো বিদ্যাতে ভাবঃ’ ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই ভাব দুইরূপ হইতে পারে,—নিত্য ও বিকারী । বিকারী ভাব ষড়ভাব-বিকারযুক্ত, তাহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ইহার মধ্যে জন্ম, স্থিতি ও নাশ প্রধান । ব্রহ্ম হইতে বা ব্রহ্মরূপ সংকারণ হইতে জগতের ও সর্বভূতের এই ভাববিকার হয়, এই উৎপত্তি, রক্ষণ ও নাশ হয় । ব্রহ্মরূপ আধারেই সর্বভূতগণ এই জন্ম-স্থিতি-নাশের মধ্য দিয়া নিয়ত গতাগতি করে । ইহাতে পরি-
দৃশ্যমান জগতের বিশেষ পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না । বলিয়াছি ত, একদিকে যেমন জন্ম, অন্য দিকে সেইরূপ নাশ—যোগ ও বিরোগ, ফলে কোন পরি-
বর্তন হয় না । তাহা না হইলেও এই জন্মস্থিতিনাশরূপ নিত্য পরিবর্তন-
যুক্ত জগৎকে আমরা ‘জগৎ’-কল্পনামাত্র ধারণা করি, অথবা সত্য বলিয়া ধারণা করি—ইহার মূলে আধাররূপে,—অপরিবর্তনীয় নিত্য কারণ-
রূপে এক অনন্ত শক্তিমান্ সদ্বস্তুর ধারণা না করিলে, এই জন্ম-স্থিতি-লয়-
রূপ নিত্য পরিবর্তন আমরা বুঝিতে পারি না । সেই ‘সৎ’ই ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয় । সেই ‘সৎ’ (Being) হইতে স্বভাবতঃ সর্বভূত ভাবরূপের,

উদ্ভব ও বিকাশ: (Becoming) হইয়া, আবার তাহাতেই মিলাইয়া (Nought হইয়া) যায়—অব্যক্ত হয়, সেই সংকারণেই, লীন হয়। ইহাই জগতের কৰ্মচক্র (process)। ইহা নিত্য। পূর্বে ৯।১০ম শ্লোকে “জগৎ বিপরিবর্ততে” এই কথাই ব্যাখ্যা এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য। এই যে জগতের ও ভূতগণের নিয়ত বিপরিবর্তন (এই যে infinite procession) ইহাই সকলকে উৎপত্তির পর বিকাশ, বৃদ্ধি ও অপক্ষয়ের মধ্য দিয়া মৃত্যুমুখে লইয়া যায় (জগৎকে Evolution ও Involution এর মধ্য দিয়া Dissolutionএর দিকে লইয়া যায়)। এই বিপরিবর্তনের মধ্য দিয়া জীবের ক্রম আপূরণ হয়। যাহা হউক, এই নিয়ত বিপরিবর্তনমধ্যে এক নিত্য অপরিবর্তনীয় অবিকারী সত্তার ধারণা না করিলে, আমরা এই পরিবর্তন বুঝিতে পারি না। এই নিত্য পরিবর্তনমধ্যে—এই নিয়ত জন্ম-স্থিতি-লয়ের মধ্যে যে অপরিবর্তনীয়, অচল, সনাতন ‘ভাব’ বিদ্যমান, যে আধারে, যাহার বৃকে মহাকালের এই জন্মস্থিতিনাশরূপ নিত্য ক্রিয়া, তিনিই অবিক্রিয় ব্রহ্ম। তিনিই এই প্রকারে সর্বভূতের ভর্তা, এদিকু ও প্রভবিষ্কুরূপে জেয়।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ৭



জ্যোতিঃ সকলের জ্যোতিঃ, তিনি তমঃ-পারে

অবস্থিত ; জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞানগম্য রূপে,

তিনি হন সবার হৃদে অবস্থিত ॥ ১৭

১৭ । জ্যোতিঃ সকলের জ্যোতিঃ (জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ)—

ব্রহ্ম—সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি দীপ্তিময় বস্তু সকলের জ্যোতিঃ । আয়ত্তরূপ চৈতন্যের জ্যোতির্ধারা প্রদীপ্ত হইয়াই তাহার প্রকাশ পায় । শ্রুতিতে আছে—“যেন সূর্য্যস্তপতি জ্যোতিষেহঃ ।” (শঙ্কর) । দীপ, আদিত্য, মণি প্রভৃতির তিন জ্যোতিঃ বা প্রকাশক । আয়ত্তরূপ জ্ঞানই দীপ-সূর্য্যাদি সকলকে প্রকাশ করে । দীপ-সূর্য্যাদির জ্যোতিঃ কেবল বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ হইলে, বিষয়-প্রকাশের বিরোধী অন্ধকারকে মাত্র নষ্ট করিয়া দিগ্বা বাহুবস্তুকে জ্ঞানের নিকট প্রকাশ করে । (রামানুজ) । ব্রহ্মজ্যোতির্ধারা অবভাসক বাহু আদিত্যাদির জ্ঞান অন্তরে বুদ্ধি প্রভৃতিও আয়ত্তৈতন্য জ্যোতির্ধারা প্রকাশিত হয় । চৈতন্য-জ্যোতিঃ জড় বস্তুর জ্যোতির অবভাসক (মধু) । ব্রহ্মই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণের প্রকাশক (স্বামী, বলদেব) ।

শ্রুতিতে আছে—

ব্রহ্ম—“জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১৬) ।

অন্যত্র আছে—

“হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ।

তৎ শুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাআবিদো বিহঃ ॥”

(মুণ্ডক, ২।২।৯) ।

এ স্থলে শঙ্কর অর্থ করেন যে, হিরণ্ময় অর্থে বিজ্ঞান-প্রকাশযুক্ত । ব্রহ্মঃ জ্যোতিকে জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশক জ্যোতিঃ বলা হইয়াছে ।

শ্রুতিতে অন্যত্র আছে—

“ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারণ্যং

নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহন্নয়িঃ ।

তমেব ভাস্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং

তস্ত ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥”

(কঠ, ৫।১৫ ; মুণ্ডক, ২।২।১০ ; খেতাখতর, ৬।১৪) ।

বৃহদারণ্যকে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে (৪।৩।২-৯) এইরূপ আছে—

জনক । “যাজ্ঞবল্ক্য কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষঃ ?”

যাজ্ঞবল্ক্য । “আদিত্যজ্যোতিঃ সত্রাট্ !” আদিত্যে নৈব জ্যোতিষা তে
পলারম্ভে কৰ্ম্ম কুরুতে...”

জনক । আদিত্যে অন্তমিতে কিং জ্যোতিরেব অয়ং পুরুষঃ ?

যাজ্ঞবল্ক্য । “চন্দ্রমা এবাস্য জ্যোতির্ভবতি...”

জনক । “অন্তমিতে ॥ আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমন্তমিতে কিং
জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ?”

যাজ্ঞবল্ক্য । “অগ্নিরেব অন্ত জ্যোতির্ভবতি...” ।”

জনক । অন্তমিতে আদিত্যে চন্দ্রমস্যন্তমিতে শাস্তেহ্মৌ কিং
জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ?”

যাজ্ঞবল্ক্য । “বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতি...” ।” • • •

জনক । অন্তমিতে আদিত্যে চন্দ্রমস্যন্তমিতে শাস্তেহ্মৌ শাস্তারং
বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ?”

যাজ্ঞবল্ক্য । “আট্শ্ববাস্ত জ্যোতির্ভবতি...” ।”

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১৭।৭) আছে—

“আদিং প্রভুস্য রেতসঃ উদ্বয়ং তমসম্পরি জ্যোতিঃ পশ্চস্ত উত্তরং যঃ
পশ্চস্ত উত্তরং দেবং দেবত্না সূর্যামগন্ম জ্যোতির্কৃত্তমম্ ঠতি ।” অর্থাৎ
“আদি বা পুরাণ কারণের (ব্রহ্মের) জ্যোতিঃ তমঃ অতীত (অপ্ৰাকৃত) ।
জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার স্মীর জ্যোতিঃ উহা হইতেও উৎকৃষ্ট । এই আত্ম-
জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া আমরা দেবগণের মধ্যে সূর্যাস্বরূপ দেবকে প্রাপ্ত
হইয়াছি । উহা উত্তম জ্যোতিঃ ।”

ইহা হইতে জানা যায় যে, আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ—সর্বপ্রকাশক ।
আত্মার জ্যোতিতে অন্তঃকরণ জ্যোতিবৃদ্ধি হইয়া প্রকাশক হয়, আত্মার
জ্যোতিতেই বাহ্য বিষয় প্রকাশিত হয় । বাহ্যবস্তু সকল অবশ্য সূর্যাদি

কোন জ্যোতিষ্মান্ বস্তুর আলোকে আলোকিত না হইলে, চক্ষু তাহার রূপাদি গ্রহণ করিয়া অস্তঃকরণের নিকট প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কের সাহায্যেই বাহ্যবিষয় বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গোচর হয়। ইহাই আপাততঃ মনে হয়। কিন্তু সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ এই প্রকাশ-শক্তি—এই আলোক কোথা হইতে পায়? ইহার উত্তর এই যে, ইহারা ব্রহ্মের জ্যোতির্বারাই প্রকাশক হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

“যদাদিত্যগতং তেজো জগতাসরতেহখিলম্ ।

বচস্রমসি বচাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥” (১৫।১২)

ব্রহ্মজ্যোতির্বারা সূর্য্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল তাপ ও আলোকবৃত্ত হইলে, সেই আলোক এ জগৎকে উদ্ভাসিত করে, এজন্য এই বাহ্যজগৎ আমাদের চক্ষুগ্রাহ্য হয়। আমরা তাহার রূপ, আকার, বর্ণ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারি। সাধারণভাবে আমরা ইহা বুঝিতে পারি। কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন—আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ। আমাদের জ্ঞানে আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ, এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠাত হইলে ব্রহ্ম যে জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব্বজ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ, তাহা বুঝিতে পারিব। আত্মা অস্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বুদ্ধি ও মনের প্রকাশক হয়। এই আত্মজ্ঞান ও চৈতন্যের প্রতিবিম্ব হেতু বুদ্ধি জ্ঞান-স্বরূপ হয়, চৈতন্যবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া যখন বাহ্য-বিষয় অস্তরে প্রবেশ করে, অথবা ইন্দ্রিয়গণ যখন স্ব স্ব বিষয়কে আহরণ করিয়া মনকে উপহার দেয়, এবং জ্ঞান তাহা গ্রহণ করে, তখন যে জ্ঞানের ক্রিয়া হয়, তাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই ভাব জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। আত্মজ্যোতিঃ বা আত্মার স্বরূপ যে জ্ঞান, তাহা দ্বারা উদ্ভাসিত জ্ঞাতা তখন সমুদায় জ্ঞেয় বিষয়কেও প্রকাশ করে, এবং সেই জ্ঞেয় বিষয়ের আধাররূপে বাহ্যজগৎকে প্রকাশ করে। এইরূপে আত্ম-জ্যোতিঃ দ্বারাই জ্ঞানে বাহ্যজগৎ ‘জ্ঞেয়’ হয়। আধুনিক দর্শনের তাহার

subjectই সমুদায় objectএর প্রকাশক, এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও প্রকাশ করে । বাহ্য প্রকাশক, তাহাই জ্যোতিঃস্বরূপ ।

যদি বাহ্য-জগতের কোন 'জ্ঞাতা' না থাকিত, তবে বাহ্য-জগৎ আদৌ প্রকাশিত হইত না, এবং তাহা হইলে বাহ্য-জগৎ আদৌ আছে কি নাই, তাহা জানা যাইত না । 'জ্ঞেয়' হয় বলিয়াই বাহ্য-জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় । শুধু তাহাই নহে । বাহ্য-জগৎ আমাদের জ্ঞেয় হয় বলিয়াই আমরা জ্ঞাতা হই । জ্ঞেয় না থাকিলে জ্ঞাতাও থাকিত না । উভয়ে পরস্পর আপেক্ষিক । জ্ঞেয় না থাকিলে অন্তঃকরণে আমি জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত হইতাম না । অতএব আমরা বলিতে পারি যে, আত্মজ্যোতিতেই বুদ্ধি প্রকাশক হয়, ও জানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই ত্রৈলোক্যকে যুগপৎ প্রকাশ করে । সেজন্য আমি আছি ও এই বাহ্য-জগৎ জানিতেছি—এই অনুভব হয় ।

এই আত্মজ্যোতিঃ স্বরূপ জীব-হৃদয়ে সুরিত হইয়া প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে প্রকাশ করে, সেইরূপ সর্বজীব-হৃদয়ে সর্বজীবে অধিষ্ঠিত এক পরমাআত্মজ্যোতিতে এই সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হয় । তাহারই জ্যোতিতে সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় জগৎ (ক্ষেত্র) প্রকাশিত হয় । তিনিই আদিত্য, চন্দ্র, নক্ষত্রে সর্বত্র অধিষ্ঠিত থাকিয়া সকলকে স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতিযুক্ত করেন, এবং সেই জ্যোতির্বারা সর্ব-জগৎকে প্রকাশিত করিয়া সর্বজীবের চক্ষুগ্রাহ্য করিয়াছেন । অতএব আমাদের জানে যিনি এই জগৎ-প্রকাশক জ্যোতিঃস্বরূপের জ্যোতির কারণ, তিনি অবশ্য স্বপ্রকাশ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ । বাহ্য কারণে নাই, তাহা কার্যে থাকিতে পারে না । এইরূপে আমাদের নির্মল জানে জ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন ।

পরমাআত্ম চৈতন্যজ্যোতির্বারা সর্বভূতের অন্তরে 'জ্ঞাতা' ও তাহার 'জ্ঞেয়' স্বরূপাদিকে জ্যোতিরূপে প্রকাশ করেন, এই জহ্ন স্বরূপ, চন্দ্র

প্রভৃতিকে আমরা জ্যোতীরূপে জানিতে পারি। সূর্য্য-চন্দ্রাদির যে জ্যোতিঃ—যে তেজ, তাপ বা আলোক—আমাদের জ্ঞানে জেয়রূপে প্রকাশ পায়, তাহার কারণ এই আত্মজ্যোতিঃ বা ব্রহ্মজ্যোতিঃ। আত্মজ্যোতিতে প্রভাসিত আমাদের জ্ঞান সূর্য্যচন্দ্রাদিকে যে প্রকার রূপ দিয়া, যে আলোক-বসন পরাইয়া জ্ঞাতার কাছে প্রকাশ করে, তাহারা সেইরূপেই প্রকাশিত হয়। তাহাদের তাহাই স্বরূপ বলিয়া আমাদের জ্ঞান হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহাদের স্বরূপ কি, তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি ?

আধুনিক বিজ্ঞান সূর্য্যাদির সেই আলোক ও তাপাদিকে জড়শক্তি বলেন, এবং তাহা এক অনন্ত জড়শক্তির বিভিন্ন প্রকার বিকাশ বলিয়া কল্পনা করেন। বিজ্ঞান এই অনন্ত শক্তির আধারকে জড় ভৌতিক পরমাণু বা সূক্ষ্ম আকাশ (Ether) রূপে গ্রহণ করেন। আবার সেই জড় পরমাণুও যে সেই শক্তিরই বিকাশের বিভিন্ন অসংখ্য কেন্দ্র মাত্র (Centres of forces), তাহাও বলিয়া থাকেন। শক্তির আধার শক্তি—এ কল্পনা নিরর্থক। শক্তির অবশ্য আধার থাকিবেই থাকিবে। নিরাধার শক্তির ধারণাই হয় না।। সে আধার যদি জড় পরমাণু বা জড় ভূত না হয়, জড়ই যদি শক্তিরই ক্রিয়াবিশেষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তবে তাহার যাহা নিত্য এক সৎ আধার, সেই ‘শক্তিমান্’ জড়ও শক্তি হইতে অন্ম। তিনিই ব্রহ্মরূপে জেয়।

অন্তএব পরমাণু বা পরব্রহ্ম আমাদের অন্তরে জ্ঞাতাকে প্রকাশ করিয়া দিয়া, সেই জ্ঞাতা দ্বারাই জ্ঞাতার নিকট সূর্য্যাদিকে জ্যোতীরূপে প্রকাশ করেন, এবং এই সকল জ্যোতিককে প্রকাশ করিয়া তাহাদের আলোক দ্বারা জেয় জগতের সকল জ্যোতিহীন পদার্থকে ব্যবহার-ক্ষেত্রে সর্বভূতের জ্ঞানে তাহাদের দর্শনেত্রির বিকাশ করিয়া

দিয়া, সেই ইন্দ্রিয়-সাহায্যে প্রকাশ করেন । এইরূপে আত্মজ্যোতির্বারা সমুদায় জ্যোতিষ্কগণ, ও তাহাদের আলোকে আলোকিত পদার্থ সকল আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয় । সর্বভূতজ্ঞানে জ্যোতীরূপে বাহ্য কিছু প্রকাশিত হয়, সে প্রকাশের কারণ—এই পরমাত্মা । আর আমাদের সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বাহিরে যদি সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব থাকে, জ্ঞাতার অপেক্ষা না রাখিয়া যদি ‘কোন’ জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে সে অস্তিত্ব সেই পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বরের জ্ঞানে ‘জ্ঞেয়’রূপেই তাহা সম্ভব । জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেই পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞেয় কল্পিত হইতে পারে । অতএব আমরা যে ভাবেই হউক, বলিতে পারি যে, জ্ঞানস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ ব্রহ্মের কল্পনাতেই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক কল্পিত, এবং ব্রহ্মশক্তিতেই সূর্য্যাদি শক্তিবৃক্ক, ব্রহ্মজ্যোতিঃতেই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক জ্যোতিবৃক্ক । জ্যোতির জ্যোতীরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় ।

তিনি তমঃপারে অবস্থিত (তমসঃ পরমুচ্যতে)—পূর্ক্স-লোকে ব্রহ্মকে সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় বলা হইয়াছে । তিনি সর্বত্র বিদ্যমান অথচ উপলব্ধ হন না, তাহাও বলা হইয়াছে । ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে যে, তবে তিনি ‘তমঃ’ হইবেন । এই সন্দেহ নিরাস জন্য উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, ও অজ্ঞানরূপ তমঃ বা অন্ধকারের অতীত, অজ্ঞান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না (শঙ্কর) । তমঃ অর্থে সূক্ষ্মাবহার প্রকৃতি । ব্রহ্ম (জীবাত্মা) এই প্রকৃতির অতীত (রামানুজ) । তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ (শ্যামী) । তমঃ অর্থাৎ অড়বর্ণ । ব্রহ্ম তাহা হইতে পর, অর্থাৎ তাহা দ্বারা অসংস্পৃষ্ট । অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য সকল অপারমার্শিক । পারমার্শিক তব ব্রহ্ম সে সকল হইতে অসংস্পৃষ্ট । সৎ বা অসৎ—ইহাদের সহিত ব্রহ্মের সঘর্কযোগ নাই । তিনি অড়ের সহিত অসংস্পৃষ্ট থাকিরাও স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ (মধু) । তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতি দ্বারা অসংস্পৃষ্ট (বলদেব) ।

ব্রহ্ম যে তমঃ হইতে অতীত, সে সম্বন্ধে শ্রুতি যথা—

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥” (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮) ।

‘ব্রহ্ম তমসঃ পরম্ অপশ্রুৎ । (মৈত্রায়ণী, ৬।২৪) ।

‘প্রত্নস্ত র়েতসঃ তমসঃ পরি জ্যোতিঃ ।’ (ছান্দোগ্য ৩।১৭।৭) ।

‘যস্তমসি তিষ্ঠন্ তমসোহস্তুরো ষং তমো ন বেদ যস্ত তমঃ শরীরং
যস্তমোহস্তুরো যময়তি স আত্মা ।’

(বৃহদারণ্যক, ৩।৭।১৩) ।

স্বতিতে আছে—

“নিঃসঙ্গস্য সসঙ্গেন কূটস্থস্য বিকারিণা ।

আত্মনোহনাত্মনো যোগো বাস্তবো নোপপद्यতে ॥”

(মধুসূদনধৃত বচন) ।

এই সকল শ্রমাণ হইতে জানা যায় যে, এই তমঃ সৃষ্টির বীজ অবিজ্ঞা
বা অজ্ঞান হইতে পারে অথবা সৃষ্টির মূল উপাদান কারণ হইতেও পারে ।
তমঃ অর্থে যে অজ্ঞান, তাহা সৃষ্টির ‘তমসঃ পারং দর্শকৃতি’ (ছান্দোগ্য
৭।৩।২), ‘তমসো মা জ্যোতির্গময়’ (বৃহদারণ্যক ১।৩.২৮), ‘অন্ধঃ তমঃ
প্রবিশক্তি’ (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১০), ‘অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন
তমসা বৃত্তাঃ’ (ঈশ ৩), ‘পারায় তমসঃ পরস্তাৎ’ (মুণ্ডক, ২।২.৬)...
ইত্যাদি মন্ত্র হইতে জানা যায় । তাহা হইলে, অর্থাৎ তমঃ অর্থে যদি
অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা হয়, তবে তাহার বিপরীত ‘জ্যোতিঃ’ অর্থে জ্ঞানের
জ্যোতিঃ—ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ মাত্র বুঝিতে হয় । আর তমঃ অর্থে
যদি প্রকৃতি বা শুড় বর্ণ বা শুড় জগৎ কারণকে বুঝিতে হয়, তবে এই
শুড় অপ্রকাশ জ্যোতির্হীন বলিয়া জ্যোতিঃ অর্থে আলোক, প্রভা, দীপ্তি,
বা শুড়ের বিপরীত ধর্মযুক্ত পদার্থ বুঝিতে হয় । তাহা দ্বারাই শুড়

সূর্যামণ্ডল জ্যোতিষ্মত, আর সে জ্যোতিঃ ব্রহ্মের,—এইরূপ অর্থ করিতে হয়। কিন্তু সে অর্থ তত সঙ্গত হয় না। তমঃ অর্থে যে জগতের অতি জড় কারণ, সে সম্বন্ধে শ্রুতি যথা—

“তমো বা ইদমগ্র আসীৎ” (মৈত্রায়ণী, ৫।২) ।

এই শ্রুতি অনুসারে জগতের আদি কারণ ‘তমঃ’ ; সেই তমঃ হইতে রজঃ (ক্রিয়া) উৎপন্ন হয়, (তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রযাতশ্চ রজসঃ রূপম্ ইতি মৈত্রায়ণী শ্রুতি) এবং এই রজঃ হইতে সত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব মিলিয়া প্রকৃতি। যে প্রকৃতি সাংখ্যের মূল তত্ত্ব, এই শ্রুতি অনুসারে তাহা মূলতত্ত্ব নহে, তাহা আদি তমঃ হইতে উৎপন্ন। সে আদি তমঃ কতকটা chaosএর অনুরূপ। ঋগ্বেদেও এই তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। যথা সৃষ্টির আগে—

‘তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্ অগ্রে

অপ্রকৃতং সলিলং সর্বম্ আ ইদম্ ।

তুচ্ছ্যান আ ভু অপিহিতঃ ষৎ আসীৎ

তপসঃ তৎ মহিনা অজায়ত একম্ ॥’

(১০ম মণ্ডল ১২৯ সূত্র ৩ মন্ত্র) ।

এই সূত্র অনুসারে সৃষ্টির পূর্বে ‘সৎ’ও ছিল না, ‘অসৎ’ও ছিল না। ... কিছুই ছিল না—কেবল পরম ‘এক’ ছিলেন (এই সূত্রের ১২ শ্লোক)। এই সৃষ্টি তখন ঘোর অন্ধকারে আবৃত ছিল। সেই এক সেই অন্ধকার অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হইলেন। সৃষ্টির পূর্বে সেই ‘এক’ তমঃ দ্বারা গূঢ় ছিলেন, (আবৃত ছিলেন)। এই তমঃ সম্বন্ধে সাধারণ অর্থ করেন যে, যেমন নৈশ অন্ধকার সর্বপদার্থজাতকে আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ আত্মতত্ত্বের আবরক হেতু মায়া বা রূপবাচ্যভাবরূপ অজ্ঞানই এস্থলে তমঃশব্দবাচ্য। সেই তমঃ জগৎ-কারণভূত। তাহা দ্বারা নিগূঢ়ভাবে সেই ‘এক’ আচ্ছাদিত ছিলেন। সেই আচ্ছাদক তমঃ

হইতে নামরূপের দ্বারা জগৎ বিবর্তিত হইয়াছে । ইহা হইতেই জগতের সৃষ্টি ।” অতএব সাধারণের অর্থানুসারে এই তমঃ মূল অজ্ঞান বা মায়ী । ইহাই জগৎ-কারণ । ব্রহ্ম তাহার অতীত ।

জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞানগম্য—জ্ঞান অত্যন্ত দুর্লভ ভাবিয়া যদি কোন সাধক অবসাদযুক্ত হন, তবে তাঁহাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলা হইতেছে যে, এই জ্ঞেয়ই জ্ঞান, অর্থাৎ অমানিত্ব প্রভৃতি সাধন যে জ্ঞান, তাহাই এই জ্ঞেয় ব্রহ্ম, তাহাই সেই জ্ঞানে জ্ঞেয় ; ‘জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি’ বলিয়া তাহা আরম্ভ হইয়াছে, উপসংহারে তাহাই বলা হইতেছে । এই জ্ঞেয়ই জ্ঞানগম্য, জ্ঞেয় যখন জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই জ্ঞানের ফল বলিয়া বুঝিতে হয় । জ্ঞানের বিষয়কে জ্ঞেয় বলে, যাহা ‘জ্ঞায়মান’, তাহা জ্ঞেয় । (শঙ্কর) । যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞানের সহিত এক আকার, তাহাই অমানিত্ব প্রভৃতি উল্লিখিত জ্ঞানসাধনের দ্বারা প্রাপ্য (রামানুজ) । সেই ব্রহ্মই বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত জ্ঞান, তাহাই রূপাদি আকারে জ্ঞেয়, তাহাই পূর্বোক্ত অমানিত্বাদিলক্ষণ জ্ঞানসাধনের দ্বারা প্রাপ্য (স্বামী) । তাহা জ্ঞান অর্থাৎ প্রমাণজন্য চিন্তাবৃত্তিতে অভিব্যক্ত সংবিৎ-রূপ, তাহাই অজ্ঞাত বলিয়া জানিবার যোগ্য । জড় অজ্ঞাত নহে, একজন্ম তাহা জানিবার যোগ্য নহে । ব্রহ্ম যদি অজ্ঞাত হন, জ্ঞানের যোগ্য না হন, তবে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় কিরূপে ? ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম জ্ঞানগম্য । অর্থাৎ অমানিত্ব হৃদয়ে আরম্ভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন পর্য্যন্ত যে জ্ঞানের হেতু বিভিন্ন সাধন সকলকে জ্ঞান বলা হইয়াছে, সেই জ্ঞানেরই ইহা গম্য । এই সকল সাধন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ব্রহ্ম জ্ঞানগম্য হন না (মধু) জ্ঞান=চিনেকরস । ‘বিজ্ঞানমানদঘনং ব্রহ্ম’—ইতি শ্রুতিঃ । জ্ঞেয়—মুমুকুর একমাত্র শরণ্য বলিয়া জানিবার যোগ্য । “তং হ দেবম্ আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুকু বৈ শরণমহং প্রপদ্যে” ইতি শ্রুতিঃ । ব্রহ্মই জ্ঞানগম্য । “তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি”—ইতি

শ্রুতিঃ । (বলদেব) জ্ঞান = অমানিহাদি । জ্ঞেয় = অনাদিমৎপরঃ
ব্রহ্ম । জ্ঞানগম্য = জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্য ফল । (হনু) ।

এ স্থলে ব্রহ্মকে জ্ঞান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ,
চিৎস্বরূপ বা সংবিৎস্বরূপ । শ্রুতিতে ইহা বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে,
যথা—

“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ।” (তৈত্তিরীয়, ২।১।১) ।

“যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ।” (মুণ্ডক, ৩।১।২) ;

ব্রহ্ম যে বিজ্ঞানস্বরূপ, তাহাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । যথা—

“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ।” (বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮) ।

“যো বিজ্ঞানং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে ।” (ছান্দোগ্য, ৭।৭।২) ।

“যস্য বিজ্ঞানং শরীরম্ ।” (বৃহদারণ্যক ৩।৭।২২) ।

“বিজ্ঞানং ব্রহ্ম ইতি ব্যক্তানাং । বিজ্ঞানাং হি এব খলু ইমানি ভূতানি
জায়ন্তে, বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি, বিজ্ঞানং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি—
ইতি ।” (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।৫) ।

“সকং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্...প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ।” (ত্রৈতরেয়, ৩।৩) ;

ব্রহ্মই যে একমাত্র বিজ্ঞাতা, তাহাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ।

“নাত্তোহত্তোহস্তি বিজ্ঞাতা ।” (বৃহদারণ্যক, ৩।৭।২৩) ।

“যেন সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞানান্তি...অরে বিজ্ঞাতারং কেন
বিজ্ঞানীয়াৎ ।” (ছান্দোগ্য ৩।৪।৩৪) ।

জ্ঞান—ব্রহ্ম যে জ্ঞানরূপ, তাহা আমরা কিরূপে ধারণা করিব?
নানাভাবে মনন ও চিন্তা করিয়া ইহার উপলব্ধি হইতে পারে । ব্রহ্ম যে
জগৎকারণরূপে জ্ঞেয়, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । জগতের যে এক
অদ্বিতীয় মূল কারণ আছে এবং তাহাকে যে সৰ্ব্বব্যাপক, সৰ্ব্বাধার
বলিয়া ‘ব্রহ্ম’ বলা যায়, তাহা শ্রুতির উপদেশ বিনাও অনেক পাশ্চাত্য
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিত, তাঁহাদের জ্ঞানে ধারণা করিয়াছেন ।

ঠাহাদের এই একত্ববাদের নাম Monism । কিন্তু কেহ সেই আদি কারণকে জড় বলেন, কেহ জড়শক্তি বলেন, কেহ আকাশ বা ether বলেন, কেহ অচৈতন্য ইচ্ছাশক্তি বলেন । কেহ বলেন, সেই আদি কারণে কোনরূপ জ্ঞান বা চৈতন্য নাই ; কেহ বলেন, তাহাতে জ্ঞান বীজভাবে থাকিতে পারে ; কেহ বলেন, তাহা অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ ; কেহ বলেন, তাহা জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীত তত্ত্ব ।

যাহারা “জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব” (মুণ্ডক, ৩।১।৮) ঠাহারাই সেই অনাদিমৎ অধিতীয় জগতের পরম কারণকে অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম-রূপে জ্ঞানিতে পারেন । প্রথমতঃ জগতে সৰ্ব্বপ্রাণীর মধ্যে যে জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে, এবং মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ অবস্থায় যে সেই জ্ঞানের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইতে জগতের যাহা আদি-কারণ, তাহা যে পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি । যাহা কারণে নাই, তাহা কার্য্যে থাকিতে পারে না । যাহারা সংকারণ-বাদ সিদ্ধান্ত করেন, ঠাহাদের মতে কারণ-গুণ কার্য্যে অভিব্যক্ত হয় । অতএব জগতে এই যে সৰ্ব্বভূতের অন্তরে জ্ঞানের অভিব্যক্তি দেখা যায়, সেই জ্ঞান অবশ্য সেই আদি কারণেই নিহিত আছে । কিন্তু এ সিদ্ধান্তে এই আপত্তি হইতে পারে যে, সেই জ্ঞান কারণে বীজভাবে নিহিত থাকে মাত্র ; তাহাতে জ্ঞান যে পূর্ণ অভিব্যক্ত, তাহা বলা যায় না ।

তাহার পর জগতে আমরা শৃঙ্খলা, নিয়ম, বিবর্তন ও পরিণতি প্রভৃতি দেখিয়া, তাহার মূলে যে অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান নিহিত আছে, তাহার ধারণা করি । জড়ের স্বভাব বা ‘যদৃচ্ছায়’ পরিণতি হইতে, অক্ষ শক্তির উদ্দেশ্যহীন, অভিসন্ধিহীন ক্রিয়াফলে যে একরূপ শৃঙ্খলাযুক্ত ও সুনিয়ত জগতের বিকাশ হইতে পারে, তাহা জড়বাদী পণ্ডিতগণও সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না । এ জগতে সমুদায়ই পরস্পর অঙ্গাঙ্গিতাবে অবস্থিত, সকলই এক সূত্রে গ্রথিত, একই নিয়মে নিয়মিত । সবই যেন এক

বিরাট্ নিয়মের শাসনে থাকিয়া কি এক গুঢ় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জ্ঞান-বশে অগ্রসর হইতেছে। অতএব জগতের বাহা আদিকারণ, তাহা কেবল উপাদান-কারণ নহে, তাহা নিমিত্ত-কারণও বটে। সেই আদিকারণ অনন্ত অব্যাকৃত জ্ঞানের দ্বারা সকলকে পরিচালিত করিতেছেন, সকলকে শাসন করিতেছেন, সকলকেই একই নিয়মে পরিণত করিয়া কোন অজ্ঞেয় উদ্দেশ্যসাধন জন্য নিয়মিত করিতেছেন। এ জগৎ-সৃষ্টির মূলে জ্ঞান, ইহার রক্ষা ও পরিণতির মূলে জ্ঞান, ইহার ধ্বংসেও সেই জ্ঞান নিহিত। এ জগতে প্রত্যেক বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি, পরিণতি ও নাশের মূলে সেই জ্ঞানেরই নিত্য অবস্থিতি। সেই বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের “বিজ্ঞানাৎ ধমু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি, বিজ্ঞানং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি।” সেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বিজ্ঞান হইতেই এই সকল ভূতগণের উৎপত্তি, সেই বিজ্ঞান দ্বারাই জাত জীবগণ বিধৃত ও রক্ষিত হয়, এবং বিনাশকালে সেই বিজ্ঞানেই অনুপ্রবেশ করে। জগতের মূলে এই বিজ্ঞান না থাকিলে, এ সৃষ্টি আদৌ হইত না, হইলেও তাহা সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, অমঙ্গল উপস্থিত করিয়া অচিরেই জগৎকে বিনাশের মুখে লইয়া যাইত,—সৃষ্টি থাকিত না।

জগতে সর্বত্র এই যে জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়ার অভিব্যক্তি, এই যে জ্ঞান দ্বারা সমুদায় নিয়মিত, পরিচালিত, পালিত, সে জ্ঞান অবশ্য অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, অজ্ঞানসাধনাবিহীন। জগতে তাহা অনেক স্থলে পরিচ্ছিন্ন, অপ্রকট, অজ্ঞানযুক্ত মনে হয়। কেন না, কারণ কার্যরূপে পরিচ্ছিন্ন হয়; কার্য ব্যাপ্য, কারণ ব্যাপক। কারণের দ্বারা কার্য সীমাবদ্ধ। কিন্তু কারণ কাহারও দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না, তাহার কেহ ব্যাপক নাই। এজন্য জগৎকারণ যে জ্ঞান, তাহা অবশ্য অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত বলিতে হইবে।

এই জ্ঞান হইতেই জগৎতর সৃষ্টি। অজ্ঞান হইতে সৃষ্টি হয় না।

“ঐক্যতে নাশকম্” বেদান্ত-দর্শনের এই (১১৫) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শ্রুতিতে আছে—‘স অকল্পয়ৎ বহু স্রাং প্রজায়েষু ।’ এইরূপ কল্পনা, ঈক্ষণ বা ভাবনা হইতেই জগতের সৃষ্টি, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই কল্পনা বা ঈক্ষণ,—জ্ঞানেরই স্বভাব । শ্রুতি সর্বত্র ব্রহ্মকে বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন । সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই জ্ঞানে ‘জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই দ্বৈত তত্ত্বের বিকাশ হয় ।’ “আমি” এইরূপ বহু জ্ঞেয় কল্পনা বা ঈক্ষণ করিতেছি—এইরূপ জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয় । এ অভিব্যক্তিতেই জ্ঞানে এ জগৎ কিরূপ হইবে, কি নিয়মে পরিচালিত হইবে, কি উদ্দেশ্যে কি শক্তি হইবে, ইহাতে জীব-জগতের সংস্থান ও পরিণতি কিরূপ হইবে, সমুদায়ই যুগপৎ, বিনা চেষ্টায় ঈক্ষিত বা দৃষ্ট হয় । তাহা না হইলে, এরূপ শৃঙ্খলা ও নিয়মিত জগতের কদাচ অভিব্যক্তি হইতে পারিত না । একত্র ব্রহ্মকে কামস্বরূপ বলিতে হয় ।

সেই ব্রহ্মজ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন । তাহা কোন ক্রিয়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে । তাহা ‘জ্ঞাতা’ ও ‘জ্ঞেয়’ রূপ দ্বৈত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে । সৃষ্টিতে সে জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বোধ হইলেও সৃষ্টির পূর্বে সে জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ মাত্র । সৃষ্টির প্রারম্ভে কল্পনা, ঈক্ষণ বা ‘কাম’ হেতু তাহা জ্ঞাতা হইয়া সেই জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয় কল্পিত হয় মাত্র । নতুবা সূর্য্যের প্রকাশের স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান নিত্য । • নির্মল চিত্তে সেই জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয় এবং তাহা হইতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞেয় হয় ।

যাহা হউক, নির্মল জ্ঞানে জ্ঞেয় ব্রহ্ম যে জ্ঞানস্বরূপ, তাহা উক্ত প্রকার বিচার ব্যতীত, আমরা অল্পরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব । আমরা আমাদের জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, এ তত্ত্ব জানিতে পারিব ।

* শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-দর্শনের ১১১৫ সূত্র-ভাষ্যে এই তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন ।

আমাদের জ্ঞান সাত্বিক নির্মল বুদ্ধিরই রূপ। একথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। যাহার বুদ্ধি ষে রূপ, তাহার জ্ঞানও সেইরূপ। বুদ্ধি সাত্বিক স্নাত্বিক, তামসিক ভেদে বহুরূপে ভিন্ন হয়। জ্ঞানও তদনুসারে ভিন্ন হয়। যে জ্ঞান নির্মল পরিশুদ্ধ অজ্ঞান-মগ্না-হীন তাহা অমানিষাদি রূপযুক্ত তাহা ক্ষেত্রের ধর্ম। এ জ্ঞান আত্মার নহে। ইহা বৃত্তি জ্ঞান, ইহা বুদ্ধিরই এক রূপ, তাহা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। চিত্ত এরূপ চৈতন্য ও জ্ঞান-স্বভাব হয় কি প্রকারে? ইহার একমাত্র গ্রাহ্য উত্তর এই যে, আত্ম বা ব্রহ্ম জ্ঞান ও আত্ম-চৈতন্য আমাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া, বুদ্ধিতে চৈতন্য ও জ্ঞানের আভাস হয়। চিত্ত যত নির্মল হয়, তত এই জ্ঞানের স্পষ্ট আভাস গ্রহণ করে। এই জন্ত বিভিন্ন চিত্তে জ্ঞান বিভিন্ন হয়। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিন রূপে ভিন্ন হয়। এই 'জ্ঞাতা' রূপে আত্মা আত্ম-ভাব বা স্ব-ভাব প্রকাশিত হয় এবং জ্ঞাতার এই আত্মভাব বা স্বভাব হইতে আমি কর্তা জ্ঞাতা ভোক্তা ইত্যাদি রূপে বা অহঙ্কার তত্ত্ব চিত্তে প্রকাশিত হয়। আর এই 'জ্ঞেয়' হইতে চিত্তে 'ইদং' 'তম্' ইত্যাদি বাহ্য জগৎ জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও মনের সহায়তার বিকাশিত হয়। আত্মা ও স্বপ্নাবস্থার বধনই এই চিত্তে জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখনই এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় বা তাহার অতীত তুরীয় অবস্থায় চিত্তে এইরূপ বৃত্তি জ্ঞানের বিকাশ হয় না। সে বৃত্তিনিরোধ অবস্থায় হয়ত আত্মজ্ঞান চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় না। এইজন্য আত্মজ্ঞান—এই জ্ঞাতা জ্ঞেয়রূপ দ্বন্দ্বের অতীত, তাহা জ্ঞান-স্বরূপ, ইহা নির্মল জ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধ হয়।

তোমার আমার—সকলের চিত্তেই এইরূপ আত্মস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া, জ্ঞাতা আমি এই জ্ঞেয় জগৎ জানিতেছি, এইরূপ অসুভব হয়। তোমার আমার—সকলের আত্মা এক; নতুবা সকলের চিত্তেই

সে জ্ঞান, একরূপ জ্ঞাতাকে ও একরূপ জ্ঞেয় জগৎকে প্রকাশ করিতে পারিত না। তুমি এই চিত্তবৃত্তির জ্ঞানে বেক্রপ রূপ রস গন্ধাদি অনুভব কর, আমিও সেইরূপ অনুভব করি। যে আকাশ-তরঙ্গ (Ether waves) তোমার কাছে শুভ্র নির্মল আলোকের জ্যোতিঃ প্রকাশ করে, আমার কাছেও সেইরূপ প্রকাশ করে। তুমি যে পরমাণু বিশেষ মাংষে ও যে শক্তি ক্রিয়ার আধারে—বিশেষ রূপরসাদি-বিশিষ্ট ঐ আয়ুবুক্ষ দেখিতেছ, সেখানে থাকিলে আমিও সেইরূপ ঐ আয়ুবুক্ষ দেখিব। মতএব যে আত্মজ্ঞান চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহাতে এইরূপে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে একই প্রকারে প্রকাশ করে, সে আত্মজ্ঞান, তোমার বা আমার একার নহে। তাহা সকল ক্ষেত্রে, সকলের চিত্তে সমভাবে একই নিয়মে একই প্রকারে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে প্রকাশ করে। সৃষ্টির আদিতে, আমি বল হইয়া উৎপন্ন হইব—এই কল্পনার হেতু বা ব্রহ্মজ্ঞানে বেক্রপ জ্ঞেয় জগৎ অভিযুক্ত ও বিধূত, সেই জ্ঞানই আমার চিত্তে ও তোমার চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া একই ভাবে আমাদের জ্ঞানে জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় জগৎকে প্রকাশ কবে। আমরা এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞানে কল্পিত জগৎকে একই ভাবে জানিতে পারি। সেই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান, আমাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া একই রূপ জ্ঞেয় জগৎ প্রকাশ করে। এজন্য অবশ্য বলিতে হয় যে তোমার, আমার ও সকলের আত্মা এক, তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই পরমাত্মা। একই পরমাত্মা সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত, সেই একই পরমাত্মার জ্ঞান বিভিন্ন ভূতের চিত্তে প্রতিফলিত, তাহাদের চিত্ত বা বুদ্ধি একই প্রকারের বৃত্তি জ্ঞানবুদ্ধি। বৃত্তির মালিন্য হেতু সে জ্ঞান মলিন হইলে আত্মা তাহাতে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। চিত্ত নির্মল হইলেই তাহাতে এই পরমাত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়। পরমাত্মজ্ঞান চিত্তে পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হইলেও, বতটুকু প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাতেই আমি ও আমার জ্ঞেয় জগৎ আমার কাছে ব্যক্ত হয়। সেই পরমাত্মার জ্ঞান হইতেই এ জগৎ আমার জ্ঞানে

প্রকাশিত হয় । সেই জ্ঞানই আমার জ্ঞানে প্রকাশিত জগতের কারণ ; অতএব অধ্যায় যোগে ব্রহ্মজ্ঞানে আমরা পরমাথাকে জ্ঞানস্বরূপ ও জগৎ-কারণ রূপে জানিতে পারি । নিৰ্ম্মল পরিশুদ্ধ জ্ঞানে, এই প্রকারেই ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপে জ্ঞেয় হন ।

ইহা হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্ম অবিভক্ত এক হইয়াও কেন সৰ্ব্বভূতে বিভক্তের স্তায় প্রতীয়মান হন । সৰ্ব্বভূতের চির বিভিন্ন বসিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান তাহাতে বিভিন্নরূপে প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়াই প্রতি জীবে বিভক্তের স্তায় তাহাকে বোধ হয় । আমাদের, এই প্রতি-বিম্বিত জ্ঞানে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একরূপে প্রকাশিত হইলেও চিত্তের বিভিন্ন রূপ মগ্নিতা হেতু পার্থক্য জন্ম জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভিন্ন রূপে উভয়েই প্রতীয়মান হয় । কেবল যে দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছেদ হেতু ভূতগণকে পৃথক্ বোধ হয় বলিয়া, তাহাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত ব্রহ্ম ৫ পরমাথ্যা পৃথক্ বোধ হয়, তাহা নহে । এই বিভিন্ন ভূত জ্ঞানে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয় বলিয়া জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে বিভক্তের স্তায় বোধ হয় । কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম পরমাথ্যারূপে সৰ্ব্বহৃদয়ে আবর্তিত ভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন ।

জ্ঞেয়—ব্রহ্ম যেমন জ্ঞানস্বরূপ সেই প্রকার 'জ্ঞেয়' স্বরূপও বটেন । আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয় রূপে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা ব্রহ্ম । "সকলং খলিদং ব্রহ্ম ।" ব্রহ্ম সৃষ্টির প্রারম্ভে 'আমি' বহু হইব, এই কল্পনা বা কল্পন করিয়া যে জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং তাঁহার জ্ঞেয় রূপে যে জগৎ জ্ঞানে ধারণ করেন, আমাদেরও সেই জ্ঞান প্রতিবিম্বিত বুদ্ধিতে—বা বৃত্তি জ্ঞানে সেইরূপ 'জগৎ' সীমাবদ্ধ হইয়া দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞেয় হয় । ব্রহ্ম জ্ঞানে যাহা জ্ঞেয়, তাহা ব্রহ্মের জ্ঞানেরই রূপ । সুতরাং আমাদের জ্ঞানে বা বৃত্তি জ্ঞানে যাহা জ্ঞেয়, তাহা সেই জ্ঞানেরই রূপ ; তাহাই আমাদের স্মৃতি জ্ঞানে প্রতিফলিত জ্ঞেয় রূপের আংশিক

পরিষ্কৃত বিকাশ । এই ব্রহ্ম জ্ঞান ধারাই আমরা এই সকল—অর্থাৎ এই জ্ঞেয় জগৎ আমাদের বৃত্তি জ্ঞানে জানিতে পারি । তিনি জ্ঞেয়-রূপ হইয়া জগৎ-রূপ হইয়া আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হন বলিয়া, আমরা জগৎকে জানিতে পারি । শ্রুতিতে আছে—

“যেন সর্কমিদং বিজানাতি ।” (ছান্দোগ্য ৩-৪.১৪) ।

অর্থাৎ বিজ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম, যে বৈত-জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপ হন, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । যত্র অবৈতভূতং বিজ্ঞানং বৈতীভূতম্ ।” (মৈত্রায়ণ্য ৩।৪) গৌড়পাদ কারিকায় আছে (৩.৩১) ।

“অকল্পকম্ অজং বিজ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নম্” । ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । অতএব ব্রহ্ম নির্মল জ্ঞানে সমুদয় ‘জ্ঞেয়’ রূপেই জ্ঞেয় । তিনি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন জ্ঞেয় নাই । সকল জ্ঞেয়েই তাঁহাতে অভিযুক্ত । আমাদের জ্ঞানে ভ্রম হেতু যেমন রজ্জুতে সর্প কল্পিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেতেই সমুদায় জগৎ কল্পিত—সমুদায় ‘জ্ঞেয়’ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ এই ব্রহ্ম । তাঁহার সত্তাতেই সমুদায় জ্ঞেয় সত্তাব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত, ভ্রান্তি দূর হইলে জ্ঞান পরিষ্কৃত হইলে আমরা ইহা বুঝিতে পারি । শঙ্করের অনুবর্তী হইয়া আমরা একথাও বলিতে পারি ।

জ্ঞানগম্য ।—জ্ঞান নির্মল হইলে, অমানিষাদি লক্ষণযুক্ত হইলে ব্রহ্মই তাহার একমাত্র জ্ঞেয় হয়, তখন ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞেয়রূপে সে জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, একত্র ব্রহ্ম সেই জ্ঞানগম্য । এই জ্ঞানেই ব্রহ্ম প্রাপ্তব্য । এই ব্রহ্মেই জ্ঞানের স্থিতি হয় । ব্রহ্মই তাহার ধ্যম (goal) তাহার একমাত্র গন্তব্য, প্রাপ্তব্য (ideal), ও শেষ বিশ্রাম স্থান তাহার পরম পুরুষার্থ । নির্মল জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় বটে, কিন্তু যাহা কেবল জ্ঞেয়রূপ তাহাতে জ্ঞানের স্থিতি হয় না, তেমন জ্ঞেয় স্বরূপ ব্রহ্ম জ্ঞানের বিশ্রাম স্থান হইতে পারে না । জ্ঞাতা-স্বরূপেই জ্ঞানের স্থিতি । সমাধি অবস্থায় যখন চিত্ত বৃত্তির নিরোধ হয়, তখন আত্মা কেবল দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা-স্বরূপে

করেন (পাতঞ্জল দর্শন ১।১, ২ সূত্র)। তখন স্বতন্ত্র জ্ঞেয় থাকে না, জ্ঞাতার মধ্যে জ্ঞেয় বিলীন হইয়া যায়। তখন জ্ঞান কেবল জ্ঞাতা-স্বরূপেই আপনাকে প্রতিষ্ঠা করে। সেই শুদ্ধ জ্ঞাতা-স্বরূপ আত্মাই ব্রহ্ম। প্রমাতা-রূপে, বিজ্ঞাতারূপে ব্রহ্ম জ্ঞানে প্রতিভাত হন। এই পরম বিজ্ঞাতারূপেই ব্রহ্ম জ্ঞানগম্য। ব্রহ্মই জ্ঞান, ব্রহ্মই জ্ঞাতা, ব্রহ্মই জ্ঞেয়। ব্রহ্মই প্রমাতা চৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য ও প্রমেয় চৈতন্য। এই ত্রিপুরী ব্রহ্ম একীভূত। ব্রহ্মজ্ঞান—এইরূপে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞানস্বরূপ। সেই জ্ঞান আমাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া, তাহাতে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এ তিনের প্রকাশ হয়। তিনি ব্যতীত আর কেহ জ্ঞাতা নাই—“নাশ্চদন্তি বিজ্ঞাতা” তিনিই একমাত্র বিজ্ঞাতা, আর কিছু দ্বারা সে বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না—‘বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ’ (ছান্দোগ্য ৩।৪।৩৪)। অতএব এই জ্ঞানগম্য শব্দের দ্বারা সেই বিজ্ঞাতাই নির্দিষ্ট হইয়াছেন; নির্মল জ্ঞানে ব্রহ্মই একমাত্র বিজ্ঞাতা-রূপে প্রকাশিত হন। তখন সাধক আর আপনাকে পরিচ্ছিন্ন বিজ্ঞাতা বলিয়া বোধ করে না। চিত্তে প্রতিবিম্বিত তাহার পরিচ্ছিন্ন বিজ্ঞাতারূপের অন্তরালে যে ব্রহ্মস্বরূপ—পরমাত্মাস্বরূপে বিজ্ঞাতা অবস্থিত থাকিয়া, তাহাকে বিজ্ঞাতা করিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে। জ্ঞান তাহাতেই বিলীন হইতে চায়। অতএব ব্রহ্ম নির্মল জ্ঞানে বিজ্ঞাতা রূপেই গম্য।

ব্রহ্মই যে আমার মধ্যে বিজ্ঞাতা, তাহা মলিন জ্ঞানে ধারণা হয় না। যেমন আত্মজ্ঞান চিত্তে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ সে চিত্তও আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয়। এই প্রতিবিম্ব হেতু আমাদের আত্মাতে চিত্তের ছায়া পড়ে! চিত্ত যদি নির্মল হয়, তবে তাহাতে কেবল আত্মারই ছায়া পড়ে, আত্মা সেই প্রতিবিম্বেই আত্মাকে দর্শন করে। চিত্ত মলিন হইলে আত্মার ছায়াও তাহাতে মলিন হয়, চিত্তে আর আত্মদর্শন হয় না।

আত্মাও সেই মলিন চিত্তের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া আপনাকে মলিন বোধ করে । একত্র যাহার চিত্ত ষত মলিন, তাহার আত্মাও তত মলিন রূপে তাহার নিকট প্রতিভাত হয় । এই মলিন জ্ঞানে আত্মা পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ বোধ হয় । এইরূপে পরিচ্ছিন্ন—চিত্তবদ্ধ আত্মা, আপনাকে জ্ঞাতা রূপে, পৃথক্ বোধ করে । যখন চিত্ত নিশ্চল হইয়া তাহাতে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তখন আত্মাকে অপরিচ্ছিন্ন নিশ্চল সর্বগত সর্বাঙ্গী রূপে অনুভব হয় । তখন সেই জ্ঞানে আপনাতে ও সর্বভূতে একমাত্র বিজ্ঞাতার দর্শন লাভ হয় । তাই বলতোছ, ব্রহ্ম নিশ্চল জ্ঞানে বিজ্ঞাতারূপে প্রাপ্য ।

সবাকার হৃদে অবস্থিত ।—মূলে দুইরূপ পাঠ আছে 'সর্বশু হৃদি বিষ্টিতম্' আর 'সর্বশু হৃদি ধিষ্টিতম্ ।' 'বিষ্টিতং' অর্থাৎ বিশেষ ভাবে অবস্থিত, সন্নিহিত (রামানুজ) । বিশেষ ভাবে অপচ্যুতরূপে নিয়ন্তা-স্বরূপে অবস্থিত (স্বামী, বলদেব) । বিশেষভাবে স্থিত (শঙ্কর) । ধিষ্টিত—অর্থাৎ অধিষ্ঠান পূর্বক স্থিত (স্বামী, কেশব) ।

সবাকার ।—অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর (স্বামী, মধু, শঙ্কর) । মনুষ্যাদি সকলের (রামানুজ কেশব) । হৃদি হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে (মধু, শঙ্কর) ।

শঙ্কর বলেন, এই জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য—এই তিনই সকল ; প্রাণীর বুদ্ধিতে বিশেষভাবে স্থিত । এই তিনটি বিভাগই বুদ্ধিতে প্রাতিভাত হইয়া থাকে । স্বামী বলেন,—ব্রহ্ম নিয়ন্তারূপেই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত । মধুসূদন বলেন,—ব্রহ্ম সামান্ত্য ভাবে সর্বত্র স্থিত হইলেও বিশেষ ভাবে তিনি যেক্রমে স্থিত ও অভিব্যক্ত, তাহাই উক্ত হইয়াছে । তিনি বিশেষভাবে জীবহৃদয়ে অন্তর্গামিরূপে স্থিত । সূর্য্যকাস্ত মণিতে যেমন সৌরভেজ অবস্থিত, সেইরূপ স্থিত । অজ্ঞান হেতু বস্তু ভ্রম হয় । অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

এস্থলে যে হৃদি বা হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ কি ? ঐতরের উপনিষদে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । যথা—

“যদেতৎ হৃদয়ং তৎ মনশ্চৈত্যা—সংজ্ঞানং অজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টিঃ শ্রুতিঃ মতিঃ মনীষা ইতিঃ স্মৃতিঃ সংকল্পঃ ক্রতুঃ অমুঃ কামো বশ ইতি ।” (৩:২) ।

অতএব এই হৃদয় মন বুদ্ধিরূপ চিন্তা । ব্রহ্ম সর্বভূতের চিন্তে বা অন্তঃকরণে অবস্থিত । ব্রহ্ম যে সর্বভূতের হৃদিস্থিত তাহা প্রথমে উক্ত হইয়াছে, যথা—

“হৃদা মনীষা মনসাভিকুপ্তঃ ।” (কঠ উপ: ৬:৯ ; শ্বেতাশ্বতর উপ: ৪:১৭ ; ৩:১৩) ।

অর্থাৎ হৃৎস্থিত অবিকল্পিত, সংশয়রহিত মননদ্বারা ব্রহ্ম অভি-প্রকাশিত হন । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে অন্যত্র (৫:২০) আছে “হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনং বিদুঃ—“অর্থাৎ হৃদয়ে মনন দ্বারা হৃদিস্থিত ইচ্ছাকে যাহারা জানেন...।” অন্যত্র আছে—

“স বা এষ আত্মা হৃদি তস্মৈ এতদেব নিকরুং—হৃদি অয়ম্ ইতি, তস্মাৎ হৃদয়ম্ ।” (ছান্দোগ্য, ৮:৩ (৩)) ।

“সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ । (কঠ উপ ৬:১৭)

শ্বেতাশ্বতর, ৪:১৭, ৩:১২) ।

“যশ্চায়ং হৃদয়ে যশ্চাসাবাদিত্যে স এষ একঃ ।”

(মৈত্রায়ণী, ৬:১৭) ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—

“হৃদয়ং বৈ ব্রহ্ম ।” (৪:১;৭) ।

“তা িস্থিতা...হৃদয়েব...হৃদয়ং বৈ আয়তনম্...

হৃদয়ং বৈ প্রতিষ্ঠা...হৃদয়ে হেয সর্বাণি ভূতানি

প্রতিষ্ঠিতানি ।” (৪:২:৭) ।

“হৃদয়ং বৈ পরমং ব্রহ্ম” (ঐ) ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—

স য এষোহস্থ হৃদয়াকাশঃ তন্নিয়মং পুরুষে মনোময়ঃ অমৃতো

হিরণ্ময়ঃ ।”

শ্রুতিতে এই হৃদয়কে ব্রহ্মপুর বলিয়াছেন । দহর বিদ্যায় ইহা বিবৃত হইয়াছে পূর্বে ৮ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে এই দহরবিদ্যা বিবৃত হইয়াছে । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্চয়োজন ।

সে যাহা হউক, আমাদের অন্তরে হৃদয়াকাশে স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থায় বে দেশকাল আধারে এই জগৎ প্রকাশিত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি । জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন বলিয়া এই প্রকাশ সম্ভব হয় । হৃদয়-পুণ্ডরীকে এইজন্ত ব্রহ্ম ধ্যান করিবার উপদেশ আছে । ভগবান্ যে সর্বজীব-হৃদয়ে অবস্থান করেন, এবং হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া সর্বজীবকে নিয়মিত করেন, তাহা বলিয়াছেন । যথা—

“সর্বত্র চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ।” (গীতা, ১৫।১৬)

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েহজ্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রামধনু সর্বভূতানি যত্রাকৃতানি মায়মা ॥ (গীতা, ১৮।৬১)

ব্রহ্ম কিরূপে সর্বভূত-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ।—ব্রহ্ম সর্বভূত-হৃদয়ে অবস্থিত, এ তত্ত্ব আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি ? (১) আমাদের অন্তরে যিনি আত্মরূপে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম । যিনি আমাদের ‘অণুরাশ্মা’ (কঠ, ৪।১ ; খেতাশ্বতর ৩।১৫ ; মুণ্ডক, ২।১।২), যিনি আমাদের ‘অণুরতর’ (বৃহদারণ্যক ১।৪ ৮), যিনি সর্বজন্তুর হৃদয়গুহায় নিহিত (কঠ, ২।২০) ; (খেতাশ্বতর, ৩।২০) যিনি আত্মরূপে সকলের অন্তরে স্থিত (বৃহদারণ্যক ৩।৪।১) তিনিই ব্রহ্ম (মুণ্ডক ২), তিনিই অমৃত ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য ৮।১৪।১) ; তিনি বিশ্বরূপ বৈশ্বানর (ছান্দোগ্য ৫ ১৩ ১) । সেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে আকাশাদিক্রমে ভূতগণের উৎপত্তি হইয়া জগতের সৃষ্টি (তৈত্তিরীয়

২।১।১) । সেই ব্রহ্মই 'বহু' বহুনা করিয়া, আত্মরূপের দ্বারা সেই কর্তৃত্ব জীবাদি সৃষ্টি করিয়া আত্মরূপে সেই জীবমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন (ছান্দোগ্য ৬।৩।২) । এইরূপে শক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মই আত্মরূপে সর্বজীব-হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত আছেন । তিনিই সর্বাস্তভূত আত্মা ।

(২) অক্ষর নিগুণ নিরূপাধিক ব্রহ্ম সর্বজীবহৃদয়ে তাহার আধার-রূপে, তাহার কারণরূপে অবস্থিত । ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই কাহারও কারণ নহে । যাহা কিছু কার্য্য, ব্রহ্ম তাহার কারণ, আর এই কারণরূপে ব্রহ্ম সকল কার্য্যের অন্তরালে অবস্থিত, আমাদের হৃদয়, যাহাকে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মনোযুক্ত চিত্ত বা অজ্ঞঃকরণ বলা যায়, তাহা কার্য্য । প্রকৃতি তাহার কারণ হইলেও প্রকৃতি ব্রহ্মেরই মায়ামক্তি । ব্রহ্মই শক্তিমান্ হইয়া সর্বভূতচিত্তের কারণ হন । এই কারণরূপে, এই ব্যাপক আধাররূপে, কুটস্থ অক্ষররূপে ব্রহ্ম অলোচন্য স্বরূপে সর্বভূত-হৃদয়ে অবস্থিত ।

(৩) ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ । কেননা, তিনিই জ্ঞানরূপে, সত্তারূপে, আনন্দরূপে আমাদের অন্তরে প্রতিবিস্তৃত হইয়া, সেই প্রতিবিস্তার আধাররূপে অবস্থান করেন । চিত্ত সেই প্রতিবিস্তার গ্রহণ করে বলিয়াই চিত্ত চৈতন্যযুক্ত হয়, আমরা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা হই । ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের চিত্তে প্রতিফলিত হয় বলিয়াই আমাদের বুদ্ধি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুটীযুক্ত হয় । ব্রহ্ম-সত্তা আমাদের চিত্তে প্রতিফলিত হয় বলিয়াই 'আমি আছি' এইরূপে আমার অস্তিত্ব গৃহীত হয়, এবং আমি কর্তা হইয়া কর্ম্ম করিতে পারি । ব্রহ্মানন্দ আমার চিত্তে প্রতিবিস্তৃত হয় বলিয়া, আমরা দুঃখ পরিহারপূর্বক সুখভোগের জন্ত লালসিত হই । পরিশেষে তুমি ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিবার জন্ত সকল কুণ্ড পরিচ্ছিন্ন সুখলিপ্সা ত্যাগ করি । অতএব ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপে আমাদের

অন্তরে অবস্থিত হইয়া, আমাদের চিত্তে সেই সচ্চিদানন্দরূপ প্রতিবিম্বিত করিয়া আমাদের জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা করেন ।

(৪) “ব্রহ্ম সত্যং শিবং সুন্দরম্ ।” তাঁহার এই ভাব আমাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া আমরাও সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প হই । আমরা যাহা শিবময় মঙ্গলময়, তাহার অনুষ্ঠান করি । আমাদের জ্ঞানে ‘I ought’ এষ্টরূপ কর্তব্যবুদ্ধি বিকশিত হয় । সেই বিবেকবাণী দ্বারা পরিচালিত হইয়া ‘সদৃভাবে’ ‘সাধুভাবে’ পরহিতার্থে কৰ্মনিরত হই । সেই ‘সুন্দরের’ সৌন্দর্য্য আমাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া, আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতিবৃত্তির বিকাশ হয়—অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, মঙ্গল দর্শন করিতে পারি ।

(৫) ব্রহ্মকল্পনা হইতে সৃষ্টির আরম্ভে যে জাতি প্রভৃতি কল্পনামূলে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়, মনুষ্যজাতি সেই কল্পনাগ্রন্থত । তিনি মনুষ্যপিণ্ড সৃষ্টি করিয়া দেবতাগণের নিকট উপস্থিত করিলে, দেবতগণ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন । সেই মনুষ্যজাতির যাহা চরম আদর্শ কল্পনা, সেই কল্পনা বা highest ideal রূপে ব্রহ্ম আমাদের অন্তরে সর্বদা অনুপ্রবিষ্ট থাকেন, এবং সেই আদর্শ কল্পনা অনুসারে আমাদের গকে পরিণত করেন । তাহাতে মানুষের জন্মের পর জন্ম এইরূপ কত জন্ম ধরিয়া ক্রমে পরিণতি ও অভ্যুদয় হয় ।

(৬) ইহা ব্যতীত ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি পরমেশ্বররূপে অন্তর্যামী হইয়া, নিয়ন্তা হইয়া, সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ হইয়া সর্বজীব-জন্মে অবস্থান করেন । ব্রহ্ম সগুণ পরমেশ্বর রূপেই এইভাবে সকলের নিয়ন্তা, সর্কাস্তর্যামী, সর্বজন্মদ্রষ্টা হন ।

যাহা হউক, নিশ্চল পরিপূর্ণ বুদ্ধিতে, অমানিষাদিরূপ গুণযুক্ত জ্ঞানে জ্ঞান-ক্ষেত্র জ্ঞানগম্য ও সর্বস্থিতিরূপে ব্রহ্মকে আমরা জানিতে পারি । ব্রহ্ম এইরূপে আমাদের এই জ্ঞানে জ্ঞেয় হন । এ স্থলে বলা বাহুল্য যে,

ব্যাখ্যাকারগণ জ্ঞান, জ্ঞেয় প্রভৃতির বৈকল্পিক অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই ।

এইরূপে এই অধ্যায়ে যে ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, সে তত্ত্বার্থ আমরা বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । ইহার সংক্ষেপ অর্থ “সর্কং খলিদং ব্রহ্ম”, ইহার অর্থ তৎ-স্বম্-অদি, ইহার অর্থ ব্রহ্মই এ সমুদায়, অথচ ব্রহ্ম সমুদায়ের অন্তর্গত । তিনি সগুণ (immanent) এবং নিগুণ (transcendent) । তিনি অবিতর্ক হইয়াও সর্কত্র বিভক্তের স্থায় স্থিত—সকলের অন্তরে বাহিরে তিনিই অস্থিত । ব্রহ্মত্বের আর জ্ঞেয় কোন তত্ত্ব নাই । তিনি ‘সর্ক’ ।*

৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত “সমগ্র” ঈশ্বরতত্ত্ব বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে । কিন্তু এ স্থলে অতি সংক্ষেপে কেবল ছয়টি মাত্র শ্লোকে এই অতি দুজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । ইহার কারণ কি ? আমরা এই কথা এ স্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিব এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক যে তত্ত্ব সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, সেই তত্ত্ব, এবং তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ আমরা আরও একটু বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ব্রহ্ম এই তিন বিষয়ে সংক্ষেপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই সকল বেদের সার অর্থ, এই গীতায়ও তাহাই প্রগণতঃ প্রতিপাদ্য অর্থ । কিন্তু ইহা গীতার সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে ! পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ও ত্ব যথা এক

* এইরূপে বেদান্তের মায়াবাদ বুঝিতে হইবে । মায়া অসৎ নহে, ইহা ব্রহ্মের পরাশক্তি । সেই শক্তি হইতে জগৎকর্তার অতিব্যক্তি বলিয়া জগৎ মিথ্যা নহে—ব্রহ্মই জগৎ, এইরূপে Idealism ও Realism সামঞ্জস্য হয় । অসিদ্ধ জ্ঞানপণ্ডিত পালডুসেন বলিয়াছেন—

By accomodation to the empirical consciousness, which regards the universe as real, it (the fundamental idealistic view) passes over into the pantheistic doctrine which is the prevailing one in the Upanishads. (Philosophy of the Upanishads, p 162)

অর্ধে ব্রহ্মতত্ত্বের অস্তর্গত, তাহা প্রাচীন ঋষিগণ দ্বারা বিস্তারিত বিচার পূর্বক “ব্রহ্মসূত্রপদে” বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে গীতার সংক্ষেপতঃ তাহা উপদিষ্ট হইবে । ষাঁহার বিস্তারিতভাবে এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে চাহেন, তাঁহার প্রাচীন ব্রহ্মসূত্রপদ অধ্যয়ন করিবেন । একত্র গীতার তাহা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয় নাই । আরও এক কথা । জ্ঞানের যে অমানিষাদিরূপ অবস্থায় ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, যে ঈশ্বরে অনন্ত অব্যক্তি-চারিণী ভক্তিরূপ, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যস্থিতিরূপ ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ বর্শনরূপ অতি নিশ্চল ও পরিপূর্ণ জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, সে জ্ঞান কদাচিৎ কোন সাধনাসিদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে । প্রকৃত জিজ্ঞাসুর সংখ্যা অতি অল্প এবং জিজ্ঞাসু হইবার অধিকারী ব্যক্তির মধ্যেও ভগবান্কে বা ব্রহ্মকে জানিতে পারে, এরূপ লোকের সংখ্যা আরও অল্প । ভগবান্ বলিয়াছেন—

“মনুষ্যাণাং, সহস্রেষু কশ্চিৎ ষততি সিদ্ধয়ে ।

ষততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি ভক্ততঃ ॥ (৭।৩)

কোটি মানুষের মধ্যে একজনও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত কি না, তাহাও বলা যায় না । একত্র গীতায় এই ব্রহ্মতত্ত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে নাই—বিস্তারিতরূপে বিবৃত হয় নাই । ষাঁহার গীতা-পাঠের অধিকারী, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার উপযুক্ত হইতে পারেন । তাঁহাদের অন্ত এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট । আরও বলা যাইতে পারে যে, ভগবান্ এ স্থলে অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতা উপদেশ দিতেছেন । তখন অর্জুন যেরূপ শোকমোহযুক্ত, হঃখে আতভূত ছিলেন, তাহাতে তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণের উপযুক্ত ছিলেন না । একত্র সংক্ষেপে তাঁহার নিকট এই ব্রহ্মতত্ত্ব একমাত্র জ্ঞেয়রূপে প্রতিষ্ঠাপিত করা হইয়াছে, বিশেষভাবে তাহা উপদিষ্ট হয় নাই ।

তাহা হইলেও যে ভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব এ স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে—তাহাই

যথেষ্ট । তাহাতেই উপনিষদ্বুক্ত ব্রহ্মতত্ত্বের সম্পূর্ণ আভাস পাওয়া যায় ; এ স্থলে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কথা উল্লিখিত হইতে বাকী নাই । কোন কথা বাদ যায় নাই । কেবল তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে মাত্র । এত সংক্ষেপে অথচ একরূপ বিশদভাবে ও এ প্রকার সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব আর কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই । ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে ইহা সৰ্ব উপনিষদের সার । উপনিষদ্ হইতেই আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি ।

বাহা হউক, এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, মূল উপনিষদে ব্রহ্মকে “বিজ্ঞানানন্দঃ” বলা হইয়াছে । (যথা—বৃহদারণ্যক, ৩।১।২৮, তৈত্তিরীয় ২।৪।১ ইত্যাদি) আধুনিক (নৃসিংহতাপনীয়, রামতাপনীয়, মুক্তিকোপনিষদ প্রভৃতি) উপনিষদে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ বলা হইয়াছে ; কিন্তু গীতার ব্রহ্মের এ লক্ষণ উক্ত হয় নাই । ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ, তাহা উক্ত হয় নাই । প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না । তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য বটেন, অর্থাৎ সকলের হৃদয়ে এইরূপে অবস্থিত বটেন ; কিন্তু তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ, তাহা স্পষ্ট উক্ত হয় নাই । ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব সম্বন্ধেও কিছুই উক্ত হয় নাই । পরে (১৪।২৭) উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ ঐকান্তিস্থত্বের প্রতিষ্ঠা । গীতা অনুসারে যখন ব্রহ্ম কোনরূপে বাচ্য নহেন, তখন তিনি সৎ কি অসৎ, জ্ঞান কি অজ্ঞান (অর্থাৎ চিৎ কি অচিৎ), এবং আনন্দ কি নিরানন্দ কোনরূপে বাচ্য নহেন । তাহা হইতে সদসৎ, চিদচিৎ, আনন্দ-নিরানন্দ ভাব সকলই বিবর্তিত । সুতরাং তাঁহাকে নির্বিশেষভাবে জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ—অথবা নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দরূপ বলা যায় না । বিশেষভাবে সত্ত্ব ব্রহ্ম পরমেশ্বরই সচ্চিদানন্দময় । এজন্য গীতার ব্রহ্মের এ লক্ষণ উক্ত হয় নাই ।

ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে উক্ত হইলেও গীতার ঈশ্বরতত্ত্ব অতি বিস্তৃতভাবে

উপনিষ্ট হইয়াছে । কেন হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে । ঈশ্বরতত্ত্ব কোথাও পূর্বে একরূপভাবে বিবৃত হয় নাই । উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ স্থানে তাঁহাকে সর্বভূতাস্তরস্থিত অধিভূত পুরুষরূপে, সর্বদেবাত্ত্বিত অধিদেবপুরুষরূপে এবং জগতের নিয়ন্তা 'ঈশ'রূপে বর্ণিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদেব পুরুষরূপে ব্রহ্মের ধারণাকে 'প্রতীক' বলা হয় ; 'সর্বং খলিদং ব্রহ্ম' এই তত্ত্বের ব্যাখ্যারূপে বর্ণিত হইয়া থাকে । মামাশক্তি দ্বারা ব্রহ্ম সগুণ হইলেও, সে ব্রহ্ম প্রকৃতিপুরুষের অতীত তত্ত্ব, সূত্রাং এক অর্থে ঈশ্বরের অতীত তত্ত্ব । এক উপাশ্রয় পরম পুরুষ পরমেশ্বরের তত্ত্ব উপনিষদে কোথাও স্পষ্ট উপনিষ্ট হয় নাই । এই ঈশ্বরতত্ত্ব পূর্ণরূপে 'সমগ্র'ভাবে স্থাপন করাই গীতার বিশেষত্ব । একত্র গীতায় এই তত্ত্ব বিস্তারিতরূপে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে । ৭ম হইতে ১২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত তাহা নানারূপে নানা ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

ব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব ঠিক এক নহে । ঈশ্বরতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের সত্ত্বভূত হইলেও, ব্রহ্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্গত নহে ! অনির্বাচ্য, অপ্রমেয়, অবিজ্ঞেয়, নিক্রুপাধি নির্কিংশেষ পরম ব্রহ্মতত্ত্বও আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয় নহে । তবে নিশ্চল জ্ঞানে আমরা দুই ভাবে পরমব্রহ্মকে ধারণা করিতে পারি—তিনি দুই ভাবে নিশ্চল জ্ঞানে জ্ঞেয় হন । এক ব্রহ্মের নিগুণতাব, আর এক সগুণ তাব । এ উভয় তাব একই, ব্রহ্ম এক ব্যতীত দুই নহে, অথবা ব্রহ্ম এক, দুই একরূপ কোন সংখ্যা দ্বারা বাচ্য নহেন । একত্র এই দুই রূপ তাব এ হলে একত্র উক্ত হইয়াছে । এ সকল কথা আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এই সগুণভাবে ব্রহ্ম দুইরূপে জ্ঞেয় :—এক পুরুষ, আর এক প্রকৃতি । মনুদায় জড়বর্গ প্রকৃতি । বুদ্ধি মন হইতে জড়ভূত পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্গত । আর পুরুষ গীতা অনুসারে ক্ষর (সর্বভূত), অক্ষর (নিত্য আত্মা) আর

পরম । এই পরম পুরুষই পুরুষোত্তম ঈশ্বর । ভগবান্ এই প্রকৃতি (Nature) ও পুরুষকে (spirit) তাঁহার অন্তর্ভূত তত্ত্ব—প্রকৃতি তাঁহারই, এই কথা বলিয়া, সগুণ ব্রহ্মের সহিত ঈশ্বরের একত্ব প্রতাপন করিয়াছেন । অতএব ব্রহ্ম সগুণভাবেই পরমেশ্বর (Immanent God)—তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ, সগুণভাবেই ব্রহ্ম জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত । নিঃসর্গভাবে ব্রহ্ম জগদতীত (Transcendent) । এজন্য বলিতে হয় যে, ঈশ্বরতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত । কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্ভূত নহে ।

এ সম্বন্ধে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে । অধ্যাত্মজ্ঞান সাধনার পরিণামে যে অনন্তভক্তির উদয় হয়, সেই ভক্তি সাধনার ফলে পরমেশ্বর সমগ্ররূপে জ্ঞেয় হন (৭।১) । ব্রহ্ম কখন সমগ্ররূপে জ্ঞেয় হন না ; তিনি জ্ঞেয় হইয়াও অজ্ঞেয় থাকেন । শ্রুতিতে আছে—

“যস্তামতং তস্ত মতং মতং যস্ত ন বেদ সঃ ।

অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্ ॥”

(কেন উপঃ ১।১১) ;

ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানে পূর্ণ বা সমগ্ররূপে জ্ঞেয় হইয়া আমাদের জ্ঞান দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হন ; কিন্তু ব্রহ্ম সেরূপ পরিচ্ছিন্ন হন না । যাহাকে আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে আনা যায়, জ্ঞানের সীমার বন্ধ করা যায়, তাহা জ্ঞানপরিচ্ছিন্ন হয়, আমাদের জ্ঞান তাহার ব্যাপক হয় । এই জন্য বলা যায় যে, ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানপরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন । কিন্তু ব্রহ্ম কখন সেরূপ হন না । এজন্য বলিতে হয় যে, ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাপ্য, ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাপক । ঈশ্বরতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত ।

ভগবান্ বয়ং ব্রহ্মকেই জ্ঞেয় বলিয়াছেন । ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব । ব্রহ্মকে জানিলেই সমুদায় জানা হয়, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ব্রহ্মতত্ত্ব জানিলেই ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় । এজন্য স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বরতত্ত্বকে জ্ঞেয়

বলা হয় নাই । অবশ্য, পূর্বে ভগবান্ ঈশ্বরতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া-
ছেন । বাহ্যতে ঈশ্বরতত্ত্ব “সমগ্র”রূপে জানা যায়, ভগবান্ তাহার নানা-
রূপে উপদেশ দিয়াছেন । কেন না, প্রথমে সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব না জানিলে,
শ্রেয়তরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না । এই ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই সর্বতঃ
পানিপাদ সর্কেষ্মিন্নশুণাভাস, সর্কভূৎ, শুণভোক্তা, চরাচরের সর্বত্র
বাণিয়া স্থিত, সর্কভর্তা, সৃষ্টিলয়কর্তা সশুণ ব্রহ্মকে জানা যায় । সশুণ
ব্রহ্ম এইরূপে ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে জেয় হইয়া, তাহা দ্বারাই নিশূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব-
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন । এই জন্ত ভগবান্ বলিয়াছেন যে, “ব্রহ্মণো হি
প্রতিষ্ঠাহম্” (১৪।২৭) । এইরূপে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান হইতে সশুণ ব্রহ্মতত্ত্ব-
জ্ঞানের সহিত সর্কশুণাতীত সর্কেষ্মিন্নবিবর্জিত, অসক্ত, সূক্ষ্ম,
জ্ঞানস্বরূপ, ‘নেতি নেতি’ বাচ্য, নিশূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত
হইতে পারে ।

এই ব্রহ্মতত্ত্ব—সশুণ ও নিশূর্ণ—ইহা উপনিষদে নানা স্থানে নানা-
ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । শঙ্করই ইহা প্রথমে বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন ।
অথচ তিনি নিশূর্ণ ব্রহ্মকেই পারমার্থিক তত্ত্ব বলেন, সশুণ ব্রহ্ম মায়িক
কেবল ব্যবহারিকভাবে সত্য, এই তত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন । নিশূর্ণ
ব্রহ্মতত্ত্বই একমাত্র সত্য পারমার্থিক তত্ত্ব বলিলে, ব্রহ্মতত্ত্বমধ্যে পারমার্থিক
ভাবে ঈশ্বরতত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না । এইরূপে নিশূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে
প্রতিষ্ঠিত হইলে, সশুণ ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান মায়ার সহিত দূর হইয়া
যায় । আর ঈশ্বরজ্ঞান থাকে না । এজন্য শঙ্করের ব্যাখ্যা হইতে
ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না । ভগবান্ যে তত্ত্ব বিশেষভাবে স্থাপিত
করিয়াছেন, শঙ্করের মত অনুসারে তাহা খণ্ডিত হইয়া যায় ।

অত্যাঁদিকে যাহারা ঈশ্বরতত্ত্বকে বা সশুণ ব্রহ্মতত্ত্বকে পারমার্থিকভাবে
সত্য ও পরম তত্ত্ব বহিয়া গ্রহণ করেন, নিশূর্ণ ব্রহ্ম স্বীকার করেন না,
অর্থাৎ নিশূর্ণ ব্রহ্ম অর্থে সমুদায় হের স্বর্ক-বর্জিত সশুণ ব্রহ্মকেই বুঝেন,

কিংবা ষাঁহার। পরমব্রহ্মতত্ত্ব উড়াইয়া দিয়া জীবাশ্মাকেই ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহাদের নিকট গীতোক্ত বা উপনিষদ্রু এই ব্রহ্মতত্ত্ব নিরর্থক হইয়া পড়ে । তাঁহাদের ব্যাখ্যা হইতে গীতার এই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝা যায় না, তাহা আমরা পূর্বেই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এইজন্ত শঙ্কর ও তাঁহার অনুবর্তী ব্যাখ্যা কারগণের দ্বারা যেমন ঈশ্বর-তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব সঙ্গতরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই, সেইরূপ রামানুজ-প্রমুখ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের দ্বারাও ব্রহ্মতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব প্রভৃতি প্রকৃতরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই ।

আমরা বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ব্রহ্মতত্ত্ব কেবল জীব-তত্ত্ব নহে, তাহা কেবল সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বও নহে, অথবা কেবল নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্বও নহে । ব্রহ্ম নিগুণ ও সগুণ উভয়ই । জীবাশ্মা—অথবা চিত্তরূপ আধার বা উপাধিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মতত্ত্ব—ও ব্রহ্ম এক নহে ; তবে আশ্মা বা পরমাশ্ম-স্বরূপে ব্রহ্ম সর্ব উপাধিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সগুণ হন এবং চিত্তরূপ উপাধিতে নিজ প্রতিবিম্ব দ্বারা জীবাশ্মা সকল প্রকাশ করেন । নিগুণ ব্রহ্ম আশ্মস্বরূপেরও অতীত । ষাঁহা হউক, নিগুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম একই—সে ব্রহ্ম পরব্রহ্ম বা পূর্ণ-ব্রহ্ম । কেবল নিগুণ ব্রহ্ম অবিস্ক্রম, জ্ঞানের অধিগম্য নহে । সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই নিগুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানের ভিত্তির উপরই নিগুণ-ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । সগুণ-ব্রহ্ম-জ্ঞানের সহায়েই নিগুণ ব্রহ্মভাব জ্ঞেয়, সগুণ ব্রহ্মেই নিগুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা । নিগুণ ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের পরমধাম,—পরম স্বরূপ । নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্বের অস্তিত্ব হইয়াই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশ হয় । এ কারণ ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে না জানিলে, পূর্ণ পরব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হয় না, পরব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না । ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত ঈশ্বরারাধনা করিলে, ভগবানের প্রদানে

পরমেশ্বরের সমগ্র স্বরূপ জানা যায় (৭।১) । এই বলিয়াই ঈশ্বর-
তত্ত্ব, এবং ষেক্রমে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞেয় হয়, তাহার উপদেশ আরম্ভ করিয়া-
ছেন, এবং সেই ঈশ্বরতত্ত্ব কিরূপ, তাহা বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়াছেন ।
আর এই অনন্ত অব্যভিচারিণী ভক্তিরূপ জ্ঞানে (১৩।১০) ঈশ্বরতত্ত্ব
সম্যক্ জ্ঞাত হইলে, তবে সেই জ্ঞানে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞেয় হয়, তাহাও স্পষ্ট
উপদেশ দিয়াছেন ।

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র অনুসারে—ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্যাকে Theology
বলে । আর পাশ্চাত্য দর্শনে যাহা Philosophy of the Absolute
Philosophy of the Unconditioned, Transcendental Philo-
sophy বা Philosophy of the Absolute Reason, Trans-
cendental Logic প্রভৃতি সংক্রায় আখ্যাত হয়, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা ।
ব্রহ্মবিদ্যাকে পরাবিদ্যাও বলে । মুণ্ডক উপনিষদে আছে—

“দে বিদ্যে পরা চৈব অপরা ।” (১।১।৪)

বেদাদি সমুদায় শাস্ত্রই অপরাবিদ্যার অন্তর্গত ।

“তত্র অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ষবেদঃ ।

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্ ইতি ॥” (ই ১।১।৫) ।
কেননা, এই সকল শাস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না । যাহার দ্বারা অক্ষর
পরম ব্রহ্মকে (কঠ ৩।২) জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা,—তাহাই উপনিষদ ।

“অথ পরা যদা অক্ষরমধিগম্যতে ।” (মুণ্ডক, ১।১।৫) ।

সেই অক্ষর পরব্রহ্ম যে সগুণ ও নিগুণ উভয়রূপ, তাহাও মুণ্ডক উপ-
নিষদে হইয়াছে । যথা—

“অদ্রেশম্ অগ্রাহম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃ অশ্রোত্রম্ অপানিপাদং নিত্যম্ ।”

(ইহা নিগুণ ব্রহ্ম)

আর,—“বিভুং সর্ষগন্তং সুস্বপ্নং যৎ অব্যয়ং যৎ ভূতধোনিম্ ।”

(ইহা সগুণ রূপ)—(মুণ্ডক, ১।১।৬) ।

অতএব ব্রহ্মবিদ্যাই সৰ্ববিদ্যার সার । ব্রহ্মবিদ্যাই একমাত্র পরা-
বিদ্যা । ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তিশাস্ত্র । ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, অর্থাৎ
নির্মল জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইলে, এবং ব্রহ্ম জ্ঞানগম্য হইলে, যখন সর্কো-
পাধি ঘুচিয়া যায়, তখনই প্রকৃত মুক্তি হয় । পাশ্চাত্য দর্শনে কোথাও
এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যা বুঝান হয় নাই । আধুনিক কয়েকজন জর্মান-
দার্শনিক পাণ্ডিত তাহার অস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন মাত্র ।

ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে হইলে প্রথমে বুদ্ধিকে সর্বপ্রকার রজঃ ও
তমোমলা হইতে মুক্ত করিয়া, তাহাকে পরিশুদ্ধ ও নির্মল করিতে হয় ।
সেই নির্মল বুদ্ধিতে যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, যে অধ্যাত্মজ্ঞান ও পরমে-
শ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান তাহাতে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতেই ব্রহ্ম
জ্ঞেয় হন । বুদ্ধিকে নির্মল করিয়া তাহাতে প্রকৃত জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা
না করিলে, ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী হওয়া যায় না । বুদ্ধি সাধিক ও
কতকটা নির্মল হইলে, ইহকালে ও পরকালে স্বর্গভোগবিতৃষ্ণারূপ বৈরাগ্য
উদয় হয়, এবং মুমুক্শু উপস্থিত হয় । তখন কর্মমার্গে, জ্ঞানমার্গে, ভক্তি-
মার্গে যাহার যেরূপ অধিকার, সে সেই মার্গে অগ্রসর হইতে পারে । এই-
রূপ অধিকারী যদি প্রথমে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে, তবে জ্ঞানের সাধনা
করিয়া তাহাকে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে । আর যদি ভক্তিমার্গে
যায়, তবে ভক্তির সাধনা করিয়া প্রকৃত ভক্ত হইয়া (গীতার ষাটশ
অধ্যায়োক্ত) তাহাকে ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে হইবে । চিত্ত শুদ্ধ করিয়া
জ্ঞান বা ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে, কর্মযোগসাধন করিতে হয় ।
জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে নিষ্কাম কর্মযোগ ও ভক্তিমার্গে
ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্মযোগ সাধন করিতে হয় । তখন
ধ্যান-যোগাত্ম্যাসম্বারা চিত্ত আরও নির্মল হয় । এইরূপে নিষ্কাম কর্মদ্বারা
পরিশুদ্ধচিত্ত-যুক্ত জ্ঞানীর জ্ঞানে যখন এই আত্মতত্ত্বের বিকাশ হয়,
এবং জ্ঞান ভক্তের হৃদয়ে যখন ঈশ্বরতত্ত্বের বিকাশ হয়, তখন কর্ম, ভক্তি

ও জ্ঞান একীভূত হইয়া যে নিৰ্মল জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই জ্ঞান পরা-
 বিদ্যালভ করিবার উপযুক্ত হয় । এই অঙ্ক ভগবান্ গীতার প্রথম ছয়
 অধ্যায়ে আত্মতত্ত্বজ্ঞান, এবং আত্মজ্ঞানে অবস্থান করিবার উপায়ের বা
 সাধনার উপদেশ দিয়াছেন । আত্মতত্ত্বজ্ঞানই সাংখ্যজ্ঞান,—পুরুষ-
 প্রকৃতি বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেকজ্ঞান । ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপদিষ্ট
 হইয়াছে । ইহাই প্রকৃত আত্মবিজ্ঞান (Psychology) । তাহার পর
 যে নিষ্কাম কর্মসাধনা, সৰ্বকর্মফলত্যাগরূপ কর্মসন্ন্যাসসাধনা দ্বারা
 চিত্তকে নিৰ্মল করিয়া এই আত্মজ্ঞানলাভের উপযুক্ত হওয়া যায়,
 তাহা তৃতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে । এই-
 রূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সেই আত্মস্বরূপে অবস্থান অঙ্ক ষষ্ঠ অধ্যায়ে
 ধ্যানযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে । এইরূপে যাহা “অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্ব”রূপ
 জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিবার উপায়, তাহা গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে বিবৃত
 হইয়াছে । ইহাই জ্ঞানের পরানিষ্ঠা (১৮।৫০) । বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে ধ্যান-
 যোগনিরত হইলে, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ সমুদায় হইতে
 মুক্ত হইয়া (১৮।৫৩) আত্মাকে সর্বভূতহ ও আপনার আত্মাতে
 সর্বভূত দর্শন পূর্বক সমদর্শী হইয়া, সর্বভূতার্থ নিষ্কামভাবে কর্মানুষ্ঠান
 করিলে, ক্রমে সর্বত্র ভগবান্কে দর্শন করিতে শিক্ষা করিয়া এবং নিষ্কাম-
 ভাবে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে ও ঈশ্বরার্থ কর্ম করিবার বুদ্ধিতে কর্মাচরণ
 করিয়া, ভগবানের প্রতি পরাক্রান্তিলাভরূপ ফল সিদ্ধ হয় (১৮।৫১) ।
 তাহাতে ‘ময়ি চানন্ত্রযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিনী’-রূপ জ্ঞানে স্থিত
 হওয়া যায় এবং সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান ভগবৎপ্রসাদে লাভ হয় ।
 এই ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিবোগ সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ।
 জ্ঞান যখন এইরূপে ভক্তিরূপ, অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্বরূপ ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ
 দর্শনরূপ হয়, তখন সেই জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয় ।

আমাদের বুদ্ধি সাধিক হইলে ও যথাসম্ভব রজস্তমোমলবিহীন

হইলে তবে তাহাতে এইরূপ পরিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ সম্ভব হয় । যতক্ষণ চিত্তে অভিমান, অহঙ্কার, দম্ভ, হিংসা, অ-ঋজুতা, ক্রোধ প্রভৃতি মলা থাকে, চিত্ত নিগৃহীত ও স্থির না হয়, মন শুদ্ধ না হয়, বৈরাগ্যের ভাব চিত্তে উদয় না হয়, জগৎকে জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দোষ-যুক্ত দুঃখময় বলিয়া ধারণা বন্ধমূল না হয়, যতক্ষণ বিষয়ে আসক্তি থাকে, সর্বত্র সমদর্শন সিদ্ধ না হয়,—এক কথায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তের এ সকল মলা না দূর হয়, ততক্ষণ প্রকৃত জ্ঞান হয় না, ততক্ষণ সে জ্ঞান—অজ্ঞানমাত্র ; এজন্ত সে জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না । অতএব এই জ্ঞানসাধনই সাধকের প্রথম-কর্তব্য । বেদান্ত শাস্ত্র অনুসারে ষাটার শমদমাদি ষট্-সম্পত্তিযুক্ত, ও যুমুক্ষুত্বাদি চতুর্বিধসাধনযুক্ত, তাহারাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী । এইরূপ অধিকারী না হইলে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় কোন ফল নাই,—ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না । সে জিজ্ঞাসা নিরর্থক । পাতঞ্জল-দর্শন অনুসারে চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা চিত্তের অধঃশ্রোতো-নিরোধরূপ যোগ অভ্যাস করিতে হইলে, প্রথম ‘ষম’ ও ‘নিয়মে’র সাধনা করিতে হয় । “অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ ইহাই ষম” (পাতঞ্জলসূত্র ২।৩০) । আর ‘শৌচ সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান’ ইহাই নিয়ম (পাঃ সূ, ২।৩২) । এই ষম ও নিয়মসাধনা দ্বারা সম্বুদ্ধি হয়, সৌমনস্তু বা চিত্তপ্রসন্নতা লাভ হয়, চিত্তের একাগ্রতাসিদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়-জয় হয়, এবং আত্মদর্শনে যোগ্যতা লাভ হয় । (পাতঞ্জল দর্শন, ২।৪১) । আর এইরূপে সম্বুদ্ধি হইলে, ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ যোগ দ্বারা ঈশ্বরে পরাভক্তি হয় এবং তাহাতে ঈশ্বরতত্ত্বদর্শনযোগ্যতা লাভ হয়—শ্রেষ্ঠ যোগী হওয়া যায় । (গীতা ৬।৪৭) ।

চিত্ত যখন নিশ্চল হয়, যখন তাহাতে আর দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি থাকে না, যখন সাধক চতুর্বিধ সাধনযুক্ত হয়, তখন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয় । ইহা নিশ্চল জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ-আকাঙ্ক্ষা । এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে,

তত্ত্বদশী আচার্য্যের নিকট উপগমন করিয়া, সেবাদি দ্বারা তাঁহাকে সঙ্কট করিয়া, তাঁহার নিকট বসিয়া 'উপনিষদ' বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয় (গীতা ৪।৩৪); উপনিষদ্ 'শ্রবণ' করিতে হয় । ইহাই 'আচার্য্যোপাসনম্' (১৩৭) । এইরূপে শ্রবণ হইলে মনন ও নিদিধ্যাসন বা ধ্যানযোগদ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞানে নিত্যস্থিতিরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হয় । ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই মনন ও নিদিধ্যাসন সাধন জন্ত ও ভক্তির বিকাশ জন্ত 'নির্জনে' একাকী থাকিতে 'অভ্যাস' করিতে হয় । তাহাতে 'বিবিক্ত-দেশসেবিত্ব' ও 'অরতিজর্নসংসদি'-রূপ জ্ঞানে স্থিত হওয়া যায় । চিত্ত এইরূপে নির্মল হইলে, তাহাতে জ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় আপনি প্রকাশিত হয় । (গীতা ৫।১৬) ।

এইরূপে কর্ম্মমার্গে, জ্ঞানমার্গে ও ভক্তিমার্গে সাধনা করিলে, তবে পূর্বেকৃত অমানিত্বাদি বিংশতিরূপ গুণযুক্ত জ্ঞানের বিকাশ হয় । উক্তরূপ সাধনার জ্ঞানের যাত্রা চরমস্বরূপ, তাহা ঈশ্বরে ভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন । এই বিংশতি প্রকার জ্ঞানमध्ये নিজাম কর্ম্মযোগ ও ধ্যানযোগ প্রভৃতির কথা উক্ত হয় নাই । বলিয়াছি ত, তাহারা জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ লাভ করিবার জন্ত 'ইহাতে সিদ্ধ হইবার জন্ত অনুর্ত্তেয় । জ্ঞানযোগে চিত্তকে স্থির করিয়া আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় । আর ভক্তিযোগ দ্বারা চিত্তকে স্থিরভাবে ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় । চিত্তকে স্থির করিবার উপায় 'কর্ম্মযোগ' । আর স্থিরভাবে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় 'ধ্যানযোগ' । এক্ষণে এই কর্ম্মযোগ ও ধ্যানযোগ ফলে যে জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেই জ্ঞানের স্বরূপ ইহারা নহে । এই জ্ঞানে যখন ঈশ্বরে 'ভক্তি' অধ্যাত্ম-জ্ঞাননিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়—তখন সেই জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন । ঈশ্বরে ভক্তি হইতে সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায়, সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞেয় হয়, এবং তাহা হইতে নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞেয় হয়, তাহা

পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞেয়, ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানের মধ্য দিয়াই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন। এই সত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিলে নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না, এবং সত্ত্ব নিগুণ উভয়রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিলে, পূর্ণ পরব্রহ্মকে জানা যায় না। পরব্রহ্মকে কেহ পূর্ণরূপে জানিতে পারে না। তিনি জ্ঞেয় হইয়াও অজ্ঞেয় থাকেন, বিজ্ঞাত হইয়াও অবিজ্ঞাত থাকেন। যাহারা কেবল নিগুণ ব্রহ্মবাদী, তাহারা সত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বকে বা ঈশ্বরতত্ত্বকে মাধ্যম, অপারমার্থিক বলেন, তাহারা কেবল আত্মতত্ত্বের মধ্য দিয়া অথবা পরমাত্ম-তত্ত্বের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা করেন। তাহারা একদেশদর্শী; তাহারা নির্বাণমুক্তি বা সালোক্যাদিরূপ মুক্তিলাভ করিতে পারিলেও পূর্ণ পরব্রহ্ম-তত্ত্ব প্রবেশ করিতে পারেন না।

ঈশ্বর বা সত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব দ্বারা পরব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞেয় হন। তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আত্মতত্ত্ববিকাশদ্বারা বা অধ্যাত্মজ্ঞান দ্বারাও ব্রহ্ম ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয় হইতে পারেন, তাহাও বলিয়াছি। আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা এক অর্থে একই। শ্রুতিতে ‘আত্মা’ অনেক স্থানে ব্রহ্ম অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সে স্থলে ব্রহ্মবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা একই। অথবা আত্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত। আত্মজ্ঞান না হইলে ঈশ্বরজ্ঞানও পরিষ্কৃত হয় না—ব্রহ্মজ্ঞানও লাভ হয় না। এজন্য শ্রুতিতে বিশেষ-ভাবে আত্মতত্ত্বের উপদেশ আছে এবং সেই আত্মাই যে ব্রহ্ম, তাহা উক্ত হইয়াছে।

গীতার আরম্ভেও এই আত্মতত্ত্বের উপদেশ আছে, তাহা বলিয়াছি। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে হইলে, যেমন ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বও জানিতে হয়। শুধু তাহাই নহে। আত্মতত্ত্বজ্ঞান না হইলে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানও পরিষ্কৃত হয় না এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান ও ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান উভয়ই না প্রতিষ্ঠিত হইলে পরব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না।

নির্মল জ্ঞানে আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিভাত ও প্রতিষ্ঠিত হইলেও ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না ; সেই জ্ঞানে এই আত্মজ্ঞান ও ঈশ্বরজ্ঞানের সহিত তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে সে জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন। তাহা গীতার উক্ত হইয়াছে ; আমরা দেখিয়াছি। তত্ত্বজ্ঞানার্থ কি, তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। মূলতত্ত্ব, জীব জগৎ ও ঈশ্বর ও ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ। এক অর্থে এই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন আত্মতত্ত্বদর্শন এবং ঈশ্বরতত্ত্বদর্শন উভয়ই হইতে পারে। পাশ্চাত্য দর্শন অনুসারে এই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনকে Metaphysics বলে। গীতার এই তত্ত্বজ্ঞান ১৩শ হইতে ১৮শ অধ্যায়ে স্থানে স্থানে বিবৃত হইয়াছে। অতএব নির্মল পরিষ্কৃত, ব্রহ্মসত্ত্বমোমলবিহীন জ্ঞান যখন শ্রবণাদি সাধন দ্বারা অধ্যাত্ম-জ্ঞানে স্থিত হইবে, ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বে স্থিত হইবে এবং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন করিতে পারিবে, তখনই প্রকৃতরূপে পরব্রহ্ম জ্ঞেয় হইবেন। তখনই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইবে। পাশ্চাত্যদর্শনে যাহাকে Psychology বা Philosophy of the Spirit বলে, তাহা অধ্যাত্মশাস্ত্র, যাহা Theology তাহা ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্যা, আর যাহা Metaphysics তাহা তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন। এই তিন শাস্ত্র অধিগত হইলে, তবে জ্ঞানে পরাবিশ্বা বা Philosophy of the Absolute or Unconditioned লাভ হইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের আর অন্য উপায় নাই। ইহাই গীতার উপদেশ।

— — —

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়কোক্তং সমাসতঃ ।

মদ্ভুক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮

—*o*o*—

এইরূপে ক্ষেত্র জ্ঞান আর জ্ঞেয় যাহা
কহিনু সংক্ষেপে ; ইহা বিজ্ঞাত হইয়া
মম ভক্ত মম ভাব পারে লভিবারে ॥ ১৮

১৮ । এইরূপে...সংক্ষেপে—১ম হইতে ৬ষ্ঠ শ্লোকে ক্ষেত্রতত্ত্ব সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । ১ম ও ২য় শ্লোকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জ্ঞ জ্ঞেয়-তত্ত্বের উল্লেখ আছে মাত্র, তাহা সে স্থলে বিবৃত হয় নাই । এই অধ্যায় শেষে ও ১৫শ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে । ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে* এবং ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে ।

ইহা বিজ্ঞাত হইয়া মম ভক্ত মম ভাব পারে লভিবারে—এই ক্ষেত্রজ্ঞান ও জ্ঞেয় তত্ত্বের সমাগ্দর্শনে কে অধিকারী, তাহাই এক্ষণে উল্লিখিত হইয়াছে । আমি পরমেশ্বর, সর্বজ্ঞ এবং সকলেরই গুরু—এই প্রকার বাসুদেবস্বরূপ আমাতে যে সর্বাশ্রুভাবে সমর্পণ করিতে পারে, অর্থাৎ যাহা কিছু দেখে, শ্রবণ করে, স্পর্শ করে, তাহা সকলই বাসুদেব, এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসে যাহার জ্ঞান পরিণত হইয়াছে, সেই মন্তু । যে ব্যক্তি এইরূপ মন্তু, সে সমাগ্দর্শনের তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হয়, এবং বুঝিয়া আমার ভাব অর্থাৎ পরমাশ্রুভাবে লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ সে মোক্ষলাভ করে (শঙ্কর) । ‘ত্বম্’ পদার্থগুণি জ্ঞ যে সবিকার ক্ষেত্র-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তদ্বাচ্যার্থ বিবেকসাধন অমানিত্বাদি যে উক্ত হইয়াছে এবং তৎ-পদার্থ সাধন জ্ঞ যে ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, সেই তত্ত্ব-বিজ্ঞানের ফল কি, তাহাই এ স্থলে উপসংহারে উক্ত হইয়াছে । যাহার সর্বাশ্রুভাব ঈশ্বরে সমর্পিত, সেই মন্তু, (গিরি) । আমার ভক্ত,—এই ক্ষেত্রযথাশ্রুতত্ত্ব ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ আশ্রুস্বরূপপ্রাপ্তির উপায় জ্ঞানের তত্ত্ব এবং ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ আশ্রুস্বরূপ ও যথাশ্রু বিশেষভাবে জানিয়া

আমার যে অসংসারিত্বভাব, তাহা প্রাপ্তির জন্য উপপন্ন হয় (রামানুজ) ।
আমার ভক্ত এই তত্ত্ব জানিয়া আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তির
যোগ্য হন (বামী) । পূর্বে দ্বাদশ অধ্যায়োক্ত মন্তুই এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও
জ্ঞেয় ব্রহ্মত্ব জানিবার অধিকারী । যাহার সর্বাঙ্গভাব, পরম গুরু বাসুদেব
আমাতে সমর্পিত, যিনি মদেকশরণ, তিনিই এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ত্ব
বিবেকপূর্বক জ্ঞাত হইয়া সর্বানর্থশূন্য পরমানন্দস্বরূপ যে আমার ভাব
বা মোক্ষ, তাহা পাইবার যোগ্য হন (মধু) ।

আমার ভক্ত এই তিন তত্ত্ব বিবেক-পূর্বক অবগত হইয়া, আমার ভাব
বা আমার অসংসারিত্ব স্বভাব লাভ করিবার যোগ্য হন (বলদেব) ।

আমার ভক্ত আমার এই অকরায়ক বিভূতি বিশেষরূপে জানিয়া,
আমার ভক্তনশীল হইয়া, আমার ভাবাত্মকস্বরূপ লাভের যোগ্য বা
সমর্থ হন । (বল্লভ) । আমার ভাব অর্থাৎ জন্মমরণরাহিত্য ভাব
পাইবার যোগ্য হন (কেশব) ।

এ স্থলে মন্তুভক্ত অর্থে দ্বাদশাধ্যায়োক্ত আমার অর্থাৎ ভগবান্
বাসুদেবের উপাসক । মধুসূদনের এই অর্থই সঙ্গত । শব্দ 'মদ্-
ভাবের' অর্থে এই সকল ভাব যে পরমাঙ্গা বাসুদেব, এই বুদ্ধিতে
সেই সকল ভাবকে বাসুদেবে সমর্পণ দ্বারা পরমাত্মভাবপ্রাপ্তির 'জন্ম'
যোগ্যতা বুঝিয়াছেন, ও 'মদ্'ভাবকে মোক্ষও বলিয়াছেন । এ অর্থ
সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না । ঈশ্বরের যে বিভিন্ন ভাব, তাহা
সম্ভব হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । কিন্তু তাহার যে পরমভাব,
(২।১১)—যে ভূতমহেশ্বর ভাব অথবা যাহা তাঁহার পরমধাম, সেই
ব্রহ্মভাব, যাহা অব্যয়, অক্ষয়,—যাহা পরমগতি (৮।২১), তাহাই এস্থলে
উক্ত হইয়াছে বোধ হয় । যিনি ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ব্রহ্মবিজ্ঞান
লাভ করিতে পারেন, তিনিই ভগবানের এই পরমভাব লাভ করিবার
যোগ্য হন ।

ভগবানের ভক্ত এই ভাব লাভ করিবার যোগ্য, ইহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে । তবে কি যিনি আত্মজানী, অথবা যাহারা কর্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে সাধক, তাঁহারা এ ভাব লাভ করিতে পারেন না ? এই আশঙ্কায় জ্ঞানবাদী শঙ্কর ভক্তের জন্ম অন্বেষণ করিয়াছেন । তিনি বলেন,—বাসুদেবই সমুদায়,—এই জ্ঞান যাহাদের হইয়াছে, তাঁহারাই বাসুদেবভক্ত । এইরূপ অর্থ করিলে, ষাটশাধ্যায়ে যে ভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ হয় । এক্ষণে বলিয়াছি যে, ষাটশাধ্যায়ে বিবৃত লক্ষণযুক্ত ভক্তকেই এ স্থলে মদ্ভক্ত বলা হইয়াছে এবং সেই ভক্তই যে ভগবদ্ভাব লাভ করিতে পারেন, ইহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে । এই কথাই অর্থ ১৮শ অঃ ৫৪, ৫৫শ শ্লোকেও বুঝান আছে । যিনি অহঙ্কারাদি ত্যাগ করিয়া নিম্নল ও শাস্ত হন, তিনি স্থির অচল ব্রহ্মভাব লাভ করেন,—তিনি আপনাকে সর্বাভূত আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করেন । তিনি সেই অত্যাশ্রিত বা আত্মস্বরূপ ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিলে সর্বাভূত, সমদর্শী হইয়া, চিন্তাপ্রসাদ লাভে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করেন । তিনি ‘মদ্ভক্ত’ অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তিমান হন, এবং ভক্তিযারাই সমগ্র ঈশ্বরত্ব তাঁহার অধিগত হয়, এবং তদনন্তর সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরকে ‘তত্ত্বতঃ’ জানিয়া তিনি এই সগুণ ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে পারেন । প্রথমে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি হইতে নিগুণ ব্রহ্মভাব হয়, পরে সর্বাভূত পরমাশ্রিতরূপে অবস্থিতি হইতে ঈশ্বরে পরাভক্তি হয়, তাহাতে ঈশ্বরত্বজ্ঞান হইলে তাহার কলে সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরে অবস্থিতি হয় । তখন ভক্ত ঈশ্বরভাব লাভ করেন ।

তাই এ স্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যিনি তাঁহার ভক্ত, তিনি এই ক্ষেত্রে, জ্ঞান ও জ্ঞের ব্রহ্মত্ব বিজ্ঞাত হইয়া অর্থাৎ বিজ্ঞান সহিত সেই জ্ঞান লাভ করিয়া, ভগবানের ভাব লাভকরিবার যোগ্য হইতে পারেন । ‘মদ্ভাব উপপদ্যতে’ ইহার অর্থ আমার ভাব লাভ করিবার

কৃত্য সেই ভক্ত উপপন্ন হন অর্থাৎ ভগবানে প্রপন্ন হন, তিনি ভগবানের পরম ভাব লাভ করিবার অধিকারী হন ।

জ্ঞানফল মুক্তি কিরূপ—এই অধ্যায়েও ঈশ্বরে অনন্তভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনরূপ জ্ঞানের কথা উক্ত হইয়াছে— এবং সেই জ্ঞানেই ব্রহ্ম জ্ঞেয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে । অতএব অধ্যাত্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে যে পরাভক্তির উদয় হয়, সেই ভক্তি-মান্ সাধকই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ব্রহ্ম তত্ত্ব বিশেষরূপে জানিতে পারেন । বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা ৭ম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । সেই বিজ্ঞানের ফল কি ? সে ফল অবশ্য মোক্ষ । কিন্তু সে মোক্ষ সর্বব্যাপী বা সর্বগত, স্থির, অচল, সনাতন, নিগুণ, প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মভাবে অবস্থিতরূপ নির্বাণমুক্তি নহে । সে মোক্ষ নিগুণ ও সগুণ উভয় ভাববুক্ত পরম ব্রহ্মভাবে অবস্থিত । সেই মুক্তিতে নিগুণ ব্রহ্ম-ভাবের সহিত পরমাত্মা পরমেশ্বরভাবের ঐক্য অনুভূতি থাকে । নিগুণ ব্রহ্মরূপ পরমধামে—পরমেশ্বর ভাবে আপনাকে বিলীন করিয়া দিয়া সর্ব-স্বরূপ ব্রহ্মের অনুভূতি থাকে । অগৎ মায়াময়, অসৎ হইলে, নিগুণ ব্রহ্ম ভাবই মুক্তির পারমাধিক স্বরূপ হইত । অগৎ যদি সত্য হয়, তবে নিগুণ ও সগুণ এই উভয় ব্রহ্মভাবই পারমাধিক তত্ত্ব । এই উভয় ভাব ধারণা করিয়া মোক্ষ লাভ করিয়া, সাধক বলিতে পারেন—‘সোহং’ বা ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ । সোহং এই স্থলে সঃ—নিগুণব্রহ্ম বা ‘তৎ’ নহে, তিনি সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর—পুংলিঙ্গে ‘সঃ’ দ্বারা বাচ্য ।

বাহারা কেবল আত্মজ্ঞানী বা সাংখ্যজ্ঞানী, সমদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, তাঁহারা ব্রহ্মভাবে স্থিত হন (৫।১২,২০), ব্রহ্মযোগযুক্ত হন (৫।২১), অন্তঃস্থ, অন্তর্জ্যোতির্ভুক্ত হইয়া ব্রহ্মভূত হন, ও ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন (১৫,২৪) । এইরূপে আত্মজ্ঞানীই সর্বতঃ ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন । (অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্—গীতা, ৫।২৬) । এবং

তীহারি অব্যক্ত অক্ষরের উপাসক হইয়াও ভগবান্কেই প্রাপ্ত হন (১২।৪) । যদি এই ব্রহ্মনির্বাণই শেষ তত্ত্ব হইত, তবে আর ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরে গীতার অন্য উপদেশ প্রয়োজন হইত না, ঈশ্বরতত্ত্ব উপদেশের প্রয়োজন হইত না, এবং ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পরমব্রহ্মের উপদেশও প্রয়োজন হইত না । পরম ব্রহ্ম যখন জ্ঞানে বিশেষরূপে জ্ঞাত বা বিজ্ঞাত হন, তখন পরমব্রহ্মস্বরূপই লাভ হয় । সেই পরম ব্রহ্মস্বরূপই নিগুণ ব্রহ্মের অন্তর্ভূত পরমেশ্বর রূপ । * সেই অন্তর্ভূত নিগুণ ব্রহ্মভাবে সহিত পরমেশ্বর-ভাব-লাভেই পরম মোক্ষ । সেই ভাবে যোগযুক্ত হইয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশ দিয়াছেন । এইরূপে 'মন্তুকো মন্তাবার উপপত্ততে' ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি ।

প্রকৃতিং পুরুষকৈব বিদ্যাদানাদী উভাবপি ।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯

প্রকৃতি পুরুষ জান' উভয়ই অনাদি,

বিকার সকল আর গুণ সমুদায়

উৎপন্ন প্রকৃতি হ'তে, জানিও নিশ্চয় ॥ ১৯

এই অগৎ যে সত্য নিত্য প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগে বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ সংযোগে জ্ঞাত এবং অগৎকারণ যে মায়াধ্য শক্তিয়ুক্ত সগুণ ব্রহ্ম পারমাধিক সত্য তত্ত্ব, তাহা এই অধ্যায়ে এই শ্লোক হইতে বিবৃত হইয়াছে ।

১৯ । প্রকৃতি পুরুষ জান' উভয়ই অনাদি—সাংখ্যদর্শনে (৫।৭২) সূত্রে আছে—

* এই তত্ত্ব পূর্বে ১২।৪ শ্লোকে ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে ।

“প্রকৃতিপুরুষরোরত্ত্বং সৰ্বমনিত্যম্ ।”

এই স্থলে উক্ত হইয়াছে—প্রকৃতি পুরুষ অনানি । এই প্রকৃতি পুরুষ ও তাহাদের অনাদিত্ব—এই সকল কথাই মৰ্ম্ম বুঝিতে হইবে, প্রথমতঃ ভাষ্যকারগণের অর্থ উল্লেখ করা প্রয়োজন ।

শঙ্কর বলিয়াছেন,—“পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ে ৪র্থ ৫ম শ্লোকে, ভগবান্ বকীর দুইটি প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন—পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি । এই অধ্যায়ে পরাপ্রকৃতিকে ক্ষেত্রজ্ঞ ও অপরা প্রকৃতিকে ক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । আরও উক্ত হইয়াছে যে, এই দুই প্রকৃতিই সৰ্বভূতযোনি । “এতদ্ব্যোনিনি ভূতানি সৰ্বাণি”—৭।৬ । এ অধ্যায়েও পরে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে স্বাবর জন্ম সমুদায় সত্ত্বের উৎপত্তি (গীতা ১৩।২৬শ শ্লোক) । সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতিদ্বয় কিরূপে এই সৰ্বভূতযোনি বা ভূতগণের উৎপত্তির কারণ হয়, তাহাই এ স্থলে প্রতিপাদন করিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা করা হইয়াছে ।”

“প্রকৃতি (ক্ষেত্র) এবং পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ) এই উভয়ই ঈশ্বরের প্রকৃতি, উভয়েই অনাদি ; কেন না, ইহাদিগের আদি নাই । যে কারণে ঈশ্বরের নিত্যত্ব সিদ্ধ, সেই নিত্য সিদ্ধ ঈশ্বরের প্রকৃতিদ্বয়ও সেই কারণে নিত্য । প্রকৃতিদ্বয় আছে বলিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব । সেই প্রকৃতিদ্বয়ের সাহায্যেই ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হন । অতএব সেই প্রকৃতিদ্বয় অনাদি হইয়াই সংসারের কারণ হইয়া থাকে ।”

“কোন কোন ব্যাখ্যাকারগণ অর্থ করেন যে, • “অনাদিশব্দের অর্থ

* শঙ্করোক্ত এই ব্যাখ্যাকারগণ অবশ্য শঙ্করের পূর্ববর্তী । কিন্তু :একপে শঙ্করের পূর্ববর্তী কোন ব্যাখ্যাকারের নাম পাওয়া যায় না, সেরূপ কোন ব্যাখ্যাকারের গীতা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না । রামানুজ প্রভৃতির ভাষ্য তাঁহাদের মধ্যে কাহারও ব্যাখ্যার পূর্ববর্তী বোধ হয় । রামানুজ, শ্রীভাষ্যে তাঁহার পূর্ববর্তী তাঁহার বতানুভারী বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যাকার বৌধায়ন প্রভৃতির নাম নির্দেশ করিয়াছেন ।

যাহা আদি নহে, তাহা অনাদি । (ন+আদি ইহা তৎপুরুষ সমাস হইতে অনাদি ; যাহার আদি নাই, তাহা অনাদি এস্থলে একরূপ বহুব্রীহি সমাস হয় নাই) । অতএব পুরুষ ও প্রকৃতি, বা ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র ইহারা আদি নহে,—কেননা, ইহারা কারণ নহে, ইহারা কার্য্য । এই পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ কার্য্যের যাহা কারণ, তাহাই ঈশ্বর ; ঈশ্বরই ইহাদের এবং সমুদায় জগতের আদি বা মূল কারণ । যদি প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য হইত, তবে ইহারাি জগৎকারণ হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর জগতের কর্তা হইতেন না ।”

“এই প্রকার ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে । এইরূপ অর্থ হইলে প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টির পূর্বে কোন ঈশিতব্য বস্তু না থাকায়, ঈশ্বরে তৎকালে (অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ সৃষ্টির পূর্বে) কোন ঈশ্বরত্বই থাকিত না, তৎকালে তাহা লোপ পাইত । তিনি নিত্য ঈশ্বর হইতে পারিতেন না । আর সংসারের সম্বন্ধেও কোন নিমিত্ত না থাকিলে, সংসার সর্বদাই থাকিবার সম্ভাবনা হয়, জীবের মোক্ষ কোন কালে সম্ভব হয় না । বন্ধ মোক্ষ সম্বন্ধে শাস্ত্র বৃথা হয়, এবং বন্ধ ও মোক্ষ সিদ্ধান্তের অভাব হয় । এইরূপ অর্থে এই প্রকার নানা দোষ হয় বলিয়া অনাদি অর্থে যাহা আদি নহে, ইহা সিদ্ধান্ত হয় না । অতএব যাহার আদি নাই, তাহা অনাদি, ইহাই এ স্থলে অর্থ করিতে হয় । ঈশ্বরের প্রকৃতিত্ব নিত্য হইলে বন্ধ মোক্ষ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সকলই উপপন্ন হয় । কি প্রকারে উপপন্ন হয়, তাহা এই শ্লোকে পরে উক্ত হইয়াছে । এই প্রকৃতি কি ? ইহা ঈশ্বরের বিকার ; কারণ (বা সৃষ্টির অনুকূল শক্তি)—ইহা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া ।”

রামানুজ বলেন যে,—“প্রকৃতি ও আত্মা অত্যন্ত বিরুদ্ধ-স্বভাব । ইহাদের সংসর্গ বা পরস্পর যোগও অনাদি । এই সংসৃষ্ট উভয়ের কার্য্য-ভেদই এই সংসারের হেতু । এই তৎস্ব এ স্থলে উক্ত হইয়াছে । অন্য সংসৃষ্ট প্রকৃতি পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও । (রামানুজ ।)

গিরি বলেন,—“প্রকৃতি ও পুরুষকে যে অনাদি বলা হইয়াছে, তাহার কারণ কি ? ইহারাই সৰ্বভূতঘোনি বা ভূতগণের আদি কারণ । ভূতগণের কারণ প্রকৃতি, তাহার কারণ অপরা প্রকৃতি, ইত্যাদিরূপ সিদ্ধান্ত করিলে অনবস্থা (regresus ad infinitum) দোষ হয় । এজন্য ভূতগণের এক অনাদি কারণ সিদ্ধান্ত করিতে হয় । সেই অনাদি কারণই প্রকৃতি ও পুরুষ । আরও অকৃতাতাগমাদি দোষ নিবারণ জন্য, বন্ধনের নিদান জ্ঞানার্থ, এবং আশ্রয় বিক্রিমাভঙ্গাদি দোষ নিবারণ জন্য প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই অনাদি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । (বাহা ‘অকৃত’ বা করা হয় নাই, তাহার ‘অভ্যাগম’ বা বন্ধনরূপ ফল স্বীকার করিলে, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় । এজন্য আমাদের এই যে কৰ্ম্মরূপ বন্ধন, ইহার আদি কারণ পুরুষের সহিত প্রকৃতি-সংযোগ স্বীকার করিতে হয় । এজন্য প্রকৃতিপুরুষ—হই-ই মূলতত্ত্ব) ।”

স্বামী বলেন,—“পূর্বে ক্ষেত্র ‘বৎ চ বাদৃক্ চ’ ইহাই উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে ‘বদ্বিকারি বতশ্চ বৎ, স চ যো যৎ প্রভাবঃ’ পূর্ব প্রতিজ্ঞাত এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ তত্ত্ব, এই সংসার হেতু প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব এই শ্লোক’ হইতে বিবৃত হইয়াছে । অনবস্থাদোষ নিবারণ জন্য উভয়কে অনাদি বলা হইয়াছে । ঈশ্বরের শক্তি হেতু প্রকৃতি অনাদি । তাঁহারই অংশ হেতু পুরুষ অনাদি । পরমেশ্বর এবং তাঁহার শক্তিধর পরা ও অপরাপ্রকৃতি যে অনাদি, তাহা ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্কর ভগবান্ বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন ।”

মধুসূদন, শঙ্কর ও স্বামীর অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি বলেন,— পূর্বে ক্ষেত্র ‘বৎ চ, বাদৃক্ চ’ ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এখানে প্রকৃতি পুরুষের সংসার-হেতু নিরূপণ জন্য দুই শ্লোকে (১৯২০) সেই ক্ষেত্র ‘বদ্বিকারি বতশ্চ বৎ’ ইহাই বুঝান হইয়াছে, এবং তাহার পর দুই শ্লোকে (২১২২) সেই ক্ষেত্রজ পুরুষ ‘বৎ প্রভাব’ ইহা বুঝান হইয়াছে ।

প্রথমে ভগবানের পরাপ্রকৃতি জীবরূপ ক্ষেত্রজ পুরুষ, এবং তাঁহার অপরা প্রকৃতি অড়রূপ ক্ষেত্র—এই উভয়ই যে অনাদি, তাহা উক্ত হইয়াছে । এই প্রকৃতি মারাধ্যা ত্রিগুণাশ্রিত্য পারমেশ্বরী শক্তি । প্রকৃতি-পুরুষরূপ এই ভগবৎশক্তি অনাদি ।

কেশব বলিয়াছেন,—“পূর্বে ৭ম অধ্যায়ে ভগবানের যে পরা ও অপরা এই দুই প্রকৃতির কথা অভিহিত হইয়াছে, তাহাই এই অধ্যায়ে ক্ষেত্রজ ও ক্ষেত্র এই দুই শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে । এ স্থলে সেই ক্ষেত্রজ ও ক্ষেত্রকে যথাক্রমে পুরুষ ও প্রকৃতি শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে । ত্রিগুণাশ্রিত্য, অচেতন ক্ষেত্র লক্ষণ যে অপরাশক্তি তাহাই প্রকৃতি । আর বাহা তাহা হইতে ভিন্ন চেতনরূপ ক্ষেত্রজ লক্ষণ যে পরা প্রকৃতি, তাহাই এ স্থলে পুরুষরূপে উক্ত হইয়াছে ।” অর্থাৎ পুরুষ = ক্ষেত্রজ = পরা প্রকৃতি আর প্রকৃতি = ক্ষেত্র = অপরা প্রকৃতি । ইহাদের আদি কারণ নাই, একত্ব ইহারা অনাদি ।

এই প্রকৃতি ও পুরুষ—এবং এ উভয়ের অনাদি স্বরূপে ব্যাখ্যাকার-গণ বাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উক্ত হইল । এ স্বরূপে আরও অনেক কথা আমাদের বুঝিতে হইবে ।

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকই তত্ত্বজ্ঞান । পূর্বে যে তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনের কথা উক্ত হইয়াছে, এই প্রকৃতিপুরুষ তত্ত্বই এই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় । প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজতত্ত্বই জ্ঞানের বিষয় । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের যে জ্ঞান, তাহাই জ্ঞান । (১৩২) এইরূপে পূর্বে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ-তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে । ইহা পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্বের অন্তর্গত । সমষ্টিভাবে বাহা প্রকৃতি-পুরুষ, ব্যষ্টিভাবে তাহা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ । প্রতি জীব-স্বরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-তত্ত্ব আর এই জীবজড়ময় সর্বভগৎ-স্বরূপে প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব বুঝিতে হইবে । এ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইলে যে জ্ঞান পরিষ্কার হয় না, এবং তত্ত্ব জ্ঞেয় হন না,

তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই প্রকৃতি ও পুরুষ জগতের কারণ, এই প্রকৃতি এবং তাহার গুণ ও বিকারের সহিত পুরুষের সংযোগ হইতে সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি হয় । এই প্রকৃতির ত্রিগুণে ও প্রকৃতির বিকৃতি অর্থাৎ শরীরে বদ্ধ হইয়া জীবগণের সংসারভোগ হয় । ভগবান্ একাংশে জীবরূপেই এই জগৎ ধারণ করেন । প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষই জীবতাবাপন্ন হয় । এই প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষ ভোক্তা আর স্থূল জগৎ তাহার ভোগ্য । অতএব এই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বই এক অর্থে জগৎ-তত্ত্ব । এই জগৎতত্ত্ব গীতার এই স্থান হইতে অষ্টাদশাধ্যায় পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে । ইহাই গীতার Cosmology । এই অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক, বা উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, উভয়ের যে স্বরূপ এবং উভয়ের মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ হয়, ও সম্বন্ধহেতু যে ফল হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে । চতুর্দশ অধ্যায়ে জগৎসৃষ্টিকারণ প্রকৃতির ত্রিগুণ-তত্ত্ব, এবং কিরূপে ত্রিগুণবদ্ধ পুরুষ সেই ত্রিগুণাতীত হইতে পারে, তাহা বিবৃত হইয়াছে । পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংসারবৃক্ষতত্ত্ব এবং তাহার সহিত ভগবানের সম্বন্ধ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । ষোড়শ অধ্যায়ে প্রকৃতির এই ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধ হেতু মানুষের দৈবী ও আশুরী সম্পদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই ত্রিগুণের ফলে মানুষের গুণ, কর্ম্ম ও ধর্ম্মাদি কিরূপে পৃথক্ হইয়া যায়, তাহা বিবৃত হইয়াছে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে যাহা সারতত্ত্ব, তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়া, গীতার পরিসমাপ্ত হইয়াছে । এইরূপে এই ১৩শ হইতে ১৮শ অধ্যায়ে প্রথমে যে জ্ঞান সর্ববিজ্ঞান-লাভের উপযুক্ত, তাহার স্বরূপ উপদিষ্ট হইয়া, সেই জ্ঞানে জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, এবং সেই জ্ঞানের যে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন-স্বরূপও উক্ত হইয়াছে, সেই তত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ-তত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব, প্রকৃতি পুরুষ-সংযোগ-তত্ত্ব, জগৎ-তত্ত্ব, জগতের সহিত ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের এবং জীবের সম্বন্ধ-তত্ত্ব এবং প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ হেতু জীবের উৎপত্তি ও পরিণতিতত্ত্ব—

এক কথায় যাহা দর্শন-শাস্ত্রের (Metaphysics এর) সার, তাহা সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইয়াছে ।

প্রকৃতি ও মায়ী ।—এই জগতের আদি বা নিম্নত পূর্ববর্তী কারণ অনাদি প্রকৃতি পুরুষ ও তাহাদের সংযোগ । সেই প্রকৃতি-পুরুষ কি, তাহার তত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত । প্রকৃতি ও মায়াকে একই অর্থে গ্রহণ করা যায় । যাহা সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি, তাহাই বেদান্তদর্শনের মায়ী । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—‘মায়ং তু প্রকৃতিং বিদ্বাৎ’ (৪।১৩) । এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ব্যতীত কোন প্রাচীন উপনিষদে ‘মায়ী’ বা প্রকৃতির বিশেষ উল্লেখ নাই । কেবল ঋগ্বেদে ও বৃহদারণ্যকে ‘ইন্দ্রে। মায়ান্তিঃ পুরুরূপম্’ (বৃহদারণ্যক ২।৫।১০) ইত্যাদি মন্ত্রে এই মায়ীর উল্লেখ আছে । সে স্থলে মায়ী অর্থে বলশক্তি । তাহা ঐন্দ্র-জালিক মায়ীও হইতে পারে । প্রাচীন প্রামাণ্য উপনিষদে সূত্রসাং মায়ীবাদ বা প্রকৃতিবাদের কোন আভাষ পাওয়া যায় না । এই সব উপনিষদে সত্ত্ব ও নিস্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ব্রহ্মের বলের কথা উক্ত হইয়াছে । এই বলের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি লোক সকল বিধৃত । বলই ব্রহ্ম, বলই প্রাণ, বলই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত । (ছান্দোগ্য ৭।৮।১-২) । বৃহদারণ্যক (৫।১৪।৪) । দেবতাদের বল ব্রহ্মেরই (কেন ২) একত্র সর্বদেবতার অমুরত্ব বা বল একই (ঋগ্বেদ) । শ্রুতিতে এই কথা আছে । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মের পরাশক্তিকে জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়াযুক্ত বলা হইয়াছে । ইহা হইতেই জীব জড়ময় জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অতএব এই মায়ীবাদ বা প্রকৃতিবাদ কোথা হইতে আসিল ?

তহার একমাত্র উত্তর এই যে, শ্রুতিমূলক হইলেও প্রকৃতিবাদ সাংখ্যদর্শনের নিজস্ব, আর মায়ীবাদ শঙ্করাচার্য্যাব্যাখ্যাত বেদান্ত-দর্শনের নিজস্ব । এই মায়ীবাদ অনেকের মতে বৌদ্ধ দর্শনের সম্পত্তি, এবং শঙ্কর

এই মায়াবাদ গ্রহণ করার পুরাণে তাঁহাকে প্রচুর বোঝ বলা হইয়াছে । একত্র বেদান্তের মায়াবাদ শব্দের নিঃসর, অনেকের এই মত । বাহ্য হটক, গীতায় এই মায়া ও প্রকৃতি উভয়ের কথাই আছে । গীতার ভগবান্ মায়াকে, তাঁহারই মায়া বলিয়াছেন । যথা,—“সম্ভবামি আত্মমায়য়া” (৪।৬), “মম মায়া হরতায়্যা” “(৭।১৪), “ব্রাহ্মণন্ সর্কৃত্তানি যজ্ঞাকৃতানি মায়য়া” (১৮।৬১) । ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, জীবগণ “মায়য়া উপহৃতজ্ঞানাঃ” (৭।১৫) এবং তাঁহার শরণ লইলে, তাঁহার কৃপায় জীবগণ মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে (৭।১৪) । ভগবান্ এই মায়াকে দৈবী, এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণময় ভাবরূপাও বলিয়াছেন (৭।১৩, ১৪) । এইরূপে মায়া ও প্রকৃতি যে ‘এক’, উভয়েই ত্রিগুণাত্মিকা, (প্রকৃতে গুণাঃ—৩।২২) ইহা গীতার উক্ত হইয়াছে, তবে গীতার মায়া ও প্রকৃতিতে পার্থক্যও ইঙ্গিত করা আছে । ৪।৬ শ্লোকে যে আছে—“ভগবান্ আত্মমায়য়া ষায়া স্বীয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হন”—তাঁহা হইতে জানা যায় যে, মায়া ভগবানের পরাশক্তি । শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ নাই (খেতাখতর); একত্র ভগবানের মায়াতে তাদাত্ম্য আছে, মায়া তাঁহার আত্মস্বরূপ । কিন্তু প্রকৃতিতে সে তাদাত্ম্য নাই, তাহাকে ভগবান্ ‘আমার’—এই মাত্র বলিয়াছেন । পরাশক্তির যে প্রকৃষ্ট রূপ কৃতি বা কার্য্য করার অবস্থা, বাহ্য জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া অবস্থা, তাহাই সে প্রকৃতি । মায়া হেতুই প্রকৃতির জগৎকারণত্ব । মায়াতে ও প্রকৃতিতে এই মাত্র প্রভেদ । শব্দের প্রকৃতিতে ঈশ্বরের সৃষ্টি অনুকূল শক্তি বা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বলিয়াই বুঝিয়াছেন, তাহা পূর্ক উল্লিখিত হইয়াছে । শব্দের প্রথম প্রচারিত বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে মায়াকে অবিষ্টারূপা অপদাত্মিকা বলিয়াছেন সত্য, এবং তাঁহার আধার যে ব্রহ্ম, ইহাও স্পষ্ট স্বীকার করেন নাই সত্য, কিন্তু পরবর্তী গীতাতাষ্যে তাঁহার পরিণত চিন্তার কলে মায়াকে ব্রহ্মের পরাশক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । তাহাই যে

ভগবানের প্রকৃতি, তাহা বলিয়াছেন । চতুর্থাতেও মহামায়া দেবী ভগবতীকে বৈষ্ণবী শক্তি পরমা মায়া বলা হইয়াছে, এবং তিনিই যে আত্মা প্রকৃতি—সকলের প্রকৃতি, তাহাও উক্ত হইয়াছে ।

যাহা হউক, প্রকৃতি ও মায়া উভয়ই গীতার প্রায় একরূপ এক অর্থে ব্যবহৃত । তবে মায়া—ঈশ্বরের পরাশক্তি—আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া জীব ও জগৎরূপে স্থান, কাল, নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন করিয়া অভিব্যক্ত হইবার শক্তি (মীয়েতে পরিমীয়েতে অনয়া ইতি মায়া), আর প্রকৃতি জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া দ্বারা সেই শক্তির কার্যরূপ বা কার্যারম্ভরূপ, গীতার এইমাত্র বিশেষ করা হইয়াছে । ভগবান্ এই জগৎ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মমায়া দ্বারা মানুষী প্রকৃতি রূপে অবতীর্ণ হন, ইহা বলিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি (৪।৩) । তাহা হইলেও মায়া প্রকৃতি হইতে ভিন্নত্ব নহে । এ জগৎ গীতার এস্থলে প্রকৃতিত্বই বিবৃত হইয়াছে । মায়াত্ব স্বতন্ত্রভাবে বিবৃত হয় নাই ।

প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব ও সাংখ্যদর্শন ।—এই "প্রকৃতি ও পুরুষবাদের মূল উপনিষদ হইলেও সাংখ্যদর্শনে ইহা প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে । ভগবান্ সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্তক সিদ্ধশ্রেষ্ঠ ঋষি কপিলকে তাঁহারই বিভূতি বলিয়াছেন (১০।২৬) । তিনি গীতার প্রথমেই সাংখ্য জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন । শ্রীভাগবতে ঋষি কপিলকে ভগবানের ষোড়শ অবতারের মধ্যে এক অবতার বলা হইয়াছে । সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যাকারগণ তাঁহাকে ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়াছেন । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "যঃ অগ্রে প্রস্তুতঃ ঋষিঃ কপিলঃ জ্ঞানৈর্বিভক্তিঃ" (৫।২)—এই মন্ত্রে ঋষি কপিলের উল্লেখ আছে । ব্যাখ্যাকারগণ কিন্তু এস্থলে কপিল অর্থে সর্বজ্ঞানপ্রবর্তক হিরণ্যগর্ভ বুঝিয়াছেন । সাংখ্যদর্শনের সাংখ্যজ্ঞানের প্রবর্তক বলিয়াই কপিল মূনির এইরূপ স্তুতিবাদ পাওয়া যায় । কিন্তু সাংখ্যদর্শনই এই পুরুষপ্রকৃতিবাদের আদি নহে ।

বলিয়াছি ত, সাংখ্যদর্শনের মূল ভিত্তি যে তাহার পুরুষপ্রকৃতিবাদ, তাহারও প্রধান প্রমাণ শ্রুতি । তবে শ্রুতির পুরুষ প্রকৃতিবাদ ও বর্তমান সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতিবাদ মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে । গীতার পুরুষ-প্রকৃতিবাদই শ্রুতি-সম্মত । উপনিষদের মধ্যে কঠোপনিষদে এই পুরুষ-প্রকৃতিবাদের উল্লেখ আছে । এক অর্থে কঠোপনিষৎ এবং খেতাশ্বতরোপনিষৎ বর্তমান সাংখ্যদর্শনের মূল ভিত্তি । কঠোপনিষদ্ হইতে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রমাণ যাওয়া যায় । কঠোপনিষদে আছে—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসশ্চ পরা বুদ্ধিবুদ্ধেরাথ্যা মহান্ পরঃ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥”

(কঠ উপঃ ৩।১০।১১) ।

অন্যত্র আছে—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুক্তমম্ ।

সত্ত্বাদধি মহানাথ্যা মহতো ব্যক্তমুক্তমম্ ॥

অব্যক্তাত্ত্ পুরং পুরুষো ব্যাপকোহ্লিঙ্গ এব চ ।

যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে অঙ্করমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥”

(কঠ উপঃ ৬।৭।৮) ।

অতএব কঠোপনিষদ অনুসারে তত্ত্বের ক্রম এই :—(১) পুরুষ, (২) অব্যক্ত, (৩) মহান্ আত্মা, (৪) বুদ্ধি বা সত্ত্ব, (৫) মন, (৬) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, (৭) বিষয় । এই মহান্ আত্মাকে জ্ঞানাথ্যা বা বিজ্ঞানাথ্যাও বলা হয় । (কঠ উপঃ ৩।১৩) । ইহা সাংখ্যের মহত্ত্ব বা সনষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব ইহাই বেদান্তের হিরণ্যগর্ভ । ইহার সৎক্ষে মধুসূদন এক স্থলে বলিয়াছেন (৬:২৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) যে, ইহা সামান্ত

নির্কিশেষ অস্তিত্ব জ্ঞান 'আমি আছি' এইমাত্র বোধ । ইহা সর্বভূতে সামান্যভাবে বর্তমান । আর 'আমি' অমুক, অমুকের পুত্র—এইরূপ 'আমি' সম্বন্ধে যে বিশেষ ব্যাপ্তি বা ব্যক্তিত্ব জ্ঞান, তাহাই অভিমানাত্মক অহঙ্কার । ইহাই এস্থলে বুদ্ধি বা সত্তা নামে অভিহিত । ইহাই সংসারের অহঙ্কার । এইরূপে কঠোপনিষদ হইতে পুরুষ, অব্যক্ত, মহত্ত্ব, অহঙ্কারত্ব, মন, দশ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের অর্থ বা বিষয় পাওয়া যায় । এই বিষয় সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে দ্বিবিধ । তাহা অবশ্য এস্থলে উক্ত হয় নাই । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চ সূক্ষ্ম বিষয়—বেদান্তের সূক্ষ্মভূত, আর সাংখ্যের পঞ্চ তন্মাত্র, আর পঞ্চ স্থূল বিষয়, বেদান্তের পঞ্চ মহাভূত, আর সাংখ্যের পঞ্চ স্থূলভূত ; এস্থলে অর্থ = বিষয় মাত্র উক্ত হইয়াছে । এষ্ট বিষয় এই দশরূপ ধরিলে, আমরা কঠোপনিষদ হইতেই সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পাঠিতে পারি ।

যাহা হউক, এস্থলে পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বই আমাদের বুঝিতে হইবে । উক্ত মন্ত্রে যাহা অব্যক্ত, তাহাই সাংখ্যের মূল প্রকৃতি । অব্যক্তকেই সাংখ্যদর্শনে প্রধান বা মূল প্রকৃতি বলে । অতএব শ্রুতি হইতেই এই পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব পাওয়া যায় । কিন্তু সাংখ্যদর্শনেই এই তত্ত্ব বিশেষভাবে স্থাপিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । গীতার পুরুষ-প্রকৃতিবাদ যেক্রমে বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি ।

অতএব বলিতে পারা যায় যে, সাংখ্যদর্শন হইতেই গীতার এই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব গৃহীত হয় নাই । তাহা বেদান্তের ব্রহ্মবাদের অন্তর্গত । তাই গীতার সাংখ্য ও বেদান্তের সামঞ্জস্য হইয়াছে । যাহা হউক গীতোক প্রকৃতি-পুরুষবাদের সহিত বর্তমান প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি পুরুষবাদ ভিন্ন । তাহা হইলেও, প্রথমে আমাদের এই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব সাংখ্যদর্শন হইতেই বুঝিতে হইবে, এবং তাহার পরে গীতোক প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব হইতে এই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতি পুরুষ-তত্ত্বের প্রভেদ বুঝিতে হইবে ।

গীতায় পুরুষবাদ ।—প্রথমে পুরুষের কথা বলিব । পুরুষতত্ত্ব বেদান্তে স্থানে স্থানে বিবৃত হইয়াছে । সশুণ ব্রহ্মের আদি পুরুষরূপ ঋগ্বেদে পুরুষ সূক্তে (১০।৯০) উক্ত হইয়াছে ও অধিদৈবত পুরুষরূপ এবং অধিভূত ও অধ্যাত্ম পুরুষরূপ—এ সমুদায়ই বিশেষভাবে উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে । গীতায় (১৫।১৬ শ্লোকে) ক্ষর অক্ষর ও উত্তম পুরুষের তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । এই ক্ষর পুরুষ সাংখ্যদর্শনের বদ্ধ পুরুষ । গীতা অনুসারে সে পুরুষ প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া প্রকৃতিগুণ ভোগকরে (১৩।২১) সাংখ্যের মুক্ত পুরুষ গীতার অক্ষর পুরুষ । সাংখ্যদর্শনে পুরুষ বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে দ্বিবিধ । সাংখ্য দর্শনে এই মুক্ত ও বদ্ধ দুই রূপ পুরুষ স্বীকৃত । সাংখ্যদর্শনে পরম পুরুষ বা নিত্য পরমেশ্বর স্বীকৃত হয় নাই । সেশ্বর সাংখ্য বা পাতঞ্জল দর্শনে নিত্য ঈশ্বর বা ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক আশয় দ্বারা অপরাশ্রিত বিশেষ পুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে । গীতায়ও পরম পুরুষ বা উত্তম পুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে । গীতায় এই পুরুষ—ক্ষর অক্ষর ও উত্তম ভাবে ত্রিবিধ হইলেও সাংখ্যের বহু পুরুষ-বাদ স্বীকৃত হয় নাই, তাহা পরে বিবৃত হইবে ।

সাংখ্য দর্শনের ষাঠা বদ্ধ পুরুষ—তাহা গীতায় দেহী (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) । তাহাই গীতার ক্ষর পুরুষ । এই ক্ষর পুরুষের কথা এই শ্লোকে ও পরে ২০শ ২১শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । এ শ্লোকে প্রথমে সামান্য ভাবে পুরুষ উক্ত হইয়াছে । পরে ক্ষর পুরুষের কথা ও সেই পুরুষ প্রকৃতিজ গুণসঙ্গ হেতু সুখঃখ-ভোক্তা, সদসৎ ঘোনিতে জন্ম ভোগকারী—ইহা উক্ত হইয়াছে । তাহার পরে এ অধ্যায়ে—পরমাত্মা, পরম-পুরুষ পরমেশ্বরের উল্লেখ আছে । (২২ প্রভৃতি শ্লোকে দ্রষ্টব্য) । এ জন্ত এ স্থলে পুরুষ অর্থে জীবাত্মা, পরমাত্মা ও পরম পুরুষ—পুরুষের এট তিন অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে । পুরুষ একই—বহু নহে, ইহাও বলা হইয়াছে । কিন্তু কোন ব্যাখ্যাকারই পুরুষকে এ অর্থে গ্রহণ করেন নাই । তাহার

পুরুষ অর্থে ভোক্তা কর্তা জীবকেই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ এখানে পুরুষ যে সীতোক্ত ক্ষেত্রজ পরাপ্রকৃতি (৭।৫) এবং এই শ্লোকে প্রকৃতি যে অপরা প্রকৃতি (৭।৪) বা ক্ষেত্র, তাহারা তাহাই বুঝিয়েছেন। পুরুষ কখন প্রকৃতি হইতে পারে না, এবং প্রকৃতিও কখন পুরুষ হইতে পারে না। সুতরাং যাহা পরাপ্রকৃতি তাহা পুরুষ বা ক্ষেত্রজ হইতে পারে না। পুরুষের এখানে যে অর্থ, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রকৃতিতত্ত্ব পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহার পূর্বে অল্প কথা বুঝিতে হইবে।

সাংখ্যের পুরুষবাদ।—সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। এখানে তাহার উল্লেখ নিম্নরূপে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ বহু, প্রকৃতি এক। এই বহু পুরুষমধ্যে যাহারা অজ্ঞানযুক্ত, তাহারা প্রকৃতিবদ্ধ হয়। প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইলে, সেই অধিষ্ঠান হেতু—স্ব রজঃ তমঃ গুণের বা শক্তির যে সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি, তাহার গুণক্ষোভ হয়। এই গুণ-ক্ষোভ হইতে সেই পুরুষ-সংসৃষ্ট প্রকৃতিতে মহত্ত্বাদিক্রমে পূর্বোক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে পুরুষের ক্ষেত্র বা শরীর উৎপন্ন হয়। পুরুষ সেই ক্ষেত্রের দ্বারা বদ্ধ হইয়া পড়ে—এজন্য পুরুষ প্রকৃতির গুণ আপনাতে আরোপ করে, আপনি সুখ-দুঃখ-মোহযুক্ত হয় এবং আপনাকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তারূপে অনুভব করে। নতুবা পুরুষ স্বরূপতঃ শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত 'জ'-স্বভাব। অবিজ্ঞাহেতু পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ হয়। প্রকৃতি ও পুরুষসংযোগে, প্রকৃতিতে পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতি চৈতন্যযুক্ত হয়। যখন পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্রভাবে আপনাকে জানিতে পারে বা প্রকৃতির দ্রষ্টা হয়, তখন প্রকৃতি তাহাকে ত্যাগ করে, পুরুষ মুক্ত হয় ও তাহার সংসারদশা দূর হয়।

প্রকৃতি পুরুষ অনাদি।—সাংখ্যদর্শন অনুসারে এইরূপে প্রকৃতি

পুরুষের সংযোগে সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি হয় । এই প্রকৃতি পুরুষই শেষ তত্ত্ব—ইহার অতীত আর কোন তত্ত্ব নাই—ইহার অতীত কোন ঈশ্বর নাই, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ ঈশ্বরের শক্তি নহে, প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর স্বতন্ত্র—প্রকৃতি স্বাধীনা । একত্র প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে অনাদি ও মূলতত্ত্ব ।

“প্রকৃতিপুরুষরোরত্ত্বং সৰ্ব্বম্ অনিত্যম্ ।”

—সাংখ্যসূত্র, ৬:৭৩

গীতা অনুসারে প্রকৃতি পুরুষ অনাদি হইলেও তাহারা মূলতত্ত্ব নহে । প্রকৃতি স্বাধীনা বা স্বতন্ত্রা নহে, প্রকৃতি ভগবানেরই, তাহা পরমেশ্বরের মায়াখ্যা পরাশক্তি । কার্যকালে বা জগতের ব্যক্তাবস্থায় প্রকৃতি বা ভগবানের এই শক্তি ছই রূপে ভিন্ন হয় । এক পরা প্রকৃতি, আর এক অপরা প্রকৃতি । এই অপরা প্রকৃতি আবার বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চ-তন্মাত্রাভেদে আট প্রকারে বিভক্ত । ইহাই সাংখ্যদর্শনে ‘লিঙ্গ’ অর্থাৎ লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীরের মূল উপাদান । ইহার সহিত অহঙ্কারের বিকার দশ ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়া সূক্ষ্ম-শরীর (বা ক্ষেত্রের সূক্ষ্মাংশ) সৃষ্টি করে । এই মায়া বা প্রকৃতি এক নহে,—বহু হইয়া ব্যক্ত হয় । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—“পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়ন্তে” (৩৮) । ইহাতে আরও আছে যে, এই প্রকৃতি অষ্ট-রূপা, (৩৯) তাহা পূর্বে বলিয়াছি । ঋগ্বেদে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে,—‘ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঃ’ । এস্থলে মায়া বহুবচনে উক্ত হইয়াছে । অতএব এই প্রকৃতি ব্রহ্মের মায়াখ্যা পরাশক্তি বলিয়া ইহা অনাদি । আর পুরুষ, তাহা ও ব্রহ্ম । ব্রহ্ম সগুণভাবেই পরম পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও ক্ষর পুরুষ । ব্রহ্ম সগুণভাবে স্ব-মায়া-শক্তিতে অধিষ্ঠিত বলিয়াই তিনি পুরুষ । এই অধিষ্ঠানের পার্থক্য হেতু পুরুষের এই তিন ভাব । অতএব পুরুষ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অনাদি ।

সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্ব ।—একগে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব । সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বাধীনা,— স্বতন্ত্র-তত্ত্বাত্মিকা । ইহা এক বটে, কিন্তু ইহার মূল উপাদান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি । ইহাট জগতের নানাধের মূল । সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিপর্যায় ও তারতম্য অনুসারে ইহাদের বিভিন্নরূপে মিশ্রণ হেতু প্রকৃতি ব্যক্তাবস্থায় বহু— এমন কি, অভিন্ন হইয়া এই জগৎরূপে পরিণত হয় (কারিকা ১৬) : কেহ বলেন,— অনন্ত সত্ত্ব, অনন্ত রজঃ, ও অনন্ত তমঃ ইহাদের সমবায়ই প্রকৃতি । ইহাদেরই বিভিন্ন সংযোগ হইতে প্রকৃতির বহু পরিণাম হয় । এই জগৎ অনন্তসংখ্যক বহু পুরুষের সহিত অনন্তরূপে ভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন ভাবে সংযোগ হইয়া বিভিন্ন পুরুষের বিভিন্ন সূক্ষ্মশরীর সৃষ্ট হয় । এই জগৎ প্রত্যেক বহু পুরুষের অবিজ্ঞা অনুসারে, তাহার ক্ষেত্র ভিন্ন হয় ।

কেহ বলেন,—একই প্রকৃতির পরিণাম হইতে প্রথমে একই মূলবুদ্ধি অহঙ্কার ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রযুক্ত সূক্ষ্মশরীর সৃষ্ট হয় । ইহাই কারিকায় উক্ত হইয়াছে (সাংখ্যকারিকা ৪০) ; তদনুসারে লিঙ্গশরীর সৃষ্টির পূর্বে উৎপন্ন, অসক্ত, নিয়ত (নিত্য), অষ্টরূপ, ভেদরহিত, ও ধর্মাদি ভাব দ্বারা অধিবাসিত । বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন,—‘সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্’ এই সাংখ্যসূত্রের (২১৭) বিজ্ঞানভিক্ষু-ভাষ্য দ্রষ্টব্য । অতএব সাংখ্যদর্শন-মতে এই লিঙ্গশরীর এক । এই এক লিঙ্গশরীর প্রকৃতির বিভূষণ-যোগ হইতে নটের ন্যায় কার্যকরণের ব্যবস্থা সম্পাদিত হয় (সাংখ্য-কারিকা, ৪২) । এই লিঙ্গশরীর প্রতি পুরুষে তাহার অবিজ্ঞা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় । প্রতি পুরুষের এই লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীর ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার, সেই বিভিন্ন সূক্ষ্ম শরীর অনুসারে তদুপযোগী মূল শরীর গঠিত হয় বলিয়া পুরুষ নানান্নাতীর জীবদেহ গ্রহণ করে, প্রত্যেকের ক্ষেত্র পৃথক্ হয় ।

এইরূপ ব্যাখ্যা অনুসারে স্বতন্ত্রা স্বাধীনা প্রকৃতির এইরূপ অনন্তরূপে ভিন্ন হইয়া পরিণত হওয়া ঠিক বুঝা যায় না । সাংখ্যদর্শন ইহা যেভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা পরে উল্লিখিত হইবে । যাহা হউক, বহু পুরুষের সন্নিধানভেদ হেতু প্রতি পুরুষের সন্নিহিত প্রকৃতি যে ভিন্ন হয়, তাহা বলা যায় না ; কেন না, মূলতঃ প্রকৃতি দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন । আর এইরূপে প্রতি পুরুষের ক্ষেত্র এক প্রকৃতি হইতে বিভিন্নরূপে উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিলেও, তাগ দ্বারা স্থূল পাঞ্চভৌতিক জগৎ-সৃষ্টি বুঝা যায় না । প্রতি পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতি পরিণত হইয়া পঞ্চভূত পর্য্যন্ত রূপে বিকৃত হইলে, প্রতি পুরুষের সন্নিধানে সৃষ্টি লিঙ্গ শরীর ও পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর ও বাহ্য জগৎ পৃথক্ হইত । এই সমষ্টিভাবে পাঞ্চভৌতিক জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোন কোন সাংখ্য-পণ্ডিত হিরণ্যগর্ভাখ্য সিদ্ধ পুরুষ স্বীকার করেন, এবং এই হিরণ্যগর্ভই সামান্যভাবে প্রকৃতির ভূত পর্য্যন্ত পরিণামের কারণ বলেন, এবং বহু পুরুষ তাহার কারণ নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত করেন । হিরণ্যগর্ভ হইতে একই স্থূল শরীর সৃষ্টি হইয়া, তাহাই বিভিন্ন পুরুষের কৰ্ম বা সংসার ভেদে বা আবিষ্টাভেদে পৃথক্ হইয়া যায়, এবং দেখা যায়, সমষ্টি পঞ্চভূত হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন পুরুষের বিভিন্নরূপ স্থূল শরীর সৃষ্টি হয়, তাহারাই এ কথাও বলেন ।

যাহা হউক, সাংখ্যদর্শন অনুসারে এই প্রকার কোন একরূপে অনন্ত বহু পুরুষগণ প্রত্যেকে তাহার উপযুক্ত স্থূল শরীরে আবদ্ধ হয় । এই প্রকারে বহু প্রকৃতিবদ্ধ সংসারী পুরুষের (যাহাকে জর্মান দার্শনিক Leibnitz Monad বলিয়াছেন তাহাদের) সমষ্টিই এই সংসার । এইরূপে বহুপুরুষ ও বহু প্রকৃতির পরিণাম স্বীকার করিলে জগতের মধ্যে কোন একত্ব বা একত্ব সিদ্ধান্ত করা যায় না । বহু পুরুষमध्ये কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকায়, এ জগতের মধ্যে একটা সম্বন্ধ বা একত্ব

(organised whole) ধারণা করা যায় না। অগত্যা কেবল দুঃখের অমঙ্গলময়, পরস্পর মধ্যে যদি কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহা বিরোধের সম্বন্ধ; কেবল পরস্পর মধ্যে কাটাকাটি, মারামারি, বিবাদ-বিসংবাদ, প্রত্যেকে অপরকে অভিভূত করিতে, নিজ স্বার্থ রক্ষা করিতে নিরত, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়; সংসার হইতে মুক্ত না হইলে এ অনন্ত দুঃখ ক্লেশের বিরাম নাই, ইহাই ধারণা হয়। এক কথায় দুঃখবাদ (বা Pessimism) আসিয়া পড়ে। বহুজ্ঞানই অজ্ঞান; সুতরাং তাহাই দুঃখের কারণ। •

গীতোক্ত পুরুষ—জীব বা ব্রহ্ম প্রকৃতি নহে।—বলিয়াছি ত, গীতায় এই অর্থে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষত্ব গৃহীত হয় নাই। গীতা অনুসারে পুরুষ এক, তিনি পরম পুরুষ, পরমেশ্বর। ব্রহ্মই অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের আয় স্থিত। তিনিই পরমেশ্বররূপে অন্তর্যামী; নিরন্তররূপে

• এ স্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, ঋষি কপিলের প্রচারিত কোন মূলগ্রন্থ পাওয়া যায় না। অনেকে সাংখ্যত্ব-সমাসকে মূল সাংখ্যগ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাহাতে বহু পুরুষের কথা নাই; ঈশ্বর অস্বীকৃত হন নাই। সাংখ্যসূত্রেও 'ব্রহ্ম' অস্বীকৃত হন নাই। সুতরাং ঋষি কপিলের মূল মত কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই, এবং তাহা যে গীতোক্ত সাংখ্যজ্ঞান হইতে ভিন্ন, তাহাও বলিবার কোন উপায় নাই। কপিল ঋষির পরে সাংখ্যজ্ঞানপ্রবর্তক আশ্রমি পঞ্চশিখ প্রভৃতির কোন প্রামাণ্য গ্রন্থও পাওয়া যায় না' যে, এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যাইবে। সাংখ্যসূত্র ও সাংখ্যকারিকা আধুনিক গ্রন্থ। বৌদ্ধ দর্শন যেমন বুদ্ধের মূলমত হইতে ভিন্ন হইয়া চারি প্রকার হইয়াছে, আধুনিক সাংখ্য-পণ্ডিতগণ সেইরূপ কপিল-মত ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করেন বলা যায়। সুতরাং ত্রিকালদর্শী ঋষি কপিল যে ঋষিগোষ্ঠ "একস্তদাগীৎ" (১০।১২২) এই একমুখ তত্ত্বের বিরোধী মত প্রচার করিয়াছেন, ইহা বলা সম্ভব হয় না। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, গীতায় ও শ্রীভাগবতে সাংখ্যজ্ঞান যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই মূল সাংখ্য মত।

সর্বজীব-হৃদয়ে অবস্থিতি করেন । পরমাত্মরূপে এক হইয়াও তিনিই প্রতি জীবে পৃথক্ জীবাত্মার গ্ৰাম অধিষ্ঠিত থাকেন । তিনিই সর্বক্ষেত্রে এক ক্ষেত্রজ্ঞ । তিনিই পরমেশ্বররূপে আপনার অপরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া, অধ্যক্ষ হইয়া, প্রকৃতিকে এই জগৎ প্রসব করান ও প্রকৃতিকে সর্বজীবক্ষেত্ররূপে পরিণত করান ; এবং এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভক্তের গ্ৰাম অধিষ্ঠিত হইয়া বহু জীবাত্মরূপে বহু পুরুষরূপে প্রতীয়মান হন এবং সেই ক্ষেত্র সকলকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন জীবভাব প্রকাশ (manifest) করেন । স্কীতা অনুসারে এই পুরুষ ত্রিবিধ ;—ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ । এই পুরুষতত্ত্ব পরে ১৫।১৬-১৭ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা এস্থলে দ্রষ্টব্য ।

পরম পুরুষ পরমেশ্বর সর্বভূতক্ষেত্রে অবিভক্ত হইয়াও প্রতিভূতে বিভক্তের গ্ৰাম প্রতীয়মান হন, বহু ক্ষর পুরুষরূপে আপনাকে অজ্ঞানীর জ্ঞানে প্রকাশ করেন । তিনিই সর্বভূত-হৃদয়ে কূটস্থ অক্ষর আত্মা-রূপে সর্বদেহীর অন্তরে 'এক' অবিভক্তরূপে অবস্থিত থাকেন । ভগবান্ আপনার পরাশক্তি-বলে, এই প্রকারে বহুত্বপূর্ণ জীবজড়ময় জগৎরূপে প্রকাশিত হন ।

এজন্য গীতার 'পুরুষ' অর্থে পরম পুরুষ পরমেশ্বর এবং প্রকৃতি অর্থে তাঁহারই মায়াধ্য পরাশক্তিকে বুঝিতে হইবে । সশুণব্রহ্ম নিত্য এই পরম পুরুষ ও পরমা শক্তিরূপ, সশুণব্রহ্ম আপনার জ্ঞানস্বরূপকে প্রপঞ্চ সম্বন্ধে এই পরম জ্ঞাতা-পরমেশ্বর বা পরমপুরুষ এবং পরম জ্ঞেয় স্বশক্তি রূপা পরমা প্রকৃতি ভাবে এই জগৎকারণ হন । এই পরমেশ্বর-রূপ পরম পুরুষ এবং তাঁহার এই পরাশক্তি অনাদি । জগতের মূল কারণ এক ; তাহা বহু হইতে পারে না । ব্রহ্ম অনাদিমৎ (১৩।১২) ভগবান্ অনাদি (১০।৩) এবং প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি—এইরূপ চারিটি স্বতন্ত্র অনাদি বস্তু থাকিতে পারে না । অতএব বলিতেই হইবে যে ; পরব্রহ্মই

একমাত্র 'অনাদিমৎ' এবং পরমেশ্বর পরম পুরুষ এবং প্রকৃতিরূপা পরাশক্তি একমাত্র তাঁহারই স্বরূপ, এবং শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ থাকিতে পারে না বলিয়া এই প্রকৃতি পুরুষ অনাদি । ব্রহ্ম এই প্রকৃতি-পুরুষ রূপেই জগৎ-কারণ হন ; এ জন্ত এই জগৎ সম্বন্ধে এই প্রকৃতি পুরুষ অনাদি । পরব্রহ্ম আপনিই সঞ্জন পরমেশ্বররূপ হন এবং আপনিই মহদব্রহ্মরূপা প্রকৃতি হইয়া পরমেশ্বরের জ্ঞানরূপ বীজ-নিবেক গ্রহণ করিয়া সেই ভগদ্বীজ ধারণ করেন এবং তাহা হইতে জগৎ প্রসব করেন ।

অতএব এস্থলে পুরুষ অর্থে ব্যাখ্যাকারণণ যে ক্ষেত্রজ পুরুষ বা ভগবানের পরা প্রকৃতি বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে । পরবর্তী ২২শ শ্লোকের সহিত এ অর্থের বিরোধ হয় । যাহাকে একস্থলে পুরুষ বলা হইয়াছে, তাহাকেই আবার প্রকৃতি বলা যাইতে পারে না । ইহাতে পরম্পরবিরোধী বাদ আসিয়া পড়ে । তবে চিন্তে আত্মার যে প্রতিবিম্ব পড়ায় চিত্ত চৈতন্যযুক্ত হইলে তাহাতে জ্ঞাতা প্রভৃতি ভাবের বিকাশ হয়, এবং যাহা আত্মাতে পুনঃ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা প্রকৃতি হইলেও অজ্ঞান হেতু তাহাতে পুরুষের অধ্যাস হয় বলিয়া, তাহাকে পুরুষ বলা যাইতে পারে । কিন্তু সে প্রতিবিম্ব অনাদি নহে । তাহা বস্তুও নহে । তাহা বস্তুর (আত্মার) আভাস মাত্র । এজন্য তাহা ক্ষর ।

গীতোকৃত প্রকৃতি এস্থলে অপরা নহে — গীতা অনুসারে প্রকৃতি অনাদি হইলেও তাহা এক নহে । প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ বা ভাবযুক্ত বটে ; কিন্তু এই গুণ প্রকৃতি হইতেই জাত (৩৫, ১৩।২১) । এই প্রকৃতি স্বাধীনা নহে । ইহা পরমেশ্বরেরই প্রকৃতি ব্রহ্মের মায়াখ্যা পরাশক্তি ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । প্রকৃতি চাইরূপ ; — অপরাও পরা । অপরা প্রকৃতিই বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চ মহাত্মরূপে

ভিন্না হয়। তাহাদের সমবায়ই লিঙ্গ। আর পরা প্রকৃতি উপনিষক্ত প্রাণরূপ, ইহা ৭ম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতেই জীবতাবের প্রকাশ হয়, ইহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। এই জীব প্রকৃতি বলিয়া ইহা ক্ষর বা অক্ষর কোনরূপ পুরুষ হইতে পারে না। ইহা প্রকৃতিই। এই জীবরূপা পরা প্রকৃতি ভূতও হইতে পারে না; কেন না, তাহা ও অপরা প্রকৃতি উভয়ে মিলিয়া সর্বভূতধোনি হয় (৭।৬)। তবে এ পরা প্রকৃতি কি? ইহা জীব বা জীবত্বের আধার জীবন—ইহা প্রাণ। সাংখ্যদর্শনে প্রাণকে করণের সামান্য বৃত্তি বলা হইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত-দর্শনে তাহা মূল তত্ত্ব। প্রাণ—ব্রহ্ম, প্রাণই এই সমুদায়, ইহাই শক্তির উপদেশ। ইহাই ব্রহ্মের পরা শক্তির আদি রূপ, প্রথম নিঃসৃত। পরা প্রকৃতি—এই প্রাণ, আর অপরা প্রকৃতি এক অর্থে বায়ু। জগতে এই প্রাণ ও রসি এই দুই মূল তত্ত্ব। এই প্রাণ (পরা প্রকৃতি) লিঙ্গের (অপরা প্রকৃতি) সহিত যুক্ত হইয়াই ভূতধোনি হয়। তাহাতে পুরুষ-অধিষ্ঠিত হইয়া বা বীজপ্রদ পিতা হইয়া সর্বভূতের উৎপত্তি- কারণ হন। ইহাও পরে বিবৃত হইবে।

অতএব গীতা অনুসারে এই প্রকৃতি পুরুষ ব্রহ্মের সঙ্গণ ভাব হেতু পরমতত্ত্ব এবং তাহা অনাদি জগতের আদি কারণ। জর্মান দার্শনিক পণ্ডিত সেলিং যাহার তত্ত্ব Philosophy of the Spirit এবং Philosophy of Nature গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন, এবং তাহা তাহার Philosophy of the Absolute এর অন্তর্গততত্ত্ব বলিয়াছেন। সেই Nature ও Spirit এক অর্থে এই অনাদি প্রকৃতি ও পুরুষ।

আমরা গীতার ও প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষবাদ- মধ্যে যে প্রভেদ এস্থলে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে এ স্থলে বিবৃত হইল।

সাংখ্য ।

গীতা ।

১। পুরুষ বহু-অনন্ত, বহু মুক্ত
ভেদে তাহা দুইরূপ । ইহা ব্যতীত
সিদ্ধ পুরুষও আছে ।

২। মূল প্রকৃতি এক ত্রিগুণা-
ত্মক ।

৩। প্রকৃতি স্বাধীনা, স্বতন্ত্রা ।

৪। পুরুষ, প্রকৃতি পরস্পর
স্বতন্ত্র দুই ভিন্ন মূলতত্ত্ব ।

৫। পুরুষ প্রকৃতি অনাদি ।

৬। বহুপুরুষ ও ত্রিগুণাত্মক
প্রকৃতিই শেষতত্ত্ব ।

পুরুষ—এক, কর অকর ও
পরমভেদে ত্রিবিধরূপে প্রতীয়মান ।

প্রকৃতি দুইরূপ—পরা ও অপরা
প্রকৃতি ভগবানের বা পরম
পুরুষের মায়াখ্যা পরা শক্তির মূল
কার্যরূপ ।

পুরুষ প্রকৃতি—স্বতন্ত্র নহে,
তাহা পরব্রহ্মের সঞ্জন রূপ । প্রকৃতি
পরম পুরুষেরই—অর্থাৎ তাঁহারই
অধীন ।

যাহা জগৎকারণ সঞ্জন ব্রহ্মের
পরম পুরুষ ও পরমাপ্রকৃতিরূপ
তাহাই কেবল অনাদি ।

পরম ব্রহ্মই জ্ঞেয়, সঞ্জন ব্রহ্ম বা
পরমপুরুষ ও তাঁহার পরমা প্রকৃতি
বা বল-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা বিবিধ
শক্তিই শেষতত্ত্ব । এই প্রকৃতি
হইতেই ত্রিগুণের উৎপত্তি ।

পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে অল্প কথা আমরা ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত করিব ।

বিকার...আর গুণ উৎপন্ন প্রকৃতি হ'তে—বুদ্ধি হইতে আরম্ভ
করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত বিকার এবং সুখ-দুঃখ-মোহরূপ প্রত্যক্ষ-
কারে পরিণত গুণ সকল—ইহারা ঈশ্বরের বিকার ; কারণ শক্তি ত্রিগুণা-
ত্মিকা মায়াখ্যা প্রকৃতি হইতে জাত—বা প্রকৃতির পরিণাম ইহা জান,

(শঙ্কর, হনু) । দেহ ইন্দ্রিয়াদি বিকার, এবং গুণ-পরিণাম সূক্ষ্ণঃখ-
মোহাদি প্রকৃতি-সত্ত্ব, (স্বামী) । একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাত্ম—
এই ষোড়শ বিকার, আর সঙ্ঘ-রজঃ-তমোরূপ ত্রিগুণ—ইহারা প্রকৃতি-
সত্ত্ব, অর্থাৎ প্রকৃতিই ইহাদের কারণ (মধু) । বন্ধনের হেতুভূত ইচ্ছা-
দেবাদি বিকার, আর অমানিষাদি মোক্ষ—মোক্ষহেতুভূত গুণ-সকল
প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব । পুরুষদ্বারা সংসৃষ্ট বা সম্বন্ধযুক্ত হইয়া অনাদি-
কাল-প্রবৃত্ত যে ক্ষেত্রাকারে পরিণত প্রকৃতি, তাহা নিজ বিকার ইচ্ছা
দেব প্রভৃতি দ্বারা পুরুষের বন্ধন-হেতু হয়, সেই প্রকৃতিই আবার
স্ববিকার অমানিষাদি দ্বারা পুরুষের অপবর্গ হেতু হয় । ইহাই অর্থ
(রামানুজ) । দেহেইন্দ্রিয়াদি বিকার ও সূক্ষ্ণঃখ মোহ এই গুণ প্রকৃতি
হইতে জাত, তাহারা জীব হইতে জাত নহে । ক্ষেত্ররূপে পরিণত
প্রকৃতি হইতে জীব ভিন্ন (বলদেব) । বিকার অর্থাৎ জীবগণের
বন্ধ-হেতুভূত ইচ্ছা দেব আদি, গুণ অর্থাৎ অমানিষাদি জ্ঞান দ্বারা
মোক্ষ-হেতুভূত গুণ । এই বিকার ও গুণ প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব ।
অনাদি কর্ম্মাত্মক অবিদ্যার নিমিত্ত জীব সংসৃষ্ট প্রকৃতি ক্ষেত্ররূপে
পরিণত হইয়া নিজ বিকারভূত ইচ্ছা-দেবাদি দ্বারা পুরুষের সংসারে
বন্ধনের কারণ হয়, আর সেই প্রকৃতিই অমানিষাদি গুণ দ্বারা পুরুষের
মোক্ষের কারণ হয় । (কেশব) ।

প্রকৃতির কারণত্ব :—এই স্থলে এবং পরবর্তী কয়েক শ্লোকে
প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান, প্রকৃতির ধর্ম ও পুরুষের ধর্ম পৃথকভাবে
উপদিষ্ট হইয়াছে । এ শ্লোকে প্রকৃতি কারণ হইতে যে কার্য বা কার্য্যা-
ত্মক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা উক্ত হইয়াছে । মূল প্রকৃতি হইতে
সমুদায় “বিকার” ও “সমস্ত-গুণ” উৎপন্ন হইয়াছে । এই ‘বিকার’ ও গুণের
অর্থ কি ? মূলকারণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, বিকার এবং ত্রিগুণতত্ত্ব
সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে । সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা ।

স্ব, রজঃ ও তমঃ—সেই তিন গুণ । এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি । “স্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ” (সাংখ্যসূত্র, ১।৫২) । পুরুষের সান্নিধ্যে এই ত্রিগুণের ক্ষোভ হইয়া (অর্থাৎ equilibrium নষ্ট হইয়া) প্রকৃতির বিবর্তন আরম্ভ হয় । প্রকৃতি কেবল কারণ । প্রকৃতি—অব্যক্ত । এই প্রকৃতি হইতে ২৩ ভেদের উৎপত্তি হয় । সাংখ্যদর্শনে আছে—“প্রকৃতের্মহান্ মহতো হৃৎকারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি উভয়ম্ ইন্দ্রিয়ং তন্মাত্রৈভ্যঃ সুলভূতানি” (১।৫৬) কারিকা এই শ্লোকও দ্রষ্টব্য ।) প্রকৃতি হইতে প্রথম যে কার্য উৎপন্ন হয়, তাহাই কারণ হইয়া যে অন্য কার্য উৎপন্ন করে, তাহাদিগকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলে । এই প্রকৃতি-বিকৃতি কোন কোন মতে সাতটি, কোন কোন মতে আটটি । বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি, কোন কোন সাংখ্যব্যাখ্যায় এবং গীতায় মনকেও এই প্রকৃতি-বিকৃতিমধ্যে ধরা হইয়াছে । এমতে প্রকৃতি-বিকৃতি আটটি । ইহাই অষ্টধা ভিন্না অপরা প্রকৃতি (৭।৪) । এই প্রকৃতি-বিকৃতি হইতে পঞ্চদশবিধ বিকৃতির উৎপত্তি হয় । তাহা হইতে: আর কিছু উৎপন্ন হয় না বলিয়া, তাহা কেবল বিকৃতি । অতএব জীবের সম্বন্ধে দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকেই বিকৃতি বলা যায় । গীতায় অষ্ট প্রকৃতি-বিকৃতিকে অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে । এস্থলে দশ ইন্দ্রিয় ও পাঞ্চভৌতিক সুলদেহকে প্রকৃতিভাৱে ‘বিকৃতি’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । এই প্রকৃতি-বিকৃতি ও বিকৃতি লইয়া সাংখ্যের ত্রয়োবিংশতিতত্ত্ব ।

গীতা অনুসারে যে অষ্টধা ভিন্না অপরা প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে, তাহা লিঙ্গশরীরের উপাদান । সমষ্টিভাবে তাহা এক, এই জগতের লিঙ্গশরীর । ব্যষ্টিভাবে তাহা প্রকৃতি জীবের লিঙ্গশরীর । ইহা হইতে যে বিকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার মধ্যে দশটি ইন্দ্রিয় এই লিঙ্গশরীরেরই অন্তর্গত হয় । অবশিষ্ট পাঁচটি সুলভূতই এই বাহ্য জড়-জগতের উপাদান ।

এই মূল প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে ক্ষেত্রে যে সুখ দুঃখ মোহ উৎপন্ন হয়, যে রজোগুণ হইতে রাগ-ঘেযাদি জন্মে, ব্যাখ্যাকারগণের মতে এ সমুদায়ই প্রকৃতি-সম্ভূত গুণ । কিন্তু সাংখ্য দর্শন অনুসারে গুণ quality নহে, ইহা দ্রব্য (substance) ইহাই প্রকৃতির উপাদান । গুণ প্রকৃতির সম্বন্ধসমূহো গুণ,—ইহা জগতের উপাদান । এই ত্রিগুণ-জাত সুখদুঃখাদিকে যদি গুণ বলা যায়, তাহা লিঙ্গশরীরের বা চিত্তের গুণ । এজন্য তাহারাও প্রকৃতি-সম্ভূত ।

এই যের্বিকার-সমূহ ও গুণ-সমূহ, ইহারা ভগবানের সেই মায়াধা পরাশক্তি প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন । গীতা অনুসারে ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতির উপাদান নহে, ইহারা প্রকৃতি হইতে জাত । গীতায় পূর্বে উক্ত হইয়াছে,—

“যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামশচ যে ।

মত্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥” ৭।১২

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, এই ত্রিগুণময় ভাবের দ্বারাই সমুদায় জগৎ মোহিত থাকে এবং তাহাই তাহার দৈবী গুণময়ী মায়া । সুতরাং মায়াই এই ত্রিগুণময়ী এবং তাহা হইতে এই ত্রিগুণময় ভাবের উৎপত্তি হয় । ভগবান্ পরে ১৪শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

“সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

নিবদ্ধস্তি মহাবাহো ! দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ” ৫ ১৪

অতএব গীতা অনুসারে এই ত্রিগুণ ভগবানের প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন । এবং ভগবান্ হইতেই এই ত্রিগুণের বিভিন্ন ভাবের উৎপত্তি হয় । সুতরাং এই শ্লোকের গুণ অর্থে এই ত্রিগুণ । এই ত্রিগুণের ভাব রাগ-ঘেযাদি নহে । সাংখ্যদর্শন অনুসারে ত্রিগুণকে যে প্রকৃতির উপাদান বলা হইয়াছে তাহা গীতায় স্বীকৃত হয় নাই ।



কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরূচ্যতে ॥ ২০

কার্য্যও কারণ আর কর্তৃত্ব বিষয়ে
প্রকৃতিকে কহে হেতু ; কহে পুরুষেরে
সুখ আর দুঃখাদির ভোক্তৃত্বের হেতু ॥ ২০

২০ । এই শ্লোকে ‘কারণ’ শব্দের পরিবর্তে ‘করণ’ এই পাঠান্তর আছে ।

কার্য্য করণের কর্তৃত্বে প্রকৃতি হেতু—পূর্বে যে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণ ও বিকারের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই গুণ ও বিকার কি, তাহা এস্থলে বলা হইতেছে । (শঙ্কর) ।

কার্য্য = দেহ । করণ = শরীরস্থ ত্রয়োদশ প্রকার করণ, বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন এই তিন অন্তঃকরণ, আর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটি বহিঃকরণ,—সর্ব্বশুদ্ধ করণ ত্রয়োদশ প্রকার । “করণং ত্রয়োদশ-বিধং” (সাংখ্যকারিকা, ৩২) । ইহা ব্যতীত দেহের আরম্ভক যে পঞ্চভূত ও শব্দস্পর্শাদি বিষয়, এবং প্রকৃতি-সম্ভূত গুণ যাহা পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহারাই কার্য্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া কার্য্য-রূপে ইহাদের গ্রহণ করা যায় । এক্ষণে এস্থলে কার্য্য অর্থে দেহ, পঞ্চভূত ও বিষয় ।

এইরূপে সুখ-দুঃখ ও মোহ এই প্রকৃতি-সম্ভূত গুণত্রয়কেও ‘করণ’ শব্দের অন্তর্গত বলিয়া এস্থলে বুঝিতে হইবে ।

কর্তৃত্ব—এই কার্য্য ও করণ সমূহের উৎপাদকত্ব ।

প্রকৃতিই এ সকল বস্তুর আরম্ভক অর্থাৎ উপাদানকারণ, সেই সেই আকারে পরিণত হইবার হেতু । ‘করণ’ স্থলে ‘কারণ’ এই

পাঠ গ্রহণ করিলে, কার্যকারণ-কর্তৃত্বে—এই কথার এইরূপ অর্থ করিতে হয় যে, বাহ্য বাহ্যার পরিণাম, তাহাও তাহার কার্য । বিকার কার্য, এবং বিকারী কারণ । সেই কার্য ও কারণ, অর্থাৎ বিকার ও বিকারী এই দুইরূপ পদার্থের উপাদান-বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু । অথবা কার্য-পূর্বোক্ত ষোড়শ বিকার (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চস্থূলভূত) আর কারণ শব্দের অর্থ সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি (বুদ্ধি-অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র বা স্থূলভূত) । এই ত্রয়োবিংশতি পদার্থই কার্য-কারণরূপে গৃহীত । সেই কার্য ও কারণের কর্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু, অর্থাৎ প্রকৃতি তাহার আরম্ভক কারণ । প্রকৃতি এইরূপে সংসারের কারণ হন ।

শঙ্কর এইরূপ অর্থ করিয়াছেন । ইহার মধ্যে শেষ অর্থ সাংখ্যদর্শন-সম্মত । ‘কারণ’ পাঠ গ্রহণ করিলেও, ত্রয়োদশ কারণ, এবং পঞ্চস্থূলভূত ও তাহাদের উৎপাদক পঞ্চস্থূলভূত বা তন্মাত্র, এই দশটি কার্য—এই ত্রয়োবিংশতিটির উপাদান ও আরম্ভক কারণ প্রকৃতি—এইরূপ অর্থ সাংখ্যদর্শন অনুসারেও করা যাইতে পারে । প্রকৃতির এইরূপে ত্রয়ো-বিংশতি কার্যকারণরূপ পরিণাম—সাংখ্যশাস্ত্র হইতে সর্বশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে ।

কেশব ও রামানুজ বলেন,—প্রকৃতি-পুরুষ-সংসর্গ হেতু যে কার্যভেদ হয়, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে । কার্য—শরীর, আর ‘কারণ’ মন মন্থিত ইন্দ্রিয়গণ । তাহাদের কার্যকারণে পুরুষ অধিষ্ঠিত প্রকৃতিই হেতু । পুরুষ-অধিষ্ঠিত প্রকৃতি ক্ষেত্রকারে পরিণত হইয়া, পুরুষের আশ্রয় ও ভোগসাধনের কারণ হয় । পুরুষের অধিষ্ঠান হেতুই প্রকৃতির আপেক্ষিক কর্তৃত্ব । আর শরীর অধিষ্ঠান প্রযত্ন হেতু পুরুষের কর্তৃত্ব ।

স্বামী বলেন,—এ স্থলে পুরুষের সংসার-হেতুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । কার্য = শরীর, কারণ = সুখদুঃখসাধন ইন্দ্রিয় । তাহাদের কর্তৃত্বে অর্থাৎ তদাকারে পরিণত প্রকৃতিই হেতু । প্রকৃতি অচেতন হেতু তাহার স্বভঃ

কর্তৃত্ব সম্ভব না হইলেও চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান ও দৃষ্টি হেতু তাহার ক্রিয়ানির্বর্তকত্ব সম্ভব হয়—অচেতন চেতনধর্মযুক্ত হয় ।

∴ মধুসূদন এখানে শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি বলেন--‘করণ’ ও ‘কারণ’ এ উভয় পাঠে অর্থ একই ।

কহে (উদ্যতে) অর্থে মধুসূদনের মতে মহর্ষিগণ, স্বামীর মতে কপিলাদি ঋষিগণ এইরূপ কহিয়াছেন । এই ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যা যে সাংখ্যশাস্ত্র-সম্মত, তাহা আমরা দেখিয়াছি ।

কার্য্য কারণাত্মক জগৎ । যাহা হউক, এ স্থলে ‘কার্য্যকরণ’ (কারণ) কর্তৃত্বে অর্থে ‘কার্য্য ও কারণের বা কারণের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে,’—ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপ বুঝাইয়াছেন এবং কার্য্যকরণ বা কার্য্যকারণ, যেকোনই পাঠ গ্রহণ করা হউক, ইহার অর্থ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ত্রয়োবিংশতিতত্ত্ব দ্বারা সংহতক্ষেত্র বা স্থূল পাক্‌ভৌতিক শরীর ও লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর—ইহাও বুঝাইয়াছেন । যাহা হউক, কার্য্য-করণ (কারণ) কর্তৃত্ব অর্থে কার্য্য কারণ এবং কর্তৃত্ব এ তিনও হইতে পারে এবং কার্য্য কারণ বা কার্য্যকারণ অর্থে এই কার্য্যকারণাত্মক জগৎ ও হইতে পারে ।

অবশ্য, এই শ্লোকের পরবর্ত্তী অংশ হইতে কার্য্য-কারণ (কারণ) কর্তৃত্ব শব্দের অর্থ কার্য্য ও কারণের বা কারণের কর্তৃত্ব—অধিক সঙ্গত, এবং শব্দের অর্থই গ্রহণীয় । তথাপি এই শ্লোকাংশের অন্তরূপ যে অর্থ হইতে পারে, তাহা চিন্তা করা উচিত । তাহাও সাংখ্যদর্শন-সম্মত । অতএব সাংখ্যদর্শন হইতে আমরা এ অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব । সাংখ্যদর্শনে সং-কার্য্যবাদ স্বীকৃত । এজন্য কার্য্য কারণ-শুণ থাকে । কারণ শুণদ্বাং কার্য্যশ্চ (ইতি সাংখ্যকারিকা ১৪) ।

আর এই কার্য্যকারণ-বিভাগ হইতে এই বিচিত্র কার্য্যাত্মক অর্থাৎ এক অবিত্তক (বা organised) জগতের মূলকারণ যে এক অব্যক্ত

প্রকৃতি তাহা সিদ্ধ হয়। কারিকায় আছে, ‘কারণ-কার্য-বিভাগাৎ অবি-
ভাগাৎ বৈশ্বরূপস্ত।’ (ইতি কারিকা ১৫)।

ইহার ব্যাখ্যায় কোমুদীকার বলিয়াছেন,—

“কারণেসংকার্যামিতি স্থিতম্।...কারণাৎ কার্য্যানি...হেমপিণ্ডাৎ
কটককুণ্ডলমুকুটাদিত্যেব...আবির্ভবন্তি বিভজ্যন্তে অয়ং কারণাৎ
পরমব্যক্তাৎ সাক্ষাৎ পারম্পর্যেণ অন্বিতস্ত বিশ্বস্ত কার্যাস্য বিভাগঃ।”

গোড়পাদ বলিয়াছেন—“করোতি ইতি কারণম্। ক্রিয়ত ইতি কার্যম্।
কার্যস্ত কারণস্ত চ বিভাগো যথা—ঘট...পরসাং ধারণে সমর্থং ন তথা তৎ
কারণং যুৎপিণ্ডঃ। অস্তি বিভক্তং তৎকারণং যস্ত বিভাগঃ ইদং ব্যক্তম্।”

সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি হইতে মহান্ (বুদ্ধিতত্ত্ব), মহান্ হইতে
অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, মন ও দশ:ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্র
হইতে পৃথিব্যাदि ভূত-সৃষ্টি হয়। (সাংখ্যসূত্র ১।৫৬, কারিকা, ২২)
ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এই অব্যক্ত প্রকৃতি মূল-কারণ, বুদ্ধি,
অহঙ্কার ও তন্মাত্রি পরম্পরা ভাবে কারণ; আর সমুদায় তত্ত্ব কেবল কার্য।

অতএব সাংখ্যদর্শন অনুসারে এস্থলে ‘কার্যকারণ’ পাঠই অধিক
সঙ্গত; এবং এই কার্যকারণ-বিভাগ—এই কার্যাত্মক বিশ্বের বা
সমুদায় জগতের বিভাগ। কার্য-কারণ অর্থে কেবল প্রতি পুরুষের
ক্ষেত্র পৃথকভাবে না বুঝিয়া সমষ্টিভাবে সমুদায় ক্ষেত্র বা এই সমুদায়
জগৎকে বুঝিলে সঙ্গত ও সাংখ্যদর্শন-সম্মত অর্থ হয়। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে
বহুপুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা পূর্বে বলিয়াছি। কারিকায় আছে।—

“জন্মমরণকরণানাং প্রতি নিয়মাৎ যুগপৎ প্রবৃৎশ্চ।

পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যায়াক্ষেপে ॥” (১৮)

প্রতি পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া সেই পুরুষের অধিষ্ঠান তেতু সেই পুরুষের
ভোগমোক্ষার্থে যে প্রকৃতির বৎস দৃষ্টে গাভীর ছন্দ স্বভাবতঃ সুরণের ঞ্চার
প্রকৃতি পরিণত হইয়া তাহার ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার আপূরণ ও

পরিণতি করে,—সাংখ্যদর্শনের এই সিদ্ধান্ত হইতে এই জ্ঞের ও ভোগ্য বাহু জগতের উৎপত্তি ও পরিণতি বুঝা যায় না । প্রতি পুরুষ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞের ও ভোগ্য জগৎ পৃথক্ ও অজ্ঞের জ্ঞের ও ভোগ্য জগতের সহিত অসম্বন্ধ, এইরূপ ধারণা হয় । সকল পুরুষের নিকট প্রকাশিত জগৎ যে একরূপ তাহা সিদ্ধান্ত করা যায় না । এবং প্রতি পুরুষের সন্নিহিত প্রকৃতি যে মহাদাদি হইতে স্থলভূত পর্য্যন্ত সৃষ্টি করে, তাহার যে বাহু অবিদ্য আছে, তাহাও সিদ্ধান্ত করা কঠিন হয় । অথচ সাংখ্যমতে জগৎ সত্য । এ জন্ত ব্যাখ্যাকারগণ সকল পুরুষের সান্নিধ্যে একই প্রকৃতি একই কালে একই রূপে পরিণত হয়, ইহা সিদ্ধান্ত করেন । কেহ বা এই প্রকৃতির পরিণতি ও ভৌতিক জগৎ-সৃষ্টির কারণ ‘সিদ্ধ’ ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠানসাপেক্ষ, ইহা সিদ্ধান্ত করেন । এই হিরণ্যগর্ভ-সান্নিধ্যে একই প্রকৃতি হইতে মহাদাদি ক্রমে একই লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়, এবং একই বাহু স্থল পাঞ্চভৌতিক জগৎ উৎপন্ন হয় এবং প্রতি পুরুষের অবিদ্যা-ভেদে প্রতি পুরুষ-সান্নিধ্যে সেই এক লিঙ্গশরীর পৃথক্ হইয়া যায়, অনেকে এ কথা বলেন । এ সকল কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ।

অতএব সিদ্ধ ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভই প্রকৃতির পরিণামের হেতু, ইহা স্বীকার না করিলে বাহু জগতের সত্যতা সিদ্ধ হয় না । গীতার এই প্রকৃতির পরিণাম ও তাহা হইতে জগতের উৎপত্তির হেতু যে পরমেশ্বর, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে ।

গীতার আছে—

“মরাধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্মরতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কোন্তের জগদ্বিপরিস্বর্ততে ॥” (৯।১০)

অতএব গীতা অনুসারে প্রকৃতির এই পরিণাম বা কার্যরূপে অস্তিত্ব-ব্যক্তিতে বিভিন্ন পুরুষের অধিষ্ঠান মাত্র হেতু নহে । ইহা মনে রাখিয়া আমাদের এই কার্যকারণকর্তৃত্বে প্রকৃতি যে হেতু, এই কথা বুঝিতে হইবে ।

এই কার্য-কারণ অর্থে এ জন্ত এই নিয়ত পরিবর্তনশীল কার্যকারণরূপে বিভক্ত এই বিশ্ব বা জগৎ—এইরূপ অর্থও গ্রহণ করা যায় । উপাদান-কারণরূপ প্রকৃতিবক্ষে যে এই কার্যাজাত জগতের নিয়ত পরিণাম ও পরিবর্তন হয়, সাধারণ অর্থে যাহা কোন কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী ব্যাপার, তাহাই সে কার্যের কারণ । সমষ্টিভাবে এই মুহূর্তে যে জগৎ আমাদের সকলের জ্ঞানে প্রকাশিত, অব্যবহিত পূর্ববর্তী মুহূর্তের জগৎ তাহার কারণ । অতএব এই অর্থে ও সমষ্টিভাবে—এই কার্য-কারণ-সংঘাতই এই জগৎ । আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্র বা শরীর সেই জগতেরই অন্তর্গত । অতএব কার্য-কারণ অর্থ—এই ব্যক্ত বাহ্য-জগৎ, ইহা বলা যাইতে পারে । আমাদের শরীর এই জগতের অন্তর্ভূত । এ জন্ত ব্যষ্টিভাবে কার্য-কারণ অর্থে আমাদের ক্ষেত্রও বটে । তবে এই শেষ অর্থে সমস্ত জগৎ-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয় না ।

এই জগৎ কার্য-কারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ । বলিয়া'ছ ত, সাংখ্যদর্শনে সংকার্য-বাদ স্বীকৃত । কার্য কারণের অন্তর্ভূত । কার্য-কারণ-নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না । যে সব কারণ হঠতে এখন কোন কার্য উৎপন্ন হইল, সেইরূপ কার্য সে সব কারণে গরে হইতে পারে ও হইবে । এ নিয়মের ব্যতিচার নাই । ইহাকে Uniformity of nature বলে । একই প্রকৃতি-সূত্র কারণরূপে থাকায় এই কার্য-কারণ-সূত্র অবিচ্ছিন্ন, এ জগৎ একই রূপ কার্য-কারণ-সূত্রে গ্রথিত ।

কার্য-কারণ-কর্তৃত্ব । এক্ষণে কার্য কারণ-কর্তৃত্ব কথার অর্থ কি, তাহা বুঝিতে হইবে । সাংখ্যদর্শনে কার্য কারণ-কর্তৃত্বের কথা নাই বটে, কিন্তু গুণ-কর্তৃত্ব—অর্থাৎ মহাদায়ির কর্তৃত্ব এই কথা আছে । পুরুষ এই গুণ কর্তৃত্বহেতু-কর্তার স্মার হন, ইহা উক্ত হইয়াছে । কারণকার আছে :—

“গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্তা ইব ভবতি উদাসীনঃ” ॥২০

এই কর্তৃত্বের অর্থ কি ? কর্তৃত্ব ও কৃতিত্ব একই কথা । যাহার কৃতিত্ব আছে—কর্মে বুদ্ধিপূর্বক প্রযত্ন আছে—আমি করিতেছি, এ অভিমান আছে, সাধারণতঃ তাহাকেই কর্তা বলে, তাহারই কর্তৃত্ব আছে । এই কর্তৃত্ব জ্ঞানপূর্বক হয় । “জ্ঞান হইতে ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে কৃতি, কৃতি হইতে চেষ্টা, ও চেষ্টা হইতে ক্রিয়া হয় ।” অতএব প্রকৃতিকে কর্তা বলিলে, তিনি যে চিন্ময়ী, তাহা স্বীকার করিতে হয় । সাংখ্যদর্শনে তাহা স্বীকৃত হয় নাই । সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি জড় । তবে প্রকৃতি হইতে যে বুদ্ধিত্বের সৃষ্টি হয়, তাহাতে পুরুষ চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া তাহা চেতনবৎ হয় । অতএব সাংখ্যদর্শন অনুসারে বুদ্ধিত্ব বা মহত্ত্ব হইতে যে প্রকৃতির পরিণতি, তাহার মূলে এই পুরুষের জ্ঞান ও চৈতন্য প্রতিবিম্বিত আছে বলিয়া প্রকৃতির সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্বক হয় বলা যায় এবং এই অর্থে প্রকৃতি কর্তা । এই অর্থে প্রকৃতির কার্য-কারণের কর্তৃত্বও আছে বলা যায় । নতুবা প্রকৃতির স্বাভাবিক জড় পরিণাম যে কোন কর্তৃত্ব বা জ্ঞান চািলিত প্রযত্ন-সাপেক্ষ, তাহা বলা যায় না । পুরুষের অধিষ্ঠান হেতুই প্রকৃতি কার্য-কারণ-কর্তৃত্ব-হেতু হন । ঈশ্বর-কর্তৃত্বে হেতু হন । গীতা অনুসারে সেই পুরুষ পরম পুরুষ পরমেশ্বর । তিনি প্রকৃতি-লীন প্রতি জীবের বাসনা বা সংস্কার-বীজ অনুসারে এইরূপে ওলঙ্ঘের পর শীঘ্র প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, ও প্রতি জীবের উপযোগী মাত্র সৃষ্টি করেন । ঈশ্বরের অধিষ্ঠানেই প্রকৃতির কর্তৃত্ব । ভগবান্ অসক্ত ভাবে উদাসীনের স্থায় আসীন থাকেন মাত্র (৯৯) । সাংখ্যদর্শন কিন্তু ঈশ্বরের কোনরূপ কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না । কেন না, ঈশ্বরই অসিদ্ধ । সাংখ্যসূত্রে উক্ত হইয়াছে—“অহঙ্কারকর্জুধীনা কার্যাসিদ্ধি ন ঈশ্বরাদীন’ প্রমাণাভাবাৎ’ (৬:৬৫) ।

যাহা হউক, যদি কার্য, কারণ ও কর্তৃত্ব এই তিনকে পৃথকভাবে

গ্রহণ করা যায় ও কারণ অর্থে অষ্টধাবিভক্ত অপরা প্রকৃতি ও কার্য অর্থে পূর্বোক্ত ষোড়শ বা পঞ্চদশ বিকার ধরা যায়, এবং কর্তৃত্বকে স্বতন্ত্রভাবে ধরা যায়, তাহা হইলে বলা যায় যে, এই মূল প্রকৃতি হইতে মহাদি ক্রমে প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণাম হয় ইহাতে প্রকৃতির কোন কর্তৃত্ব বা জ্ঞানপূর্বক নিয়ন্তৃত্ব নাই। যেমন জলীয়বাষ্প হইতে জল ও হিনশিগার পরিণতি স্বাভাবিক বলা যায়, সেইরূপ প্রকৃতির এই পরিণাম স্বাভাবিক। জীবের জ্ঞানেই কর্তৃত্বের বিকাশ হয়। জীবের বুদ্ধিতেই অহঙ্কার বা ‘আমি কর্তা’ ভাবের বিকাশ হয়। সেই যে কর্তৃত্ব-ভাব, তাহার হেতু প্রকৃতি। প্রকৃতি যেমন কার্য-কারণের হেতু, সেইরূপ প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত কর্তৃত্বভাবেরও হেতু। কেন না, এই কর্তৃত্ব—বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিস্তৃত পুরুষের জ্ঞান বা চৈতন্য হইতে উৎপন্ন, তাহা বুদ্ধিতত্ত্বেরই গুণ বা ধর্ম অথবা বুদ্ধিতত্ত্বাত অহঙ্কারের ধর্ম। অতএব এই কর্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু।

হেতু অর্থে কেহ কেহ আশ্রয় বুঝিয়াছেন। এ স্থলে হেতু অর্থ কারণ বটে, কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যাহাকে কারণ বলি, তাহা হেতু নহে। কারণের ইংরাজী কথা cause। হেতুর ইংরাজী কথা reason। হেতু অর্থে নিমিত্তকারণও বলা যায়। আমাদের জ্ঞানে কার্য-কারণ সম্বন্ধে যে বুদ্ধি—যে নিয়ম বুদ্ধি, তাহাকে হেতু বলি। হেতু দ্বারা ‘কেন?’ এই প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধি। জগতে ও আমাদের মধ্যে এই যে কার্য-কারণ-কর্তৃত্ব দেখি—তাহা কেন এরূপ হয়, কি নিমিত্ত এরূপ হয়—এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রকৃতিই ইহার হেতু। এ সৃষ্টি জ্ঞানপূর্বক, একান্ত আমাদের জ্ঞানে ইহার হেতু ধারণা করিতে পারি। ব্রহ্মজ্ঞানে বা পরমেশ্বরের জ্ঞানে যে রূপ জগৎ কল্পিত হয়, পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতার প্রকৃতিই সেই কল্পনা অনুসারে পরিণত হইয়া এই জগৎরূপে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি কার্য-কারণ-কর্তৃত্বের হেতু

হয়, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। যুক্তি ও অনুমান প্রধান সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতির অস্তিত্ব ও তাহার অনাদিত্ব ও আদি-কারণত্ব আমরা এই প্রকার অনুমান দ্বারা বুঝিতে পারি। অগতের হেতুও অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইহা নিশ্চয় শুদ্ধ জ্ঞানে বুঝিতে পারি; এট প্রকার নানা ভাবে গীতায় এই শ্লোকে উক্ত এই তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়।

পুরুষ সুখ-দুঃখাদির-ভোক্তৃত্বের হেতু—প্রকৃতি বিরূপে সংসারের কারণ হয়, তাহা উক্ত হইল। এক্ষণে পুরুষ কি প্রকারে সংসারের কারণ হয়, তাহা বলা হইতেছে। পুরুষ এস্থলে কর পুরুষ—জীব। ক্ষেত্রজ্ঞ ও ভোক্তা শব্দের দ্বারা জীব বা ভূতগণ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ভোগ্য সুখ ও দুঃখের ভোগের প্রতি এই পুরুষই হেতু, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ভোক্তৃত্ব অর্থে উপলব্ধি। কার্য্য-কারণ-কর্তৃত্ব ও সুখ-দুঃখ-ভোক্তৃত্ব সংসারের এই দুইটি রূপ। প্রকৃতি কার্য্যকারণ-কর্তৃত্বরূপে ইহার হেতু, আর পুরুষ সুখ-দুঃখ-ভোক্তৃত্বরূপে ইহার তেতু। কার্য্য বা কারণ এবং সুখ বা দুঃখ, অর্থাৎ হেতু ও ফল এই বিবিধরূপে ব'হ প্রকৃতির পরিণাম না হইত, এবং কোন চেতন পুরুষ যদি সেই প্রকৃতি পরিণাম বা ভোগ্য বস্তুর উপলব্ধি না থাকিত, তবে সংসার কিরূপে থাকিত? যদি উক্তরূপে পরিণত প্রকৃতি ভোগ্য হইত, এবং প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষ যদি তাহার ভোক্তা হয়, তবে এই ভোগ্য ও ভোক্তার অনাদি সংযোগ হইতে এ সংসার সিদ্ধ হইতে পারে। এই কারণে প্রকৃতিকে কার্য্যকারণকর্তৃত্বের হেতুরূপে ও পুরুষকে সুখ-দুঃখ-ভোক্তৃত্বের হেতুরূপে সংসারের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। এ পরিদৃশ্যমান সংসারের স্বরূপই সুখদুঃখভোগ, এবং এই সুখদুঃখ-ভোক্তৃত্ব পুরুষের সংসারিত্ব।” (শঙ্কর)

পুরুষাধিষ্ঠিত, ক্ষেত্রাব্যারে পরিণত প্রকৃতির পুরুষের ভোগ-সাধক।

প্রকৃতিসংসৃষ্ট পুরুষ সুখদুঃখ সকলের ভোক্তা বা অনুভবের আশ্রয়রূপ হেতু হয় । (রামানুজ) ।

“পুরুষ অর্থাৎ জীবজন্তু প্রকৃতিকৃত সুখ-দুঃখের ভোক্তৃৎসের হেতু । ইহার ভাব এই যে, প্রকৃতি অচেতন, একত্র তাহার স্বতঃ কর্তৃত্ব সম্ভব নহে ; সেইরূপ পুরুষও অবিকারী, তাহারও ভোক্তৃৎস সম্ভব নহে । তথাপি কর্তৃত্ব অর্থাৎ ক্রিয়ানির্কর্তৃকত্ব চৈতন্যাদিষ্ঠান এবং চৈতন্যমূলক পুরুষের দৃষ্টি হইতে সম্ভব হয় । এইজন্য পুরুষের সরিধান হেতু প্রকৃতির কর্তৃত্ব । সেইরূপ সুখ-দুঃখ-বেদনরূপ ভোক্তৃৎস চৈতন্যময়, প্রকৃতি-সরিধান হেতু পুরুষে সম্ভব হয় ।”

পুরুষ অর্থাৎ কেন্দ্রজ পরা প্রকৃতি । পুরুষ সুখ-দুঃখ-বোহরূপ সমুদায় ভোগ্যের ভোক্তৃৎসের বা উপগন্ধির হেতু ।” (মধু)

‘পুরুষ অজ্ঞানবশে প্রকৃতি-অধিষ্ঠিত হইয়া বা প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে বলিয়া প্রকৃতি সেই পুরুষের সংস্কারানুসারে পরিণত হইয়া তাহার শরীরাদির সৃষ্টি করে, এবং ভোগের জন্য সুখ-দুঃখাদি পুরুষকে অর্পণ করে । এইরূপে পুরুষ সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা হয় । সেই ভোগের পুরুষই কর্তা । প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সুখ-দুঃখাদি ভোগ করা পুরুষেরই কার্য ।’ (বলদেব) । “পুরুষ প্রকৃতি সংসৃষ্টে সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃৎসের হেতু অর্থাৎ সুখ দুঃখ অনুভবের আশ্রয় । যে পর্য্যন্ত প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংসর্গ থাকে, সে পর্য্যন্ত সুখ দুঃখভোগ অবর্জনীয়” । (কেশব)

পুরুষ-তত্ত্ব — পূর্ক শ্লোকে পুরুষ সামান্যভাবে উক্ত হইয়াছে । গীতার পরে পুরুষের ত্রিবিধ ভাবের কথা আছে । বাহ্যকে ‘ক্ষর’ পুরুষ বলে, তাহার বিষয় গ্রন্থলে ও পরবর্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । পরমায়া বা অক্ষর পুরুষের কথা পরে ২২শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ; এবং তাহার পরে পরম পুরুষ পরমেশ্বরের তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে । অতএব গ্রন্থলে পুরুষ যে সাংখ্য-ধর্মানোক্ত বহু পুরুষ ও গীতোক্ত ক্ষর পুরুষ তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত । এই

পুরুষই প্রকৃতিস্থ হইয়া বা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া অজ্ঞানবশে সুখ-
 দুঃখ-ভোক্তা হয়। এই পুরুষ প্রতিক্রমে বিভক্তের গায় স্থিত ভোক্তা পুরুষ
 এবং অক্ষর ও পরম পুরুষ বা সর্বজীবে অধিষ্ঠিত এক অবিভক্ত পরমায়া
 পরমেশ্বর, পারমার্থিক ভাবে এক হইলেও ব্যবহারিক অর্থে ঠিক এক
 নহে, তাহা স্মৃতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। পরমায়া ও জীবায়া—এই দুই
 রূপে যে পরম পুরুষ পরমেশ্বর প্রতি শরীরে স্বরূপে ও জগদায়রূপে
 অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে। স্বা সুপর্ণা সবুজা সখাগ
 সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে” (ঋগ্বেদ) । ১৬৪।২১ ; মুণ্ডক ৩।১।১ ; ৯
 খেতাখতর ৪।৩ মন্ত্র দ্রষ্টব্য) এই মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া, ইহা পূর্বে দেখান
 হইয়াছে। পরমায়া প্রতি শরীরে অপরিচ্ছিন্নভাবে সর্বভূতের অন্তরে
 অবস্থান করেন ; আর তিনিই জীবরূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়া প্রতি দেহে
 বিভক্তের গায় অবস্থান করেন। গীতায় এই পরমায়া পরম পুরুষের বর্ণ
 পরবর্তী ২২শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি। পারমার্থিক
 অর্থে ক্ষর পুরুষই এই পরম পুরুষের প্রতিবিম্বিত স্বরূপ। তাহা পরে
 বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ক্ষরপুরুষ ভোক্তা—এই প্রতি শরীরস্থ জীবায়া ও পরমায়া
 ক্ষরপুরুষ ও পরমপুরুষমধ্যে জীবই ভোক্তা, পরমায়া ভোক্তা নহেন, তিনি
 অন্তর্যামিভাবে জীবকে এই ভোগে নিয়োজিত করেন—প্রেরয়িতা ইন
 পূর্বোক্ত মন্ত্রের শেষাংশে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। খেতাখতর উপ
 নিষদে আছে (১।১২)—

“এতজ্ জ্ঞেয়ং নিতামেবাত্মসংস্থং

নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ।

ভোক্তা ভোগাপ্রেরয়িতারঞ্চ মম্বা

সকং প্রোকৃতং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥”

অতএব এক ব্রহ্মই ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (জড় প্রকৃতি)

প্রেরিতা (পরমেশ্বর) রূপে জগতে বিবর্তিত হন। খেতাবতর উপনিষদে অমৃতও এ কথা আছে, যথা—

“জ্ঞ-অজ্ঞৌ ধৌ অজ্ঞৌ ঈশ-অনৌশৌ

অজ্ঞা হি একা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা ।

অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হি অকর্তা

ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ।” (১১২) ।

অতএব এক ব্রহ্মকে জীব, ঈশ্বর ও প্রকৃতি এই তিন অনাদি (অজ) রূপে জ্ঞেয়। ইহাই সত্ত্ব ব্রহ্মের রূপ, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরই সর্বজ্ঞ; কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ জীব অজ্ঞ, অজ্ঞানবদ্ধ। সে-ই ভোক্তা। প্রকৃতি এই ভোক্তার ভোগ্য-বিষয়-প্রদায়িনী। ঈশ্বরশক্তি-রূপ প্রকৃতিও অজ্ঞা (নিত্য, অনাদি)। পরমাত্মাই বিশ্বরূপ হইয়াও অকর্তা।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, জগৎসৃষ্টিকালে ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয়রূপে বিবর্তিত হয়, আমি বহু হইব, এই কল্পনা হয়, এবং এই কল্পনা অনুসারে ব্রহ্মশক্তি-মায়া বা প্রকৃতি এই জগৎরূপে পরিণত হয়। এই পরিণতির উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন কি? কোন কার্য যদি জ্ঞানপূর্বক হয়, তবে তাহার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য কি—এ প্রশ্ন স্বতই আমাদের জ্ঞানে উদয় হয়। সৃষ্টির সেই প্রয়োজন—ভোগ।

জগৎ ভোগ্য—যেমন জ্ঞেয়রূপে জগতের সৃষ্টি ও জ্ঞাতারূপে জীবের সৃষ্টি হইয়া উভয়ের সংযোগে এই জগৎ বিদ্যুত হয়, সেই প্রকার ভোগ্যরূপে এ জগতের সৃষ্টি, আর ভোক্তারূপে জীবের সৃষ্টি হইয়াই জগৎ বিদ্যুত হয়। ব্রহ্মই এই ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে বিবর্তিত হন। জগৎ কেবল জ্ঞানে জ্ঞেয় হইবার জন্য সৃষ্টি হয় না। তাহা হইলে, সৃষ্টি নিরর্থক হইত। একান্ত অবশ্য বলিতে হয় যে, ভোক্তার ভোগের জন্যই প্রকৃতি “ভোগার্থযুক্ত”। ভোক্তার ভোগের জন্যই জগতের সৃষ্টি।

ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানস্বরূপ নহেন। তিনি আনন্দস্বরূপ। আমাদের আনন্দ প্রধানতঃ এই ভোগমূলক। সুখ-দুঃখ-মোহরূপে ভোগ ত্রিবিধ। আমাদের এই আনন্দস্বরূপত্ব জ্ঞাত্য আমরা মোহভোগ করিয়া, দুঃখভোগ করিয়া, কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিতে যত্ন করি। এইরূপে ভোগের ক্রম-আপূরণ হেতু আমাদের জন্মজন্মান্তর ধরিয়া পুরুষকারাখ্যা চেষ্টার কালে আমাদের তামসিক প্রকৃতি ক্রমে রাজসিক হয়, ও পরে সাত্বিক হয়। আমরা মোহকে ও দুঃখকে যথাসাধ্য পরিহার করিয়া সুখ অনুভব করিবার জ্ঞাত্য যত্ন করি। প্রকৃতিই ক্রমে আমাদের স্বভাবকে সাত্বিক করিয়া দেয়। তখন আমরা প্রকৃত সুখ ভোগ করিতে পারি। যতদিন চিত্ত মলিন থাকে, আমাদের প্রকৃতি তামসিক বা রাজসিক থাকে, ততদিন আমরা সুখভোগের চেষ্টা করিয়াও সুখভোগ করিতে পারি না; আমাদের রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতি আমাদের দুঃখমোহ ভোগ করায়,—সুখভোগে বাধা দেয়। আমাদের প্রকৃতি যেরূপ সুখ-দুঃখ বা মোহ আনিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত করে, আমরা তাহকে ভোগ করি। প্রকৃতির দ্বারা পুরুষ সুখদুঃখাদির ভোক্তা হয়। প্রকৃতি সত্বপ্রধান হইলে আমাদের স্বভাব নির্মল হয়, তখন সুখভোগ হয়।

পুরুষের যে এই ভোগেচ্ছা, বা যে আনন্দস্বরূপত্ব প্রকৃতিতে প্রতি-
বিম্বিত হয়, তাহা গ্রহণ করিয়া সেই প্রকৃতি-অধিষ্ঠিত পুরুষ ভোক্তা
হয়। প্রকৃতির মতিনতা অনুসারে সেই প্রতিবিম্ব মলিন হয়, তাহ
দুঃখাত্মক ও মোহাত্মক হয়। পুরুষ তদনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করে
প্রকৃতি সাত্বিক হইলে, তাহার সংযোগে পুরুষ সুখভোগ করে। এই
রূপে পুরুষ সুখদুঃখভোক্তৃত্বে হেতু হয়। এই ভোক্তৃত্বভাবের জ্ঞাত্য
অনীশ আত্মা বদ্ধ হন। “অনীশশচাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃত্বাৎ।” (হেতা
শতর, ১৮)।

ভোক্তৃত্বের কারণ। দূর্শন শাস্ত্রের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে,

যেমন ব্রহ্মজ্ঞান—সৃষ্টির প্রারম্ভে জ্ঞান-অজ্ঞান এই দ্বৈতভাব (law of contradiction) যুক্ত হয়, এবং ইহা হইতেই জাহ্নু-ক্লেম-ভাব হয়, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ, আনন্দ ও নিরানন্দ এই দ্বৈতরূপে বিবর্তিত হইয়া ভোক্তৃভোগ্যভাব হয় । গীতার ইহাকে বন্দ বা বন্দ্যভাব বলা হইয়াছে (৭।২৭-২৮) । এই বন্দ-ভাব দূর করিয়া বন্দ্যাতীত হওয়াই মুক্তি (৪।২০, ১৫।৫) । জীবজ্ঞান এই বন্দের অধীন । ভোক্তারূপে জীবজ্ঞানে আনন্দ নিরানন্দ উভয়ের ছায়া পড়ে বলিয়া সুখ দুঃখ মোহ ভোক্তারূপে অনন্ত প্রকার ভোক্তা হইবার অল্প অনন্ত জীবরূপে ব্রহ্মই বিবর্তিত হন, এবং জীব ভাবে ব্রহ্মই ভোক্তা হন । ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ হেতু জীবের এই ভোক্তৃভাব অনাদি ।

এক অনন্তব্রহ্ম মায়ী হেতু পরিচ্ছিন্ন হইয়া বহু জীব হইলে প্রতি জীব ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ হয় । আনন্দ বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ পরিচ্ছিন্ন হইলেই দুঃখযুক্ত হয়—সুখদুঃখরূপে বন্দযুক্ত হয় । পূর্ণত্বে অপূর্ণতাই পরিচ্ছিন্নতা । এহ অপূর্ণত্ব-বোধই দুঃখ । ইহা পূর্ণ সুখস্বরূপের অভাব বা প্রচ্যুতি-বোধ । এজন্ত জীবের ভোক্তৃত্ব সুখ দুঃখ-বন্দ মিশ্রিত । জীব সুখ দুঃখের ভোক্তা হয়, পূর্ণ আনন্দ ভোক্তা হইতে পারে না ।

ভোগের মূল কাম বা বাসনা । এটি আনন্দস্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি হেতু এই অনন্দস্বরূপের পরিচ্ছিন্নত্ব হেতুই সেই আনন্দস্বরূপ পুনর্লাভ করিবার অল্প জীবের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা, বাসনা বা কামনা-বীজ উপস্থ থাকে । ইহাকে কাম বলে । এই কাম অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে কার্যকারী হয়, আমদের সেই আনন্দস্বরূপে স্থিতি করাইবার চেষ্টা করে । প্রথমে এই কাম, দুঃখ পরিহার ও সুখলাভের ইচ্ছারূপে বিকাশ হয় । শেষে তুমি সুখ ব্যতীত কোন অল্পসুখে আর তাহার চরিতার্থতা হয় না । তখন ক্ষুদ্র সকল সুখের 'কাম' দূর হইয়া যায় ।

অতএব এই ভোগভাব—‘কাম’ ‘বাসনা’ বা ইচ্ছা-মূলক। ইহার মুখভোগের ইচ্ছা, কাম বা বাসনা। আনন্দ-নিরানন্দ-মিশ্রণে এ বাসনা মলিন হয়। বাসনা যত মলিন হয়, আনন্দ তত নিরানন্দময় হয়, তাহা তত দুঃখভোগের কারণ হয়। শাস্ত্র অনুসারে সৰ্ব্বজীবের অনন্তরূপ বাসনা বীজ বা কামনাই সৃষ্টির মূল। সে বাসনা অনাদি বলিয়া সৃষ্টিও অনাদি। বাসনা বীজভাবে থাকিলে সৃষ্টি লীন থাকে, আর কামনা অক্ষুরিত হইতে আরম্ভ হইলে সৃষ্টি আদ্রক হয়। বীজাকুরের প্রবাহের স্থায়, একান্ত জগৎ অনাদি।

প্রলয়ের পর যখন ব্রহ্ম পূৰ্বসৃষ্টির অনুরূপ জগৎ করণা করেন, তখন সেই লীন বাসনা-বীজ, অক্ষুরোন্মুখ হইলে তিনি কামনা করেন “আমি বহু হইব”—

“স অকাময়ত বহু স্তাং প্রজায়েষ ॥” (তৈত্তিরীয়, ২।৬।১)।

এই কাম বা কামনার সম্যক্ অভিব্যক্তির উপরই জগতের প্রতিষ্ঠা—

“কামস্তাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্” (কঠ, (২।১১))

ব্রহ্মই প্রতি জীবের কাম অনুসারে তাহার ভোগ-আয়তন (শরীর) ও ভোগ্য বিষয় সৃষ্টি করেন ; জীব সকল নিদ্রিত থাকিলেও তিনিই তাহাদের প্রত্যেকের কাম অনুসারে তাহাদের শরীরকে নিৰ্ম্মাণ করেন, ধারণ করেন, প্রকৃতিশক্তি দ্বারা সেই শক্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ব্রহ্মই শরীরাদির নিৰ্ম্মাতা হন। যাহার যেরূপ বাসনা বা কামনা, তাহা সেইরূপ শরীর সৃষ্টি করিয়া দেন ও রক্ষা করেন। স্রুতিতে আছে—

“য এষ সৃষ্টেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নিৰ্ম্মমাণঃ ॥”

... তৎব্রহ্ম ... ॥ (কঠ উপনিষদ ৫৮)

অতএব এই কামনা বা বাসনাই ভোগের মূল। তাহা হইতেই জন্মসংসার। ব্রহ্ম ভোগ্যরূপে এ জগৎ সৃষ্টি করিয়া, প্রতি জীবভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, জীবরূপে ভোগী হইয়া তাহা ভোগ করেন, ইহা বলা যাইবে

পারে। এই ভোগবাসনা হইতেই জীব ভোক্তা হয়। তাহা হইতেই প্রকৃতি-সংসর্গে জীব বা পুরুষ সূখ-দুঃখ ভোগ করে ও সূখ-দুঃখ ভোক্তৃত্বের হেতু হয়। শুধু তাহাই নহে। এই ভোগের দ্বারা এই কাম বা বাসনার ক্রম আপুরণ হয়, তাহা ক্রমে শোধিত হইয়া আইসে। বহু জন্ম ধরিয়া ভোগের পর এই কাম শুদ্ধ ও নির্মল হয়। তখন জ্ঞান বিকাশ হইতে পারে। কামদেহ শুদ্ধ না হইলে—কামমানস নির্মল হইয়া মনোময় কোষ শুদ্ধ না হইলে, বিজ্ঞানময় কোষের শুদ্ধি সম্ভব হয় না; এবং আনন্দময় কোষেরও বিকাশ হয় না। বিজ্ঞানময় কোষের বিশেষ বিকাশ না হইলে, জ্ঞানে অমানিষাদি গুণ ও বিকাশের সম্ভব হয় না। অতএব জীব রূপে পুরুষ প্রধানতঃ ভোক্তা। এই ভোক্তৃত্ব-ভাবে ক্রম-আপুরণ হইলে সে জ্ঞাতা হয়। অর্থাৎ জ্ঞানে ভোক্তৃত্ব কীর্ণ হইয়া আসে—জ্ঞাতৃত্বের স্ফূরণ হয়। অতএব এই ভোগই পরিণামে মোক্ষের কারণ হয়। ভোগ হইতে ভোগক্ষয় হয়, কামনা বা বাসনা ক্রমে কীর্ণ হয়, এবং শেষে এই কামনা-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নির্বাপন লাভ চাইতে পারে। এজ্ঞ সাংখ্যদর্শনে আছে—পুরুষের ভোগ ও মোক্ষার্থেই প্রকৃতির প্রবৃত্তি। যাহা হউক, আত্মা ভোক্তা হইলেও কর্তা নহে। কর্তৃত্ব প্রকৃতির, ইহাই গীতার এ স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে।

প্রকৃতির কর্তৃত্বে পুরুষের ভোক্তৃত্ব। আত্মা যে কর্তা ইহা হায়-দর্শনেরই সিদ্ধান্ত। আত্মার ইচ্ছা প্রযত্ন হইতেই করণ ব্যাপার হয়। কিন্তু শক্তি অনুসারে ইচ্ছা-প্রযত্নাদি মনের ধর্ম। সাংখ্যদর্শন অনুসারেও পুরুষ জস্বরূপ। প্রকৃতি-সংযোগে সে 'ভোক্তা' হয়। কখনই সে 'কর্তা' নহে। ইহা বেদান্তেরও সিদ্ধান্ত। গীতারও এস্থলে পুরুষের অকর্তৃত্ব ও প্রকৃতির কর্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার পূর্বে উক্ত হইয়াছে,—

প্রকৃতঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহহমিতি মন্বতে ॥ (৩।২৭)

প্রকৃতির কর্ত্ত্বে অঙ্কারবিমূঢ়াত্মা আপনাকে কর্ত্তা মনে করে ; পুরুষ বাহ্যবিক কর্ত্তা নহে । তাহার স্বদেহে বা স্বক্ষেত্রেও তাহার কর্ত্ত্ব নাই । অজ্ঞান বা মোহ হেতু তাহার কর্ত্ত্ব ভাব হয় । যখন পুরুষ কোন বস্তু গ্রহণাদি করিতে ইচ্ছা করে এবং কন্দ্বেন্দ্রিয়কে নিয়মিত করিতে চাহে, তখন প্রকৃতিই সেই ইন্দ্রিয়কে পরিচালন করাইয়া এই গ্রহণাদিকার্য্য সম্পন্ন করে । আমাদের দেহে নাড়ী দুইরূপ—জ্ঞান-পরিচালক ও বল-পরিচালক । ইহাদিগকে sensory ও motor nerves বলে । এই জ্ঞাননাড়ীর দ্বারা (sensory nerves দ্বারা) যখন কোন বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হয়, তখন কন্দ্বেন্দ্রিয়ের সাহায্যে (motor nerves দ্বারা) আমরা সে বস্তু গ্রহণাদি ব্যাপারে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করি । এই বাহ্যবিষয় প্রকাশ ও বাহ্যবিষয় গ্রহণাদি স্বক্কে কৰ্ম্ম—ইহার কর্ত্ত্ব প্রকৃতির । পুরুষ-সান্নিধ্যে পুরুষের বাসনা অনুসারে অবশ্য প্রকৃতি এইরূপ কর্ত্ত্বী হয়েন । পুরুষের কোন কর্ত্ত্ব নাই । পুরুষ কেবল সেই প্রকৃতির কর্ত্ত্বহেতু কৰ্ম্ম হইতে যে সুখতঃখরূপ অন্ন ভূতি লাভ করে—তাহার ভোক্তা মাত্র হয় । আত্মার 'জ্ঞ'স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিত্তে জ্ঞাতা ও ভোক্তাভাব উৎপন্ন হয় । এই চিত্তবন্ধ পুরুষ চিত্তের এই প্রতিবিম্ব পুনর্গ্রহণ করিয়া জ্ঞাতা ও ভোক্তা হয়, তাহা বলিয়াছি । তাহাতে তাহার প্রকৃত জ্ঞ ও আনন্দস্বরূপ আবরিত হয় । কিন্তু আত্মার সংস্বরূপ চিত্তে প্রতি-বিম্বিত হইয়া চিত্তে কর্ত্ত্ব বোধ হইলেও আত্মা শক্তিস্বরূপ বা শক্তির আধার হইয়াও অকর্ত্ত্বা বা উদাসীন থাকেন ; চিত্তের এই কর্ত্ত্বভাব অবশ্য পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়, নতুবা পুরুষের কর্ত্ত্ব-অভিমান হইত না । এই চিত্তের কর্ত্ত্বভাব প্রকৃতির ; বলিয়াছি ত পুরুষের বাসনা অনুসারে

প্রকৃতির কর্তৃত্ব । প্রকৃতিই ক্ষেত্রের কর্তা পুরুষ ক্ষেত্রজন্মাত্র । পুরুষ কোন কৰ্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিলে প্রকৃতি তদনুসারে স্বতঃ প্রবর্তিত হয় । অথবা ঈশ্বরনিঃসৃত অধিষ্ঠাতৃত্বে এইরূপে প্রবর্তিত হইয়া প্রকৃতি কর্তা হয় । এই শেষ সিদ্ধান্ত গীতার । ইহা বেদান্তদর্শন-সম্মত ।

আর প্রথম সিদ্ধান্ত সাংখ্যদর্শনের । সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ কর্তা নহে, জ্ঞাতা ও ভোক্তা মাত্র । পুরুষের ভোগ ও মোক্ষার্থ প্রকৃতিই স্বতঃ প্রবর্তিত হইয়া কর্তা হইলেন । যাহা হউক, বন্ধ পুরুষের এই জ্ঞাতা, কর্তা বা ভোক্তাভাব—কিছুই বাস্তব নহে ; তাহা ব্যবহারিক (phenomenal) । জ্ঞান ও চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের যে প্রতিবিম্ব, তাহা তদধিষ্ঠিত প্রকৃতিজ চিত্তে পতিত হয়, তাহা হইতে সেই চিত্তেই এই জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তাভাব হয় । পুরুষ আবার সেই চিত্তের প্রতিবিম্ব প্রতিগ্রহণ করিয়া আপনাকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা মনে করে । আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এইরূপে এই জীবের জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তাভাব হয় । যদি কর্তাভাব একেবারে অলৌকিক হয়, তবে জ্ঞাতা ও ভোক্তাভাবও অলৌকিক । একাধে জীবের ভোক্তা ও জ্ঞাতাভাব যেমন অলৌকিক নহে, সেইরূপ এ কর্তাভাবও ঠিক অলৌকিক নহে । তবে এই অহংকার প্রতিষ্ঠিত কর্তাভাব হইতে তাহার যে কর্তৃত্ববোধ—আমিই কৰ্ম্ম করি—এই যে বোধ, তাহাই অলৌকিক । কিন্তু প্রকৃতির উপর প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষের কোন কর্তৃত্ব নাই । প্রকৃতির কার্যের সে কর্তা নহে । প্রকৃতি জীবের ভোগ-মোক্ষার্থ প্রবর্তিত হয় বটে, কিন্তু তাহা জীবের কর্তৃত্বে বা তাহার অধীনে হয় না । সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি স্বাধীনা স্বতঃই প্রবর্তিত হয় । সাংখ্যদর্শনে আছে যে, আমাদের ক্ষেত্রে যে ত্রয়দর্শনবিধ করণ, তাহাদের কার্য্য আহরণ, ধারণ ও প্রকাশ, তাহা দশবিধ (সাংখ্য পারিকা ১২) । এই অণুঃকরণ (চিত্ত) ও বহিঃকরণ

(ইন্দ্রিয়গণই) বিষয় আচরণ করে, প্রকাশ করে, এবং প্রাণন ক্রিয়ার দ্বারা দেহ ধারণ করে । এই করণ সকল পরম্পরের উক্তরূপশক্তি অনুসারে আপন আপন বৃত্তি লাভ করে । পুরুষের ভোগাপবর্গই ইহার হেতু ।

“স্বাং স্বাং প্রতিপত্ত্বন্তে পরম্পরাভূতহেতুকাং বৃত্তিঞ্চ ।

পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্যতে করণম্ ॥” (কারিকা, ৩১ ।)

অতএব সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষার্থ এই সকল করণ প্রবর্তিত হয়, তাহারা আর কাহারও দ্বারা প্রবর্তিত হয় না । পুরুষের ভবিষ্যৎ ভোগ মুক্তি লক্ষ্য করিয়া স্বতঃ, বৎস জন্তু গাভীর স্ততঃ দুগ্ধ ক্ষরণের দ্বারা, তাহারা প্রবর্তিত হয় । পুরুষের বা আর কাহারও কর্তৃত্বে তাহারা প্রবর্তিত হয় না ।

বেদান্ত ও গীতা অনুসারে পুরুষ (জীব) অকর্তা বটে, এবং প্রকৃতির উপর তাহার কর্তৃত্ব নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতি পরমেশ্বরেরই শক্তি । পরমেশ্বরই প্রকৃতিতে নিয়ন্ত্ররূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পুরুষের ভোগ মোক্ষার্থ তাহাকে প্রবর্তিত করেন, পুরুষের নিজ বাসনারূপ ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া দেন,—ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

যাহা হউক, এই সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে এই শ্লোকোক্ত প্রকৃতির কর্তৃত্ব ও জীবের ভোকৃত্ব বুঝিতে পারা যাইবে । এ তত্ত্ব বিশেষভাবে না বুঝিলে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান হইতে পারে না । পরবর্তী শ্লোকে এই ভোকৃত্বের ফল উক্ত হইয়াছে । সে স্থলে এ তত্ত্ব আরও বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে । এতন্ত এ স্থলে তাহার আর বিস্তারিত উল্লেখ নিম্নয়োজন ।



পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চো হি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসম্ভোহস্য সুদসদ্যোনিজন্মসু ॥ ২১

প্রকৃতিতে হয়ে স্থিত, প্রকৃতিজ গুণ—

পুরুষ করয়ে ভোগ ; গুণ-সঙ্গ তার

সদসৎ-যোনি মাঝে জনম কারণ ॥২১

২১। প্রকৃতিতে হয়ে স্থিত প্রকৃতিজ গুণ পুরুষ করয়ে ভোগ—“কি নিমিত্ত পুরুষের ভোক্তৃৎ বা সংসারিত্ব—এই শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে ; ভোক্তা পুরুষ প্রকৃতিকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়াই ভোগ করিতে সমর্থ হয় । এস্থলে প্রকৃতি অর্থে কার্য্য-করণরূপে পরিণত অবিজ্ঞা । এই প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া পুরুষ প্রকৃতিজ গুণ-সমূহকেই ভোগ করে অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহ আকারে পরিণত বা অস্থিভুক্ত বা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণ, তাহাই ভোগ করে । ‘আমি সুখী’ আমি দুঃখী, আমি মূঢ় বা আমি পণ্ডিত এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই পুরুষের প্রকৃতিজাত গুণের ভোগ । ইহাই অবিজ্ঞা । এই অবিজ্ঞার বর্তমান নশায় উপভূজ্যমান সুখদুঃখ-মোহ-রূপ গুণে যে সঙ্গ অর্থাৎ আত্মভাব, তাহাই এই সংসারের উৎপত্তির প্রধান কারণ ।” (শঙ্কর) ।

“পূর্বে পরস্পর-সংসৃষ্ট প্রকৃতি-পুরুষের কার্য্যভেদ উক্ত হইয়াছে । পুরুষ স্বতঃই সুখ স্বরূপ আপন আত্মাতে অনুভূত সুখ-ভোক্তা । তাহা হইলেও সে বৈষয়িক সুখ-দুঃখের উপভোক্তা হয় । কেন হয়, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে । পুরুষ এক অবিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ হইয়াও, প্রকৃতি-সংসৃষ্ট হইয়া প্রকৃতিজাত গুণ—অর্থাৎ প্রকৃতি-সংসর্গ হেতু উপাদিরূপ বা উপচারিক সত্ত্বাদি গুণ-কার্য্যভূত সুখদুঃখাদি গুণ ভোগ করে বা অনুভব করে ।” (রামানুজ) ।

অবিকারী অন্তরহিত পুরুষের এ ভোক্তৃত্বের কারণ কি, তাহা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে । প্রকৃতিস্থ হইয়া, অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য যে দেহ, তাহাতে তাদাত্ম্যভাবে স্থিত হইয়া পুরুষ সেই স্থিতিজন্য প্রকৃতিজনিত সুখদুঃখাদি গুণ ভোগ করে (স্বামী) ।

প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া ; তাহা মিথ্যা । তাহাতে তাদাত্ম্যরূপে উপগত হইয়া পুরুষ প্রকৃতিস্থ হয় । সেই হেতু পুরুষ প্রকৃতিজ গুণ উপভোগ করে বা উপলাভ করে । (মধু) ।

পুরুষ একেবারে অকর্তা নহে । প্রকৃতির অধিষ্ঠানে এবং সুখানি-ভোগে তাহার কর্তৃত্ব । এ স্থলে ইহাই বিবৃত হইয়াছে । চিৎসুখ এক-রস হইয়াও পুরুষ অনাদি কৰ্ম্ববাসনা দ্বারা প্রকৃতি অধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ প্রকৃতিকৃত প্রাণবিশিষ্ট দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠিত ও দেহ-প্রাণ-বিশিষ্ট হইয়া, সেই প্রকৃতি জাত গুণ বা সুখদুঃখাদি ভোগ করে বা অনুভব করে । (বন্দেব) ।

পুরুষের সুখদুঃখাদি ভোগে যে উক্ত হইয়াছে, তাহা জ্ঞানস্বরূপ হেতু সুখস্বরূপ পুরুষের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হয়, তাহাই এস্থলে বুঝান হইয়াছে । স্বরূপতঃ পুরুষ স্থখী ও নির্বিকার হইলেও পুরুষ উচ্চ বা নীচ নানারূপ দেহরূপে পরিণত, প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হইয়া প্রকৃতিজ গুণ অর্থাৎ প্রকৃতিজ গুণকার্য্যভূত সুখদুঃখাদি ভোগ করে । (কেশব)

গুণ-সঙ্গ তার সদসদ্ব্যোনিমাত্রো জনম কারণ—“সংসার-দশায় উপভুজ্যমান সুখদুঃখ-মোহরূপ গুণে যে সঙ্গ আসক্তি বা আশ্রয়, তাহাই তাহার সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মলাভের কারণ । দেবারি যোনি—সদ্ব্যোনি, পশু প্রভৃতির যোনি—অসদ্ব্যোনি, আর মনুষ্যযোনি—সদসদ্ব্যোনি । এই ত্রিবিধ যোনি এ স্থলে উদ্দিষ্ট বলা যায় । এই স্থলে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ অবিদ্যাও গুণসঙ্গ অর্থাৎ কাম এই দুইটিই পুরুষের সংসারদশার কারণ । সংসার হইতে মুক্ত হইতে হইলে এই দুইটিই ত্যাগ করিতে হইবে । এই দুইটি নিবৃত্তির কারণ সম্যাস-সংক্ৰম জ্ঞান ও বৈরাগ্য । ইহাই গীতা-শাস্ত্রের উপদেশ । এই জ্ঞান যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রকে বিষয় করিয়া থাকে, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, এবং ইহা জ্ঞানিয়া যে মোক্ষলাভ করা যায়, তাহাও উক্ত

হইয়াছে । এই জ্ঞান লাভ করিবার উপায় দুইটি—অগ্ন্যপোহ ও অতর্ক্কারোপ । ব্রহ্ম ব্যতীত আর সকলের সত্তার অপলাপই অগ্ন্যপোহ, এবং ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত জড় ব্রহ্মধর্মের আরোপ করা অতর্ক্কারোপ ।” (শঙ্কর) । “তৎ ন সং ন অসৎ” এই জ্ঞানে ব্রহ্মে অগ্ন্য নিবেদন পুরুষ, এবং সর্বতঃ পানিপাদং তৎ, ইত্যাদি দ্বারা অতর্ক্কারোপ দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের উপায় উক্ত হইয়াছে (গিরি) ।

পুরুষ কিরূপে ও কেন প্রকৃতিস্থ হয়, তাহার হেতু এ স্থলে উক্ত হইয়াছে । পূর্ব পূর্ব প্রকৃতি-পরিণামরূপ দেব-মহুয্যাদি যোনিবিশেষে উচিত হইয়া, এই পুরুষ সেই যোনি-প্রযুক্ত সত্ত্বাদি গুণময় স্রুতাদিতে আদৃত হয়, এবং তাহার সাধনভূত পুণ্যপাপ-কর্মে প্রবর্তিত হয় । ভদনস্তর সেই পাপপুণ্যের ফল অনুভব করিবার জন্য অসাধু বা সাধু যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । সেই যোনিতে অবস্থান করিয়া, আবার কর্মারম্ভ করে, আবার সে যোনিত্যাগ করিয়া অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । যতদিন অমানিষাদি আত্মপ্রাপ্তির সাধনভূত গুণ না সেবা করে, ততদিন সে পুরুষ বন্ধ থাকিয়া সংসারে গতায়াত করে । এইরূপে গুণসঙ্গই তাহার সদসদ্ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয় (রামানুজ) ।

এই পুরুষের দেবাদি সদযোনিতে এবং তির্য্যগাদি অসদযোনিতে যে সকল জন্মলাভ হয়, গুণসঙ্গই তাহার কারণ । গুণ অর্থাৎ শুভা-শুভ কর্মকারী ইন্দ্রিয়গণের সহিত যে সঙ্গ, তাহা গুণসঙ্গ (স্বামী) ।

এই প্রকৃতিজ গুণ উপলব্ধহেতু সদসদ্ ও মিশ্র যোনিতে জন্ম হয় । দেবাদির যোনিই সদযোনি, তাহাতে সাত্বিক দৃষ্টকল ভোগ হয় । পশুাদির যোনি অসৎ, তাহাতে অহিত অনিষ্টকল ভোগ হয় । সদসদ্-যোনি ধর্ম্মাধর্ম্মমিশ্রিত হেতু তাহা ব্রাহ্মণাদি মহুয্যযোনি । তাহাতে রাজসিক ইষ্টানিষ্টমিশ্র কলভোগ হয় । এইরূপ বিভিন্নযোনিতে অন্যের

কারণ গুণসঙ্গ । সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক প্রকৃতিতে তাদাত্ম্যের অভিমানেই গুণসঙ্গ । এই গুণসঙ্গ না হইলে স্বতঃ অমল পুরুষের সংসারদশা হইত না । গুণসঙ্গের আর এক অর্থ সুখদুঃখ-মোহাত্মক শব্দাদি বিষয়ে অভিলাষ বা কাম । সেই কাম বা বাসনাই পুরুষের সদসদ্ যোনিতে জন্মের কারণ । প্রকৃতিতে তাদাত্ম্যের অভিমানেই এই কাম বা বাসনার মূল কারণ (মধু) ।

দেবমানবাদি সাধুকর্্মরচিত সদ্যোনিতে ও অসাধু কর্্মরচিত পশু পক্ষী প্রভৃতির অসদ্যোনিতে পুরুষের যে সকল জন্ম হয়, তাহাতে সেই সেই যোনিতে পুরুষের কর্তৃত্বভাবে সংসর্গ হয় । আর অন্যত্র গুণময়স্পৃহাই সে সংসর্গের কারণ (বলদেব) ।

পুরুষ কেন প্রকৃতিস্থ হন, তাহার কারণ এ স্থলে উক্ত হইতেছে । এই পুরুষের সদস্য যোনিতে জন্মের কারণ গুণসঙ্গ । ইহার মধ্যে দেবগণই স্বতঃগুণকার্য্যভূত সদ্যোনি । রক্ষঃ-পিশাচ-পশু-প্রভৃতি তমোগুণ-কার্য্যভূত অসদ্যোনি এবং মনুষ্যাগণ রজঃকার্য্যভূত সদস্যোনি । সেই সেই যোনিতে যথাক্রমে শুভ, অশুভ ও মিশ্র ফল ভোগের জন্য পুরুষের জন্মের কারণ গুণসঙ্গ, অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শরূপাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রিয়ভোগ্যত্ব বুদ্ধিতে মনের অভিনিবেশ । সত্ত্বাদি গুণকার্য্য সুখাদিতে আসক্ত পুরুষ তাহার সাধনভূত পুণ্যপাপাত্মক কর্্মে প্রবর্তিত হয় । তদনন্তর সেই ফলানুভবের জন্য সদস্যোনিতে অর্থাৎ উত্তমাদম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । তদনন্তর সেই দেহে কর্্মারম্ভ করে এবং আবার জন্ম-গ্রহণ করে । এইরূপে যে পর্য্যন্ত না বিষয় ত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষসাধনভূত বিশুদ্ধবুদ্ধিবৈরাগ্যাदि অনুসেবন করে, সে পর্য্যন্ত সংসারে পুরুষের এইরূপ গতায়ত চলিতে থাকে (কেশব) ।

এই শ্লোকে পুরুষের 'প্রকৃতি'স্থ হওয়া, প্রকৃতিজগুণ ভোগ করা, এবং সেই গুণে আসক্তি হেতু নানারূপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করার তত্ত্ব

উক্ত হইয়াছে । ব্যাখ্যাকারগণ এ তত্ত্ব কিরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বুঝা গেল । তথাপি এ তত্ত্ব আরও বিশদ করিয়া বুঝা আবশ্যিক । আমরা বিশেষভাবে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিব ।

বলদেব এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রথমে উল্লেখ করা উচিত । তিনি বলেন, জীব অনাদি ও কৰ্ম্মরূপ অনাদি বাসনাযুক্ত । জীব ভোক্তা, এজন্য ভোগ্যবিষয় স্পৃহা করিয়া তাহার সন্নিহিত অনাদি প্রকৃতিকে আশ্রয় করে । .সং-প্রসঙ্গের দ্বারা ষতদিন সেই সেই বিষয়ে বাসনা ক্ষয় না হয়, ততদিন বিষয় ভোগ করে । বাসনা ক্ষয় হইলে পর-মায়ুধামে সুখ ভোগ করে । শ্রুতিতে আছে, ‘স অশ্রুতে সৰ্ব্বান্ কামান্ ।’ এই অধ্যায়ের ১৯, ২০, ২৯-ও পরের অধ্যায়ে ১৯ শ্লোক হইতে যাহারা আপাততঃ অর্থগ্রাহী সাংখ্যপণ্ডিত, তাঁহারা কেবল প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব বলিয়া থাকেন । কিন্তু যাহারা রহস্যজ্ঞ, তাঁহারা লোষ্ট্র কাষ্ঠবৎ অচেতন প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না । প্রত্যক্ষ উপাদানকে অন্ত অপরোক্ষ-রূপে পরিণত করিবার ইচ্ছা জন্ম যে কৃতিত্ব, তাহাই কর্তৃত্ব । সে কর্তৃত্ব চেতনেরই সম্ভব । শ্রুতিতে আছে “বিজ্ঞানং...কৰ্ম্মাণি তত্ত্বতে... । এস হি দ্রষ্টা...কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ।” (তৈত্তিরীয়, ২।৫।১) । অনেকে বলেন, পুরুষ-সন্নিধানেই প্রকৃতিতে চৈতন্যাদ্যাস হয় বলিয়া সেই অধ্যাত্ম চৈতন্য হেতু প্রকৃতির কর্তৃত্ব হয় । ইহাও তত্ত্ব নহে । সেই প্রকৃতির তৎসন্নিহিত চৈতন্যযুক্ত পুরুষের কর্তৃত্বের অধ্যাস মাত্র ; এই অধ্যাস স্বীকার করিলে, ইহাও বলা যাইতে পারে, তপ্ত লোহের যে দাহ করিবার শক্তি, তাহার যেমন লোহ হেতু, সেইরূপ অগ্নিও হেতু । জল চলিতেছে বলিলে জলের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না । জলে অন্তর্যামী আত্মার অধিষ্ঠান হেতুও তাহার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না । শ্রুতি স্মৃতিতে যে স্বর্গাদি ফলমোক্কক জ্যোতি-ষ্ঠৌম প্রভৃতি কৰ্ম্ম ও মোক্কসাধক ধ্যানাদি বিহিত, তাণ্ডা জড় প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া বিহিত হয় নাই । প্রকৃতি যে চেতন ভোক্তা পুরুষের

উদ্দেশে নিজ কর্তৃত্বে এইরূপ কৰ্ম করিবে, তাহাও সম্ভব নহে । অতএব পুরুষেরই কর্তৃত্ব । তবে গীতার প্রকৃতির কর্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে কেন ? সে কেবল প্রকৃতির এই কৰ্মবৃত্তির প্রাচুর্য জ্ঞা । যেমন বাহ্যিক বস্তু গ্রহণকারী পুরুষে—বাহু গ্রহণ করিতেছে, এইরূপ ব্যপদেশ বা ব্যবহার হয়, সেইরূপ প্রকৃতি দ্বারা কৰ্মকারী পুরুষে প্রকৃতি কৰ্ম করিতেছে এইরূপ ব্যপদেশ হয় । অতএব অর্থ এই যে, প্রকৃতি হইতে দেহাদি দ্বারা যুক্ত পুরুষেরই বস্ত্র যুদ্ধাদি কৰ্ম কর্তৃত্ব, প্রকৃতি-বিমুক্ত স্বচ্ছ পুরুষে কর্তৃত্ব নাই, ইহা বুঝাইতেই প্রকৃতির কর্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে ।”

পুরুষ অকর্তা—আমরা পূর্বেশ্লোকের ব্যাখ্যা দেখিয়াছি যে, সাংখ্য, বেদান্ত ও গীতা অনুসারে পুরুষ অকর্তা, প্রকৃতি কর্তা । কেবল শ্রীমদ্ভগবদ্দর্শন অনুসারে পুরুষ বা আত্মা কর্তা । বলদেব এই শ্রীমদ্ভগবদ্দর্শনই গ্রহণ করিয়াছেন, ও এই মত সমর্থন করিয়াছেন । গীতা অনুসারে যে পুরুষ অকর্তা—সর্বাবস্থায়ই অকর্তা এবং অকর্তা হইয়াই ভোক্তা, তাহা পূর্বে ১৯, ২০শ শ্লোকে ইঙ্গিত করা আছে, কিন্তু পরবর্তী ২৯শ শ্লোকে ও ১৪শ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকে তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । আর প্রকৃতিগুণের দ্বারা সমুদয় কৰ্ম হইলেও অহঙ্কারবিমুক্ত আত্মা পুরুষ আপনাকে কর্তা মনে করে, ইহাও ৩২শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । অতএব বলদেব যাহাই বলুন, গীতা অনুসারে পুরুষ অকর্তা বটে । সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ অকর্তা । সাংখ্যদর্শনে আছে, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন পুরুষের প্রয়োজনসাধন জ্ঞা নিজ নিজ বৃত্তি আহরণ ধারণ ও প্রকাশরূপে কৰ্ম করে । অন্তঃকরণ কাহারও দ্বারা কার্যকর্তৃত্বে নিয়োজিত হয় না (সাংখ্যকারিকা, ৩১) । সাংখ্যদর্শনে আরও উক্ত হইয়াছে যে, উদাসীন (অসঙ্গ) পুরুষ প্রকৃতির গুণকর্তৃত্বেই কর্তার ভাব হয় (কারিকা, ২০) । চিত্তে অহঙ্কারের কর্তৃত্ব পুরুষে প্রতিবিধিত হয়, পুরুষ তাহাতে সঙ্গিত হয় মাত্র । সাংখ্যশাস্ত্রে আরও

‘অহঙ্কারঃ কর্তা ন পুরুষঃ’ (৯।৫৫) । ও ‘উপরাগাৎ কর্তৃৎ
চিংসান্নিধ্যাৎ ।’ (১।১৬৫) ।

বেদান্ত-দর্শনেও এই কথা আছে । যথা—

“অকর্তা বিজ্ঞাতা ভবতি ।” (ছান্দোগ্য, ৭ ৯।১) ।

“অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহকর্তা ।” (খেতাশ্বতর, ১।৯) ।

আত্মা অক্রতু (খেতাশ্বতর, ৩।২০) । বেদান্ত অনুসারে ভূতাত্মাই

(অহঙ্কার বিমুক্ত আত্মা) কৰ্ম্ম করে (মৈত্রায়ণী, ৩।৩) । প্রকৃত কর্তা

‘প্রধান’ বা প্রকৃতি (মৈত্রায়ণী ৬।১০) । বেদান্তে অশ্রুত আছে যে, কামই

কর্তা । “কামঃ কর্তা কামঃ কারয়িতা ।” (মহানারায়ণ, ১৮।৬)

“কামঃ অকার্ষীৎ ন অহং করোমি কামঃ করোতি, কামঃ কর্তা, কামঃ

কারয়িতা ।” (মহানারায়ণ, ১৮।২) এই কাম মনের স্বরূপ, তাহা

পূর্বে উক্ত হইয়াছে (বৃহদারণ্যক, ১।৫।৬) । এই কাম অনুসারেই কৰ্ম্ম

হয়, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। শ্রুতিতে আছে—‘স যথা কামো ভবতি

তৎ কৰ্ত্ত্বম্ভবতি, তৎ কৰ্ম্ম কুরুতে, তদভিসম্পদাতে ।’ (বৃহদারণ্যক,

৪।৪।৫) । অতএব গীতা, বেদান্ত ও সাংখ্যমতে পুরুষ অকর্তা । অবশু,

উপনিষদে অনেক স্থলে আত্মাকে কর্তা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ আমরা

পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব । গীতায় ভগবান্ আপনাকে অনেক স্থলে,

কর্তা অর্থাৎ এই জগৎকর্তা বলিয়াছেন, অথচ উপদেশ দিয়াছেন যে,

তাহাকে অব্যয় অকর্তারূপে জানিতে হইবে (৪।১৩) । তাহার অধ্যক্ষ-

তায় প্রকৃতি এই জগৎ প্রসব করে (গীতা ৯।১০) । একত্র বলিতে

পারা যায় যে, পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্তা, প্রকৃতিই কৰ্ম্ম করে, পুরুষে কর্তৃৎ

ঔপচারিক । প্রকৃতির কর্তৃত্বে সেই কর্তৃত্ব পুরুষে আরোপিত ।

যাহা হউক, আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব যে, এই কর্তৃত্ব ঠিক

ঔপচারিক নহে । পুরুষ অর্থাৎ পর পুরুষ ও পরম পুরুষ স্বরূপতঃ

অকর্তা হইয়াও কর্তা । তবে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষ সম্বন্ধে কর্তৃত্ব প্রকৃতিরই ।

পুরুষ অভিমানবশে আপনাকে কর্তা মনে করে। এই প্রকৃতিবদ্ধ ব্যবহার পুরুষ অকর্তা হইয়াও কিরূপে ভোক্তা হইতে পারে, এবং প্রকৃতির কর্তৃত্ব আপনাতে আরোপ করে, তাহা পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহা এ স্থলে আরও বিশদভাবে বুঝার প্রয়োজন।

পুরুষ অকর্তা হইয়াও ভোক্তা।—পুরুষকে অকর্তা বলিলে আপত্তি হইতে পারে যে, পুরুষ যদি কর্তা না হন, তবে কিরূপে ভোক্তা হইতে পারেন, কিরূপে কর্মফল ভোগ করেন? কিরূপে তাহার কর্ম-বন্ধন হয়? প্রকৃতি কর্ম করিবে, আর পুরুষ তাহার ফল ভোগ করিবে? একের কর্মে অপরে ভোক্তা হইবে—ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন-সম্মত উত্তর এই যে, অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানই ইহার মূল। এই অজ্ঞানহেতু পুরুষ প্রকৃতিবদ্ধ থাকে। প্রকৃতিতে পুরুষের আত্মাধ্যাস হয়। একজ্ঞ পুরুষ প্রকৃতির গুণ ভোগ করে, প্রকৃতির কর্তৃত্ব প্রকৃতিজ অহংকারবশে আপনাতে আরোপ করে। আরোপস্থলে বাস্তবের গ্রাম ব্যবহার হয়। ভ্রমহেতু রজ্জুতে সর্পের আরোপ হইলে, তদনুসারে ব্যবহার হয়। আরও এক কথা, অধ্যাসহেতু একের কর্ম ও ভোগ অপরে আরোপিত হইতে দেখা যায়। বাহার পুত্রে আত্মাধ্যাস হয়, সে পুত্রের কর্ম আপনীর কর্ম মনে করে, সে পুত্রের সুখ-দুঃখ-ভোগ আপনাতে আরোপ করে। অতএব যদি অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান স্বীকার করা যায়, তবে এই তত্ত্ব বুঝিবার গোল হয় না।

পুরুষ যে প্রকৃতিতে স্থিত হইয়াই ভোক্তা হয় এবং প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে, তাহা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে।

“আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেন্দ্ৰিয়াহম্নীষিণঃ ।”

(কঠ উপঃ ৩।৪ ।

এই আত্মা অর্থে এ স্থলে বুদ্ধি । অতএব শ্রুতি অনুসারে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়সংযোগই পুরুষের ভোকৃত্বের হেতু । তাহা হইতে সুখ-দুঃখ-ভোগ হয় । সাংখ্যদর্শন অনুসারেও এই প্রকৃতি-সংযোগই পুরুষের ভোকৃত্বের হেতু । এই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা । প্রকৃতির সত্ত্ব-রজঃ ও তমঃ, তাহা গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে । সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ, রজোগুণের স্বভাব কর্ষ, আর তমোগুণের স্বভাব এই প্রকাশ ও কর্ষকে আবরণ বা অভিভূত করা । প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অন্তঃকরণে বা চিত্তে, এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে সুখ, দুঃখ ও মোহ-রূপ গুণের উৎপত্তি হয় । তাহা হইলে সুখ লাভ ও দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রধানতঃ মনের ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতি ধর্মের বিকাশ হয় । তাহা হইতে চঞ্চলস্বভাব রজোগুণবশে কর্ষে প্রবৃত্তি হয় । কাম বা ভোগেচ্ছা চরিতার্থ জন্মই কর্ষে প্রবৃত্তি । এই ভোকৃত্ব চৈতন্যের । প্রকৃতিতে পুরুষ অধিষ্ঠিত বলিয়া প্রকৃতি চৈতন্যভাসবৃত্ত হইয়া প্রথমে ভোকৃত্ব-ভাবে আভাসবৃত্ত হয় । সেই ভাব পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া পুরুষ ভোক্তা হয় । পুরুষ, ভোক্তা হয় বলিয়া তাহার কর্তৃত্বভাবও হয় । প্রকৃতির কর্তৃত্ব তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া পুরুষে কর্তৃত্বের জ্ঞান হয় । প্রকৃতিতে চিত্তের কাম, অথবা ভোকৃত্ব, কর্তৃত্ব সকলই পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইলে, পুরুষ তাহা গ্রহণ করে । প্রতিবিম্বিত হইলেও বাহ্য চিত্ত নিশ্চল, যে জ্ঞানী, সে তাহাতে আসক্ত হয় না ; কিন্তু বাহ্য চিত্ত মলিন, যে অজ্ঞানযুক্ত, তাহার তাহাতে আসক্তি হয় । এই আসক্তিই সংসারের কারণ । তাহা পরে বুঝিব । এইরূপে পুরুষে যে প্রকার কাম বা বাসনার অধ্যাস হয়, যেসকল কর্তৃত্বের ইচ্ছা হয়, প্রকৃতি তদনুসারে কর্ষ করে বা কর্ষে প্রবৃত্তিত হয় । একত্র অহঙ্কারবশে পুরুষ আপনাকে কর্তা মনে করে । এইরূপে ত্রাণ কর্তৃত্ব-বুদ্ধিতেই পুরুষ কর্ষফলভোক্তা হয় । আবার এই ভোকৃত্বভাব হয় বলিয়াও তাহার

কর্তৃত্বভাব হয় । তাহার উক্তরূপে চিন্তে অভিব্যক্ত কোনরূপ কাম বা বাসনা উৎপন্ন হইবামাত্র প্রকৃতি তদনুরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হয় বলিয়াই পুরুষের কর্তৃত্ব-বোধ হয় । আর সেই কর্ম সাধিত হওয়ায় যে সুখ-দুঃখ বা মোহ হয়, তাহা সে ভোগ করিয়া আপনাকে নিজকৃত কর্মের ফল-ভোক্তাও মনে করে ।

সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুরুষের জন্ত কর্ম করে এবং সেই কর্ম দ্বারা পুরুষকে বদ্ধ রাখে । যদি আমার কোন বস বা ভৃত্য আমার অভিপ্রায় জানিয়া আমার প্রয়োজনার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কর্ম করে, তবে সে কর্মফল আমার । সেনাগণের জয়ে সেই সেনাপতি বা রাজারই জয় গণ্য হয় । যেমন একজন অপরের জন্ত পাক করে এবং সেই অপর তাহা ভোগ করে, (সাংখ্য মূল, ২।১০৩) সেইরূপ প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুরুষের ভোগমোক্ষার্থে কর্ম করে বলিয়া পুরুষই সে কর্মফল ভোগ করে । বৎসের পানের জন্ত গাভীর স্বাভাবিক যে দুগ্ধ স্রবণ হয়, গাভী যে তৃণাদি আহার করে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ দুগ্ধে পরিণত হয়, আর সে দুগ্ধ সেই বৎসই ভোগ করে, গাভী তাহা ভোগ করে না । এইরূপে প্রকৃতির কর্ম হইতে যে ফল হয়, তাহা পুরুষে ভোগ করিতে পারে । সাংখ্যদর্শনে আছে,—উপকারিণী শৃগবতী প্রকৃতি নানা উপায় দ্বারা নিত্য নিগুণ পুরুষের ভোগমোক্ষার্থে প্রয়োজন, নিজ প্রয়োজন বিনাও সাধন করে (কারিকা, ৬০) ।

আরও এক আপত্তি । চৈতন্যই যেমন ভোক্তা হয়, জড়ে ভোক্তৃত্ব থাকিতে পারে না, সেইরূপ চৈতন্য ব্যতীত কর্মে প্রবর্তনা থাকিতে পারে না । সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষের চৈতন্য প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা বলিয়াছি । অন্তঃকরণে পুরুষের চৈতন্যে চৈতন্যযুক্ত হইয়া কর্তৃত্বের ও কর্মের হেতু হয় । এই প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই প্রকৃতির কর্মপ্রবর্তক, তাহা দ্বারাই প্রকৃতির কর্তৃত্ব । প্রকৃতিকৃত কর্মের ফল বা কর্মবন্ধন

সেই অন্তঃকরণকেই আশ্রয় করে । চিত্তেই সংস্কার-বীজ উৎপন্ন হয় । পুরুষে সেই অন্তঃকরণেরই প্রতিবিম্ব পড়ে এবং পুরুষ তাহা গ্রহণ করে বলিয়া অন্তঃকরণের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করে । এইরূপে সে প্রকৃতির কর্তৃত্বে যে কর্ম হয়, তাহার ফল ভোগ করে । এইরূপে পুরুষ অকর্তা হইয়াও কর্তা ও কর্মফলভোক্তা হয় । পুরুষ অকর্তা হইয়াও অবিবেক হেতু ভোক্তা হয় (সাংখ্য মূল ১।১০৪) । সে প্রকৃতির জ্ঞান ভোগ করে । চিত্ত সাত্বিক হইলে পুরুষকে সাত্বিক বলে, চিত্ত রাজসিক হইলে পুরুষকে রাজসিক বলে, আর চিত্ত তামসিক হইলে, পুরুষকে তামসিক পুরুষ বলে । গীতার পরে ইহা বিবৃত হইয়াছে । সাত্বিক পুরুষ প্রধানতঃ সুখ ভোগ করে, রাজসিক পুরুষ প্রধানতঃ দুঃখ ভোগ করে । অতএব এই কর্মফল হেতু অন্তঃকরণে যে সুখদুঃখাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, পুরুষই তাহা ভোগ করে ।

পুরুষ-প্রকৃতি-যোগ—অতএব পুরুষ অকর্তা, উদাসীন ও অসঙ্গ হইলেও প্রকৃতিস্থ বা প্রকৃতি সংযুক্ত হইয়া প্রকৃতির জ্ঞান ভোগ করে । এখানে কথা হইতেছে, পুরুষ কিরূপে প্রকৃতিস্থ হয় ? এই প্রকৃতির অর্থ গীতা অনুসারে অষ্টধা ভিন্ন অপরা প্রকৃত ও পরাপ্রকৃতি । এই প্রকৃতিতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও রূপরসাদি পঞ্চতন্মাত্র — ইহাই অষ্টধা অপরা প্রকৃতি । আর প্রাণই পরাপ্রকৃতি, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । পুরুষ এই প্রকৃতিতে স্থিত হয় । সাংখ্যদর্শন অনুসারেও বুদ্ধি, অহঙ্কার ও অহঙ্কার হাতে উৎপন্ন মন ও পঞ্চতন্মাত্র—এই আটটি লিঙ্গশরীরের উপকরণ । “মহদাদি সূক্ষ্ম-পর্য্যন্তং লিঙ্গম্” (সাংখ্যকারিকা ৪০) । ইহার অর্থ “মহদাদি বুদ্ধিরহংকারো মন ইতি, পঞ্চতন্মাত্রাণি সূক্ষ্মপর্য্যন্তম্ ইতি তন্মাত্রপর্য্যন্তম্” (গৌড়পাদ কারিকা) । এ স্থলে এ অষ্টধা অপরা প্রকৃতিই—বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চতন্মাত্রযুক্ত (বা ভূমি, অপ, অনল, বায়ু, আকাশ—এই পঞ্চ-ভূতের বাহা সূক্ষ্ম অবিশেষ রূপ তাহা যুক্ত)—এই লিঙ্গশরীর । মন

ইন্দ্রিয় এই মনেরই বিকার বা মনেরই পরিণাম । এজন্ত উক্ত আটটির সহিত এই দশ ইন্দ্রিয়—সর্বশুদ্ধ এই অষ্টাদশটি সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরের অন্তর্গত লিঙ্গশরীরের উপাদান । পুরুষ পরাপ্রকৃতিযুক্ত হইয়া ইহাতেই অবস্থিত হয় । এই প্রকৃতিতে বা লিঙ্গশরীরে অধিষ্ঠিত পুরুষই জীব (monad) । এবং এই লিঙ্গশরীরই সংসার-দশায় জীবের বীজ (neucleus) । ইহাই পরাপ্রকৃতি যোগে পিতামাতা হইতে দৈহিক উপাদান গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মশরীর-যুক্ত হইয়া, জন্মগ্রহণ করে এবং এই শরীরের দ্বারা কর্ম ও কর্মফল ভোগ করে ; আর সেই কর্মফলই সংস্কাররূপে লিঙ্গশরীরে উৎপন্ন হয়, ও প্রতি পুরুষের লিঙ্গশরীরকে অন্য পুরুষের লিঙ্গশরীর হইতে ভিন্ন করিয়া দেয় । এইরূপে সূক্ষ্মশরীরে কৃতকর্ম হইতে সূক্ষ্মশরীর সংস্কারযুক্ত হইয়া বিশিষ্ট হয়, এবং সেই সংস্কারযুক্ত লিঙ্গশরীরই আবার সেই সংস্কারানুযায়ী সূক্ষ্মশরীর গ্রহণ করে । আবার সে সূক্ষ্মশরীর ত্যাগ করিয়া আবার সেই সূক্ষ্মশরীরের কর্ম অনুসারে সংস্কার লইয়া লিঙ্গশরীর আরও বিবর্তিত হয়, এবং তদনুসারে আবার নূতন শরীরগ্রহণ হয় । এইরূপে সংসারে পুনঃ পুনঃ নানা জাতীয় সূক্ষ্মশরীর গ্রহণ করিতে হয় । কিন্তু বরাবর সূক্ষ্মশরীর একই থাকে, কেবল তাহা বিভিন্ন জন্মের সংস্কার দ্বারা কিছু রূপান্তরিত—বর্জিত হয় এইমাত্র । ইহারই ফল এই প্রকৃতির বা লিঙ্গশরীরের আপূরণ অর্থাৎ লিঙ্গশরীর উপযুক্তরূপে নানা সূক্ষ্মশরীর ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিয়া ক্রম-আপূরণিত হইতে থাকে, এবং তাহার ফলে জাত্যন্তরপরিণাম হয় (পাতঞ্জল দর্শন) । এইরূপে তৃণ হইতে ক্রমে পক্ষী প্রভৃতির যোনি, ক্রমে জন্তু প্রভৃতির যোনি বা সূক্ষ্মশরীর গ্রহণ হয়, এবং যখন পশুযোনি লাভ করিয়া সূক্ষ্মশরীরের একরূপ সংস্কার উৎপন্ন হয়, যে তাহা মানবযোনি ব্যতীত উপযুক্তরূপে অকুরিত ও পরিণত হইতে না পারে, তবে ক্রমে

সেই লিঙ্গশরীর মানবশরীরই গ্রহণ করে । মানবজন্মও পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে করিতে লিঙ্গশরীরের সংস্কাররাশি ক্রমে শুদ্ধ হইতে থাকে, ক্রমে উন্নত মানবধোনি-গ্রহণ হয়, শেষে এই সংস্কার-শোধিত হইয়া নৃশরীর বা িত্ত নিৰ্ম্মণ হইলে, উচ্চতর ব্রাহ্মণাদির কুলে জন্মগ্রহণ হয়—এবং জ্ঞান লাভ হইলে মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইয়া যায় ।

অতএব এই শ্লোকোৎপন্ন অসক্ৰ নিম্নত নিত্য লিঙ্গশরীরই জ্ঞান, অজ্ঞান, ধর্মাধর্ম, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐর্ষ্যা, অনৈর্ষ্যা এই অষ্টবিধ ভাবের দ্বারা ‘অধিবাসিত’ হইয়া সংসারে গতাগত করে (সাংখ্যকারিকা, ৪০) । এই সকল ভাব বিনা লিঙ্গশরীর থাকিতে পারে না, আর লিঙ্গশরীর ব্যতীতও ভাবের নিবৃত্তি হয় না । এরূপ অর্থ দ্বিবিধ ;—লিঙ্গাখ্য ও ভাবাখ্য (কারিকা ৫২) । এই সকল ভাব লিঙ্গশরীরেরই ধর্ম । এই সকল ভাবের মধ্যে শেষ সাতটি বন্ধন কারণ ; কেবল জ্ঞানই মুক্তির কারণ (কারিকা, ৬৩) ।

সদসদ্ যোনিতে জন্ম—এ স্থলে যে সদসদ্ যোনিতে এইরূপ পুরুষের জন্মগ্রহণের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা এইরূপে বুঝিতে হইবে । সাংখ্য-দর্শন অনুসারে এই যোনি ত্রয়োদশ প্রকার । উর্দ্ধে সম্ভবিশাল লোকে দেবধোনি অষ্টবিধ । মধ্যে রজোবিশাল মনুষ্যালোকে মনুষ্যধোনি এক প্রকার, এবং তমোবিশাল অধোলোকে পশুপক্ষ্যানির যোনি পঞ্চবিধ (সাংখ্যকারিকা, ৫৩, ৫৪) । সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃত পক্ষে বা পারমাধিক অর্থে এই লিঙ্গশরীরেরই সংসরণ বা উক্তরূপে সংসারে গতাগতি হয় । পরন্তু পুরুষের কোনরূপ গতাগতি নাই । তবে এই লিঙ্গশরীরহিত বলিয়া পুরুষের এই সংসরণ বোধ হয় । ইহা অজ্ঞানের ফল । নতুবা পুরুষ বদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না, সংসরণ করে না । মানা আশ্রয়যুক্ত প্রকৃতিই (লিঙ্গশরীরই) এইরূপে সংসরণ করে, বদ্ধ হয়, মুক্ত হয় । (সাংখ্য-কারিকা, ৬২) । এইরূপে চৈতন্যযুক্ত পুরুষ

প্রকৃতিস্থ হইয়া জরামরণাদিজনিত দুঃখ ভোগ করে । যে পর্য্যন্ত লিঙ্গশরীরের নিবৃত্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত বার বার জন্ম ও দুঃখভোগ স্বাভাবিক (কারিকা, ৫৫) ।

সদসদ্ যোনিতে জন্মের কারণ যে কর্ম ও কর্মজ সংস্কার, তাহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে । যথা,—তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যোরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়-যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা অন্ত য ইহ কপুণ্ণচরণা অভ্যাসো হ যত্তে কপুণ্ণাং যোনিম্ আপদ্যোরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিম্ ।’ (ছান্দোগ্য উপঃ, ৫।১০।৭) ।

কিরূপে মৃত্যু হয় ও কিরূপে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম হয়, তাহা উপনিষদে দহর বিদ্যা ও পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপদেশস্থলে বিবৃত হইয়াছে । দহর বিদ্যা পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে । এতদে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন । পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উল্লেখও অনাবশ্যক । যাহারা ইহা জানিতে চাহেন, তাহারা ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম ব্রাহ্মণের চতুর্থ হইতে নবম খণ্ড দেখিবেন ।

এইরূপে পুরুষের সহিত অপরা প্রকৃতির সংযোগ যতদিন থাকে, যতদিন পুরুষ এই অন্তঃকরণ বা চিত্ত ও পঞ্চতন্ত্র বা সূক্ষ্ণভূতরূপ অষ্টধা অপরা প্রকৃতি বা লিঙ্গশরীরযুক্ত থাকে, ততদিন এই প্রকৃতিস্থ গুণে যে কর্ম হয়, এবং তদনুসারে যে ভোগ হয়, তাহা আপনাতে গ্রহণ করিয়া ভোক্তা হয় । যতদিন জ্ঞান না হয়, ততদিন এই ভোগে আসক্তি থাকে, তাহার গুণসঙ্গ থাকে, এবং তাহাই তাহার সদসৎ যোনিতে জন্মের প্রতি কারণ হয় । যখন জ্ঞানরূপ ভাব লিঙ্গশরীরে বুদ্ধিতত্ত্বে বিকাশিত হইয়া, সেই জ্ঞানের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, পুরুষ আপনার স্বরূপ দেখিতে পায়, তখন আর এই ভোগে আসক্তি থাকে না ; তখন আর গুণে সঙ্গ হয় না ; পুরুষ আপনাতে

অকর্তা, অভোক্তা, উদাসীনরূপে দেখিতে পায়। তখন পুরুষ প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিতে পারে, তখন প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকতাব তাহার লাভ হয়। সেই জ্ঞান হইলে পুরুষ কর্তৃক প্রকৃতি দৃষ্ট হইলে প্রকৃতি পুরুষকে তাগ করে, আর প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ থাকে না (কারিকা ৬১)। এজন্য জন্মগ্রহণ হয় না,—মুক্তি হয়।

পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে ক্লেশমূল কর্মাশয় বা ধর্মাধর্মরূপ কর্মের সংস্কার, এবং তাহার বিপাকই বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ, আয়ু ও ভোগের মূল। “ক্লেশ-মূলঃ কর্মাশয়ঃ সতি মূলে জাত্যাযুর্ভোগঃ।” (পাতঞ্জলদর্শন, .২.১২-১৩) ব্যাসভাষ্যে আছে—কর্মাশয়—কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ-প্রসূত। ইহারাি বিভিন্ন যোনিতে জন্মের কারণ।

অতএব পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে, ও প্রকৃতিজ গুণে আসক্ত হয় এবং এই ভোগে আসক্তিহেতু, অর্গাং লিঙ্গশরীরের সহিত ভাদাখ্যাহেতু তাহার সদগদ্যোনিতে জন্মগ্রহণ হয়, এবং এইরূপে সংসারে বার বার গত্যাত করিতে হয়।

পুরুষেব প্রকৃতিস্থ হইবার কারণ।—এই প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ কিরূপে হয়, পুরুষ কিরূপে প্রকৃতিস্থ হয়, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, অকর্তা, অভোক্তা, উদাসীন এবং সর্বরূপ প্রকৃতিধর্মবিরহিত হইলেও, অনাদিকাল হইতেই প্রকৃতিবদ্ধ। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ অনাদিকাল হইতে স্বতঃসিদ্ধ। পুরুষ পরিণামে অজ্ঞানমুক্ত হইয়া জ্ঞানবলে প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত হইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার এ প্রকৃতি সহ সংযোগ অনাদি। যাহা অনাদি, তাহার আর কোন কারণ অনুসন্ধান নিরর্থক। এই প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগই জগতের মূল কারণ, ইহার অন্য কারণ নাই। এ সংসার অনাদি; কেন না, এ প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ অনাদি। অতএব পুরুষ প্রকৃতির সহিত অনাদিকাল হইতে বদ্ধ। সাংখ্য-

দর্শন অনুসারে এই প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ অক্ষুণ্ণ—পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্ত । পুরুষকে আপনার স্বরূপ দেখাইবার জন্ত, পুরুষের ভোগ প্রদান জন্ত এবং গুণ-আপূরণ দ্বারা তাহার অভ্যাস ও নিঃশ্রেয়স-সাধন জন্ত প্রকৃতি প্রবর্তিত হয় (কারিকা ২১) । প্রকৃতির এ কার্য স্বার্থের জ্ঞান হইয়াও পরার্থ ।

“ইত্যেব প্রকৃতিকৃতো মহাদাদি বিশেষভূতপর্যন্তঃ ।

প্রতিপুরুষবিমোক্ষায় স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ ॥”

(কারিকা, ৫৬) ।

প্রকৃতি লোকের জ্ঞান উৎসুক হইয়া পুরুষের ভোগ-মোক্ষার্থই প্রধানতঃ প্রবর্তিত হয় (কারিকা, ৫৭, ৫৮) । প্রকৃতি নানারূপ উপায়ে পুরুষের উপকার করে, নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে (কারিকা, ৬০) । ক্রমে পুরুষের নিকট নিখিল জ্ঞান প্রকাশ করে । তখন পুরুষ জানিতে পারে যে, ‘ন অস্মি, ন মে, ন অহং’ (কারিকা, ৬৪) । তখন অভিমান দূর হয়, অষ্টভাবের মধ্যে সপ্তভাব নিবৃত্ত হয় (কারিকা, ৬৫), কেবল জ্ঞান হেতু মুক্তি হয় । অতএব প্রকৃতিই যেমন পুরুষের বন্ধনের কারণ, সেইরূপ পুরুষের মুক্তিরও কারণ । প্রকৃতি পুরুষকে মুক্ত করিবার জন্তই প্রবর্তিত । যাহা হউক, এক্ষেপে কদাচিত্ কোন পুরুষ মুক্ত হইতে পারে । কাজেই অনন্ত বন্ধ পুরুষের মুক্তির জন্ত সংসার অনন্তকাল থাকিবে, প্রকৃতি অনন্তকাল প্রবর্তিত হইবে । “আত্মার্থ প্রকৃতি যে সৃষ্টি করে” (সাংখ্য সূত্র, ২.১১) তাহাতে প্রকৃতির স্বার্থ যে একেবারে নাই, তাহা বলা যায় না । তাহা হইলে প্রকৃতি পুরুষের অক্ষুণ্ণ সংযোগ নিরর্থক হয় । পুরুষের সন্নিধানে চৈতন্যযুক্ত হইয়া, প্রকৃতি পুরুষকে আপনার অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তি, তাহার কর্তৃত্বাদি অনন্তরূপে দেখাইতে চাহে । দ্রষ্টার দর্শনেই দৃষ্টের চরিতার্থতা । দ্রষ্টার দর্শনহেতু আনন্দ লাভ করাই

দৃষ্টের স্বার্থ । তাহার আর অন্য স্বার্থ থাকিতে পারে না । কিন্তু সাংখ্য-
সূত্রে আছে যে, স্বভাবতঃ মুক্ত পুরুষ যে বদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে মুক্ত
করাই প্রকৃতির স্বার্থ (২।১) ।

অতএব সাংখ্যদর্শন হইতে জানা যায় যে, পুরুষ অনাদি কাল হইতেই
প্রকৃতিবদ্ধ, প্রকৃতিস্থ । যদি আদিতে পুরুষ মুক্ত থাকিয়া পরে প্রকৃতিবদ্ধ
হইত, তবে মুক্তির সার্থকতা থাকিত না । মুক্ত হইয়াও আবার পুরুষ
বদ্ধ হইতে পারিত । অতএব এই প্রকৃতি-পুরুষ-যোগ অনাদি । তাহার
অন্য কারণ নাই ।

“ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্ত ত্বুযোগং তদেযোগাদৃতে ।

(সাংখ্য সূত্র, ১।১৮) ।

সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত এইরূপ । প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর অনাদি কাল
হইতে সংযুক্ত থাকায়, পুরুষের প্রকৃত হইতে নিজের পার্থক্য বোধ
থাকে না । ইহাই অবিবেক । ইহাও সূত্রাং অনাদি বিবেক-জ্ঞানের
উদয় পর্য্যন্ত স্থায়ী । কিন্তু বেদান্তদর্শন অনুসারে, এবং গীতা অনুসারেও,
প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ অজ্ঞান বা অবিচ্যাজনিত । এই
জ্ঞান বা অজ্ঞান সাংখ্যোক্ত বুদ্ধিজ্ঞান বা অজ্ঞান মতে এবং ইহা
বুদ্ধির ধর্ম বা স্বরূপও নহে । এই চিত্তস্থ অজ্ঞান, পুরুষে প্রতিবিম্বিত
হইয়া তাহাকে অজ্ঞানযুক্ত করে না । প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া পুরুষ এই
অজ্ঞানযুক্ত হইতে পারেন । কিন্তু তাহা পুরুষের প্রকৃতি সহযোগের
কারণ হইতে পারে না । তাহা সে সংযোগের পরে উৎপন্ন । অতএব
যে অজ্ঞান প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগের কারণ, তাহা অনাদি । নিত্য অনন্ত
জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম মায়ী হেতু বিকাশোন্মুখ অবস্থায় পরিচ্ছিন্ন হন, এবং
পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব হন । মায়ীশক্তি হেতু ব্রহ্মজ্ঞান, বৈত হইয়া তাহার
বিপরীত অজ্ঞানযুক্ত হন । (by law of contradiction) । অনন্তকে
আমরা অনন্ত প্রকার সাস্ত্রের সমষ্টি ও তাহার অতীত রূপে ধারণা

করিতে পারি। নতুবা অনন্তের ধারণা হয় না। * অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞান ও অনন্তরূপ সাস্ত্র পরিচ্ছিন্ন অনন্তরূপে অজ্ঞানযুক্ত ভাবে এবং তাহার অতীত শুদ্ধরূপে ধারণা করিয়া, তবে ব্রহ্মজ্ঞান যে অনন্তস্বরূপ, তাহার ধারণা করিতে পারা যায় ; এ জ্ঞাত ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াও পরিচ্ছিন্ন-জ্ঞান হইয়া বা অজ্ঞানযুক্ত হইয়া বহু জীব বা পুরুষরূপে বিবর্তিত হন। এবং স্বীয় পরিচ্ছিন্ন স্বভাব মায়া বা প্রকৃতির অধীন হন। ইহাই পুরুষের প্রকৃতিস্থ হইবার কারণ। এ দুর্বোধ্য .তত্ত্ব এ স্থলে কুণ্ডলার প্রয়োজন নাই।

পুরুষ অকর্তা হইয়াও কর্তা—এক্ষণে পুরুষ অকর্তা হইয়াও কেন ভোক্তা হয়, এবং নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এ সম্বন্ধে আর এক গুরুতর আপত্তি বলদেব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ করিব। বলদেব বলিয়াছেন যে, প্রকৃতিই যদি কর্তা হন, তবে সেই জড় প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বর্গাদি ফলপ্রদ জ্যোতিষ্টোমাদি ও মোক্ষপ্রদ ধ্যানাদি শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহা অসম্ভব। আমরা আরও বলিতে পারি যে, পুরুষ যখন অকর্তা, তখন ভগবান্ যে অর্জুনকে স্বধর্ম্ম যুদ্ধ কর্তব্য বলিয়া বারংবার উপদেশ দিয়াছেন এবং কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন, সে সমুদায়ই নিরর্থক এবং পুরুষ অকর্তা-স্বরূপ হইলে মোক্ষার্থীর পক্ষে সর্ক-কর্ম্মসন্ন্যাসরূপ যোগই ত একমাত্র অবলম্বনীয়। অর্জুন পূর্বে ভগবান্কে বার বার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, পূর্বে একবার বলিয়াছিলেন, যে কর্ম্ম হইতে যদি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে আমার এ ধোর কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ?

* ইংরাজী দর্শনের ভাষায় বলা যায় যে, The Infinity is more than the summation or integration of infinite series of the finites. The Infinite cannot be conceived without relation to the finite.

কিন্তু অর্জুন এক্ষণে বিশ্বরূপ দেখিবার পর স্তম্ভিত হইয়াছেন,—ভগবানের পরম রূপ দেখিয়া নির্বাক হইয়া গিয়াছেন । আর তাঁহার পক্ষে কোন প্রশ্ন করা সম্ভব বা সম্ভত নহে । এজন্য এ স্থলে অর্জুন কোন প্রশ্নই করেন নাই ; এই ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে আর তিনি কোন প্রশ্নই করেন নাই । কিন্তু বলদেবের গ্নান, আমাদের এ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, এবং ইহার মীমাংসাও প্রয়োজন হইতে পারে ।

সাংখ্যদর্শন ইহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । পুরুষ প্রকৃত অকর্তা হইলেও, যতদিন সে প্রকৃতি বা প্রকৃতিবদ্ধ থাকে, ততদিন, তাহার কর্তৃত্ববোধ অবশ্যসম্ভাবী । অহঙ্কার হইতে কর্মে কর্তৃত্ববোধ হয় । সেই অহঙ্কার—সেই ‘আমি জ্ঞান’ যতদিন না যায়, ততদিন পুরুষ সেই চিত্তের ধর্ম অহঙ্কারকে অবশ্যই আরোপ করিবে । এই জন্ত প্রকৃতি হইতে মুক্ত না হইলে, পুরুষ আপনার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহার কর্তৃত্ব-বোধও যায় না । তাহার জ্ঞান হইলেও,—সে আপনাকে অকর্তা বলিয়া জানিতে পারিলেও, ব্যবহারক্ষেত্রে তাহার সে জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞানে আবৃত হইয়া যায়, সে আপনাকে কর্তা বোধ করে । এই জন্ত ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন,—

“যদহঙ্কারমাত্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মনুসে ।

নিঠৈব্য ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিত্বাং নিযোক্যতি ॥

স্বভাবজেন কোন্তের নিবন্ধঃ স্মেন কর্মণা ।

কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যন্তবশোহপি তৎ ॥” (১৮:৫৯,৬০)

এই তৎ শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতেও জানা যায় । যথা—

“তথাপি মমতাবর্তে মোহগতে নিপাতিতাঃ ।

মহাময়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥

জানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ।

বলাদাকৃষা মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥”

(প্রথম মাহাত্ম্য, ৫৮।৫০ মন্ত্র) ।

অতএব সংসার-স্থিতিকারী ভগবান্ সংসারস্থিতির জন্য তাঁহার মহামায়া দ্বারা জ্ঞানীকেও মায়ামোহে বদ্ধ করেন, ও বলপূর্বক তাহাকে কর্তৃত্ব-ভার দিয়া তাহাকে কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করান। গীতা অনুসারে এই মায়ী হইতে উদ্ধীর্ণ হইবার একমাত্র উপায় ভগবানে অনন্তভক্তিবলে ভগবদনুগ্রহ লাভ । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“অত্রিওণমৈঃ সর্বৈরোভঃ সৰ্বানিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেষ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥

দৈবী হেযা গুণময়ী মম মায়ী হুরত্যয়া ।

মায়মব প্রযচ্ছন্তে মায়ামেষ্যঃ তরন্তি তে ॥”

(গীতা, ৭।১৩, ১৪) ।

যখন মায়ী হইতে বা প্রকৃতি-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তখন অল্প পুরুষে কর্তৃত্ববোধ থাকে না। যতক্ষণ তাহা না হয় (আর মুক্তি কদাচিৎ কাহারও পক্ষে সম্ভব হইলেও হইতে পারে) এই কর্তৃত্বাভিমান দূর হয় না। এজন্য পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্তা হইলেও প্রকৃতিবদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতির কৰ্ম্মে কর্তৃত্বের অভিমান পুরুষের অবশ্যস্তাবী। আর এক অর্থে প্রকৃতির কৰ্ম্ম তাঁহারই কৰ্ম্ম। কেন না, প্রকৃতি পুরুষের ভোগ-মোক্ষার্থে স্বরূপ কামনা বাসনা ইচ্ছা পুরুষের চিত্তে উদ্ভেক করিয়া দেয়, তদনুসারে পুরুষে সেই ইচ্ছা প্রতিবিম্বিত হয় এবং সেই ইচ্ছার উদ্ভেক মাত্র তদনুসারে প্রকৃতি কৰ্ম্ম করে বলিয়া, সে কৰ্ম্মে তাহার কর্তৃত্ব-বোধ অবশ্যস্তাবী। ঈশ্বরই সংসার-স্থিতির জন্য সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান পূর্বক মায়ার অধিকৃত সর্বজীবকে যজ্ঞের মত মায়াদ্বারা ভ্রমণ করান, তাহা ভগবান্ বলিয়াছেন (গীতা, ১৮।৬১)। ভগবান্ই পুরুষের অন্তরে কর্তৃত্ববোধ

উৎপাদন করান এবং সেই কৰ্তৃত্ব-বুদ্ধি অনুসারে প্রকৃতিকে তদনুরূপ কর্ণে নিয়োজিত করান । তিনিই অস্তর্যামী,—জীবের নিয়ন্তা । জীব এক অর্থে ভগবানের নিয়ন্তৃত্বে কৰ্ম্ম করে, এবং ভগবানের নিমিত্তমাত্র হয় । এই কৰ্ম্ম করিতে করিতে, অর্থাৎ তাহার যেরূপ ইচ্ছা বা বাসনা হয়, তদনুসারে প্রকৃতি কৰ্ম্ম করিয়াই জীবের ক্রমোন্নতি সাধন করে, তাহার অভ্যাদয় ও বৃদ্ধির কারণ হয় । জ্ঞান অনেক সময় অবাধ্য হয়, পুরুষ আপনাকে অকর্তা জানিয়া কৰ্ম্ম-সম্মাস করিতে যায়, কিন্তু পারে না ; তাহার কৰ্ম্ম-সম্মাস-চেষ্টাও প্রকৃতি-শুণজ, সে চেষ্টা নিরর্থক হইয়া পড়ে । জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয় না । জন্ম পরে জ্ঞানবান্ ভগবান্কে প্রপন্ন হয়, তবে সে মায়াবদ্ধ হইতে মুক্ত হইতে পারে । অতএব অর্জুনকে জ্ঞান উপদেশ দিলেও তাহাকে প্রকৃত অকর্তৃত্বস্বরূপ বুঝাইলেও অর্জুন, সেই উপদেশ হইয়া মুক্ত হইয়া 'অকর্তা'-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিবেন না, ইহা জানিয়াই ভগবান্ তাহাকে 'কর্তা'-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া কৰ্ম্ম করিবার কৌশল বা কৰ্ম্মযোগ উপদেশ দিয়াছেন । সেই কৌশলে কৰ্ম্ম করিলে, কৰ্ম্মবন্ধন হয় না, এবং পরিণামে 'অকর্তা'-স্বরূপে অধিষ্ঠান করিতে পারা যাইতে পারে ; এজন্য ভগবান্ অর্জুনকে স্বকৰ্ম্মপালনের উপদেশ দিয়াছেন ।

প্রকৃতিস্থ হইয়া পুরুষের যে কৰ্তৃত্বভাব হয়, এবং তদনুসারে যে কৰ্ম্ম হয়, তাহা দুইরূপ । এক প্রকৃতির বশে কৰ্ম্ম করা, আর এক প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া ত্রিগুণাতীত হইয়া কৰ্ম্ম করা । সিদ্ধগণ ত্রিগুণাতীত হইয়া প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া কৰ্ম্ম করেন । তাঁহারা কৰ্ম্ম করেন না । ভগবান্ অকর্তা হইয়াও অগৎরক্ষার্থ এইরূপে স্বপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া কৰ্ম্ম করেন, তাহা বুঝাইয়াছেন । অতএব অর্জুনের জ্ঞান হইলেও এবং আপনাকে অকর্তা জানিয়া সেই 'অকর্তা'-স্বরূপে স্থিত হইলেও, তিনি এই ভগবানের দৃষ্টান্তে কিরূপে কৰ্ম্ম করিতে পারেন, ভগবান্ তাহারও

উপদেশ দিরাছেন । অসক্ত অকর্তা হইয়াও এরূপ কর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হয়, কিরূপে প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া কৰ্ম্য করা যায়, মাঝাকে বা প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারিলেই কিরূপে ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয়, ভগবান্ তাহাও বলিরাছেন । শ্রুতিতে আছে—

“স ঈশো যৎ বশেৎ মায়া, স জীবঃ যন্তরাদিতঃ ।”

(খেতাবতর উপনিষদ্)

অতএব শ্রুতি ও গীতা অনুসারে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া অপেক্ষা অল্প এক উৎকৃষ্ট অবস্থা আছে । তাহা প্রকৃতিকে বশীভূত করা, প্রকৃতিকে নিজের করিয়া লইয়া নিয়মিত করা ; ঈশ্বর অকর্তা হইয়াও এইরূপে স্বপ্রকৃতি দ্বারা কৰ্ম্য করেন ।

এ অবস্থা ঈশ্বরের ।—মানুষ সাধনাবল, এবং ভগবদনুগ্রহে; এই অবস্থা লাভ করিতে পারে । নিকাম কৰ্ম্য, লোকহিতার্থ কৰ্ম্য, ঈশ্বরে অর্পণ বুদ্ধিতে কৰ্ম্য, ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্য—যাহা কিছু উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া তাহাকে স্ববশে আনিয়া তাহাকে নিয়মিত করিবার সাধনা সিদ্ধ হয় । রাজা যেমন স্বয়ং অকর্তা ও অসক্ত হইয়াও কেবল অধিষ্ঠান দ্বারাই রাজর্ষি জনকের দ্বারা স্বজনকে বা স্বসৈন্যকে বশীভূত করিয়া নিয়মিত করিতে পারে, সেইরূপ প্রকৃতির উপর পুরুষ স্বীয় অধিকার বা স্বরাজ্য স্থাপন করিতে পারে । গীতার প্রধানতঃ তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে । প্রকৃতির বশে থাকিয়া প্রকৃতির কৰ্ম্যে নিজ কর্তৃত্বের অভিমান অজ্ঞান-মূলক ; কিন্তু প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, তাহার কৰ্ম্য নিয়মিত করার যে কর্তৃত্ব, তাহা অজ্ঞান-মূলক নহে । সে অবস্থায় পুরুষ অকর্তা হইয়াও প্রকৃত পক্ষে কর্তা হয় । কিন্তু প্রকৃতি ঈশ্বরের ; প্রকৃতির উপর সেই এক ঈশ্বরেরই কর্তৃত্ব । পুরুষ সেই ঈশ্বরের সহিত মিলিত বা একীভূত না হইলে তাহার এ কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না । তখন প্রকৃতির কর্তৃত্ব আপনাতে আরোপ না করিয়া সে কর্তা হয় ।

কাম বা বাসনা যে কৰ্মের মূল, বাহা রাগ-দ্বेष-পরিচালিত, তাহার কর্তৃত্ব প্রকৃতির । পরমেশ্বরের নিয়ন্ত্ৰে তাঁহার প্রকৃতিরই সে কর্তৃত্ব । সে কর্তৃত্ব কার্য্য, কারণ, নিয়ম বা নিমিত্তবদ্ধ । তাহা Law of Causation বা Necessityর অধীন । পুরুষ প্রকৃতি-বদ্ধ থাকিলে, তাহাতে যে কর্তৃত্বের ছায়া পড়ে, তাহাতে পুরুষের স্ব-কর্তৃত্ব আবরিত থাকে । পুরুষের এ অধীনতা দূর হইলে, তাহার কর্তব্য জ্ঞান, I ought এই দৈবের বাণী তাহার বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় । সে বাণী অনুসরণ করিয়া স্বাধীনভাবে প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া সে লোকাহতার্থ—দৈবরার্থ কৰ্ম্ম করে । তখন সে অকর্তা হইয়াও কর্তা হয় ।

বাহা হউক, প্রকৃতি সংসর্গে পুরুষের দুই অবস্থা কল্পনা করা যায় । এক প্রকৃতির অধীন অবস্থা, আর এক স্বাধীন অবস্থা । এই স্বাধীন অবস্থাও এক অর্থে প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্ত অবস্থা ; এ অবস্থার প্রকৃতি কৰ্ম্ম করিয়া সেই কৰ্ম্মের অভিমান দ্বারা আর পুরুষকে অজ্ঞানবদ্ধ করিতে পারে না । তখন পুরুষ আপনি 'অকর্তা'-স্বরূপে থাকিয়া ও প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া কৰ্ম্ম করাইতে পারে । ইহাই তাহার কর্তৃত্ব । কিন্তু এক আগতি হইতে পারে যে, এক প্রকৃতির যদি বহু স্বাধীন কর্তা থাকে, তবে পরস্পরের বিরুদ্ধরূপ কর্তৃত্বে জগতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে । জগতে শৃঙ্খলা নিয়ম দেখিয়া এককর্তৃত্ব নিয়ন্ত্ৰে সিদ্ধ হয় । অতএব পুরুষ প্রকৃতিস্থ থাকিয়াও যদি সেই একের সহিত একীভূত হইতে পারে, অন্তর্যামী দৈবের: I ought বাণী শুনিয়া কেবল কৰ্ম্ম করিতে পারে, তখন তাঁহার কর্তৃত্বে কৰ্ম্ম ও দৈবকর্তৃত্বে কৰ্ম্ম এক হইয়া যাইতে পারে । এরূপে জগতে একই অভিপ্রায়, একই কর্তৃত্ব অবিতণ্ড হইয়াও এই সব পুরুষে বিভক্তের স্তায় কার্য্যকারী হয় ।

মায়াবাদী পণ্ডিতগণ প্রকৃতি বা মায়ার উপরে, এ কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্ৰেও যে অজ্ঞানমূলক, তাহা বলিতে পারেন, এবং প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে

যুক্তিলাভই পরম নিঃশেষস, ইহা বলিতে পারেন ; কিন্তু গীতার তাহা উপদেশ নহে ; এবং উপনিষদেরও তাহা উপদেশ নহে, ইহা বলিতে পারা যায় । খেতাখতর উপনিষদ্ অনুসারে ব্রহ্মের মায়াধা পরাশক্তি আছে এবং তাহাই প্রকৃতি, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই পরাশক্তি বিকাশ (manifestation) বা ক্রিয়া অবস্থার দুইরূপ—জ্ঞান-ক্রিয়া ও বলক্রিয়া । শক্তির এই বলক্রিয়ার উপর জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, পরিণতি ও লয় নির্ভর করে । ব্রহ্ম জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা সেই বলক্রিয়াকে নিয়মিত করেন । এইরূপে সগুণভাবে ব্রহ্মের এই জ্ঞান, দ্বারা ক্রিয়া-শক্তি-পরিচালনাতেই তাঁহার কর্তৃত্ব । এইজন্ত তিনি অকর্তা হইয়াও জগৎকর্তা । ব্রহ্মের এই সগুণতাব মায়াব্রহ্ম হইলেও তাহা মিথ্যা বা কল্পিত নহে, এবং এ কর্তৃত্বও কল্পিত নহে ।

আর এক দিক্ হইতে আমরা এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব । এ জগতে জ্ঞান, সত্তা ও সুখাদি অনুভূতির বিকাশ হইতে সেই জগৎকারণ ব্রহ্মকে অনন্ত সচ্চিদানন্দরূপে ধারণা করা হয় । ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দধন । তিনি সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তিবিধিষ্ট । এই জগৎতীতরূপে ব্রহ্মের এ জ্ঞান, সত্তা বা শক্তি ও আনন্দ নির্বিশেষ । জগতেরঃ কারণরূপে জগতের সহিত সম্বন্ধ জন্ত সেই জ্ঞান ক্রিয়াশক্তি ও আনন্দ বিকাশোন্মুখ হয় । বিকাশোন্মুখ অবস্থায় তাহার পরম্পর বিপরীতভাবযুগ্ম হয় । বিপরীত ভাবযুক্ত না হইলে বিকাশের সম্ভাবনা থাকে না, ইহা জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ সত্য । ইহাকে পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় Principle of Contradiction বলে । আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই নিমিত্ত, সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থা যদি কল্পনা করা যায়, তবে তখন ব্রহ্ম জ্ঞান জ্ঞান-অজ্ঞান রূপ হয়, ব্রহ্মানন্দ আনন্দ-নিরানন্দরূপ হয় ; ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে এতদনুসারে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার সংস্করণও জগৎকারণরূপে সদসংরূপ হয়, তাঁহার

পরাশক্তির বলক্রিয়া হেতু যে কর্তৃৎ, তাহা কর্তৃৎ-অকর্তৃৎরূপ হয় । এইজন্য সপ্তগত্রক কর্তা হইয়াও অকর্তা অথবা অকর্তা হইয়াও কর্তা । পরমেশ্বররূপেও তিনি অকর্তা হইয়াও কর্তা । আর পুরুষরূপেও তিনি অকর্তা হইয়াও কর্তা । জীবায়া যদি ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের স্বরূপ হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, জীবায়া স্বরূপতঃ অকর্তা হইয়াও স্বশক্তি হেতু কর্তা । তবে জীবের জ্ঞান যেমন পরিচ্ছিন্ন, অসারবুদ্ধ, সেইরূপ জীবের কর্তৃত্বও পরিচ্ছিন্ন । তাহা ভগবানের নিয়মিত প্রকৃতির কর্তৃত্ব দ্বারা আবরিত । এই আবরণ দূর হইলে তাহার স্বকর্তৃত্ব প্রকাশিত হয় । প্রকৃতিজ বুদ্ধিতে যে পুরুষ-সাম্বিধায়তঃ জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহার দ্বারা পুরুষের স্বীয় জ্ঞান স্বরূপ যেমন আবরিত থাকে, সেইরূপ প্রকৃতির কর্তৃত্বে প্রকৃতি-বশীভূত জীবের স্বীয় স্বরূপ—তাহার কর্তৃত্বরূপও আবরিত থাকে । যে পুরুষ প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারে, তাহারই এই কর্তৃত্ব-অকর্তৃত্ব-স্বরূপ লাভ হয় । সে প্রকৃতিকে কেবল নিয়মিত করে বলিয়া কৰ্ম্ম করিয়াও কৰ্ম্ম করে না । এই অর্থেই প্রধানতঃ গীতার উক্ত হইয়াছে—

“কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্চেনকৰ্ম্মণি চ কৰ্ম্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ ক্লেশকৰ্ম্মক্লেশ” ॥ (৪।১৮) ।

বুদ্ধি বা চিত্ত যখন নিৰ্ম্মল হয়, তখন তাহাতে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তখন সেই নিৰ্ম্মল চিত্তে আত্মস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়, এবং সেই জ্ঞান আত্মদর্শন হয় । আত্মার স্বরূপ—এই সচ্চিদানন্দ-ঘনরূপ এই স্বরূপে আত্মার ‘জ্ঞ’-স্বভাব ও আনন্দ-ভোগ-স্বভাব—যেমন প্রকাশিত হয়, সেইরূপ স্বশক্তিও প্রকাশিত হয় । সেই শক্তি দ্বারাই জীবায়া স্বপ্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব নিয়ন্তৃত্ব করিতে পারে । ভগবান্ গীতাতে ইহাই উপদেশ দিয়াছেন । নিৰ্ম্মলায়া ব্যক্তিকে তিনি অসঙ্গ নিলিপ্ত ভাবে, অকর্তা-স্বরূপে অবস্থান করিয়াও জগৎ-চক্র-প্রবর্তন জগৎ দৈবরার্থে কৰ্ম্ম করিবার

উপদেশ দিয়াছেন । বলিয়াছি ত, সগুণ নিগুণ উভয়রূপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিই মুক্তির পরাকাষ্ঠা ; কেবল নিগুণ ব্রহ্মস্বরূপলাভ যে মুক্তি, তাহাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে । তাহাতে পূর্ণপরব্রহ্ম-স্বরূপ লাভ হয় না । এ তত্ত্ব পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । নিগুণ ব্রহ্মরূপই অকর্তা ; সগুণরূপে ব্রহ্ম অকর্তা হইয়াও কর্তা । ব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপ লাভ করিতে হইলে, পুরুষকে অকর্তা হইয়াও এই ভাবে কর্তা হইতে হইবে ।

অতএব ভগবান্ অর্জুনকে যেমন উপদেশ দিতেছেন পুরুষ অকর্তা, তেমনই অন্তদিকে তাঁহাকে অনাসক্তভাবে, নিকাম কর্মের উপদেশ দিতেছেন । ইহাতে কোন অসঙ্গতি নাই । প্রকৃতিই হইয়া প্রকৃতিত্ব গুণে আসক্তিই সমুদায় অনর্থের মূল । কর্তা হইয়াও কর্তৃত্বে আসক্তি হেতু আপনাকে কর্তা বোধ করাতেই কর্ম-বন্ধন হয় । এজন্য অর্জুনকে এই কর্তৃত্বভাব ও আসক্তি দূর করার জন্য ভগবান্ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন । এই আসক্তিবৃত্ত কর্তৃত্বভাবরূপ অহঙ্কারের যে অভিব্যক্তিতে পুরুষ বদ্ধ হয়, তাহা ক্রমশঃ দূর করিবার জন্য শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রে বিহিত কর্মের উপদেশ আছে । তাহা নিরর্থক নহে ।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মোতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২

উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা আর

মহেশ্বর—তাঁহাকেই পরমাত্মা কর,

এই দেহে হন তিনি পুরুষ পরম ॥ ২২

২২ । এই শ্লোকে সেই পুরুষের পুনর্বার সাক্ষাৎভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে । (শঙ্কর) । প্রকৃত মোক্ষ হেতু যে জ্ঞান, তাহাই এই শ্লোকে

সাক্ষাৎ নির্দেশ করা হইয়াছে (গিরি) । এই দেহাবস্থিত পুরুষের স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে (রামানুজ) । প্রকৃতি-বিবেক না হওয়া পর্য্যন্ত যে প্রকারে পুরুষের সংসারিণী সিদ্ধ হয়, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । তাহা পুরুষের স্বরূপ নহে । পুরুষের বাহ্য স্বরূপ, তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (স্বামী) । পূর্বে সংসারী পুরুষের কথা উক্ত হইয়াছে । সেই সংসারিণী দূর করিবার জন্য পুরুষের বাহ্য প্রকৃত স্বরূপ, সেই তত্ত্ব সাক্ষাৎভাবে এস্থলে নির্দিষ্ট হইয়াছে (মধু) । পূর্বে শ্লোকে দেহবদ্ধ ভোক্তা জীবের কথা উক্ত হইয়াছে । এই শ্লোকে তাহার নিরস্তা সেই দেহস্থ ঈশ্বরের তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে । এই দেহে জীব ব্যতীত অন্য যে পুরুষ আছেন, তিনি মহেশ্বর পরমাত্মা । তাহার তত্ত্ব এস্থলে উক্ত হইয়াছে (বলদেব) । এইরূপ প্রকৃতিস্থ হইয়া গুণসঙ্গ হেতু প্রকৃতির সংসার-দশা হয়, তাহা পূর্বে শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ; কিন্তু ইহা পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ নহে । পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা এই শ্লোকে বিবেচিত হইয়াছে (কেশব) ।

উপদ্রষ্টা—যিনি সমীপস্থ হইয়া দ্রষ্টা হন, অথচ স্বয়ং অব্যাপ্ত থাকেন, তিনি উপদ্রষ্টা । ইহার দৃষ্টান্ত—যেমন বজ্রমান ও ঋষিক্ প্রভৃতি যে সময় বজ্রকর্মে ব্যাপ্ত থাকে, সে সময় অন্য বজ্র-বিদ্যাকুশল (ব্রহ্মা) ব্যক্তি যেমন, তাহার পরিদর্শন করে, অথচ নিজে কোন কার্যে লিপ্ত বা ব্যাপ্ত হয় না, কেবল ঋষিক্ ও বজ্রমানাদির কার্যে দোষ-গুণ পরিদর্শন করে মাত্র, সেইরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের যে সকল ব্যাপার হইতেছে, তাহার নিকটে থাকিয়া পুরুষ বা আত্মা তাহার দ্রষ্টা হয় মাত্র, কোন কার্যে স্বয়ং লিপ্ত হয় না । এই কারণে পুরুষ উপদ্রষ্টা । অথবা দেহ, চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও আত্মা—সকলেই দ্রষ্টা ; ইহাদের মধ্যে দেহ বাহ্যদ্রষ্টা (by sensation of touch) তাহা অপেক্ষা চক্ষু অন্তর্দ্রষ্টা (by perception), মন বুদ্ধি তাহা অপেক্ষা অন্তর্দ্রষ্টা এ

সকল দ্রষ্টা হইতে আত্মাই প্রকৃত পক্ষে অন্তর্দ্রষ্টা ; কারণ, আত্মা (পুরুষ) সকলেরই প্রত্যক্ অর্থাৎ আত্মভাবে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা হইয়া সমুদায় দর্শন করেন । এইজন্য আত্মা উপদ্রষ্টা । অথবা যাহা অপেক্ষা অধিক ভাবে কেহই দেখিতে পার না, সেই সর্বাতিশয়ী আন্তর-দ্রষ্টাই উপদ্রষ্টা । অথবা যজ্ঞকর্মের দর্শকের মত সকল বিষয়েই আত্মা দ্রষ্টা ; এজন্য আত্মা উপদ্রষ্টা (শঙ্কর) ।

এস্থলে 'উপ' এই উপসর্গের অর্থ সামীপ্য । যিনি সমীপস্থ হইয়া দ্রষ্টা হন, তিনি উপদ্রষ্টা । সমীপে থাকিয়া নানাভাবে দ্রষ্টা হওয়া যায় । সন্নিধিমাঞ্জে স্বব্যাপার বিনা উপদ্রষ্টা হওয়া যায় । পুরুষ প্রত্যগাত্মা বলিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক সন্নিহিত, অন্তরস্থ প্রত্যগাত্মরূপে তিনি সর্বসাক্ষী । চিন্মাত্র-স্বভাব আত্মা সমুদায় গোচর করেন, এজন্য তিনি উপদ্রষ্টা (গিরি) ।

এই দেহে অবস্থিত পুরুষ দেহ-প্রবৃত্তির অনুগুণ সংকল্লাদিক্রমে দেহের উপদ্রষ্টা হয় (রামানুজ) । এই প্রকৃতিকার্য্য-দেহে বর্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতিজ দেহ হইতে ভিন্ন, প্রকৃতিজ দেহ গুণযুক্ত নহে ; তাহার কারণ এই যে, পুরুষ উপদ্রষ্টা, অনুমত্তা ইত্যাদি । উপদ্রষ্টা—অর্থাৎ দেহ হইতে পৃথগ্ভূত হইয়াও দেহের সমীপে স্থিত হইয়া দ্রষ্টা বা সাক্ষী হয় (স্বামী) ।

এই প্রকৃতি-পরিণামদেহে জীবরূপে বর্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতির অতীত ; প্রকৃতিজগতের দ্বারা অসংশ্লিষ্ট পরমার্থতঃ অসংসারী । তিনি স্বীয় রূপেই উপদ্রষ্টা । যেমন যজ্ঞ-বিজ্ঞাকুশল ব্রহ্মা যজ্ঞকর্ম ব্যাপারে সমীপস্থ থাকিয়াও—স্বয়ং অব্যাপ্ত হইয়া তাহাতে ব্যাপ্ত ঐতিহ্যক যজ্ঞ-মানাদির ব্যাপার পরিদর্শন ও দোষগুণ পর্যালোচনা করে, সেইরূপ কার্য্য-কারণ-ব্যাপারে বিচক্ষণ পুরুষ স্বয়ং সমীপস্থ হইয়াও অব্যাপ্ত থাকিয়া তাহা দর্শন করেন । তিনি দ্রষ্টা হন মাত্র, কর্তা হন না । এজন্য তিনি উপদ্রষ্টা । অথবা দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইহাদের দ্রষ্টা হইয়া বাহ্য । তাহাদের

অপেক্ষা আত্মা প্রত্যগাত্মরূপে অব্যবহিত, অতি সমীপস্থ দ্রষ্টা । সন্নিহিত অথচ পৃথগ্ভাবে থাকিয়া যিনি দ্রষ্টা, তিনিই উপদ্রষ্টা (বলদেব) । শরীরেন্দ্রিয় ব্যাপারে সমীপস্থ থাকিয়া দ্রষ্টা (হনু) । সাক্ষী, যে দেহাদি সমুদায় ভগবানে নিবেদন করিয়া দিয়া, তদন্ত প্রসাদরূপে সেবার্ধ উপযোগী ভোগকর্তা তাহার সাক্ষী অর্থাৎ তাহাকে মুখ্য সেবার উপযোগী করান । (বল্লভ) ।

উপ=সমীপে, দেহের অবস্থার পরিণামাদিতে সাক্ষীর ত্রায় অবস্থিত (কেশব) ।

অনুমত্তা—অনুমননকারী । অনুমনন অর্থে অনুমোদন অর্থাৎ লোকে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের সেই কার্য্যের উপর যে পরিতোষ, তাহাই অনুমনন । আত্মা এই প্রকার অনুমত্তা । অথবা দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহের ব্যাপার সম্বন্ধে স্বয়ং কোন প্রকারে ব্যাপ্ত না থাকিলেও আত্মা নিজের ঘেন অনুকূল ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিয়া আপাততঃ প্রতীতি হয়, এজন্য আত্মাকে অনুমত্তা বলা যায় । অথবা নিজ নিজ ব্যাপারে প্রকৃত দেহ ইন্দ্রিয় সকলকে কোন সময়ে নিবারণ করে না বলিয়া আত্মাকে অনুমত্তা বলা যায় (শঙ্কর) ।

যাহারা স্বয়ং কৰ্ম্ম করিয়া ব্যাপারবান্ হয়, সেই দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার পার্শ্বস্থ হইয়া সর্ব্বরূপে অনুমোদন ও অনুমননকারী আত্মা এই সন্নিধি-মাজ্জেই কৰ্ত্তা হয় বলিয়া অনুমত্তা (গিরি) ।

দেহের অনুমত্তা (রামানুজ) । অনুমোদিত । অর্থাৎ সন্নিধিমাাজ্জেই অনুগ্রাহক (স্বামী) । কার্য্যকারণ বৃত্তিতে স্বয়ং অপ্রবৃত্ত হইয়াও সন্নিধিহেতু তাহার অনুকূল বলিয়া প্রবৃত্তের ত্রায় বোধ হয় । এজন্য আত্মা অনুমত্তা । অথবা স্বব্যাপারে প্রবৃত্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে যিনি তেমন নিবারণ করেন না, কেবল সাক্ষিরূপে থাকেন, সেই অন্ত পুরুষ অনুমত্তা (মধু) । অনুমতিদাতা ; ঈশ্বরের অনুমতি বিনা জীব কোন কার্য্য

করিতেই সমর্পণ হয় না (বলদেব) । কার্য্য-করণ প্রবৃত্তিতে স্বয়ং অপ্রবৃত্ত থাকিয়াও প্রবৃত্তের গ্ৰাহ তাহা অনুকূলরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া আত্মা অনুমত্তা (হনু) । অনুমোদনকর্তা, অর্থাৎ যে তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করে বা তাঁহার জন্ত কর্ম্ম করে, তাহার অনু বা পশ্চাৎ মোদিত হন (বল্লভ) । দেহের ভাব প্রবৃত্তি প্রভৃতির অনুমোদক (কেশব) ।

ভর্তা—ভরণকর্তা । যদিচ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন ইহারা পরস্পর সংহত হইয়াও জড়, তাহা হইলেও ইহারা চৈতন্যময় আত্মার ব্যবহারিক ভোগ সিদ্ধ করিবার জন্ত সেই চৈতন্যময় আত্মার চৈতন্যভাসে উদ্ভাসিত হয় । সেই চৈতন্যভাস দ্বারা প্রকাশ করিয়া আত্মা যে ইহাদের স্বরূপ অবধারণ করিয়া থাকে, সেই স্বরূপাবধারণই এখানে ‘ভরণ’ বলিয়া বুঝিতে হইবে । আত্মা এইরূপ ভরণকর্তা বলিয়া ভর্তা (শঙ্কর) ।

পুরুষ দেহের ভর্তা (রামানুজ) । ঈশ্বররূপে ভর্তা, বিধায়ক (স্বামী) । সংহত দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বাহা চৈতন্যের আভাসযুক্ত হয়, তাহাদের নিজ সন্তান্যুরণ দ্বারা ধারণকারী, ও পোষণকারী (মধু) । ধারক (বলদেব) । সংহত দেহ ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিগণের যে আত্মচৈতন্যের আভাস হয়, সেই আভাসের কারণরূপে আত্মা ভর্তা (হনু) । ধারক, পতিরূপে ধারক, পোষক (বল্লভ) । ধারক (কেশব) ।

ভোক্তা—অগ্নির উষ্ণ স্বভাব যেমন সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, সেই প্রকার চৈতন্যই আত্মার নিত্য স্বভাব । এই নিত্য চৈতন্যময়, স্বভাব বশতঃ আত্মার বুদ্ধির সুখ-দুঃখ-মোহ-স্বরূপ সর্ব্ববিষয়িণী বৃত্তিকে যেন নিজ চৈতন্যগ্রস্ত করাইয়া পৃথগ্ভাবে বিভক্তাকারে প্রকাশ করে । এই জন্ত আত্মা ভোক্তা (শঙ্কর) । চিদবসান ভোগ, সেই ভোগ ক্রিয়া চিত্তে উপস্থিত হইলে, আত্মা তাহা গ্রহণ করিয়া ভোক্তা হয় (গিরি) ।

দেহপ্রবৃত্তিজনিত সুখদুঃখের : ভোক্তা এই পুরুষ (রামানুজ) । ভোক্তা অর্থাৎ পালক (স্বামী, বলদেব) । বুদ্ধির যে সুখ-দুঃখ-মোহ-

রূপ প্রত্যয়, তাহার স্বরূপ চৈতন্য দ্বারাই প্রকাশিত হয় । আত্মা নির্বিকার হইয়াও তাহা উপলব্ধি করে, একান্ত আত্মা ভোক্তা (বলদেব) । বুদ্ধির স্মৃৎ-ভৃৎ-মোহাত্মক প্রত্যয় সকল চৈতন্যস্বরূপ দ্বারা চৈতন্য-প্রান্তের জ্ঞান হয় । আত্মা এইরূপে বিভক্তবৎ প্রতীয়মান হইয়া ভোক্তা হয় (হনু) । রক্ষক, স্বীয়স্বজ্ঞানে যে রক্ষাকারী (বল্লভ) ।

এই সম্বন্ধে পূর্বে ১৪শ শ্লোকে ‘শুণ-ভোক্তার’ অর্থ দ্রষ্টব্য । জীবাত্মা যেমন বদ্ধভাবে ভোক্তা, সেইরূপ মুক্ত ব্রহ্মভাবে বা নিগুণ ভাবেও ভোক্তা হইতে পারেন ।

মহেশ্বর—আত্মাই মহেশ্বর । আত্মা সকলেরই আত্মা ; একান্ত ইহা মহান্ এবং আত্মা স্বতন্ত্র, একান্ত আত্মা ঈশ্বর । আত্মা মহান্ এবং ঈশ্বর, একান্ত মহেশ্বর (শঙ্কর) । ‘দেহের নিয়মন-ব্যাপারে দেহের উন্নয়ন-কার্যে, দেহকে পোষণ-কার্যের দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় মনের পুরুষ সম্বন্ধে মহেশ্বর হন । পরে গীতার পুরুষকে “উৎক্রামতি ঈশ্বরঃ” (১৫।৮) বলা হইয়াছে (শ্রীমাদ্ভগবৎ) । মহান্ ও ঈশ্বর ;—অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও পতি (স্বামী) । সর্বাত্মা হেতু ও স্বতন্ত্র হেতু মহেশ্বর (মধু) । ব্রহ্মাদি সমুদায় কর্তাগণের প্রভু ভগবান্ দ্বারাই তাহাদের কর্তৃক (বল্লভ) । দেহযাত্রা-নির্বাহক আর ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর, দেহের ধারক ও পালক (কেশব) ।

পরমাত্মা—আত্মার অবিজ্ঞা দ্বারা পরিকল্পিত দেহ হইতে বুদ্ধি পর্যন্ত সংঘাত অচেতন ও অনাস্থ হইলেও আত্মার চৈতন্য-শক্তি-প্রভাবে চৈতন্যযুক্ত হন বলিয়া, তাহারাই ‘আত্মা’ এই ভাবে ব্যবহার-গোচর হয় ; সেই সকল বিশেষণ-বিশিষ্ট আত্মা এই দেহের মধ্যে দেহের সহিত বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার-গোচর হইলেও বাস্তবিক এই আত্মাই পরমাত্মা বলিয়া ক্রটিতে উক্ত হইয়াছে । এই দেহেই আত্মা পরমাত্মা (শঙ্কর) । এই দেহ ইন্দ্রিয় ও মন সম্বন্ধেই পুরুষকে পরমাত্মা বলা হইয়াছে । দেহ ও মনের প্রতি আত্মা শব্দ প্রযোজ্য হয় । আত্মা শব্দ এই অর্থ

শ্রীতার "ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা" (গী . ১৩.২৪) শ্লোক হইতে পাওয়া যায় । মূলে 'ইতি চ' এই শব্দ দ্বারা পরমাত্মা ও মহেশ্বর উভয়ই পুরুষ সম্বন্ধে উক্ত হইয়া থাকে, ইহাই বুঝায় (রামানুজ) । পরমাত্মা, অর্থাৎ অন্তর্যামী (স্বামী) । অবিজ্ঞাহেতু দেহাদি বুদ্ধি পর্য্যন্ত কল্পিত । তাহা হইতে পরম বা উৎকৃষ্ট । পূর্বোক্ত উপদ্রষ্টাদি বিশেষণ-বিশিষ্ট আত্মাই পরমাত্মা । পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত (মধু) ।

আত্মা = দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন, ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অন্তরাত্মা জ্ঞানময় (কেশব), একত্র পরমাত্মা (কেশব) ।

এই দেহে হন তিনি পুরুষ পরম—(দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ) এই দেহেই উক্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট আত্মাই পরমাত্মা, এবং সেই আত্মা 'পর', অর্থাৎ উক্ত হইতে 'পর' বা বিলক্ষণ । পরে কী উক্ত হইয়াছে, "উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ পরমায়েত্বাদাক্রতঃ ।" (১৫।১৭) । এবং পূর্বে ভগবান্ বলিয়াছেন,—'ক্ষেত্রজ্ঞাঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু ভারত'(১৩।২) । অতএব এই পুরুষই উত্তম পুরুষ । পূর্বে উপক্রমে তাহা উক্ত হইয়াছে, পরে তাহাই এ স্থলে উপসংহাররূপে উক্ত হইয়াছে । (শঙ্কর) ।

পূর্বে 'অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম' ইত্যাদি দ্বারা যাহা উক্ত হইয়াছে, সেই পুরুষ পর । এই পুরুষ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানশক্তি হইয়া প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়াছেন এবং গুণসঙ্গ হেতু সেই দেহমাত্রেই মহেশ্বর ও পরমাত্মা হইয়াছেন (রামানুজ) । এই দেহস্থ সেই পুরুষই উত্তম পুরুষ (মধু) । পূর্বে সর্বতঃ পাণিপাদ ইত্যাদি দ্বারা ঈশ্বর যে জীবের সহিত অবস্থিতি করেন, ইহা উক্ত হইয়াছে । এ স্থলে ইহাই পুনরুক্ত হইয়াছে (বলদেব) । পর অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে পর (হনু) । এই প্রকৃতির কার্যে ভূতদেহে বর্তমান থাকিয়াও পুরুষ দেহ হইতে ভিন্ন (কেশব) ।

এই শ্লোকে পুরুষের অর্থ।—পূর্বে তিন শ্লোকে যে পুরুষের

কথা উক্ত হইয়াছে, এই শ্লোকেও সেই পুরুষের কথা উক্ত হইল । পূর্বের উক্ত কয় শ্লোকে যে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষের কথা উক্ত হইয়াছে, এ শ্লোকে সেই পুরুষের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, এই মাত্র বিশেষ । শঙ্কর ও তদনুবর্তী ব্যাখ্যাকারগণ ইহা দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সংস্থাপন করিয়াছেন । জীব ব্রহ্ম হইলেও প্রকৃতি বা অবিদ্যার সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ তদ্ভাবাপন্ন হওয়ায় তাহার সেই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরের সহিত বিভিন্ন যোনিতে জন্ম ও সংসারভোগ হয় । এ শ্লোকে তাহার প্রকৃত ব্রহ্ম-স্বরূপ যাহা দেখান হইয়াছে, তাহা জানিলে তাহার মুক্তি হয় । রামানুজ জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলেও পরম পুরুষ হইতে তাহার ভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন । তাহার বগদেব-স্বামী ও ব্রহ্মভের নানানুবর্তী ব্যাখ্যাকার প্রভৃতি এই শ্লোকোক্ত পুরুষ যে পরম পুরুষ, এবং তাহা পূর্বকয় শ্লোকোক্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন তাহা বুঝাইয়াছেন ।

জীবব্রহ্মে ভেদ ও অভেদবাদ ।—ভগবান্ এই অধ্যায়ের প্রথমেই বলিয়াছেন যে, এই অধ্যায়ে যে তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, তাহা ঋষিগণ দ্বারা ছন্দে ও ব্রহ্ম সূত্র পদে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত আছে । অতএব এই পুরুষতত্ত্ব আমরা উপনিষদ্ হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিব । উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাই উপদিষ্ট হইয়াছে । উপনিষদ অনুসারে আত্মাই ব্রহ্ম । একত্র উপনিষদে জীবতত্ত্ব স্বতন্ত্র উপদিষ্ট হয় নাই । প্রামাণ্য উপনিষদ্ হইতে শঙ্করাচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, এই ব্রহ্ম দুই ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছেন—এক সগুণ ভাবে আর এক নিগুণ ভাবে । শঙ্কর অবশ্য সগুণ ভাবে মায়াময় বলিয়াছেন, এবং তাহা যে পারমার্থিক সত্য, তাহা স্বীকার করেন নাই । ঈশ্বর, জীব ও জগৎ—এই ব্রহ্মের সগুণ ভাব । একত্র শঙ্কর মতে ব্রহ্মের জীব ভাব পারমার্থিক সত্য নহে । এইরূপে তিনি পারমার্থিক অর্থে জীবব্রহ্মের ঐক্য স্থাপন করিয়াছেন ।

রামানুজ উপনিষদুপদিষ্ট ব্রহ্মকে সগুণভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন,

সেই ভাবে পারমাধিক সত্য বলিয়াছেন । তিনি নিগুণ ভাব স্বীকার করেন নাই । তাঁহার মতে ব্রহ্মের ঈশ্বর-জীব ও জগৎভাব নিত্য সত্য, —পারমাধিক সত্য । ঈশ্বর চিৎ, জড় অচিৎ আর জীব চিদচিৎ অথবা জড়দেহ যুক্ত চিৎ । ঈশ্বর এক, কিন্তু এই চিদচিৎ জীব বহু । একমুখী জীবকে ব্রহ্ম বলেন, অথচ জীব ঈশ্বর হইতে নিত্য ভিন্ন, তাহাও প্রতিপন্ন করেন । রামানুজের মতই বৈতবাদের মূল । যদি ঈশ্বর, জীব ও জড় জগৎ এই তিন ভাব নিত্য ও পারমাধিক সত্য হয়, তবে আর এরূপ ব্রহ্ম স্বীকারের প্রয়োজন কি ? ঈশ্বরই একমতে পরব্রহ্ম পরমপুরুষ । জীবগণ তাঁহার অংশ হইতে পারে, তাঁহার স্বরূপও কোন অংশে হইতে পারে, কিন্তু জীব ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । এ প্রভেদ অনাদি ।

উপনিষদে জীবই ব্রহ্ম ।—বাহা হউক, এই বৈতমত উপনিষদের প্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদের বিরোধী । উপনিষদ্ অনুসারে ব্রহ্ম একই । তিনিই আত্মা,—তিনিই পরমাত্মা,—তিনিই জীবাত্মা । তিনি সৰ্ব্বতঃ পাণিপাদ, তিনি সৰ্ব্ব-অন্তরে স্থিত । গীতায়ও এই মত প্রতিষ্ঠিত । নিগুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম পরব্রহ্মের এ উভয় ভাবই গীতার পারমাধিক সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শঙ্করের অদ্বৈতবাদে অর্থাৎ ব্রহ্মের কেবল নিগুণ স্বরূপবাদের যে দোষ, এবং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে অর্থাৎ কেবল সগুণ ব্রহ্ম বা নিত্য ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিন ভাবে হিত ব্রহ্মবাদের যে দোষ, গীতার তাহা নাই । গীতা অনুসারে নিগুণ ব্রহ্ম, পরমেশ্বর ও জীব স্বরূপতঃ এক হইয়াও ভিন্ন । ব্রহ্মের এ তিন ভাব অনাদি ; কেন না, এ সংসারই অনাদি । ব্রহ্মের এ তিন ভাব পারমাধিক সত্য ; অথচ এ তিন ভাব এক,—অবিচ্ছিন্ন । সংসার-দশায় এ তিন ভাব এক হইয়াও ভিন্নের স্মার প্রতিষ্ঠাত হয় । ব্রহ্ম বা পরমাত্মা এই তিন ভাবেই সৰ্ব্বগত—সৰ্ব্বব্যাপী ।

প্রতিদেহস্থ পুরুষের তিন রূপ ।—উক্ত কারণে প্রতিদেহে, জীবাত্মা, পরমেশ্বর ও অক্ষর নিঃশূণ ব্রহ্ম নিত্য বর্তমান । দেহরূপ পুরে অধিষ্ঠান হেতু ব্রহ্মই পুরুষ (বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৮) । সেই পুরুষই সমুদায় (শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৫) আর সেই পুরুষের দ্বারাই এই সমুদায় পূর্ণ, (শ্বেতাশ্বতর, ৩।২) । জীবজীব গ্রহণ করিয়া, তিনি ক্ষর পুরুষ, অপরিচ্ছিন্ন অক্ষর নিঃশূণ ব্রহ্মভাবে প্রতিদেহে কূটস্থরূপে তিনি অক্ষর পুরুষ, আর প্রতিদেহে অন্তর্যামী নিয়ন্তা পরমেশ্বর-ভাবে তিনি উত্তম পুরুষ । ক্ষর পুরুষ বা জীব-ভাব স্থায়ী নহে ; সে তাব হইতে তাহার মুক্তি আছে, সে তাবে ক্রম-পরিণতি আছে । এ অল্প তাহা ক্ষর । এই পুরুষের ক্ষর-ভাব দূর হইলে, তাহার 'অক্ষর পুরুষ-ভাব, অথবা ঈশ্বরভাব বা পরম পুরুষ-ভাব হইতে পারে । গীতার পরে পুরুষের এই তিন ভাবের উপদেশ আছে (১৫।১৬, ১৭) । পুরুষের ষত দিন প্রকৃতি-বদ্ধভাব বা ভূতভাব থাকে, পুরুষকে ততদিন ক্ষর পুরুষ বলা যায়, ততদিন সে তাহার অন্তরস্থ অক্ষর পুরুষ বা পরম পুরুষ হইতে ভিন্ন । সেই ক্ষরভাব দূর হইলে, সেই অক্ষর বা পরম পুরুষ হইতে অভিন্ন হয় । এই শ্লোকে প্রকৃতিবদ্ধ ক্ষর পুরুষের এই পরম পুরুষরূপ উপদেশ দ্বারা, সর্ব পুরুষের একত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে । সর্বদেহে একই অক্ষর পুরুষ ও পরম পুরুষ অধিষ্ঠিত কোন দেহের সহিতই সে পুরুষ লিপ্ত নহে । এক আকাশ (অথবা Ether) যেমন প্রতিদেহে নিলিপ্তভাবে থাকে এবং তদধিষ্ঠানে দেহ-কার্য্য নির্বাহ হয়, নিঃশূণ অক্ষর ব্রহ্ম এবং পরমেশ্বর সেইরূপ নিলিপ্তভাবে প্রতিদেহে অবস্থান করেন । অক্ষর ব্রহ্ম সম্পূর্ণ নিলিপ্ত ; কিন্তু পরমেশ্বর নিয়ন্তা অন্তর্যামী হইয়াও নিলিপ্ত । এই অধ্যায়-শেষে ২৭, ২৮ ও ৩১শ শ্লোকে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে । এই অক্ষর ও পরম পুরুষের সর্বদেহমধ্যে যে নিলিপ্তভাবে স্থিতি, তাহাই বিভক্তের গ্ৰাম হইয়া আংশিকরূপে যে লিপ্তভাবে অত্যেক দেহে জীব বা ক্ষর পুরুষ-ভাবে স্থিতি, ইহাই বৃষ্টিতে হইবে ।

বিশ্ববাদ ও প্রতিবিশ্ববাদ ।—ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? উপনিষদে ইহার দুইরূপ উক্তর আছে । এক বিশ্ববাদ আর এক প্রতিবিশ্ববাদ । বৃহৎ ব্যাপক অগ্নির সন্নিহিত বস্তুতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িয়া যেমন তাহাকে অগ্নিময় করে, সেইরূপ পরমপুরুষের অংশই প্রতিদেহে বদ্ধ হইয়া জীব হয় । ইহা বিশ্ববাদ । অথবা কোন বিশেষ দেহ (লিঙ্গদেহ)-রূপ উপাধি সন্নিহিত ব্রহ্ম বা পরম পুরুষের প্রতিবিশ্ব সেই দেহ গ্রহণ করিয়া সেই দেহই জীবরূপ পরা প্রকৃতি হয়, এবং তৎসন্নিহিত পরম পুরুষ সেই প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করিয়া ক্ষর পুরুষ বা সেই দেহবদ্ধ পুরুষ হন । ইহা প্রতিবিশ্ববাদ । বিশ্ববাদ সম্বন্ধে শ্রীভগবৎ এই—

“যথা সূদীপ্তাৎ পাবকাদ্ভিস্ফুলিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাৎ ।

তথা ক্ষরাদ্ভিস্ফুলিঙ্গাঃ সৌম্যভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি বস্তু ॥” (যুগ্মক ২।১।১) ।

আরও আছে—

“যথোর্ণনাভিঃ সৃজ্যতে গৃহ্যতে চ

যথা পৃথিব্যামোষধম্নঃ সম্ভবন্তি ।

যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি

তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥” (যুগ্মক ১।১।৭)

উপনিষদে প্রতিবিশ্ববাদের স্পষ্ট উল্লেখ নাই । কিন্তু শঙ্কর এই প্রতিবিশ্ববাদই গ্রহণ করিয়াছেন । এই প্রতিবিশ্ববাদ প্রধানতঃ সাংখ্য-মতের । প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষে তৎসন্নিহিত প্রকৃতির যেরূপ ছায়া পড়ে, পুরুষ সেইরূপে রঞ্জিত হয় এবং এইরূপে স্বপ্রকৃতির সহিত তাহার সাদৃশ্য হয় । শঙ্করাচার্য্য ও সাংখ্যপণ্ডিতগণ এই প্রতিবিশ্ববাদ ভিন্নরূপে বুঝাইয়াছেন । শঙ্করের মতে, যেমন বিভিন্ন প্রকার মলিনতায়ুক্ত বিভিন্ন মর্পণে বা মলিন ও আবিল জলে সূর্য্যের প্রতিবিশ্ব জ্ঞান দেখি, অথবা যদি

আমরা তাহাতে নিজের মুখ দেখিতে বাই, তবে তাহা যেমন মলিন ও বিকৃত দেখায়, মুখের স্বরূপ কি, তাহা দেখিতে পাই না—সেইরূপ বিভিন্নরূপ মলিনতাযুক্ত চিত্তরূপ উপাধিতে আত্মা আপনার স্বরূপ দেখিতে পায় না—আপনাকে মলিন বোধ করে। সাংখ্যমতে সে প্রতিবিম্ব চূষকের (মণির) সান্নিধ্যে লৌহের চূষকশক্তির প্রতিবিম্ব (বা Induction) বেরূপ, সেইরূপ। অথবা আধুনিক বিজ্ঞানমতে চূষক তাড়িত-শক্তির প্রতিবিম্বের (induction এর) মত। পুরুষ-সান্নিধ্যে জড় অন্তঃকরণে পুরুষের চৈতন্যাদি প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া, চিত্ত বা অন্তঃকরণ চৈতন্যযুক্ত হইবে। পুরুষ সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, তাহাই তাহার স্বরূপ মনে করে। ইহাই পুরুষের প্রকৃতিবদ্ধ অবস্থা। যাহা হউক, আলোক-প্রতিবিম্ব বা চূষকাদির প্রতিবিম্ব অলীক নহে; আলোক-চিত্রে ও লৌহের চূষকক্রিয়ায় তাহা বুঝা যায়। এ প্রতিবিম্বে বিশ্ব থাকে। চিত্ত এইরূপে পুরুষের প্রতিবিম্বে চৈতন্যাদি-যুক্ত হইয়া জীব (পরা প্রকৃতি) হয়। পুরুষ সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, আপনাকে জীব বোধ করে। চিত্তের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্বই আপনার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্ব মনে করে, এবং এইরূপে পরিষ্কৃত হয়। প্রকৃতি-সংযোগ দূর হইলে, পুরুষে আর সে প্রতিবিম্ব পড়ে না। তখন পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করে—মুক্ত হয়। অতএব সাংখ্যমতে ও শঙ্কর-ব্যাখ্যাত বেদান্তমতে এইরূপ প্রতিবিশ্ববাদই সঙ্গত; কেবল বিশ্ববাদের স্থান নাই। বেদান্তের ব্রহ্মবাদে বিশ্ববাদ ও প্রতিবিশ্ববাদ উভয়কে সামঞ্জস্য করিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। গীতায় এ উত্তরবাদের সামঞ্জস্য আছে।

সিদ্ধান্ত—

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।” (১৫।৭)

এই শ্লোকে যেমন বিশ্ববাদ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, সেইরূপ—

“অংমায়া শুড়াকেশ সৰ্বভূতানস্বিতঃ ।” (১৫।২০)

এই শ্লোকে এবং প্রতিজীবে স্ব-ভাব বা ‘আমি’ ভাব (self consciousness) ব্রহ্মেরই অধ্যাত্মভাব (৮।৩) উপদিষ্ট হওয়ার প্রতিবিম্ব-বাদই গৃহীত হইয়াছে বলা যায়। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর পূর্ণ। তাঁহার অংশ পারমাৰ্থিক সত্য নহে। তাঁহার কলা নাই—তিনি নিষ্কল। “ব্রহ্ম নিষ্কলং” (খেতাস্বতর, ৩।১২, যুগুৎ, ২।২।২)। অতএব তাঁহার অংশ-কল্পনা কেবল উপদেশ জন্ত ও বোধসৌকর্য্য জন্ত।

ব্রহ্ম কিরূপে জীব হন—উপনিষদ্ অনুসারে সৃষ্টিক প্রারম্ভে ব্রহ্ম বহু হইব, কল্পনা বা ঈক্ষণ করিয়া বহুর সৃষ্টি করিয়া বা নামরূপে ব্যাকৃত করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সে অনুপ্রবেশ দ্বারা তাঁহার অংশ বিভক্ত হয় না, তিনি পূর্ণরূপেই সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হন। এজন্য প্রতি দেহে যে ব্রহ্ম পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত হন, সে তাঁহার পূর্ণ আবতন্তরূপ। তথাপি তাঁহাকে অপূর্ণ বিভক্তরূপে প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপে সৎ-অসৎ চিৎ-অচিৎ ও আনন্দ-নিরানন্দ-রূপ অনন্ত ভাবের বিকাশে বহুধা বিভক্তের স্ভায় হন। দেহস্থ হইয়া অস্তঃকরণে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়াই তিনি জীবরূপ হন। এই প্রতিবিম্বেই তাঁহাকে বিভক্তের স্ভায় দেখায়—তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বোধ হয়। প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়াই পুরুষরূপে ব্রহ্ম প্রকৃতিবদ্ধ হন। কিন্তু এই প্রতিবিম্বের অন্তরালে তিনি স্বরূপেই অবস্থান করেন। সাগরবক্ষে ভাসমান কেন, তরঙ্গ, হিমগিরির স্ভায় অক্ষয় বা পরম পুরুষের মধ্যে জীব ভাসমান থাকে, ইহা উপমাচ্ছলে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মই অনন্ত জীবরূপ হন। তিনিই অনন্তরূপ দেহ স্থাপনা করিয়া ও স্বীয় মায়াশক্তিদ্বারা সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, নিজ প্রতিবিম্ব প্রতি অস্তঃকরণকে দিয়া তাহাকে চৈতন্যবৃত্ত ও জ্ঞাতা জ্ঞাতা কর্তা ভাববৃত্ত করিয়া, অর্থাৎ তাঁহার জীবতাব বিকাশ করিয়া দিয়া এবং সেই ভাবের প্রতিবিম্ব পুনঃ গ্রহণ করিয়া, অনন্ত

প্রকারে জ্ঞান অজ্ঞান আনন্দ নিরানন্দ ও সদস্য তাবে সেই অনন্ত সত্য জ্ঞান আনন্দধনসাগরে প্রকাশিত হন। এক এক দেহে অর্থাৎ চিত্তে ইহার কোন একরূপ ভাবের বিকাশ হয়। সে প্রতিবিম্ব কর, সে পরিচ্ছিন্ন ভাব কর ও বিনাশ-শীল। এজন্য সেই ভাবে ব্রহ্মই কর পুরুষ। তিনিই জীব।

এইরূপে এ স্থলে গীতার প্রকৃতিস্থ হইয়া চিত্তের প্রতিবিম্ব গ্রহীতা ভোক্তা ভাবে হিত পুরুষের যে স্বরূপ পরমাত্মা পরমপুরুষ, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, শ্রুতি অনুসারে প্রতিদেহে সেই এক পুরুষই, ভোক্তা জীবাত্মা-রূপে ও কেবল দ্রষ্টা পরমাত্মরূপে এবং তাহার অন্তর্ধামী নিরস্তা পরমেশ্বররূপে অবস্থান করেন। এই বিভিন্ন ভাব হেতু সেই একই পুরুষকে তিনভাবে গ্রহণ করা যায়। আত্মা-স্বরূপে তিনি ছই ভাবে প্রতীয়মান হন। এক জীবাত্মা ভাবে, আর এক পরমাত্মা ভাবে। শ্রুতিতে আছে—

“দ্বা সুপর্ণা সবুজা সখারী সমানং বৃক্ষং পরিবস্বজাতে ।

তয়োৱগুঃ পিঙ্গলং স্বাধত্যানশ্রমশ্চোহ ভিচাকশীতি ॥”

(ঋষেদ, ১।১৬৪।২১ ; মুণ্ডক উপঃ ৩।১।১)

এই শ্লোক মত্রে এই অর্থে একই দেহে ভোক্তা জীবাত্মা ও দ্রষ্টা পরমাত্মার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

সাংখ্যের বহু পুরুষবাদ অগ্রাহ্য।—অতএব যদি কেবল এই অংশবাদ বা বিশ্ববাদ পারমাধিকভাবে গ্রাহ্য না হয়, যদি এই অংশ-ভাব কেবল এক অবিভক্তের বিভক্তের দ্বারা আপাত-প্রতীয়মান ভাব মাত্র হয়, তবে সাংখ্যের বহু পুরুষবাদ স্থান পায় না। এই শ্লোক হইতে বুঝা যায়, যে গীতার সাংখ্যের ‘পুরুষবাদ’ গৃহীত হইলেও, বহু পুরুষবাদ গৃহীত হয় নাই। সাংখ্যের বহু পুরুষবাদ যে গীতার গৃহীত হয় নাই, তাহা পূর্বে ১৯শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে এই বহু পুরুষবাদ কেন গ্রাহ্য নহে, তাহা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে হইবে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শন ছঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান মাত্র উপদেশ দিয়াছে । পুরুষ হইতে যে প্রকৃতি ভিন্ন, তাহা প্রতিপন্ন করিবারে সাংখ্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে । তাহাতে বহু পুরুষবাদ নিরর্থক । সম্ভবতঃ ইহা যে ঋষি কপিলের পরে কোন সাংখ্যপণ্ডিতের দ্বারা প্রবর্তিত, এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এই বহু পুরুষবাদ যে পারমার্থিক সত্য নহে, তাহা গীতার দেখান হইয়াছে । পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, তাহাই সাংখ্যদর্শনের সার উপদেশ । তাহাই সাংখ্যদর্শন হইতে জানিতে হইবে । পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রকৃতির ধর্ম পুরুষে নাই, এই “নেতি নেতি” বা নিষেধ মুখে কেবল পুরুষের স্বরূপ সাংখ্যদর্শনে ইঙ্গিত করা আছে । পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় । তাহা উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে । তাহা সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে । তাহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজনও সাংখ্যদর্শনের নাই এবং তাহা সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টাও সাংখ্যদর্শনে করা হয় নাই । তাহা হইতেই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে হইবে ।

যুক্তি অনুসারে যে সাংখ্যের পুরুষবাদ গ্রাহ্য নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায় । কারিকার আছে,—জন্ম মরণ করণ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম হেতু, অব্যুৎপৎ প্রবৃত্তি হেতু এবং ত্রিগুণের বিপর্যয় হেতু পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয় (কারিকা) । কিন্তু ইহাই পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ করিবার যথেষ্ট কারণ নহে । এক পুরুষবাদেও ইহার ব্যাখ্যা হয় । বেদান্তে ও শাক্তর ভাষ্যে তাহা বুঝান আছে । সাংখ্যকারিকার উক্ত হইয়াছে, কার্যাকারণের বিভাগ ও বিশ্বরূপের অবিভাগ হইতে এক প্রকৃতির অনুমান করিতে হয় । এ জগৎ অনন্ত বৈচিত্র্যময় অথচ ইহা শৃঙ্খলাবদ্ধ এক অবিভক্ত (Organised whole) । এই বিভাগ অবিভাগ, এই একত্ব বহুত্ব বুঝিবার জন্য মূলে দুই তত্ত্ব সাংখ্যশাস্ত্রে কল্পিত । এই দুই তত্ত্ব পুরুষ ও

প্রকৃতি । এই বিভাগ ও অবিভাগের কারণ বুঝিবার জন্য সাংখ্যশাস্ত্র প্রকৃতিকে এক এবং পুরুষকে 'বহু' কল্পনা করিয়াছেন । আর এই এক প্রকৃতিও যে ত্রিগুণাত্মিকা অথবা বহু সত্ত্ব, বহু রজঃ ও বহু তমোগুণের মিলিত সাম্যাবস্থা, তাহাও কল্পনা করিয়াছেন । ইহাতে কল্পনা-বাহুল্য হইয়াছে । কল্পনালব্ধ দ্বারা যদি ইহা বুঝিতে পারা যায়, যদি ইহা নির্ণীত (explained) হয়, তবে সেই কল্পনা (theory)ই গ্রাহ্য । ইহা জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা । এক ব্রহ্ম অর্থাৎ অনন্ত পরাশক্তিময় বা অনন্ত জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তিময় ব্রহ্ম কল্পনা করিলেই এ অগতের একত্ব ও অনন্ত বৈচিত্র্য বুঝিতে পারা যায় । একত্র ইহার নিমিত্ত কোনরূপ কল্পনা-বাহুল্যের পরিবর্তে এই 'বেদান্তসম্মত কল্পনাই (theory) বুঝিতে গ্রাহ্য । যাহা হউক, এ স্থলে এ সকল কঠিন দুর্কোধ্য দার্শনিকত্বের আলোচনার প্রয়োজন নাই ।

পুরুষের বদ্ধাবস্থা—অতএব যে পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিকে অর্থাৎ অষ্টধা ভিন্ন অপরা প্রকৃতিকে বা নিজ-শরীরকে আত্মস্বরূপকে গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে এবং গুণসঙ্গহেতু বিবিধ ঘোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সংসার ভোগ করে, সে পুরুষ এক, সে পুরুষ স্বরূপতঃ পরমাশ্রী মহেশ্বর পরম পুরুষ । বদ্ধ অবস্থায় পুরুষ, আপনার এই স্বরূপ জানিতে পারে না । ইহাই অজ্ঞান । এই অজ্ঞান-বদ্ধ অবস্থায়, এই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বাপন্ন অবস্থায় পুরুষ পরমাশ্রী মহেশ্বর বা পরম পুরুষ বা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম নহে । জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, সর্বরূপ পরিচ্ছিন্নতা দূর করিতে না পারিলে, সে তাহার স্বরূপ অবস্থা জানিতে পারে না—সে অবস্থা লাভ করিতে পারে না । দেহস্থ ও দেহবদ্ধ পুরুষের সে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় পরবর্তী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । বদ্ধ পুরুষ দেহে তাদাশ্রীহেতু সে যে দেহের অতীত আশ্রী, তাহা বুঝিতে পারে না ।

পুরুষ দেহে ‘পর’—পুরুষ যে প্রকৃতির অতীত এবং প্রকৃতিই ইন্দ্রিয়, মন অহঙ্কার, বুদ্ধি, জীবতার সকলেরই অতীত, তাহা শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে । শ্রুতিতে আছে—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃদ্যাঃ অর্ধেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসশ্চ পরা বুদ্ধিবুদ্ধেরাশ্চা মহান্ পরঃ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষায় পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥

(কঠ-উপঃ ৩।১।১১)

অন্তর আছে—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সৎসুস্তমম্ ।

সৎসাদধি মহানাশ্চা মহতোহব্যক্তসুস্তমম্ ॥

অব্যক্তাৎ তু পরঃ পুরুষঃ ব্যাপকোহলিঙ্গ এবচ ॥

(কঠ-উপঃ ৩।৭-৮) ।

কঠোপনিষদের এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, সৎ বা বুদ্ধির অতীত মহানাশ্চা, মূলপ্রকৃতি বা অব্যক্ত তাহার অতীত, আর পুরুষ সে অব্যক্তের অতীত—তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ । এই মহানাশ্চাই জীব—তাহাই ‘পরা’ প্রকৃতি (গীতা, ৭।৪) । তাহা বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত আশ্চা বা চৈতন্য । তাহা অপরা-প্রকৃতি-সংসৃষ্ট । তাহাকে কর পুরুষ বলা যায় না । কর পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে প্রভেদ তাহা পরে, ১৫।১৬ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইবে ।

পুরুষ সর্বভূতে পরমাত্মা স্বরূপ ।—এই যে পুরুষ, ইনি আশ্চা । তিনি এক সর্বভূতে গূঢ়ভাবে স্থিত পরমাত্মা ।—শ্রুতিতে আছে—

“এষ সর্কেষু ভূতেষু গুঢ় আশ্চা প্রকাশতে ।”

(কঠ, ৩।১২) ।

ঊহাকে জানিলে আর শোক মোহ থাকে না, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন, বধা,—“অশরীরং শরীরেষু অনবহেষবহিতম্ ।

মহাস্তং বিজ্ঞানানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥”

(কঠ, ২।২২) ।

এই আত্মাই সবুদায় ।

“ইমানি ভূতানি ইদং সৰ্ব্বং বৎ অয়ম্ আত্মা ।”

(বৃহদারণ্যক ২।৪।৩) ।

“অয়মাত্মা ব্রহ্ম সৰ্ব্বানুভূঃ ইতি অনুশাসনম্ ।”

(বৃহদারণ্যক, ২।৫।১২) ।

এই শ্রুতি অনুসারে এই সৰ্ব্বানুভবকরী আত্মাই ব্রহ্ম । তিনিই পুরুষ ।

মূল উপনিষদে পরমাত্মা স্বতন্ত্র ভাবে উক্ত হন নাই । সৰ্ব্বত্র আত্মারই উল্লেখ আছে । কেবল বৃহদারণ্যকে এক স্থানে আছে “নমঃ পরমাৰ্হ্মনে” (৩।১।১) ।

পরমাত্মা-রূপে পুরুষ মহেশ্বর ।—এই পরমাত্মাই সকলের শাস্তা, সকলের নিয়ন্তা । শ্রুতিতে আছে—

“ভয়াদস্তাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ ।

ভয়াৎ ইন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ ॥”

পরমাত্মা-রূপে পুরুষই মহেশ্বর । ক্রম পুরুষভাবে তান মহেশ্বর নহেন । দেহস্থ দেহবদ্ধ ‘পরাপ্রকৃতি’ জীবভাবে তিনি মহেশ্বর নহেন । নিজ শরীরে বদ্ধ পুরুষরূপেও তিনি মহেশ্বর নহেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । পরমাত্মা পরমেশ্বরকেই শ্রুতিতে মহেশ্বর বলা হইয়াছে । সগুণ ব্রহ্মই মহেশ্বর । জীবাত্মাকে কোথাও মহেশ্বর বলা হয় নাই । এই ব্রহ্মই ‘ঈশ, ঈশান ঈশ্বর, মহেশ্বর’ । শ্রুতিতে আছে—

“এব সৰ্ব্বেশ্বর এব সৰ্ব্বজ্ঞ এব সৰ্ব্বাত্ম্যামী ।” (মাতৃকা, ৬) ।

সৰ্বশ্চ বশী সৰ্বস্য ঈশানঃ সৰ্বশ্চ অধিপতিঃ ।...

‘এষ সৰ্বেশ্বর এষ ভূতপাল এষ ভূতপতিঃ এষ সেতুৰ্বিধারণে ।’

সৰ্বশ্চ প্রভুমৌশানঃ সৰ্বশ্চ শরণং মহৎ ॥’ (খেতাখতর, ৩।১৭) ।

‘ভমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ ।’ (খেতাখতর, ৬।৭) ।

‘স এষ সৰ্বশ্চ ঈশানঃ সৰ্বশ্চ অধিপতিঃ সৰ্বমিদং
প্রশান্তি যদিদং কিঞ্চ ।’ (বৃহদারণ্যক, ৫।৬।১) ।

অতএব মহেশ্বর এই সগুণ ব্রহ্ম—এই পরমেশ্বর । গীতার পরে উক্ত হইয়াছে (১৩।২৭ ; ১৮।৬১) যে, এই ঈশ্বর বা পরমেশ্বরই সৰ্বভূত-
হৃদয়ে বাস করেন ।

হৃদয়স্থিত পরমেশ্বররূপেই তিনি সকলকে ‘নিৰ্মিত করেন, তিনি সকলের মহেশ্বর হন । ঋতিতে আছে—

‘এষ হেতৈবনং সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি, তং বন্ এভ্যো লোকেভ্য
উন্নীয়তে ।’ (কোষিতকী উপঃ ৩।৮) । অথচ তাঁহার নিয়ন্ত্ৰণে
জীবের যে কৰ্ম্ম হয়, তাহাতে তিনি অসংস্পৃহ থাকেন । ঋতি
বলিয়াছেন—

‘স ন সাধুনা কৰ্ম্মণা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কনীয়ান্ ।’

(বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২ ; কোষিতকী ৩।৮) ।

এই ব্রহ্মই যে জীবজগৎরূপে বিবর্তিত, ব্রহ্মই যে জীবাত্মা বা পুরুষ,
তাহা ঋতিতে বারবার উক্ত হইয়াছে । ঋতিতে আছে—

‘স বা অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ চক্ষুৰ্ময়ঃ
শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময়ঃ আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ো-
হতেজোময়ঃ কামময়োহকামময়ঃ ক্রোধময়োহক্রোধময়ঃ ধৰ্ম্মময়োহধৰ্ম্মময়ঃ
সৰ্বময়স্তদ্ বদেভদিদম্ময়োহদোময় ইতি, যথা কৰ্ম্মী যথাচারী তথা ভবতি,
সাধুকারী সাধুভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা
ভবতি, পাপঃ পাপেন । অথ খরাত্হঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি । স

যথাকামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কৰ্ম কুরুতে, যৎ
কৰ্ম কুরুতে তদাতিসম্পত্ততে ।”

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪।৪ ৫) ।

গীতার এই শ্লোকের অর্থ । অতএব সেই এক ব্রহ্মই বহুপুরুষ
হয়েন, তিনি অক্ষর পুরুষ এবং তিনি পরমপুরুষরূপে প্রতিদেহে
অধিষ্ঠিত থাকেন । তিনিই বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদিবৃক্ত অস্তঃকরণ, তিনি চক্ষুঃ
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপে সর্বতঃ পাণিপাদ হইয়া বিবর্তিত ; তিনিই আকাশাদি
স্থলভূত,—তিনিই সমুদায় । এ সমুদায়ই ব্রহ্ম । তিনি প্রতি দেহ সৃষ্টি
করিয়া, তাহাতে . অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, বন্ধের শ্রায় হন, তিনিই
অকাম হইয়াও কামবৃক্ত হন, অকর্তা হইয়াও কর্তা হন, পাপ বা পুণ্য-
কৰ্ম আচরণ করিয়া অসাধু বা সাধু হন । তিনিই জীবরূপে বদ্ধ হন ।
তিনিই আপনাকে সে বদ্ধ-ভাব হইতে মুক্ত করেন । তিনিই এ
সমুদায় ।

অতএব এ স্থলে এই গীতোক পুরুষের স্বরূপ কি, এবং সাংখ্যোক
পুরুষ হইতে তাহার প্রভেদ কি, তাহা ব্রহ্মসূত্রপদে বা বর্তমান প্রচলিত
উপনিষদ হইতে বুঝিতে পারা যায় । এতদনুসারে এই শ্লোকের সংকলিত
অর্থ এইরূপ :—

যিনি উপদ্রষ্টা অর্থাৎ জীবের অন্তরতম প্রদেশে দ্রষ্টৃ-স্বরূপে—আত্ম-
স্বরূপে অবস্থান করেন, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিলে যে দ্রষ্টা-স্বরূপে অবস্থান
করা যায় (পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১।৩) সেই দ্রষ্টৃ-স্বরূপ যিনি,—যিনি
অনুমত্তা অর্থাৎ জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া তাহার কামকৰ্ম নিয়মিত
ও অনুমোদন করেন এবং যিনি জীবভাবে ভর্তা বা ভরণকর্তা ও
অন্তর্ধ্যামিরূপে মায়াধারা সর্বভূতকে যত্রাকৃষ্ণের শ্রায় চালন করেন,—
যিনি ভোক্তা অর্থাৎ জীব-হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থান করিয়া, তাহাকে
কৰ্মে প্রণোদিত করিয়া নির্লিপ্তভাবে সুখ দুঃখ বন্দাতীত আনন্দস্বরূপ

হইতে অপ্রচ্যুত ভাবে সেট কর্ণের ভোক্তা হন,—যিনি মহেশ্বর অর্থাৎ সর্বজীবে ও সর্বজগতে সর্বত্র অধিষ্ঠিত থাকিয়া সকলের নিরস্তা ও শান্তা হন, যিনি পরমাশ্রা, অর্থাৎ সর্বভূতে অন্তর্যামী আশ্রারূপে থাকিয়া তাহাদের আশ্রিত্যের (self এর) বিকাশ করেন,—যিনি প্রতিদেহে বিভক্তের স্তার অবস্থিত হইয়াও দেহ হইতে ভিন্ন 'পর' রূপে বা পরম-পুরুষ-ভাবে অবস্থান করেন,—তিনিই পুরুষ । ইহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ । সমগ্র গীতা-শাস্ত্র ও তাহার সমন্বয় হইতে এই অর্থই নিষ্কলিত হয় ।

য এবং বেত্তি পুরুষঃ প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ।
সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥২৩

যে জানে পুরুষে আর সর্বগুণ সহ
প্রকৃতিকে এইরূপে, থাকি বর্তমান
সর্বরূপে, পুনঃ আর না লভে জনম ॥২৩

২৩ । যে জানে পুরুষে...প্রকৃতিকে এইরূপে—এইরূপে এ স্থলে আমার স্বরূপ যে প্রকার উক্ত হইয়াছে, সেই লক্ষণযুক্ত আশ্রাকে যিনি উক্ত প্রকারে জানিয়াছেন, অর্থাৎ সাক্ষাৎ আমিই সেই পুরুষ, এইরূপ জানিয়াছেন এবং উক্ত লক্ষণ প্রকৃতি বা অবিদ্যাকে যিনি উক্তরূপে গুণ বা স্রাবিকার সহ জানিয়াছেন, অর্থাৎ এই প্রকৃতির বাস্তবিক কোন সত্তা নাই, বিদ্যাই ইহার বিনাশ করিয়া থাকে, যিনি এইরূপ জানিয়াছেন । (শঙ্কর) ।

উক্ত-স্বভাব পুরুষকে এবং উক্ত-স্বভাব প্রকৃতিকে আর পরে (১৪শ অধ্যায় হইতে) বক্ষ্যমাণ স্বভাবযুক্ত ও স্রাবিক গুণ সহ এই প্রকৃতিকে যিনি স্বথাবৎ বিবেকদ্বারা জানিয়াছেন । (রামানুজ) । এখানে

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞানীর স্তুতি করা হইয়াছে । এই উপদ্রষ্টাদিক্রমে পুরুষকে যিনি জানেন, এবং সুখ-দুঃখাদি পরিণাম সহিত প্রকৃতিকে জানেন (স্বামী) । এইরূপে পূর্কোক্ত প্রকারে যিনি গুণের সহিত প্রকৃতিকে ও পুরুষকে ভগবানের রূপ বলিয়া জানেন (বল্লভ) ।

কেন্দ্রজ্ঞ স্বভাব ও স্বপ্রভাব, তাহা (পুরুষ স্বরূপ উপকরণ) উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে ১২শ শ্লোকে 'যাহা জানিয়া অমরত্ব লাভ করিবে' বলা হইয়াছে, তাহারই উপসংহার করা হইতেছে । উক্ত প্রকারে সেই পুরুষকে জানিয়া, অর্থাৎ এই পুরুষ যে আমি, ইহা সাক্ষাৎকার করিয়া এবং অবিদ্যারূপ প্রকৃতিকে অবিকার সহ জানিয়া অর্থাৎ তাহা যে মিথ্যা, আত্মবিদ্যা দ্বারা বাধিত হয়, ইহা জানিয়া এবং এইরূপে বাহার অজ্ঞান ও তৎকার্য্য নিবৃত্ত হইয়াছে । (মধু) ।

এ স্থলে জ্ঞানফল উক্ত হইয়াছে । ইতিপূর্বে ভগবান বুঝাইয়াছেন যে, পুরুষ মহেশ্বর এবং প্রকৃতিই জীব, তাহা যিনি জানিয়াছেন, (বলদেব) । এ স্থলে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞানীর স্তুতি করা হইতেছে । উপদ্রষ্টাদি স্বভাব পুরুষকে এবং গুণসহ অর্থাৎ সুখদুঃখাদি পরিণামস্বভাব প্রকৃতিকে যিনি জানেন (কেশব) ।

এ স্থলে ব্যাখ্যাকারগণ পুরুষ ও গুণসহ প্রকৃতিকে বেরূপে বুঝাইয়াছেন, তাহা যে গৌতাম পুরুষ প্রকৃতিতত্ত্বের সহিত ঠিক সঙ্গত হয় নাই, তাহা পূর্ব কল্প শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যাইবে । পুরুষের স্বরূপ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর বটেন, পুরুষ জীব নহেন, পুরুষ বহু নহেন—এক, এ কথা সঙ্গত । কিন্তু প্রকৃতি অবিদ্যা নহে, প্রকৃতি জীবও নহে । পরা প্রকৃতি জীব হইলেও এ স্থলে যে প্রকৃতিও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা জীব নহে । তাহা অপরা প্রকৃতি । পুরুষ-প্রকৃতি-জ্ঞান অর্থে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান । তাহা অদ্বন্দ্ব অপরোক্ষ জ্ঞান । কেবল শ্রবণ মাത്രেই তাহা লাভ করা যায় না । মনন দ্বারাও লাভ করা যায় না । নির্দিধ্যাসন

দ্বারা তাহা লাভ করা যায় । ফিরুপে তাহা লাভ করা বাইরে পারে, তাহা এই অধ্যায়েই পরে বিবৃত হইয়াছে । ক্ষেত্রজ্ঞ-ক্ষেত্র-জ্ঞান, এই পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞানের অন্তর্গত ।

খাঁকি বর্তমান সর্বরূপে—(সর্বথা বর্তমানোহপি)—সর্ব-প্রকারে বর্তমান থাকিলেও (শঙ্কর) । বিহিত নিমিত্ত যে কোন ভাবে (গিরি) । দেব-মনুষ্যাদি-দেহে অতিমাত্র ক্লিষ্টভাবে বর্তমান থাকিয়াও (রামানুজ) । বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া বর্তমান থাকিলেও (শ্যামী) । প্রায়ক কৰ্ম্মবশে ইন্দ্রের শ্রায় বিধি অতিক্রম করিয়া বর্তমান থাকিলেও (মধু) । সর্বথা অর্থাৎ ব্যবহার সম্পর্কে বর্তমান থাকিলেও (বলদেব) । সেইরূপ আচরণকারী যিনি হন (বল্লভ) । তিনি দেব-মনুষ্যাদি যে কোন দেহে এবং সুখী বা দুঃখী যে কোন অবস্থায় বর্তমান থাকিয়াও (ক্ষেত্র) ।

‘সর্বথা’ শব্দের অর্থ সর্বপ্রকারে অথবা যে কোন প্রকারে বা যে কোন ভাবে । বর্তমান শব্দ ‘বৃত্’ ধাতুজ । ‘বৃত্’ ধাতুর অর্থ ‘প্রবৃত্ত’ হওয়া, অর্থাৎ বর্তমান শব্দে ‘কন্ম্বে প্রবৃত্তি’ বুঝায় । যে গুণ ও ক্রিয়া দ্বারা কোন দ্রব্যের উপস্থিত অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই কন্ম্বে ও গুণ দ্বারা সে দ্রব্যকে ‘বর্তমান’ বলা যায় ; অতএব এ স্থলে বর্তমান অর্থে কন্ম্বে প্রবৃত্ত অবস্থাই বুঝায় । ব্যাখ্যাকারগণ তাহাই বুঝিয়াছেন । যাহা হউক, বর্তমান অর্থে যে কোন অবস্থায় অবস্থানও বুঝাইতে পারে । তদনুসারে অর্থ এই যে—যিনি এই তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি কন্ম্মযোগে, কন্ম্মসন্ন্যাস-যোগে, জ্ঞানযোগে, ধ্যানযোগে বা ত্ত্বিকযোগে, যে কোনরূপ যোগে ব্যাপ্ত থাকেন । যাহা হউক, এ স্থলে যে কোনরূপ কন্ম্মে ব্যাপ্ত অর্থ অধিক সম্ভব । কেন না, যিনি জ্ঞানী, তাঁহার জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, কন্ম্মসন্ন্যাসযোগ বা ত্ত্বিকযোগ সাধনের প্রয়োজন থাকে না । তাঁহারা এইরূপ কোন এক সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়া তবে জ্ঞানী হইয়াছেন । জ্ঞানী হইলেও কন্ম্মানু-

ঠান হইতে পারে । অতএব এই শ্রেণী অর্থই সঙ্গত । সর্বথা অর্থে হিত-অহিত, বিহিত-অবিহিত, লোকের মঙ্গলকর-অমঙ্গলকর সুকৃত-দুকৃত কৰ্ম সমুদায়ই বুঝায় না । ভগবান্ কৰ্মযোগের অধুষ্ঠান অত্র যে সকল বিভিন্ন-রূপ কৰ্মের কথা বলিয়াছেন, কেবল তাহাই বুঝায় । কেবল সেই কৰ্মই কাম-সংকল্প-বিহীন, রাগ-দ্বेष-মলাহীন হইতে পারে এবং কেবল তাহাই আর পুনর্জন্মের কারণ হয় না । একথা পরে উল্লিখিত হইবে ।

আর না লাভে জন্ম (৩ স ভূয়োহভিজায়তে)—তিনি এই স্থলশরীর বিনাশের পর অত্র দেহ গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন না । তাঁহার আর স্থলশরীর গ্রহণ হয় না, দেহান্তর-গ্রহণও হয় না । সর্বপ্রকারে বর্তমান থাকিলেও যখন তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না, তখন ‘স্বরূপ’ বা স্বধর্ম্যাকারে প্রবৃত্ত থাকিলে যে আর জন্ম হইবে না, সে সম্বন্ধে কথাই নাই । ইহাই এই শ্লোক ‘অপি’ শব্দের তাৎপর্য (শঙ্কর) । তাঁহার পনর্ব্যার আর প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হয় না, তিনি আর প্রকৃতি-সংবদ্ধ হন না । সেই দেহাবসানে তিনি ‘অপহতপ্পপ্যা’ ও অপরিচ্ছিন্ন লক্ষণ আত্মাকে প্রাপ্ত হন (রামানুজ) । সে মুক্ত হয় (স্বামী বলদেব) । বিজ্ঞা দ্বারা অবিজ্ঞানাশ হেতু, আর সেই অবস্থা কার্যের (দেহ গ্রহণের) সম্ভাবনা না থাকায় এই বিদ্বৎ শরীর ধ্বংসের পর আর দেহ-গ্রহণ হয় না । তিনি বিহিত অবিহিত কোনরূপ কৰ্ম করিলেও আর যখন তাঁহার পুনর্জন্ম লাভ হয় না, তখন বিধি অতিক্রম না করিয়া স্বরূপ থাকিলে যে পুনর্জন্ম লাভ করিবেন না, তাহা নিশ্চয় । ‘অপি’ শব্দের ইহাই অর্থ (মধু) । আর প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হয় না (কেশব) ।

কৰ্ম ও কৰ্মবীজ নাশ ।—এ স্থলে যে উক্ত হইয়াছে, আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে । পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জান হইলে, সেই জ্ঞান দ্বারা সমুদায় কৰ্মবীজ বিধ্বস্ত হইয়া যায় । কৰ্মই জন্মের কারণ । সেই কৰ্মবীজ নষ্ট হইলে আর কৰ্মঅত্র জন্মগ্রহণ

হইতে পারে না । বীজ নষ্ট হইলে আর অঙ্কুর হয় না । শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, যদি এই জ্ঞানলাভ করিলেই যুক্তি হয়, আর জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, তাহা হইলে কৰ্ম্মফল-ভোগের যে নিয়ম অপরিহার্য্য, তাহার ব্যাঘাত হয় । যদি এই জন্মে এই জ্ঞান-লাভ হেতু আর জন্ম না হয়, তাহা হইলে, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে এই জন্মে কৃত কৰ্ম্ম, জ্ঞানোৎপত্তির পরে যে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে, এবং অসংখ্য পূৰ্ব্ব জন্মের অনুষ্ঠিত যে সকল কৰ্ম্মসংস্কার সঞ্চিত আছে, তাহার নিজ নিজ ফলভোগ না করিয়াই একেবারে বিধ্বস্ত হইবে । ইহা যুক্তি-যুক্ত নহে । বিশেষতঃ তাহাতে ফলের জন্ম কৰ্ম্ম করিবার যে উপদেশ আছে, তাহা নিরর্থক হয় । অতএব জ্ঞানোৎপত্তির পর সেই তিনরূপ কৰ্ম্মফলক্ষয়ের জন্ম তিনটি, অন্ততঃ একটি জন্মেরও প্রয়োজন স্বীকার করিতে হয় । শঙ্করাচার্য্য এই আপত্তির আশঙ্কা করিয়া ইহার উত্তর দিয়াছেন । তিনি বলেন, জ্ঞানোৎপত্তি হইলেই যে সমুদায় কৰ্ম্মক্ষয় হইয়া যায়, তাহা শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রেই উপদিষ্ট হইয়াছে । যথা—

“কৌরুন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি যস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ।”

“ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।”

“তস্ত তাবদেব চিরমিষীকাতুলবৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি প্রদূরন্তে ।”

এরূপ বহু শ্রুতি আছে । অতএব শাস্ত্র অনুসারে জ্ঞানীর সৰ্ব্বকৰ্ম্ম দূর হইয়া যায় । গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

“যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নিৰ্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥” (৪।৩৭)

যুক্তিতেও ইহাই সিদ্ধ হয় । অবিষ্টা কাম ক্লেশ বীজ নিমিত্তই কৰ্ম্ম-ফলারম্ভক হয় । ইহার অস্ত্র আরম্ভক নাই । শাস্ত্রে আছে—

“বীজাত্ম্যুপদষ্টানি ন যোহগ্নি যথা পুনঃ ।

জ্ঞানদগ্ধে তথা ক্লেশেনাত্মা সম্পদ্যতে তথা ॥”

ইহাতেও এক আপত্তি হইতে পারে যে, জ্ঞানোৎপত্তির পরে অনুষ্ঠিত কর্ম সমুদায় দগ্ধ হয়, বটে, কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে কৃত কর্মবীজ কিরূপে জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হইবে ? কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা সর্বকর্ম দগ্ধ হয়, ইহাই উপদেশ দিয়াছেন । সর্ব শব্দের অর্থ-সংকোচ করা বুদ্ধিবৃত্ত নাহে । প্রারম্ভ কর্ম, ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া, তাহা নষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু যে সব সঞ্চিত কর্ম ফলোন্মুখ হয় নাই, বা ফল দিতে আরম্ভ করে. নাই, তাহারা অবশ্যই জ্ঞান দ্বারা নষ্ট হয় আর ফলোন্মুখ হইতে পারে না । ধনুক হইতে যে বাণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাকে সংবরণ করা যায় না বটে, কিন্তু যে বাণ প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা সংবরণ করা যাইতে পারে । সেইরূপ প্রারম্ভ কর্ম অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত কর্মমধ্যে যেগুলির বীজ কার্যোন্মুখ হইয়া এই জন্মের কারণ হইয়াছে—এই জাতি, আয়ু ও ভোগের কারণ হইয়াছে, সে কর্ম সেই লক্ষ বেগ হেতু বাবজ্জীবন ফল দান করিবে বটে, কিন্তু যে সঞ্চিত কর্ম ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, তাহাদের বীজই জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হইয়া নিফল হয় ।

যদি জ্ঞানোৎপত্তি মাত্র প্রারম্ভ কর্ম ও বিধ্বস্ত হইত, তবে তৎক্ষণাৎ এ শরীরও বিধ্বস্ত হইত ; কিন্তু তাহা হয় না । পূর্বসঞ্চিত সংস্কার-বেগ দ্বারা (চক্রবৎ) শরীর ধৃত হয় । এ জন্ম প্রারম্ভ কর্ম জ্ঞানদ্বারা নষ্ট হয় না, ইহা স্বীকার করিতে হয় । অতএব এই জ্ঞান-স্থিতি হইলে পূর্বসঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম দগ্ধ হইয়া যায় বলিয়া আর পুনর্জন্ম হয় না । জ্ঞান অগ্নিস্বরূপ ; তাহা সমুদায় কর্মবীজকে দগ্ধ করে বলিয়া তাহার অনুরোৎপাদনশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায় ।

এই জ্ঞান দ্বারা কিরূপে কর্মবীজ বিধ্বস্ত হয় ? যাহা হউক, যিনি পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞানী, তিনি কর্মাচরণ করিয়াও কিরূপে আর জন্ম ও সংসারের অধীন হন না, তাহা এ স্থলে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত ।

জ্ঞান, তাই পুরুষ (এই ব্যাখ্যায় ১-১০ শ্লোক) উক্ত পুরুষ-জ্ঞানার্থ-দর্শন সেই জ্ঞানের এক রূপ । বলিয়াছি ত, এই পুরুষ-জ্ঞান প্রকৃতি-পুরুষ-জ্ঞান । এই জ্ঞান হইতেই গীতা অনুসারে মনস্ব, ব্রহ্মত্ব, অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব, জগত্ব, ইহাদের পরস্পর মনস্ব-ত্ব, এবং এই জগদতীত নিশ্চয় ব্রহ্মত্ব,—সমুদায়ই জানিতে পারা যায় ।

বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে রজস্তোমামলাহীন শুদ্ধ সাত্বিক ও সম্পূর্ণ নির্যমল না হইলে, এই জ্ঞান তাহাতে প্রাপ্তভাৱ হইতে পারে না, এবং বুদ্ধি এই জ্ঞানের স্বরূপ হইতে পারে না । এই পুরুষরূপ নির্যমল বুদ্ধি-ও পুরুষ দেহের পুরুষ আপনার স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন । ইহাই গীতার উপদেশ । চিত্তে কোনরূপ মলিনতা থাকিলে, চিত্তদর্পণে সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও নির্মল না হইলে, পুরুষ তাহাতে আপনার স্বরূপ স্পষ্ট দেখিতে পারেন না ।

কামই কর্মনীজ ।—চিত্তের সকল মলিনতার মূল কাম বা কামনা । ‘কাম’ এই সংসারের মূল—এ জগতের মূল । বলিয়াছি, ব্রহ্ম বহু শব্দে কামনা :—ব্রহ্মই সৃষ্টি করেন । এই জগৎ সৃষ্টিতে আছে—“কামঃ সর্বম্” । কামের ইংরাজী প্রতিশব্দ ‘Will’, জার্মান পণ্ডিত স্পেনসার তাহাকে কাম-কারণ এবং জগৎ এই কামেরই অভিযুক্তি, তাহ বুঝাইয়াছেন । তিনি যে উপনিষদ হইতেই এ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়াছেন । এট কাম যেমন জগতের মূল, তেমনি তাহা এক অর্থে পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগের মূল । এই সংযোগের মূল কারণ যে অজ্ঞান, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । সেই অজ্ঞানের মূল এই ‘কাম’ বা কামনা । ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ; পূর্বে ২০শ ও ২১শ শ্লোক পুরুষের ভোক্তৃত্ব ও অবর্ত্ত্বের ব্যাখ্যাশ্রমে এই কামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি ।

অতএব বলা যায় যে,—(সপেনসার-কৃত ‘World as Will and

Idea (ইদ্যা) ; 'কাম' হেতু পুরুষের প্রকৃতি-সংস্কার হইবে এবং পুরুষকে প্রকৃতিবদ্ধ হইতে হয় । প্রকৃতি এই কামকে কেন্দ্র (nucleus) করিয়া পুরুষের ক্ষেত্র গঠন করে । তাহার লিঙ্গ-শরীর বা সমুদায় করণ উৎপাদন করে । এই 'কাম'কে কেন্দ্র করিয়াই যত কর্ম সম্পাদিত হয়, তাহার সংস্কার-জালের সৃষ্টি হয় । এই সংস্কার অনুসারে সূক্ষ্ম শরীর বার বার সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করে, এই সংস্কার অনুসারে সেই সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা কর্ম করিয়া সেই সংস্কারকে ক্রম-আপূর্ণিত করিতে থাকে । এইরূপে 'বহু' জন্ম ধরিয়া এই 'কাম'কে কেন্দ্র করিয়া সংস্কারবাণি সঞ্চিত ও ক্রম-ক্রমে ক্রম-আপূর্ণিত হইতে থাকে । এইরূপে ৩. ৩ হইতে ১২. ১২ পর্যন্ত ক্রম-ক্রমে সংস্কার অনুসারে কর্ম আচারিত হয় এবং সেই সকল কর্মের সংস্কার সেই লিঙ্গশরীরে 'কাম' কেন্দ্রের চারি দিকে সংযুক্ত হইতে থাকে । তাহা দ্বারা কাম-জাল হোমন করে, মানসম সোমসদ জাল হইতে 'নয়ম' কোষের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে, এবং তদনুসারে জীবের জাতাস্তর-পরিণাম হইতে থাকে ; এক কথায় আমাদের চিত্তই এই সংস্কারের সমষ্টি । তাহা যে এই সংস্কারের আধার, তাহা অবশ্য স্বীকার্য । সেই সংস্কারই ক্রম-আপূর্ণিত হইয়া চিত্তকেও ক্রম-গঠিত করে, উন্নত করে, শেষে জ্ঞানভাভের উপযুক্ত করে । *

* আধুনিক পণ্ডিতগণ এই সংস্কারবাস্তবিক বংশানুক্রমে (by the law of heredity) সঞ্চিত বলেন । ক্ষুদ্র জীবাণু (ameba protosoa) হইতে আরম্ভ করিয়া স্তম্ভ আসিতে এই সংস্কারবাণি ক্রম সঞ্চিত হয় । ইহাও এখনকার সিদ্ধান্ত । পশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রসিদ্ধ ডারউইনকে অনুসরণ করিয়া, ইহা জীব জাতের নিয়ম, এইমাত্র স্বীকার করেন । ইহা যে প্রতি ব্যক্তি সম্বন্ধে নিয়ম, তাহা স্বীকার করেন না । আমাদের শাস্ত্র মতে জীব তৃণ হইতে একাধিক পর্যায়ে লাভ করিতে পারে । এই পরিণতি জন্ত কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয় । বৃক্ষযোনি হইতে বিহীনরূপ পক্ষি-যোনি, বিভিন্ন পশুযোনি ভ্রমণ করিয়া তবে মানব জন্ম লাভ হয় । মানুষজন্ম লাভের পূর্বে কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়, আবার কত লক্ষ মানব-যোনিতে ভ্রমণ করিলে তবে মানুষ মুক্তির উপযোগী হয় — জ্ঞান লাভ করে ।

বলিয়াছি ত, 'কাম' এই সংস্কারের আধার বা কেন্দ্র । সংস্কাররাশি বতই সঞ্চিত হয়, কাম বা বাসনাও তদনুসারে ক্ষুণ্ণি পাইতে থাকে । কাম, কৰ্ম ও কৰ্মজ সংস্কারের কারণ । আর কৰ্ম ও কৰ্মজ সংস্কার সে 'কাম' বা বাসনার ক্ষুণ্ণি ও পরিণতির প্রতি কারণ । এইরূপে কাম (Will) দ্বারা সংস্কাররাশি সঞ্চিত হইয়া, সেই সংস্কারজাল দ্বারাই পুরুষকে স্বকেন্দ্রে বদ্ধ করিয়া রাখে ।

জ্ঞান দ্বারা কাম-নাশ ।—যখন চিত্ত নির্মল হয়, তাহার বিজ্ঞান-ময় কোষের পূর্ণ পরিণতি হয়, তখন তাহাতে জ্ঞানের প্রকাশ হয় । সেই জ্ঞানের সাহায্যে চিত্তের যাহা কিছু মলিনতা অবশিষ্ট থাকে, তাহা দূর হয় । তখন এ মূল 'কাম' বা বাসনাবীজও বিধ্বস্ত হইয়া, তাহার সহিত সমুদয় সংস্কাররাশি নষ্ট হইয়া যায় । সমুদয় কামনাজ কৰ্মবীজ বিধ্বস্ত হয় । এই জন্ত গীতার উক্ত হইয়াছে—

“যশ সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কর-বর্জিতাঃ ।

জানার্খিদঙ্ককর্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥” ৪।১৯

এই কাম বা বাসনাই পুরুষের ব্যক্তিত্বের মূল (Principium Individuationis) । ইহাই অবিষ্টা-বীজ । ইহাকেই অনেকে মায়া-বীজ বলেন । ইহাই ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে, ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে । •

কাম-নাশে ব্যক্তিত্বের লোপ ও মুক্তি—চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল হইলে, যখন তাহাতে এই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয়, যখন তাহার পুরুষের স্বরূপ দর্শন হয় বা তাহাতে পুরুষের স্বরূপ পূর্ণ প্রতিভাত হয়, তখন এই কামবীজ নষ্ট হইয়া যায় । কামবীজ বিধ্বস্ত হইয়া গেলে, আমাদের ব্যক্তিত্ব—'আমি'ত্বের গতী দূর হইয়া যায় এবং কামকে আধার

• অতএব এই সংস্কার প্রতি জীবের নিজস্ব । মাতাপিতৃজ শরীর সেই সংস্কার-বিকাশের ক্ষেত্রমাত্র । সে সংস্কার-বিকাশের সহায় মাত্র । পুত্র মাতাপিতৃ-সংস্কার গার না । মাতাপিতৃজ সংস্কার তাহার সংস্কার-বিকাশের সহকারী কারণ মাত্র ।

বা কেন্দ্র করিয়া যে সংস্কারজাল গঠিত করিয়া চিত্তকে মলিন করিয়াছিল, সে সমুদায় সংস্কারজাল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কাজেই তাহার সহিত সমুদায় কর্মবীজ অর্থাৎ যে সব কর্ম বন্ধন-কারণ, তাহার মূল সমুদায়ও দৃষ্ট হইয়া যায়। তখন আর চিত্তে কোনরূপ মলিনতা থাকে না। চিত্তের কোনরূপ মলিনতা দ্বারা তাহাতে পুরুষের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা মলিন হয় না। পুরুষ তখন সেই নির্মল চিত্ত-দর্পণে আপনার স্বরূপ স্পষ্ট দেখিতে পায়। পুরুষের তখন প্রকৃতিবন্ধন, ব্যক্তিত্ব-ভাব (Individuality) ঘুচিয়া যায়। তখন তাহার সর্বত্র, (universality)-ব্রহ্মত্ব, তাহার পরমাত্মা মহেশ্বরের পরম স্বরূপ প্রকাশিত হয়। বাহার অহঙ্কার, দর্প, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সকলই দূর হইয়াছে, বাহার 'আমিত্ব' 'সমত্ব' ঘুচিয়া গিয়াছে, তিনি যে ব্রহ্মভূত হন, তাহা গীতার উক্ত হইয়াছে (৬।২৭ ; ১৮।৫৪)। বাহার কামনাদি দূর হইয়াছে, যিনি আপনাকে 'অতর্ক্য' রূপে জানিয়াছেন, যিনি সর্বভূতে পৃথক্ ভাবমধ্যে আপনার একত্ব দেখিতে পাইয়াছেন এবং সেই একত্ব হইতে এই বহুত্বের বিস্তার হইয়াছে জানিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মভাবাপন্ন বা ব্রহ্মসম্পদবুক্ত হন, আপনাকেও বিস্তার করিয়া দেন (গীতা ১৩।৩০)। তিনি আপনাকে এই সর্বগত সর্বত্রব্যাপ্ত ব্রহ্মরূপে জানিয়াছেন, তাহার আর ব্যক্তিত্ব বন্ধন থাকে না—ব্যক্তির সম্বন্ধীয় কোন 'কাম' বা বাসনা থাকে না, তিনি আর ব্যক্তিত্বমধ্যে আবৃত থাকেন না। তখন ব্যক্তিগত কাম ও কামজ কর্ম-সংস্কার সমুদায় বিধ্বস্ত হওয়ার, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না।

কাম নষ্ট হইলে যে ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায়, ব্রহ্মত্ব-লাভ হয়, তাহা উপনিষদেও উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—

“তদেব সক্তঃ সহ কর্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্ত।

প্রাপ্যাস্তং কর্মণস্তস্ত যৎকিঞ্চিৎ করোত্যয়ম্।

তন্মাল্লোকাৎ পুনরেত্য্যৈশ্চ লোকায় কর্মণ ইতি সূ কাময়মানোহ-

থাকাময়মানো যোহকামো নিকাম আপ্তকাম আশ্রকামঃ ন তস্ত প্রাণা
উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যোত ॥”

(বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৬) ।

ইহার ভাবার্থ এই যে,—যে ব্যক্তি কর্মফলে আসক্ত হইয়া কর্ম করে, সে সেই কর্মবিশিষ্ট হইয়া সেই ফলই প্রাপ্ত হয় । তাহার লিঙ্গশরীরামুর্গত মন যাহাতে সর্বতোভাবে আসক্ত হয়, সে কর্ম দ্বারা সেই ফলই লাভ করে । জীব ইহলোকে যে কিছু কর্ম করে, সে কর্মফল পরলোকে ভোগ করে । ভোগ দ্বারা তাহা নিঃশেষ হইলে, পুনর্বার এই জীবলোকে কর্ম করিবার জন্ত সমাগত হয় ।

এই প্রকারে কাময়মান পুরুষ সংসারে অনুবর্তন করে । কামনা-বিহীন পুরুষ তাহা করে না । যিনি অকাম, নিকাম, আপ্তকাম বা আশ্র-কাম, তাঁহার প্রাণ আর উৎক্রমণ করে না । তিনি ব্রহ্মভাব লাভের পর ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন ।

প্রকৃত জ্ঞানীর পক্ষে কেবল নিকাম কর্মই সম্ভব—এই তৎ-জ্ঞান প্রকৃতপ্রকারে লব্ধ হইলে, জ্ঞানী অতঃপর যদি কোন কর্ম করেন, তাহা অকাম ও আপ্তকাম হইয়া নিকাম ভাবেই আচরণ করেন । তাঁহার কাম বা বাসনাবীজ নষ্ট হইয়া গেলেও (অর্থাৎ জন্মোপ-পত্তিত সপেনহরের কথায়,—তাঁহার absolute denial of the will সিদ্ধ হইলেও) তিনি সেই নিকামভাবে অকর্তৃস্বরূপে অবস্থান করিয়াও আপনাকে সেই আশ্রয়রূপে যুক্ত রাখিতে পারেন, তাঁহার সে স্বরূপের প্রচ্যুতি হয় না । যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন (৪।১৮) করেন, যিনি ভগবান্কে স্বরূপতঃ আশ্রয় করিয়া সর্বকর্ম আচরণ করেন (১৮।৫৩), যিনি স্বধর্মাচরণ করিয়াও সর্বকর্মফল-সম্রাস দ্বারা নৈকর্ম্য সিদ্ধি লাভ করেন (১৮।৪৩), যিনি নিকাম ভাবে কার্য কর্ম আরম্ভ করেন (৩।১২), যে বিদ্বান্ লোকহিতার্থ কর্ম করেন

(৩২৫), যিনি মুক্ত, সঙ্গহীন ও জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া ষষ্ঠার্থ কৰ্ম্ম-
 চরণ করেন (৪২৩), যিনি ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করেন, (১২১০) তিনি
 কৰ্ম্মে অতিপ্রবৃত্ত হইয়াও কিছুই করেন না (৪২০), তিনি যোগে
 কৰ্ম্ম-ন্যাস পূৰ্ব্বক আশ্রয়ানু ও জ্ঞানদ্বারা সংশয়শূন্য হইয়া কৰ্ম্ম করিলেও
 বন্ধ হন না (৪১১), তিনি সৰ্ব্বভূতায়ুভূতায়ু হইয়া, কৰ্ম্ম করিয়াও
 কৰ্ম্মে লিপ্ত হন না (৫১৭), তিনি ব্রহ্মে সৰ্ব্বকৰ্ম্ম পৰ্য্যন্ত করেন বলিধা লিপ্ত
 হন না (৫১০) । যাহার তত্ত্বজ্ঞানলাভে 'কাম' বিধ্বস্ত হইয়াছে, যাহার
 ব্যক্তিবোধ যুচিয়া গিয়াছে, যাহার ব্রহ্মের ত্রায় 'বিতার' বা 'স্বাশ্রমসম্প্র-
 সারণ' হইয়াছে, তিনি কৰ্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া উক্ত প্রকারে যে কোন
 কৰ্ম্মানুষ্ঠান করুন, তাহাতে আর পুনর্জন্ম ভোগ করিতে হয় না । জ্ঞান
 হইলে, 'কাম'-বাক্স বিধ্বস্ত হইয়া যেনন তাহার সাহিত পূৰ্ব্ব-সংস্কার সমুদায়
 দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানে স্থিত হইয়া কৰ্ম্মযোগ করিলেও তাহাতে
 কাম না পাকায় জন্মাদি ফলপ্রদ সংস্কার আর উৎপন্ন হয় না ।

প্রকৃত জ্ঞানী অন্তায় কৰ্ম্ম করিতে পারেন না ।—অনেক
 ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে,—'সৰ্ব্বথা বর্তমানোহপি' অর্থে তিনি বিহিত
 অবিহিত যে কোনরূপ কৰ্ম্ম আচরণ করুন, ইহা সঙ্গত হইতে পারে না ।
 কেন না, যাহার জ্ঞানে স্থিতি হেতু 'কাম' দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, যিনি নিকাম,
 আপ্তকাম, আশ্রকাম হইয়াছেন, তিনি সাধারণ বিধি-নিষেধের অতীত
 হইলেও তিনি আর অকর্তব্য অন্তায় পাপ, লোকের বা সমাজের অহিত-
 কর, লোকের উদ্বেগকর কোন কৰ্ম্মই করিতে পারেন না । কেন না,
 এ সকল কৰ্ম্মের মূল 'স্বার্থ', 'কাম' । অনেক অজ্ঞানী মনে করেন যে, 'অহং
 ব্রহ্ম' এই মহাবাক্য শ্রবণে যখন আমার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তখন যদি
 আমি চুরি করি বা পরদারগমনাদি যে কোন চক্ষুর্কর করিয়া সমাজদ্রোহী
 হই, তাহাতে আমার মুক্তস্বরূপের হানি হয় না । তাহা প্রায়কবশে
 প্রকৃত বা অজ্ঞান দ্বারা কৃত কৰ্ম্ম মাত্র । তাহাতে আমার আশ্রয় সধক

নাই। আমি ত্রিগুণাতীত, অজ্ঞানাতীত,—ত্রিগুণহেতু দেহ দ্বারা যে কোন কর্ম হয়, তাহাতে আমি নিগিণ্ড। এই ধারণা যে ভুল এবং নানা অনর্থের মূল, তাহা আর বলিতে হইবে না। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানবীজ নষ্ট হইলে আর অজ্ঞানজ কর্ম হইতে পারে না। প্রকৃতি ও পুরুষ প্রয়োজন-সাধন জন্ত কর্ম করে মাত্র, ইহাই সাংখ্যদর্শনের উপদেশ। যখন পুরুষের প্রয়োজন শেষ হয়, যখন তাহার প্রকৃতিপুরুষবিবেক-জ্ঞান হয়, প্রকৃতি তাহা দ্বারা দৃষ্ট হয়, তখন প্রকৃতি আর তাহার জন্ত কর্ম করে না। সুতরাং তখন প্রকৃতি বা অজ্ঞানের উপর এই সকল কুর্কর্মের দোষ আরোপ করা নিতান্ত ভ্রান্তি মাত্র। পুরুষ যখন আপনার স্বরূপ জানিতে পারে, তখন সে আর প্রকৃতিবদ্ধ থাকে না; তখন সে প্রকৃতির বশীভূত থাকে না। তখন প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে তাহার অধীন—তাহার বশীভূত। এই জন্ত সেই জ্ঞানী পুরুষ আপনাকে নিষ্কাম ও অকর্তা জানিয়াও স্ব-প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ নিয়মিত করিয়া তাহা দ্বারা কর্ম করাইতে পারেন। যে কার্য দ্বারা অন্তরাশ্মির পরিভোষ হয় (মনু, ৪।১৬১), যে কার্য দ্বারা 'I ought' এই কর্তব্যবোধের (categorical imperative) সার্থকতা হয়, যে কার্য দ্বারা ব্রহ্ম কল্পনার (Divine Idea-Fichte—) সত্তাবে পরিণতির সাহায্য হয়, সেই ঐশ্বরীয় কার্য মাত্রই তখন তিনি আপন বশীভূত ও সুসংস্কৃত প্রকৃতির দ্বারা করাইয়া থাকেন। সুতরাং জ্ঞানীর নিকট প্রকৃতি বা বুদ্ধি অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয় সমুদায় বশীভূত। তাহার। এইরূপ কার্যের যন্ত্রমাত্র। যাহারা বলেন, জ্ঞানী প্রারব্ধে কর্ম করিতে পারেন, তাঁহাদের ইহা ভ্রম। প্রারব্ধ জাতি, আয়ু ও ভোগের কারণ মাত্র। প্রারব্ধ দ্বারা ভোগ হয়, কোন কর্ম হয় না। কাম-বীজ দখল না হইলেই 'প্রারব্ধ' ক্রিয়মাণ কর্মের কারণ হয়, নতুবা হয় না। অতএব সর্বথা বর্তমান অর্থে এ স্থলে কর্মযোগে উক্ত প্রকার কর্মমধ্যে যে কোনরূপ কর্মে ভ্রান্তি, এই মাত্র বুঝার। অথবা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ,

ভক্তিবোগ, ধ্যানবোগ প্রভৃতি যে কোন প্রকারে আত্মাতে বা পরমেশ্বরে
যুক্ত হইয়া অবস্থান, এইমাত্র বুঝায় ।

ধ্যানেনাহ্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা ।

অশ্চে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪

কেহ ধ্যানে আত্মবলে আত্মাতে আপন
করে আত্মা-দর্শন ; কেহ সাংখ্যযোগে,
অপর কেহ বা করে কৰ্ম্ম-যোগ দ্বারা ॥২৪

২৪ । কেহ ধ্যানে...করে দর্শন—এই শ্লোকে আত্মদর্শনের
উপায়-বিকল্প উক্ত হইয়াছে । ধ্যানে, অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা শব্দাদি বিষয় সকল
হইতে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় সকল মনেতে এবং মনকে আত্মাতে উপসংহৃত
করিয়া একাগ্রভাবে যে চিন্তা, তাহাকে ধ্যান বলে । তৈলধারার জ্বাল
অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিই ধ্যান । আত্মাতে—অর্থাৎ বুদ্ধিতে । আত্মবলে
বা আত্মাধারা—অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা সংস্কৃত অস্তঃকরণের সাহায্যে । আত্মাকে
দর্শন করে—অর্থাৎ প্রত্যেক চৈতন্যকে দর্শন করে (শঙ্কর) ।

যোগ-নিশ্চয় কেহ আত্মাতে বা শরীরে অবস্থিত আত্মাকে মনের দ্বারা
বা ধ্যানের দ্বারা ভক্তিবোগে দর্শন করেন (রামানুজ) । আত্মাকার
প্রত্যয় আবৃত্তি দ্বারা আত্মাতে বা দেহে আত্মাধারা বা মনের দ্বারা কেহ
দর্শন করে (স্বামী) । কেবল জ্ঞান-সাধনাই মুক্তির কারণ নহে,
একান্ত এহলে অন্য সাধনের স্বরূপও উক্ত হইয়াছে । কোন জ্ঞানী ধ্যান
দ্বারা অর্থাৎ পারিকল্পনা দ্বারা আত্মহৃদয়ে মনের দ্বারা আত্মরূপ ভগবান্কে
দর্শন করেন (বল্লভ) ।

এ স্থলে এই দুই শ্লোকে চতুর্বিধ লোকের আত্মদর্শন-সাধন-বিকল্প উক্ত হইয়াছে । কেহ উত্তম সাধক, কেহ মধ্যম সাধক, কেহ মন্দ সাধক, কেহ মন্দতর সাধক । ইহাদের মধ্যে উত্তম সাধকের পক্ষে আত্মজ্ঞান-সাধন-প্রণালী এ স্থলে উক্ত হইয়াছে । ধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ বিজ্ঞাতীয় প্রত্যয় অন্তরিত করিয়া সজাতীয় প্রত্যয়-শবাহ দ্বারা শ্রবণ মনন কণভূত আত্মচিন্তন বা নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে আত্মাকে অর্থাৎ প্রত্যক্ চৈতন্যকেই আত্মবলে অর্থাৎ ধ্যানসংস্কৃত অন্তঃকরণে উক্ত উত্তম যোগিগণ দর্শন বা সাক্ষাৎ করেন (মধু) ।

মহেশ্বরের প্রাপ্তিতে যে সাধন-বিকল্প, তাহাই এই শ্লোকে ও পরের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । যাহারা বিশুদ্ধ চিত্ত, তাহারা আত্মাতে বা মনে স্থিত আত্মাকে বা মহেশ্বর আমাকে ধ্যান দ্বারা বা উপসর্জনীভূত জ্ঞান দ্বারা আত্মবলে অর্থাৎ স্বয়ং বা অন্তের সাহায্য বিনা সাক্ষাৎ করেন (বলদেব) ।

এইরূপ প্রকৃত-বস্তু আত্ম-দর্শনের সাধনভেদ-প্রযুক্ত অধিকারিত্তে এই শ্লোকে ও পরবর্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । কেহ সর্দাভ্য বা ক আত্মতত্ত্ব নিশ্চিত অবধারণ করিয়া যোগযুক্ত হন অর্থাৎ শ্রবণ মননের আত্মভূত নিদিধ্যাসন বা ধ্যান দ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ দেহেতে আত্মার দ্বারা অর্থাৎ মনের দ্বারা দেহে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন (কেশব) ।

আত্মা এই স্থলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । দেহাদিতে আত্মাধ্যাসই ইহার কারণ । দেহাত্মবাদীর মতানুসারে দেহকে অর্থাৎ স্থল দেহকে আত্মা বলা হয় । মনাত্মবাদীর মতানুসারে মনকে আত্মা বলা হয় । আর বুদ্ধি-আত্মবাদ-মতে বুদ্ধিকে আত্মা বলা হয় । অধ্যাস হেতু ব্যবহারিক অর্থে আত্মা এইরূপ ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয় । গীতার পূর্বে ৬।৫-৭ম শ্লোকে আত্মা এইরূপ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

কেহ সাংখ্যযোগে—স্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় আমার দুঃ—
আমি এই গুণত্রয় হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ এবং এই গুণত্রয়ের যাহা কিছু

ব্যাপার, আমি তাহারই দ্রষ্টা ; আমি অবিনাশী অপরিণামী আত্মা—এই প্রকার চিন্তাই সাংখ্যযোগ । সেই সাংখ্যযোগ-বলে সংস্কৃত আত্মা অর্থাৎ অমৃৎকরণ দ্বারা কেহ কেহ আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, ইহা পূর্ব স্মৃতিতেই অনুবৃত্ত হইতেছে (শঙ্কর) । অপরে অর্থাৎ যোগীরা যোগাদি দ্বারা আত্মালোকন করিতে অধিকারী এবং জ্ঞানযোগেই অধিকারী, তাঁহারা সাংখ্যযোগ দ্বারা আত্মদর্শন করেন (রামানুজ) । সাংখ্য অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের বৈলক্ষণ্য আলোচনা দ্বারা যে অষ্টাঙ্গ যোগ, তাহা দ্বারা আত্মদর্শন করেন (স্বামী) । সাংখ্য অর্থাৎ নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক-মুক্ত যোগের দ্বারা অপরে আত্মদর্শন করেন (বল্লভ) । যাহারা মধ্যম অধিকারী, তাঁহাদের আত্মজ্ঞান-সাধন এ স্থলে উক্ত হইয়াছে । তাঁহারা সাংখ্যযোগ দ্বারা অর্থাৎ নিদিধ্যাসনের পূর্বভাবী শ্রবণ-মননরূপ অর্থাৎ নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেকাদি পূর্বক—এই গুণত্রয়-পরিণামী—ইহারা সমুদায় বিধা, ইহারা আত্মা নহে, আত্মা তাহাদের সাক্ষী, নিত্য, বিভূ, নিরিকার, নিত্য, সমস্ত জড়বর্গ সম্বন্ধশূন্য এবং সেই আমিই আত্মা ; এই প্রকার বেদাঙ্গ-রূপ-প্রণয়রূপ এবং তাহার চিন্তন বা মননরূপ যে সাংখ্যযোগ, তাহা ইহা আত্মাকে আত্মাতে ধ্যানোৎপত্তি দ্বারা দর্শন করেন (মধু) । সাংখ্য ও যোগ পৃথক্ । সাংখ্য অর্থাৎ উপসর্জনীভূত ধ্যান ও জ্ঞান দ্বারা কেহ আত্মদর্শন করেন এবং যোগ দ্বারা অর্থাৎ উপসর্জনীভূত জ্ঞান বা অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা আত্মদর্শন করেন । (বসুদেব) । অন্ত কোন সিদ্ধ যোগী শ্রবণ-মনন-পর্যায়ের সাংখ্যযোগ দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকাত্মক যোগের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন (কেশব) ।

কর্মযোগ দ্বারা—কর্মই যোগ, তাহা দ্বারা । ঈশ্বরে ফলার্পণ বুদ্ধিতে যে কর্মানুষ্ঠান করা যায়, সেই কর্মই যোগ । যোগ শব্দের সাধারণ অর্থ ঘটনা । এই প্রকার কর্মও মোক্ষঘটনার কারণ । সুতরাং ইহাই যোগ । সম্বুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা এই প্রকার কর্ম-পরম্পরা

যোক্তের কারণ । এজন্য ইহাকে যোগ বলা যায় । এই কর্মযোগ দ্বারা আবার যোগিগণ এই প্রকারে আত্মাকে দর্শন করেন (শঙ্কর) । এ স্থলে আত্মদর্শনের সুকর উপায় উক্ত হইতেছে । কর্মযোগ দ্বারা ও তদন্তর্গত জ্ঞানের দ্বারা মনের যে যোগ বা যোগ্যতা উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারাই কেবল যোগী আত্মদর্শন করেন (রামানুজ) । যাহারা মন্দ অধিকারী, তাহাদের যে জ্ঞানসাধন, তাহা এক্ষণে উক্ত হইতেছে । ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কলাভি-সন্ধিহীন হইয়া স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত বেদবিহিত কর্মকলাপের আচরণ দ্বারা ইহারা আত্মাতে আত্মবলে আত্মাকে দর্শন করেন অর্থাৎ স্নানশুদ্ধি দ্বারা শ্রবণ মনন ধ্যান উৎপত্তি দ্বারা দর্শন করেন ।

এই ধ্যান-যোগ, সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ ইহাদের মধ্যে ক্রম-সমুচ্চর থাকিলেও সেই সেই নিষ্ঠা যে অভেদ, ইহাই অভিপ্রায় বলিয়া বিকরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে (স্বামী) ।

কর্মযোগ অর্থাৎ অন্তর্গত ধ্যান, জ্ঞান ও নিরাম কর্ম দ্বারা (বলদেব) ।
কর্মযোগ অর্থাৎ কর্ম্মতে তদাত্মক প্রাকট্যরূপ যোগ (বল্লভ) ।

ইহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট অধিকারী, অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানযোগের অনধিকারী—তাহারা কর্মযোগ দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরে অর্পণ বুদ্ধিতে কলাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্বক বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধিপূর্বক ধ্যানযোগ-উৎপন্নহেতু আত্মদর্শন করে (কেশব) ।

এই শ্লোকে আত্মদর্শনের উপায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । এই উপায় তিনটি ;— ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ । ধ্যানযোগ পূর্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ; সাংখ্যযোগ দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং কর্মযোগ দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এই বিভিন্ন যোগগুলির সকলেই যে আত্মদর্শনের উপায়, তাহা এখানে কথিত হইয়াছে । মূল শ্লোকে ‘সাংখ্যেন যোগেন’ উক্ত হইয়াছে । এ অর্থ বলদেব বলেন, ইহার অর্থ সাংখ্যজ্ঞান ও যোগই বা সাংখ্য-শাস্ত্রোপদি

যোগ অর্থাৎ অষ্টাদশ যোগ । পাতঞ্জল-দর্শন সাংখ্যশাস্ত্রেরই অন্তর্গত । একত্র পাতঞ্জল যোগ-সূত্রকে সাংখ্যপ্রবচন-সূত্রও বলা যায় । এই অনুসারে বলদেব এইরূপ অর্থ করিয়াছেন । কিন্তু অল্প ব্যাখ্যাকারগণ 'সাংখ্যেন যোগেন' অর্থে এক সাংখ্যযোগ দ্বারা ইহাই বুঝিয়াছেন । গীতার পূর্বে ষড়বিধ নিষ্ঠার কথা আছে,—সাংখ্যদের জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা এবং যোগীদের কর্মযোগ-নিষ্ঠা (৩।৪) । অল্পত্র উক্ত হইয়াছে যে, ইহার মধ্যে যে কোন নিষ্ঠাতেই উত্তমের ফললাভ হয় ; একত্র এ উত্তমই এক অর্থাৎ সাংখ্যজ্ঞান দ্বারা যে স্থান-প্রাপ্তি হয়, যোগ দ্বারাও তাহাই অধিগম্য হয় ; একত্র উত্তম নিষ্ঠাই এক বা একফল-প্রদ । ফল সম্বন্ধে উত্তমের মধ্যে ইতরবিশেষ নাই (৫।৪,৫) । অতএব পূর্বে 'যোগ' অর্থে কর্ম-যোগ উক্ত হইয়াছে । এই শ্লোকে কর্ম-যোগের কথা পৃথক আছে, একত্র 'সাংখ্যেন যোগেন' অর্থে সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা । অতএব শঙ্করাদি ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যাই সঙ্গত । অর্থাৎ আত্মদর্শনের উপায় ; তিন প্রকার ;—ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ ।

এ স্থলে মধুসূদন প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ যে বলিয়াছেন, এই বিভিন্ন উপায়, বিভিন্ন অধিকারীর জন্য, তাহা সঙ্গত নহে । গীতার এরূপ অধিকারিভেদ করা নাই । কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ যে একই, উত্তমের দ্বারাই যে এক ফল লাভ হয়, বালকেরাই যে উত্তমের মধ্যে পার্থক্য দেখে, তাহা উক্ত হইয়াছে, দেখাইয়াছি । ধ্যানযোগও সেইরূপ, আত্ম-দর্শনের অন্ততম উপায় । তাহা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নহে । শঙ্করাদিগণ এরূপ প্রভেদ করেন নাই । ধ্যানযোগ শ্রেষ্ঠ অধিকারীর জন্য, সাংখ্যযোগ মধ্যম অধিকারীর জন্য এবং কর্মযোগ নিম্নাধিকারীর জন্য—এরূপ বিবেচনা সঙ্গত নহে । ভগবান্ অর্জুনের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য নানারূপে উপদেশ দিয়াছেন ।

ধ্যানযোগ ।—ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শন করিবার উপায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে

বিন্যত বসেছে, বসিগাছি । ধ্যানের ফলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে । চিত্ত
 ত্রুষ্ণরূপে অবস্থান হয় । সংকল্প-প্রভব কামকে অশেষে ত্যাগ করিয়া,
 মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সৰ্বদিক্ হইতে প্রত্যাহার করিয়া, ধৃতি-গম্ভীর বা
 ধারণায়ুক্ত বুদ্ধি দ্বারা উপরত হইয়া মনকে আত্মাতে সংস্থিত করিতে
 পারিলে, এবং কোনরূপ চিন্তা না করিলে এই ধ্যানযোগ-বিদ্যা হয়
 (৯২৪, ২৫) । তাহাতে মন প্রসন্ন হয়, ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ-
 লাভ হয় এবং যোগযুক্তাত্মা ও সৰ্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সৰ্ব্ব-
 ভূতস্থ ও আত্মাতেই সৰ্ব্বভূত দর্শন করা যায় (৬১৯) । এই
 ধ্যানযোগের নাম 'ন' । এই আত্মদর্শন-কালে ধ্যানযোগী নিশ্চয় সৰ্ব্বত্র
 এবং সমুদায় অংশেরে দর্শন করেন । (৬১৩০) ।

সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ— জ্ঞান-নিষ্ঠ যোগ অর্জনের পথ হয় ।
 জ্ঞান-সূক্ষ্মরূপে জ্ঞান প্রকাশিত হয় (১১১) । জ্ঞান-নিষ্ঠ যোগী
 সৰ্ব্বত্র 'সম' বা ব্রহ্ম দর্শন হয় । জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রহ্মাবৎ স্থিরবুদ্ধি হইয়া
 সমস্তে বা ব্রহ্মে স্থিত হন (৫১৯১২০) । জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি বাহ্য স্পর্শে
 অসংকচিত্ত হইয়া ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা হন (৫১২১) । তিনি হঃস্বপ্ন,
 জাগ্রৎ ও সুষুপ্তিতে ইয়া ব্রহ্মনিকাগ লাভ করেন (৫১২৪) । তিনি
 সৰ্ব্ব লোক-মহেশ্বরকে জানিতে পারেন এবং সতত যুক্ত থাকেন
 (৫১২৮১২৯) । এই জ্ঞানযোগীই সাংখ্যযোগী । সাংখ্যযোগী দেহ-স্বরূপ
 জ্ঞানী দেহ হইতে পৃথক্ জ্ঞান আগনাকে দর্শন করেন । তিনি 'সম'
 দ্বারা বুদ্ধি স্থির করিয়া যোগযুক্ত হনেন (২১৫৩) এবং জ্ঞান-স্বরূপ
 আত্মাতেই তুষ্ট থাকেন (২১৫৫), চিত্তকে আত্মবলে ধরিয়া নিশ্চয় ও
 নিস্পৃহ হইয়া স্থিত হনেন । বুদ্ধি ওইরূপ স্থির ও বাহ্যিক হইলে
 তবে তাহাতে আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন হয় ।

কর্মাযোগ—কর্মাযোগ দ্বারা কাম বা কর্মবীজ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া
 যায় তাহার ফলে বুদ্ধি নিশ্চল হয়, এবং সেই শুদ্ধ নিশ্চল চিত্তে

অবস্থান হইয়াছে (২।৩২) । অর্থাৎ এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কৰ্ম্য করিলে জ্ঞান বা কৰ্ম্যফলাকাঙ্ক্ষা ও কৰ্ম্যে আসক্তি থাকে না, জন্ম-বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া যায় (২।৫১) । বুদ্ধি যখন “মোহ” হইতে মুক্ত হয়, এক-অধ্যব-সাম্যায়ক হয়, তখন সেই বুদ্ধি-যুক্ত হইয়া কৰ্ম্যসাধনই কৰ্ম্য-যোগ । বুদ্ধি নিৰ্ম্মল, কামক্রোধাদি-মলবিহীন হইলে তবে সেই বুদ্ধি-যোগে নিষ্কাম-ভাবে কৰ্ম্য করিবার সাংসার সিদ্ধি হয় । এই ‘যোগ’ বা কৰ্ম্যযোগ-সিদ্ধিতে বুদ্ধি সমাধিতে অচলভাবে স্থিত হয় (২।৫৩), অর্থাৎ তাহাতে আত্ম-স্বকৰ্ম্য-সংক্রমণ-বিহীনতা বলা যায় । তাহাতে কৰ্ম্য-যোগ দ্বারা কৰ্ম্যযোগ সিদ্ধি হয়, সেই বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, তাহাতে রাগদ্বেষ-বিমুক্ত করিতে হয়, আত্মবশীভূত করিতে হয়, আত্মতে ধৃত করিতে হয় (২।৬৩) । সৰ্ব্ব ‘কাম’ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নিৰ্ম্মল ও নিরঙ্কর হইতে হয় (২।৭১) । যাহার বুদ্ধি স্থির ‘যুক্ত,’ তিনি নিষ্কাম-ভাবে কৰ্ম্য করিয়াও স্থিতপ্রজ্ঞ হন, তাহার ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয় (২।৭২) ।

সাংসার থেকে জ্ঞানযোগ, তাহা দ্বারা আত্মকে প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ বন্ধ পড়তি হইতে পৃথক্ জ্ঞানিত আত্মকে বা পুরুষকে বুদ্ধি হইতে পৃথগ্ভাবে অবস্থান করাইতে হয় । আর যোগীর যে কৰ্ম্য, যোগ তাহাতে বুদ্ধিকে এইরূপে শুদ্ধ সম্পূর্ণ নিৰ্ম্মল করিয়া আত্মকে তাহাতে অবস্থান করাইতে হয় । এই নিৰ্ম্মল বুদ্ধিকেই আত্মদর্শন হয় । এই নিৰ্ম্মল বুদ্ধির স্বরূপ—জ্ঞান, মৰ্ম্ম ইত্যাদি । এই বুদ্ধি হইয়া যজ্ঞাদি আচরণ হইলে, সেই যজ্ঞে সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয় (৪।২৩), স্বদৰ্ম্ম স্বকৰ্ম্ম আচরণে তাহা দ্বারা ভগবান্কে তর্জনা করা হইতেছে—এই জ্ঞান হয় (১৮ ৪৩) । পূর্বে কৰ্ম্যযোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এ স্থলে সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । নিষ্কাম ভাবে কর্তব্য কৰ্ম্যের আচরণ অভ্যাস করিতে করিতে পরিণামে ‘কাম-সঙ্কর’ আসক্তি প্রভৃতি

সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়, চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল হয় এবং সেই নির্মলচিত্তেই আত্মদর্শন হয় । এই অঙ্কে এ স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, কর্মযোগই আত্মদর্শনের উপায় । অন্য কোনরূপ যোগ অবলম্বন না করিয়াও কেবল এই কর্মযোগসাধন করিলেই ইহার ফলে পরিণামে আত্মদর্শন হয় ।

এ স্থলে বল্লভ-সম্প্রদায়ের অনুযায়ী ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে । গীতার ষষ্ঠম অধ্যায়ের শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে পরমেশ্বরের সমগ্র ভাব—নির্গুণ ব্রহ্মভাব, অধ্যাত্মভাব, অধিকর্মভাব, অধিদৈব ভাব, অধিতুতভাব ও অধিষজ্জ ভাব উক্ত হইয়াছে । এই ভগবানের কর্মভাব বুঝাইতে কর্মকে তুতভাবে উদ্ভবকর বিসর্গ বলা হইয়াছে (৮।৩) । ভগবানের যে বিসর্গ বা বিসৃষ্টি দ্বারা তুতভাবে উদ্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি হয়, তাহাই কর্ম । অতএব এ স্থলে কর্মযোগের অর্থ ভগবানের এই অধিকর্মভাব তদনুযায়ী কর্ম দ্বারা আপনাতে অনুভব করা । কিন্তু এই কর্মযোগ দ্বারা অধিকর্মভাবে ভগবানকে অনুভব করিলে, ক্রমে তাঁহার সমগ্র ভাব অনুভব করা হয় ।

আত্মদর্শন—অর্থাৎ পূর্বে ২২শ শ্লোকে যে পুরুষ এই দেহে থাকিয়াও দেহ হইতে পর বা পৃথক্ এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তিনিই পরমাত্মা মহেশ্বর । এ স্থলে সেই পুরুষকেই আত্মা বলা হইয়াছে । প্রকৃতি হইতে এই পুরুষকে পৃথক্ জানিয়া পুরুষের যে স্বরূপ-দর্শন, তাহাই আত্মদর্শন । পূর্বে যে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনের কথা উক্ত হইয়াছে এবং যাহা জ্ঞানের স্বরূপ, তাহাই এই আত্মদর্শন । প্রকৃতি-পুরুষ এই দুই তত্ত্ব । আত্মস্বরূপ পুরুষকে দর্শন করিতে হইলে তৎপূর্বে প্রকৃতির স্বরূপ জ্ঞান ও প্রকৃতিকে দর্শন করা প্রয়োজন । আত্মদর্শন হইলেই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন সিদ্ধ হয় ।

অন্যে ত্বেষমজানন্তুঃ শ্রদ্ধাশ্চেত্য উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫

অন্যে নাহি জানি ইহা করে উপাসনা

শুনি অপরের কাছে, শ্রুতি-পরায়ণ

তাহারা ত. মৃত্যুকেই করে অতিক্রম ॥ ২৫

২৫ । অন্তে নাহি জানি ইহা—অন্য ব্যক্তিগণ এই পূর্বোক্ত বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে কোন একটি দ্বারা যথোক্ত আত্মস্বরূপ জানিতে সমর্থ না হইয়া (শঙ্কর) । উক্ত কৰ্মযোগাদিতে আত্মাবলোকন সাধনে অনধিকারী (রামানুজ) । অতি মন্দাধিকারীর নিস্তার উপায় এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । যাহারা সাংখ্যযোগাদিমার্গে উক্ত উপদ্রষ্টা অনু-মস্তাদি লক্ষণ আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে জানে না (স্বামী) । এ স্থলে মন্দতর অধিকারীর সাধন উক্ত হইয়াছে । ইহারা যে পূর্ব শ্লোকোক্ত ত্রিবিধ অধিকারী হইতে বিলক্ষণ, তাহা এই শ্লোকে 'তু' শব্দ দ্বারা স্ফোভিত হইয়াছে । ইহারা উক্ত ত্রিবিধ উপায় মধ্যে কোন উপায় দ্বারা আত্মদর্শন করিতে জানে না (মধু, কেশব) । যাহারা উক্তরূপ কোন সাধনোপায় জানে না (বলদেব) । মূর্খলোকে ইহা না জানিয়া (বল্লভ) ।

করে উপাসনা শুনি অপরের কাছে—আচার্য্যগণের নিকট শ্রবণ করিয়া অর্থাৎ 'এই প্রকার চিন্তা কর' এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া উপাসনা করেন, অর্থাৎ শ্রদ্ধাপর হইয়া সেই উপদেশ অনুসারে চিন্তা করিতে থাকেন (শঙ্কর, মধু) । ভাবদর্শী জ্ঞানীর নিকট শ্রবণ করিয়া কৰ্মযোগাদি দ্বারা আত্মাকে উপাসনা করেন (রামানুজ) । আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপাসনা বা ধ্যান করে (স্বামী) । যাহারা এ উপায় জানে না, তাহারা

অন্তর যুখে সেই সকল উপায় শ্রবণ করিয়া সেট মনোবশত উপাসনা করেন (বলদেব) । অন্তর কাছে অর্থাৎ গুরুর যুখে শ্রুতিয়া, অমুভব বিনা 'ঐবম্' এইরূপে অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে উপাসনা করেন (বলভ) । ঐহারা হৃদয়দর্শী গুরুর নিকট এই তত্ত্ব জানিয়া শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপূর্বক উপাসনা করেন (কেশব) ।

শ্রুতিপরায়ণ তাহারা ।—শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ । আচার্যের উপদেশ-বাক্যই যাহার 'পর' বা প্রধান 'অনন' বা গমন, অর্থাৎ মোক্ষ-মার্গ প্রবৃত্তিতে প্রকৃষ্ট সাধন, যাহাদের কোন প্রকার আত্মপ্রমাণের দাবী নির্ভর নাই, আচার্যের উপদেশই সার বলিয়া গ্রহণ করে, নিজ বিবেকের উপর যাহাদের বিশ্বাস বা নির্ভর নাই—তাহারাই শ্রুতি-পরায়ণ (শঙ্কর) । শ্রবণ-ত্রি-নিষ্ঠ (রামানুজ) । শ্রদ্ধাপূর্বক উপদেশ-পরায়ণ (স্বামী) । অর্থ বিচারে অসমর্থ এবং শ্রদ্ধাপূর্বক গুরুর উপদেশ শ্রবণ-মাত্র-পরায়ণ (মধু) । ৩৭৩ কথায় শ্রবণ-নিষ্ঠ (বলদেব) । শ্রুত-প্রকারে শ্রদ্ধা সহ আচরণকারী (বলভ) । শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণপরায়ণ হইয়াও ক্রমে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়, অর্থাৎ তাহারা মনন বা বিচার-সমর্থ হইয়া ক্রমে মুক্ত হই (কেশব) ।

মৃত্যুকেও করে অতিক্রম ।—ইহারাও যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, তখন যাহারা বিবেক-বলে, প্রমাণ বিষয়ে যাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তাহারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবেই । (শঙ্কর) । তাহারা পুণ্যপাপ হইয়া বর্ষযোগাদি আরম্ভ করিয়া ক্রমে মৃত্যুকে অতিক্রম করে (রামানুজ) । 'মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ' ।—তাহারা ক্রমে সংসারের পার-সী হয় (স্বামী) । তাহারা সেই 'শ্রুত' উপায় ক্রমে অধ্যয়ন করিয়া তাহা সাধন করে এবং পরিণামে মৃত্যুকে অতিক্রম করে । এই পথে হলে 'শ্রবণ-মহিমা' দর্শিত হইয়াছে (বলদেব) । তাহারাও মুক্ত

হয়। ভগবান্ স্ববাক্যের সাধার্থ রাকার জন্ত তাহাদিগকেও মুক্ত করিবেন,—স্নেহবশে নহে (বল্লভ) ।

এই উপাসনা কাহার ।—পূর্ব-শ্লোকে যে ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ ও কন্মযোগের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা উপাসনা নহে ; উপাসনা বৃত্ত্ব। পূর্বে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা ভগবানের ষড়না ও উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে (৯১৫ ; ৯২২) । অত্র দেবতার ষড়না ও উপাসনার কথাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে (৭২১ ; ৯২৩) । দেবগণ, ভূতগণ ও পিতৃগণের উপাসনা বা ব্রতের কথাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে (৯২০) । ইহাদের মধ্যে ভগবানের উপাসনাই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা দ্বাদশাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে (১২২, ৬ ও 'পরবর্তী শ্লোকে দ্রষ্টব্য) । ইহা বাতীত দ্বাদশ অধ্যায়ে অক্ষর অক্ষরের উপাসনা উক্ত হইয়াছে । সে উপাসনা যে অধিকতর ক্লেশকর, তাহাও উক্ত হইয়াছে (১২৩-৫) । এই অব্যক্ত অক্ষর উপাসনা উপনিষদুক্ত ব্রহ্মোপাসনা—ইহা ব্রহ্মের প্রতীক উপাসনা, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । 'ওকার' সূর্য্যাদিতে অধিষ্ঠিত পুরুষ, 'প্রাণ' প্রভৃতিতে ব্রহ্ম ভাবনা দ্বারা যে উপাসনা, তাহা প্রতীক উপাসনা । শ্রুতির উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপাসক সেই উপাসনায় রত হইতেন । এই প্রতীক উপাসনা যে ব্রহ্মোপাসনা—তাহা বেদান্তদর্শনে বিবৃত হইয়াছে । অতএব যাহারা শ্রুতিশ্রবণ, অনোর নিকট 'শ্রবণ' করিয়া উপাসনা করে, তাহারা প্রধানতঃ ব্রহ্মের প্রতীকোপাসক ।

* বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ শ্রুতি । ইহা পূর্বে গ্রন্থাকারে লিখিয়া রাখিবার বিধান ছিল না । গুরু বা আচার্যের নিকট তাহা 'শ্রবণ' করিয়া লাভ করিবার ব্যবস্থা ছিল । তাহা এইরূপে গুরুশ্রবণরম্পরাক্রমে রক্ষিত হইত । শিষ্য আচার্যের নিকট শ্রবণ করিয়া তাহা শ্রবণ রাখিতেন । পরে তিনি আচার্য হইয়া অত্র শিষ্যকে তাহা শ্রবণ করাইতেন । অতএব এই শ্রবণ দ্বারাই শ্রুতান্ত উপাসনা-ও তখন জ্ঞানিতে হইত । এই শ্রুতির কথা পূর্বে ২:৫১, ৫৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।

এই প্রতীকোপাসনার ফলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ; প্রতীকো-
পাসকগণ ব্রহ্মবিৎ হইয়া, মৃত্যুর পর দেবধানে গতি লাভ করেন আর
পুনরাবর্তন করেন না (৮।২৪) । এই শ্লোকে ইহাদের কথাই উক্ত
হইয়াছে বোধ হয় । ঈশ্বরোপাসনা বা অন্ত দেবতাদির উপাসনার
কথা এ স্থলে উক্ত হয় নাই । শ্রুতি অর্থে উপনিষদাস্ত বেদকেই বুঝায় ।
আর কোন শাস্ত্র শ্রুতি নহে, আর কোন শাস্ত্রের ‘শ্রবণ’ বিহিত নাই ।
গীতার সাংখ্যযোগ, ধ্যানযোগ ও কর্মযোগ যে ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে,
শ্রুতিতে সে ভাবে স্পষ্টরূপে তাহার উপদেশ নাই । শ্রুতি শ্রবণ দ্বারা
এই সকল যোগ-মার্গ জানা যায় না । শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মোপাসনাই
নানান্তাবে উপদিষ্ট হইয়াছে ।

তন্মধ্যে শ্রুতির উপদিষ্ট প্রতীক, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার উপায়
হইলেও প্রতীকোপাসনা যে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা নহে—তাহা শ্রুতিতেই
উক্ত হইয়াছে । কেন না, ব্রহ্ম হইতে বাক্য, মননক্রিয়া, দর্শন-
শ্রবণাদি ক্রিয়া অভূদিত হয় ; সুতরাং ব্রহ্ম বাচ্য, মন্তব্য, দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য
হয় না । যাহার উপাসনা করিতে হইবে, তিনি অবশ্য বাচ্য, মন্তব্য,
চিন্তিতব্য, দ্রষ্টব্য অথবা শ্রোতব্য হইবেন । যে প্রতীক দ্বারা যে ব্রহ্মের
উপাসনা করা যায়, তাহা অবশ্য বাচ্য, দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য বা মন্তব্য
হইবেনই । অতএব ‘প্রতীক’ ব্রহ্ম নহে এবং প্রতীকোপাসনার ঠিক
ব্রহ্মোপাসনা হয় না । শ্রুতিতে ইহাই উক্ত হইয়াছে । যথা—

“যদ্বাচ্য নাভূদিতং যেন বাগভ্যগ্নতে

* * * *

যৎ মনসা ন মনুতে যেনাহ্মনো মতম্ ।

* * * *

যচ্চক্ষুশা ন পশুতি যেন চক্ষুংষি পশুন্তি

* * * *

বৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্
—তদেব ব্রহ্ম যৎ বিদ্ধি নেদং যদিদম্ উপাসতে !”

(কেব উপঃ, ১।৪—৭)।

এতদনুসারে যাহা “ইদং”, তাহা ব্রহ্ম-‘প্রতীক’ হইলেও ব্রহ্ম নহে । তাহা হয় চক্ষুর্গ্রাহ্য (রূপবিশিষ্ট) বা কর্ণগ্রাহ্য (নাসাবিশিষ্ট) বা মনোগ্রাহ্য (কল্পনা-সৃষ্ট) না হয় বাক্য-গ্রাহ্য (কোন দ্রব্যগুণ কৰ্ম্ম বা সঙ্কেতের বাচক শব্দ বাচ্য) । এই শ্রুতি অনুসারে তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে পারে না । উপনিষদে যে ‘অহং’ যে ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা বিহিত আছে, তাহাকে “অহংগ্রহোপাসনা” বলে । এই ‘অহং’ আত্মা নহে, ইহা প্রকৃতিজাত অহংকার মাত্র ; তাহা ব্রহ্ম নহেন । সুতরাং এই “অহংগ্রহোপাসনা” ও প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা নহে । ইন্দ্রিয়, মন, অহংকারের অতীত ও তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে বুদ্ধিতত্ত্ব (কঠ, ২।১০), তাহা যখন সম্পূর্ণ সাত্বিক ও নিৰ্ম্মল হইয়া এই অধ্যায়োক্ত জ্ঞানস্বরূপ হয়, তখনই কেবল আত্মা তাহাতে প্রতিবিম্বিত হওয়ার আত্মদর্শন সিদ্ধ হইতে পারে । সেই ব্রহ্ম বা আত্মাই উপাস্ত । বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ নিৰ্ম্মল করিয়া তাহাকে জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করাইয়া এই আত্মদর্শন করিবার উপায় উক্ত ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ ও কৰ্ম্মযোগ । ইহার আর উপায়ান্তর নাই ।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬

স্থাবর কিংবা জঙ্গম সত্ত্ব যাহা কিছু

হয় সমুদ্ভূত, তাহা জেনো’ হে ভারত !

হয় ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের সংযোগ হইতে ॥ ২৬

২৬। স্থাবর কিংবা জঙ্গম সত্ত্ব যাহা কিছু হয় সমুদ্ভূত—যাহা কিছু (যাবৎ কিঞ্চিৎ) বস্তু (সত্ত্ব) সঞ্জাত হয়, অর্থাৎ উৎপন্ন হয়, সে বস্তু কি, তাহা অবিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে যে, তাহা 'স্থাবর' এবং 'জঙ্গম' (শব্দ)। স্থাবর ও জঙ্গম এবং সত্ত্ব—অর্থাৎ চিদচিৎ-সংসর্গজনিত সত্ত্ব। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু সত্ত্ব সঞ্জাত হয় (রামানুজ)। যাবৎ অর্থাৎ অধ্যাস-সমাप्ति পর্য্যন্ত যাহা কিছু স্থাবর বা জঙ্গমাত্মক বস্তুমাত্র সমুৎপন্ন হয় (স্বামী)। অধ্যাস-সমাप्ति পর্য্যন্ত—সেই অধ্যাস হেতু যে গুণসঙ্গ হয়, এবং গুণসঙ্গ হইতে যে সদসদ্ব্যোনিতে "জন্মগ্রহণের কথা উক্ত হইয়াছে—সেই অধ্যাস-সমাप्ति পর্য্যন্ত এইরূপে যাহা কিছু স্থাবর বা জঙ্গম বস্তু সঞ্জাত হয় (মধু)। স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু সত্ত্ব বা প্রাণিজাত—যে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বিভিন্নরূপে সঞ্জাত হয় (বলদেব)। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাবৎ বস্তুমাত্র, তাহা পূর্বোক্তরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—এই উভয়ের সংযোগ হেতু অর্থাৎ ক্রীড়ার্থ আশ্রয় : সংযোগ হেতু—ক্ষেত্রের সহিত সংযোগ হেতু—সেই সত্ত্বাত্মক সমুদায় সমুদ্ভূত হয় (বল্লভ)। এই শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষ বিচার করা হইয়াছে। প্রকৃতি-পুরুষ-সংসর্গ হইতে যে সর্ব প্রাণীর উৎপত্তি, তাহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে (কেশব)।

তাহা হয় ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে—সে সমুদায়ই অসৎ ক্ষেত্র 'সৎ' ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর অধ্যাসরূপ সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে (শব্দ)। তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের ইতরেতর-সংযোগ হইতেই উৎপন্ন হয় (রামানুজ)। অবিবেককৃত আশ্রয়াদ্যাস হেতু ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের যে সংযোগ হয়—তাহা হইতে সঞ্জাত হয় (স্বামী)। অবিদ্যা ও তাহার কার্যাত্মক জড় বা এই অনির্বচনীয় সদসৎ-রূপ দৃশ্যজাত ক্ষেত্র, এবং তাহ হইতে বিলক্ষণ ও তাহার উদ্ভাসক স্বপ্রকাশ পরমার্থ সৎ চৈতন্য অসৎ উদ্ভাসীন নির্ধর্মক অধিতীয় ক্ষেত্রজ্ঞ—এই হইয়ের মাঝখানে অবিদ

নির্মিত মিথ্যা-তাদাত্ম্য-অধ্যাসহেতু সত্য মিথ্যা মিথুনীকরণাত্মক ইত্যেতদ্বয়
সম্বন্ধরূপ যে সংযোগ, তাহা হইতেই উৎপন্ন হয় (মধু)। তাহা ক্ষেত্র বা
প্রকৃতির সহিত ক্ষেত্রজের (জীবের) সংযোগ হইতে হয়। জীবের
প্রকৃতিকে এবং জীবকে নিয়মিত করিয়া প্রবর্তিত করেন, উভয়কে
সম্বন্ধ করেন। তাহা হইতে দেহোৎপত্তির দ্বারা প্রাণী সৃষ্ট হয়—ইহাই
অর্থ (বলদেব)। এই সমুদায় ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের
সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, কেবল পুরুষ বা কেবল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন
হয় না (কেশব)।

স্বাবর জঙ্গম—যাহাদের স্বতঃপ্রবর্তিত গতি নাই, যাহারা অচল,
সেই জড়বর্গই স্বাবর। আর যাহারা স্বতঃপ্রবর্তিত হইয়া গমন করে,
সেই সকল প্রাণিবর্গই জঙ্গম। কেবল উদ্ভিদকেই যে স্বাবর বলে, তাহা
নহে। গীতায় উক্ত হইয়াছে—“স্বাবরাণাং হিমালয়ঃ” (১০:২৫)। অতএব
স্বাবর-সমুদায় স্থিতিশীল জড়বর্গ। এ জগতে যাহা কিছু সচ বা সত্তা-
বুদ্ধ বস্তু আছে—তাহাকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়—স্বাবর ও জঙ্গম।
শ্রায়দর্শন অনুসারে সত্তাই পরা জাতি। তাহার দুই অপরা জাতি—এই
স্বাবর ও জঙ্গম। স্বাবর ও জঙ্গমকে সাধারণতঃ জড় ও জীব বা প্রাণী,
অচেতন ও চেতন বলা হয়। স্বাবর ও জড় যে জড় পরমাণু বিশেষের
সম্বন্ধ-সংযোগে জাত এবং তাহা জীব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহাই আমাদের
ধারণা। কিন্তু এ স্থলে এ জড়কেই এই (‘রাগবিরাগয়োৰ্যোগমৃষ্টে’—ইতি
সংখ্যাসূত্র) এই সামান্য (genus) সত্তার অন্তর্গত করা হইয়াছে—উভয়ের
কারণ যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ বা প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ, ইহাও উক্ত হইয়াছে।
অতএব জীবের শ্রায় জড়ও প্রকৃতি-পুরুষের বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের সংযোগ
হইতে উৎপন্ন সত্তা। সামান্য বালুকণা, এমন কি, সামান্য অণু পর্য্যন্ত
যাহা কিছু জড় দেখি, সমুদায়ের মূল যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগ,
ধত্যেকের মধ্যে যে ক্ষেত্রজ পুরুষ আছেন, এবং তাহার সহিত সংযুক্ত ক্ষেত্র

আছে, তাহা এই শ্লোক হইতে বুঝিতে হইবে । প্রতি অণু পরমাণুতে এই ক্ষেত্রজ পুরুষ স্বরূপতঃ অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের স্তায় থাকেন । প্রত্যেকের মধ্যেই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, স্নেহ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, স্থলভূতাদি বাহ্য কিছু ক্ষেত্রের উপকরণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে—সকলই থাকে । কোনটিই এই পঞ্চভূতের মধ্যে কোন এক ভূতের অতি সূক্ষ্ম অবিভক্ত অংশমাত্র নহে । প্রতি পরমাণুটিই বা জড়ের অতি সূক্ষ্ম বিভাগযোগ্য অংশই এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি (monad) হইয়াও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত । * অনেক অণু পরমাণুতে এবং তাহার সংযোজ্য গঠিত যে কোন জড়ে ক্ষেত্রের এই সূক্ষ্ম অংশ—অন্তঃকরণ 'প্রভৃতি বীজভাবে অপ্রকাশিতভাবে থাকে । তাহার বাহ্য ক্রিয়া' নাই বা সে ক্রিয়া আমরা বুঝিতে পারি না, একত্র আমরা তাহাদের কেবল স্থলভূতেরই রূপমাত্র মনে করি । জড়ে যে চৈতন্য নিহিত আছে, এক আত্মাই সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট, তাহার কোন লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই না বলিয়া তাহাকে চৈতন্যহীন মনে করি । সেইরূপ আমরা জড় স্বাবরকে প্রাণহীন মনে করি । কিন্তু কোন সত্তাই প্রাণহীন নহে । সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রাণ অন্তঃকরণের সামান্ত বৃত্তিমাত্র (সাংখ্যকারিকা, ২৯) । জড় অণু যখন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগ হইতে উৎপন্ন, যখন তাহাতে ক্ষেত্রের অন্তঃকরণ বীজভাবে নিহিত আছে, তখন অবশ্য সেই অন্তঃকরণবৃত্তি প্রাণেও নিহিত । সকল সত্তাই প্রাণী । শ্রুতিতে আছে, প্রাণ ব্রহ্ম, প্রাণই এ সমুদায়, প্রাণ শক্তি দ্বারা সমুদায় বিধৃত । এই প্রাণই যে পরাপ্রকৃতি, তাহা পূর্বে ৭।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে ।

* বাহ্যিক এই তত্ত্ব বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন, এবং গীতার এই শ্লোকের অর্থ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে চাহেন, তাহারা ইংরাজীভাষায় প্রকাশিত বর্ণাণ দার্শনিক লাইব নিট্‌স্ (Leibnity) প্রতিপাদিত Monadology পাঠ করিবেন । তাহাতে সাংখ্যদর্শনের উপদিষ্ট প্রকৃতিপুরুষবাদের কতকটা বুঝবারও সুবিধা হইবে ।

অতএব এই শ্লোক হইতে বুঝিতে হইবে যে, অণু পরমাণু হইতে হিমালয় প্রভৃতি স্থাবরাত্মক এবং সামান্ত কীটাণু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত জন্মান্বক যাহা কিছু সপ্ত বিদ্যমান আছে—তাহাতে অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণরূপ সূক্ষ্মশরীর অপ্রকাশিতভাবে অপ্রকট চৈতন্যের সহিত ও প্রাণের সহিত অবস্থিত আছে। তাই এই জড় অণু বা কীটাণু ক্রম-বিকাশিত হইতে পারে, এবং তাহার ক্রম-আপূরণ ও জাতাস্তর পরিণাম হইয়া থাকে। আজি যাহা জড়ের সূক্ষ্ম বিভক্ত অণুমাত্র সত্তা—তাঁহা হয়ত অনন্ত কালের ক্রম-বিকাশ বা জীবের নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্র-ধর্ম-রাগ-বিরাগবশেই চালিত হইয়া রাগ বা আকর্ষণ দ্বারা সত্তা অণুর সহিত মিলিত হইয়া নিম্নতম বা ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে ক্রমোন্নতির নিয়মে বৃক্ষাদি যোনিতে ভ্রমণ করিয়া পরে পশুযোনি ও ক্রমে অন্তঃকরণের ও উদ্ভিদের বিকাশ ও পরিপতি হেতু মানবযোনিও লাভ করিতে পারে, এবং পরিণামে মুক্তও হইতে পারে। অতএব জগতে অণুটি পর্য্যন্ত হয় নহে। প্রত্যেক সত্তার অন্তরে পরমাণু পরমেশ্বর নিরন্তররূপে অবস্থিত আছেন ও পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা পরশ্লোকে উক্ত হইয়াছে। (কোন প্রসিদ্ধ বর্ণনা পণ্ডিত বলিয়াছেন—“The consciousness sleeps in stone dreams in animals and awakes in man” * অর্থাৎ চৈতন্য উপলব্ধিতে নিদ্রিত অবস্থায় থাকে, পশুতে তাহা স্বপ্নাবস্থায় থাকে, মানুষে তাহা জাগরিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে, অতিক্রম—তৃণাদপি অতিক্রম উদ্ভিজ্জও “অন্তঃসংক্রান্তা শুবন্তোতে সুখ-হঃখমমস্বিতাঃ” (মনুসংহিতা, ১।৪২)।

সত্তা সমুদ্ভূত হয়—অর্থাৎ যে কোন সত্তা স্থূল বাহ্য পাঞ্চভৌতিক

* বর্ণনা পণ্ডিত সপেনহর কৃত “World as Will and Idea” নামক পুস্তক হইয়া।

শরীর গ্রহণ পূর্বক জন্মগ্রহণ করে । সত্তা কাহাকে বলে ? সত্তের ডাবই সত্তা, যাহা সৎ, তাহা ভাবযুক্ত না হইলে প্রকট হয় না । সত্তা (অর্থাৎ Being) ভাবযুক্ত হইয়া ব্যক্ত হয়, (Becoming) ব্যক্ত না হইলে, তাহাকে অসৎ (Nought) ও বলা যায় । এই ভাব দুইরূপ ;— নির্বিকার ও বিকারযুক্ত । যাহা সত্তের নির্বিকার ভাব—তাহা নিত্য । আর যাহা বিকারী—তাহা ষড়্ভাব বিকারযুক্ত জন্মস্থিতি নাশ প্রভৃতির অধীন পরিণামী, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । অতএব প্রত্যেক বিকারী সত্তার ভাববিকার আছে । তাহার জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, ক্ষয়, মৃত্যু প্রভৃতি আছে । যে সকল স্থাবর বহুপরমাণুর সংঘাতে উৎপন্ন হয়, তাহার এই জন্মাদি আমাদের প্রত্যক্ষ হয় । পঞ্চভূতযুক্ত হইয়া স্থূল শরীর গ্রহণ করিলে বা স্থূলভূত ভাবযুক্ত হইলে, তবে তাহা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে । সূক্ষ্মাবস্থায় প্রত্যক্ষগোচর হয় না । সূক্ষ্ম অণু প্রভৃতির বা পরমাণুর জন্মাদি আমরা বুঝিতে পারি না, তাহাদের নিত্য জ্ঞান হয় । কিন্তু তাহারা নিত্য নহে । প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকালে তাহাদের অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে বা অষ্টধা অপরা প্রকৃতি হইতে, প্রকৃতির পরিণাম হেতু উৎপত্তি এবং প্রলয়ে তাহাদের ধ্বংস হয় । প্রকৃতি একই নিয়মে সর্বত্র পরিণত হয় । প্রকৃতি হইতে একইরূপ বিকার যে ষোড়শতম্ব, তাহা ক্রমে উৎপন্ন হইয়া সম্পূর্ণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে । কোন স্থূলভূত বা সূক্ষ্মভূত সত্ত্বধ্বংস থাকে না । তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে পঞ্চভূতই থাকে ; এবং তাহার অন্তরালে পঞ্চতন্মাত্র, তাহার অন্তরালে কারণরূপে সূক্ষ্ম শরীর এবং তাহার অন্তরালে মূল প্রকৃতি থাকে । সংকার্যবাদ অনুসারে কার্য কারণের অন্তর্ভূত ; কারণ হইতেই কার্যের বিকাশ এবং কার্য ধ্বংসে কারণেই লয় হয় । সাংখ্যদর্শনের ইহাই দিচ্ছান্ত । একত্র পঞ্চভূত-ভূতের অন্তরালে তাহার কারণ সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র থাকে ; তন্মাত্রের অন্তরালে তাহার কারণ অহঙ্কার থাকে ইত্যাদি । অতএব প্রত্যেক

সত্তার মূল প্রকৃতি ও তাহার পরিণাম ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব মিলিত হইয়া সৰ্বত্র সৰ্বসত্তায় অবস্থান করে । পুরুষসংযোগ ব্যতীত প্রকৃতির এই পরিণতি হয় না বলিয়া পুরুষও তাহার অন্তরালে প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে । গীতার ইহাই সিদ্ধান্ত । এষ্ট ভাবে সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ব সম্বন্ধে যে আপত্তি, তাহা অনেকটা মীমাংসিত হয় । পরমাণু পর্য্যন্ত প্রতি ব্যক্তিভাবে প্রকাশিত সত্তার মধ্যে এইরূপে সংযুক্ত পুরুষ-প্রকৃতি এবং সেই সংযোগ হেতু প্রকৃতির সমুদায় পরিণাম অবস্থিত । তাহার সূক্ষ্মভাবে থাকিতে পারে, স্থূল হইয়াও সমুদ্ভূত হইতে পারে । পুরুষ ও অষ্টধা অপরা প্রকৃতিজ লিঙ্গদেহযুক্ত সকলই সৃষ্টি হঠতে প্রলয় পর্য্যন্ত অথবা মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী । বাহ্য প্রকৃতি বিকৃতি ষোড়শবিধ—তাহারই সংযোগ-বিয়োগ হয় । সংযোগ হেতু জন্ম বা উদ্ভব এবং বিয়োগ হেতু মৃত্যু । ইহাই নিয়ত পরিবর্তনশীল সংসার বা জগৎ । এইরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগ-সমুদ্ভূত সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাশ্রয়ক সত্ত্বের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে । • শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩।১২ মন্ত্রে) আছে—“মহান্ প্রভুর্কে পুরুষঃ সর্বশৈব প্রবর্তকঃ ।” এই সত্ত্ব অন্তঃকরণ নহে । ইহাই সৰ্ব-স্থাবরজঙ্গমাশ্রয়ক সত্ত্ব । এক পুরুষই এ সকলের প্রবর্তক । তিনি ক্ষেত্রক্ষেত্রজরূপে উভয়কে সংযুক্ত করিয়া সকল সত্ত্বের উৎপাদন করেন ।*

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগ—পূর্বে (১৩।২)শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে—

“ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োক্তানং যন্তজ্জ্ঞানং যতং মম ।”

* সমুদায় সত্তা বা সমুদায় সূত যে এক বর্ষে জীব, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । তবে বাহ্যের এই প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি অন্তিব্যক্ত, তাহাকেই সাধারণতঃ প্রাণী বলে । আর বাহ্যতে প্রাণশক্তি অন্তিব্যক্ত, তাহাকে জড় বলে । বাহ্যকে আমরা জড় বলি, তাহা যে প্রাণযুক্ত এ তত্ত্ব সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । জড়বাদী হারবার্ট স্পেন্সরও বলিয়াছেন, “The conception to which physicist tends is much less that of universe of everywhere alive ; dead-matter than that of a universe if not in the strictest sense still in a general sense.”

এই তত্ত্ব ভগবান্ অর্জুনকে এই অধ্যায়ের প্রথমেই উপদেশ দিয়াছেন । ইহা ভগবানের পূর্বে কেহ উপদেশ দেন নাই—এজন্য ইহা ‘আমার মত’ ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন । যে স্থলে প্রাচীন ঋষিদের মত উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে ‘উচ্যতে’ প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে ।

যাহা হউক, পূর্বে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই জ্ঞান, ইহা উক্ত হইয়াছে । এ স্থলে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে সমুদায় স্বাবরজ্জন্মান্বক সত্ত্বের উদ্ভব, ইহা উক্ত হইল । অতএব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ ও তাহাদের সংযোগ বুঝিতে পারিলেই এই জগৎতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগই পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ—পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগ ও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ এক অর্থে একই । সমষ্টিভাবে এই জড় জীবময় বা স্বাবরজ্জন্মান্বক সমুদায় জগতের মূল কারণ—এই প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ । আর ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক সত্ত্বার উৎপত্তিকারণ—এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ । ব্যষ্টির জ্ঞান হইলে তাহা চইতে সমষ্টির জ্ঞান হয় । পুরুষই এক অবিতক্ত হইয়া প্রতি শরীরে বিভক্তের জ্ঞান করেন, এবং সেট শরীরের ক্ষেত্রজ্ঞ হন । আর প্রকৃতি এক হইয়াও তাহার গুণ ও বিকার হেতু তাহা হইতে বহু শরীরের উৎপত্তি হয়,—সামান্য অণু হইতে পর্যন্ত এবং সামান্য কীটাণু হইতে মনুষ্যদেহ পর্য্যন্ত সমুদায় শরীর উৎপন্ন হয় । প্রকৃতি হইতে জাত প্রতি শরীরে বা প্রতিক্ষেত্রে পুরুষ সংযুক্ত থাকিয়া সেই ক্ষেত্রজ্ঞ হন, আর সমষ্টিভাবে সর্বশরীরে পুরুষ পরমেশ্বর-রূপে এক ক্ষেত্রজ্ঞ হন । সুধু ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন—তিনি প্রতিক্ষেত্রে সমষ্টি-ভাবে অন্তর্ধামী ও নিরস্তা হন । এ তত্ত্ব আমরা পূর্বে নানারূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি ।

এই পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ হইতে যে সংসার, তাহা সাংখ্য-দর্শনের অভিমত । তবে সাংখ্য-দর্শন অনুসারে পুত্র বহু । বহু বহু পুত্রের সহিত প্রকৃতি সংযুক্ত হইলে প্রত্যেক পুরুষের বহু উপযোগী নানারূপ

শরীর বা ক্ষেত্র সৃষ্ট হয়, এবং সেই শরীরে বদ্ধ থাকিয়া সেই দেহই পুরুষ সেই দেহেরই ক্ষেত্রজ হয় । গীতায় এই অর্থে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগ উক্ত হয় নাই, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ সব তত্ত্ব আর এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই ।

শঙ্করাচার্যের মতে ক্ষেত্র অসৎ ও সংযোগ : অধ্যাস মাত্র— শঙ্করাচার্য বলেন যে, যে জীব ও পরমেশ্বরের অভেদজ্ঞানই মোক্ষের সাধন, ইহা 'যৎ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহুভাৎ' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে । ইহাই যে সিদ্ধান্ত, ইহার হেতু দেখাইবার জন্য এই শ্লোকের আরম্ভ করা হইয়াছে । শঙ্করাচার্যের মার্যবাদ অবলম্বন করিয়া, এই ক্ষেত্র মায়ী-নির্মিত হস্তী বা স্বপ্ন-দৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরাদির ত্যায় অসৎ হইলেও সত্তের ত্যায় বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ।

শঙ্করাচার্য আরও বলিয়াছেন যে, একত্র ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগ অধ্যাস-মূলক । এই সংযোগ অবয়বের সহিত অবয়বীর সংযোগ হইতে পারে না ; কারণ, আকাশের ত্যায় ক্ষেত্রজের কোন প্রকার অবয়ব নাই । এই সংযোগ সমবায়-সম্বন্ধ-জনিতও নহে । তন্তু এবং পটের মধ্যে যে সমবায় সংযোগ-সম্বন্ধ আছে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের মধ্যে সে প্রকার সংযোগও হইতে পারে না । এই সংযোগ কার্যকারণ-সম্বন্ধ-জনিত । তন্তু বস্তুর কারণ, বস্তু তাহার কার্য । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-মধ্যে একত্র কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নাই । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ পরস্পর বিলক্ষণ-সম্ভাব । ক্ষেত্র জ্ঞানের বিষয়, আর ক্ষেত্রজ জ্ঞানস্বরূপ । ইহাদের মধ্যে বাস্তব কোন সংযোগ থাকিতে পারে না । অতএব সংযোগের কারণ—অধ্যাস । পরস্পরমধ্যে অধ্যাসরূপ যে সম্বন্ধ আছে, তাহাই এই স্থলে এই সংযোগ শব্দের অর্থ । ক্ষেত্রজের ধর্ম্ম ক্ষেত্রে আরোপিত হয়, এবং ক্ষেত্রের ধর্ম্ম ও তাদাত্ম্য ক্ষেত্রজে আরোপিত হয়, এবং ক্ষেত্রের তাদাত্ম্য ক্ষেত্রজে আরোপিত হয় । এই প্রকার পরস্পরের স্বরূপ ও

ধর্মের পরম্পরে যে আরোপ, তাহাই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপগত বিবেকের অভাবই এই সংযোগের কারণ । এই অধ্যাসরূপ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ মিথ্যাজ্ঞান ।

শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন যে, শাস্ত্রে বেক্রপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ অগ্রে জানিয়া মুক্ততৃণমধ্য হইতে যে তাহার ইষীকা বা বীজ পৃথক্ করা যায়, সেইরূপে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞকে পৃথক্ করিয়া, তাহা 'সৎ বা অসৎ বস্তু নহে' এই সকল শাস্ত্রের সহায়ে ক্ষেত্রজ্ঞকে সার্বোপাধিমুক্তস্বভাব পরব্রহ্মরূপে যে দর্শন করিতে পারে, এবং ক্ষেত্রকে মাধ্যমের মিথ্যা অসৎরূপে যে দেখিতে পারে, তাহার মিথ্যাজ্ঞান অপগত হওয়ার তৎক্ষণাতঃ উদয় হয় । তখন আর তাহার পুনর্জন্মের কারণ থাকে না,—মোকলাভ তাহার পক্ষে সুলভ হয় ।

অতএব শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার অন্তর্গত গিরিরমতে এই ক্ষেত্র অজ্ঞানকল্পিত এবং এই সংযোগ অধ্যাস মাত্র—প্রকৃত নহে । এই সংযোগ সম্বন্ধে রামানুজ ও মধুসূদন বলেন,—এ সম্বন্ধ ইতরেরতর সম্বন্ধ । স্বামী বলেন, অবিবেককৃত আত্মাধ্যাস হেতু এই সংযোগ হয় । বংদেব বলেন, ঈশ্বরই তাঁহার পরা প্রকৃতি জীবের আর্চিত, তাঁহার অপরা প্রকৃতি অষ্টধা প্রকৃতির সংযোগ বা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেন ।

সংযোগ অধ্যাস নহে—এ স্থলে শঙ্করাচার্য্যের অর্থ গ্রাহ হইতে পারে না । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের কারণ যে অধ্যাস, ইহাই তিনি সিদ্ধান্ত করেন । কিন্তু অধ্যাস সংযোগের পূর্বে থাকিতে পারে না । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ না হইলে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যাস এবং ক্ষেত্রজ্ঞে ক্ষেত্রের অধ্যাস হইতে পারে না । সুতরাং এই সংযোগ অধ্যাসের নিয়ত পূর্ববর্তী । একত্র এই সংযোগই অধ্যাসের কারণ, অধ্যাস সংযোগের কারণ হইতে পারে না । আর সংযোগের ত্রায় অধ্যাসও একটি 'সৎ' এবং আর একটি অসৎ বা মিথ্যা-জন্মিত বস্তুর মধ্যে হইতে পারে না । ক্ষেত্র

সংস্কৃত ভাষায় অধ্যাস হইতে পারে না। অধ্যাসকে সাধারণতঃ ভ্রম বলা যায়। ইহাকে যোগসূত্রে 'বিকল্প' ও বিপর্যায়রূপ চিত্তবৃত্তি বলে। ইংরাজীতে ইহাকে Illusion delusion hallucination বলে। ইহার সকলকেই অধ্যাস বলা যায় না। রজ্জু সন্মুখে দেখিয়া যদি তাহাতে সর্প-ভ্রম হয়, তাহাকেই অধ্যাস বলে। রজ্জু না থাকিলেও যদি সর্প-ভ্রম উপস্থিত হয়, তাহা অধ্যাস নহে। এজন্য কোন ভাব-পদার্থ অবলম্বন ব্যতীত অধ্যাস হয় না। অসত্যের ভাব হয় না। যাহা অসৎ, তাহা অবলম্বন করিয়া অধ্যাস হয় না। রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হলে রজ্জু অসৎ নহে। শঙ্করাচার্য্য যে ক্ষেত্রকে অসৎ মিথ্যা, সপ্নদৃষ্টরূপ পুরুষনগরের আয়তন বলেন, তাহাই তৎ হইলে, তাহাতে আত্মার অধ্যাস ও আত্মাতে এট কল্পিত পদার্থের ধর্ম্মাধ্যাসরূপ যে সংযোগ, তাহা সম্ভব হইত না।

এ সম্বন্ধে আরও এক কথা বুদ্ধিতে হইবে। এই অধ্যাসের স্থান বা অধিকরণ কোথায়? চিত্তে বা চিত্তরূপ উপাধিতেই এই অধ্যাস হয়। পাণ্ডুল দর্শন অনুসারে ইহা চিত্তবৃত্তিবিশেষ। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হইলে এ অধ্যাস থাকে না। সুতরাং চিত্তের সহিত আত্মার বা পুরুষের সংযোগ না হইলে, পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ না হইলে এ অধ্যাস হয় না। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ বিনা কোনরূপ অধ্যাসই সম্ভব নহে। সুতরাং অধ্যাস এই সংযোগের কারণ নহে।

অধ্যাসই যদি এই সংযোগের কারণ হইত, তবে স্থাবর সস্তায় বা জড়ে এই পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ কোনরূপে বুঝা যাইত না। জড় সত্তার অধ্যাস সেই জড়ে নাই। তাহার চৈতন্য বা চিত্ত সমুদায়ই অপ্রকাশিত—বৈজ্ঞানিকভাবে স্থিত। আমার জ্ঞানে সে সত্তা জড়রূপে প্রত্যক্ষিত মাত্র। অতএব তাহার সত্তাভাব অসৎ, আমার জ্ঞানের অধ্যাস মাত্র, ইহাই বলিতে হয়। তাহা হইলে সেই সত্তাই পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ বা অধ্যাস তাহার উদ্ভবের কারণ, ইহা বলা যায় না।

বাহা হউক, শঙ্করাচার্যের মত সত্য হইলে শ্রীতার সমুদায় উপদেশ মিথ্যা ও ব্যর্থ হয় । গীতা অনুসারে পুরুষ প্রকৃতি চই অনাদিত্ব । প্রকৃতির গুণ ও বিকার হইতে শরীর বা ক্ষেত্র হয় । পুরুষ সেই প্রকৃতির শরীরে স্থিত হইয়া ভোক্তা হয়, এবং প্রকৃতির গুণসমূহ হেতু তাহার সমসদ্যোনিভ্রমণ হয় । অজ্ঞান হেতুই অবশ্য পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতির গুণে আসক্ত হয় । এক অর্থে অজ্ঞানই যে এই সংযোগের কারণ, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । কিন্তু পুরুষ বা ক্ষেত্রজ এই অজ্ঞান হেতু প্রকৃতিতে বা ক্ষেত্রে সংযুক্ত হইয়া তাহাতে বদ্ধ হইলেও ক্ষেত্র সেই অজ্ঞানমূলক মিথ্যা কল্পিত বস্তু নহে । অন্ততঃ গীতার 'সে উপদেশ' নহে ।

ক্ষেত্র মিথ্যা নহে ।—আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, শঙ্করাচার্য্য মায়াকে পরমেশ্বরের পরা গতি বলিয়াছেন । শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ) অনুসারে সেই পরা গতি ত্রিবিধ—তাহা জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়ারূপা । এই শক্তির কারণাবস্থা মায়ী, আর ইহার কার্যাবস্থায় বা জ্ঞান ও বলরূপে ক্রিয়া অবস্থায় ইহাই প্রকৃতি । শ্রুতিতে আরও আছে যে, এই মায়াই প্রকৃতি । আর 'যিনি নায়ী, এই মায়ীযুক্ত বা এ মায়ার আধার, তিনি পরমেশ্বর । শ্রুতিতে আরও আছে যে, শক্তি ও শক্তিমানে কোন প্রভেদ নাই । এ সকল কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । অতএব প্রকৃতি যদি ভগবৎশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি বলিয়া শঙ্কর স্বীকার করেন, তবে কিরূপে সেই প্রকৃতির ক্ষেত্রকে তিনি মিথ্যা বলেন, বলিতে পারি না । শক্তি নিত্য, তাহার নাশ নাই । কারণাবস্থায় তাহা বীজরূপে থাকে মাত্র । শঙ্কর নিজেই বলিয়াছেন যে, কারণের অন্তর্ভূত শক্তি, এবং শক্তির অন্তর্ভূত কার্য্য । এই ক্ষেত্র—কার্য্য, ইহার অন্তর্ভূত—শক্তিরূপা মায়ী বা প্রকৃতি । তাহা সৎ । সৎ না হইলে, বলিয়াছি ত তাহা হইতে কার্য্য বা ভাববিকার হয় না ।

গীতার ভগবান্ প্রকৃতিকে ও ব্যাক্যকে 'তাহারই' বলিয়াছেন । তাহা মিথ্যা, তাহাতে যদি ভগবানের এইরূপ 'আমার' বলিয়া অধ্যাস হইয়াছে বলা যায়, তবে অবশ্য এই মিথ্যা অধ্যাস হেতু তাঁহার 'জ্ঞান'—অজ্ঞান হইবে । তিনি উপদেষ্টা হইতে পারেন না । অতএব গীতা অহুসারে প্রকৃতি ও প্রকৃতির পরিণাম ক্ষেত্র—সত্যত্ব, তাহা অন্যর্থাৎ । ভগবান্ সেই ক্ষেত্রজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন । সেই জ্ঞানই জ্ঞান, তাহা বলিতেছেন । সেই জ্ঞানই যে মিথ্যা জ্ঞান অথবা তাহা মিথ্যা অসৎ এই জ্ঞান, তাহা বলেন নাই । তিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ উভয়ই,—তৎক্ষণনই জ্ঞান,—ইহাই বলিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে একটি সৎ ও আর একটি অসৎ, এই জ্ঞানই উপদেশ দেওয়া যদি ভগবানের অভিপ্রেত হইত, তবে অবশ্য তিনি তাহাজ্ঞানই উপদেশ দিতেন । উপদেষ্টার উপদেশ যদি অসৎ বা বিকলমাত্রক হয়, তবে তাহা মিথ্যা । আরও বুঝিতে হইবে যে, যদি ক্ষেত্রজ 'সৎ' এবং ক্ষেত্র 'অসৎ' এতদ্বয়ের বিবেকজ্ঞানোপদেশই অভিপ্রেত হইত, তবে পূর্বোক্ত এই অধ্যায়ের বিচার শ্লোকে 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োজ্ঞানিং' না বলিয়া ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিবেকজ্ঞান অবশ্য বলা হইত । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ এ হলে স্বয়ংসিদ্ধ হেতু সমানার্থিকরণতাবশুৎ । এ উত্তরের 'জ্ঞান তুল্যরূপে এ হলে উক্ত হইয়াছে । অতএব ইহার মধ্যে একটি সত্যত্ব আর একটি মিথ্যাত্ব, ইহা গীতার উপদেশ বলিয়া কখনই গ্রহণ করা যায় না ।

সংযোগের অর্থ—এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ যদি উভয়ই সত্যত্ব হয়, তবে তাহাদের সংযোগ দুই কঠিন হইবে না । রামানুজ ও মধু বলিয়াছেন—ইহা ইতরেতর-সংযোগ । ক্ষেত্র জড় ও ক্ষেত্রজ চৈতন্য : জড় ও চৈতন্য এতদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ কিরূপে সম্ভব ? এই প্রশ্ন হইতে পারে । কেন না, বাহ্যিক পরস্পর বিরুদ্ধতায়, তাহাদের মধ্যে সংযোগ ধারণা করা যায় না । বলদেব এই সংযোগের কারণ যে ঈশ্বর বা স্বয়ংসিদ্ধমপুরুষ, তাহাই অস্বীকার করিয়াছেন । পাশ্চাত্য পণ্ডিত মেনব্র্যাং

প্রকৃতি occasionalism মত দ্বারা এবং 'লাইবনিট্‌স্ প্রকৃতি Pre-setablished harmony দ্বারা এই সংযোগ কতকটা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ স্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। বলদেবের বাধ্য ইহাদের ব্যাখ্যার কতকটা অনুরূপ হইলেও ভিন্ন। যাহা হউক, এই সংযোগতত্ত্ব বলদেব বেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহাই অধিক সম্ভব বোধ হয়। আমরাও পূর্বে এইরূপে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মই বহু বিশেষ সত্ত্ব।' নামরূপের দ্বারা কল্পনা করিয়া তাহা সৃষ্টি পূর্বক তাহাতে 'অনুপ্রবিষ্ট হন। এই অনুপ্রবেশ হেতু ব্রহ্ম, স্বকল্পিত ও স্বীর্ণপরাশক্তি-রূপা উপাদান হইতে সৃষ্ট বস্তুতে বা সত্তাতে সংযুক্ত হইয়া অবস্থিত হন। এই সংযোগ ও অবস্থান হেতুই তিনি পুরুষ হন। প্রতিক্ষেত্রে তিনি ক্ষেত্রজরূপে অবস্থিত থাকেন। প্রতিক্ষেত্রে তাহারই পরাশক্তি বা মায়া প্রকৃতি হইরূপ—এক অপরা জড়রূপ ও পরা জীবরূপ। জীবরূপ পরা প্রকৃতি সেই ক্ষেত্রেরই অন্তর্ভূত। সেই জীবভাবযুক্ত প্রকৃতি-অধিষ্ঠিত পুরুষ পরিচ্ছিন্নের স্থান হইয়া, অজ্ঞানাবৃত্তের স্থান হইয়া করপুরুষভাবে প্রতি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্ররূপে বিভক্তের স্থান হইয়া ক্ষেত্রজ হন। এ কথা আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং পরবর্তী শ্লোকে তাহা আরও বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। অতএব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগ ব্যাপারে ভগবানের যে মত, আমরা যে ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাই উপনিষদে উপদিষ্ট এবং তাহাই গ্রাহ্য। এই মতানুসারেও সর্বত্র ব্রহ্ম-দর্শনের বাধা হয় না ; কেবল সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব মায়াবয়, পরমার্থভাবে অসত্য, ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় না। অথবা নিগুণ ব্রহ্ম পারমার্থিক তত্ত্ব নহে, ইহাও স্থাপনার চেষ্টা করিতে হয় না। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগে ভূতগণের উৎপত্তি-তত্ত্ব পরে (১৪।৩,৪ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে। সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

সমং সৰ্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তঃ পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যৎস্বাবিনশ্যন্তঃ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭



পরমেশ সৰ্বভূতে সমভাবে স্থিত

বিনাশী সবার মাঝে তিনি অবিনাশী

এরূপে যে হেরে সেই করে দরশন ॥ ২৭

২৭ । পরমেশ সৰ্বভূতে সমভাবে স্থিত—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের

অজ্ঞান হেতু সংযোগ হইতে সংসারে বার বার অন্তভোগ করিতে
যায়, সেই পুনরাবর্তনরূপ সংসারবীজের নিবৃত্তি বা বিনাশের কারণ যে
স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান, তাহা পূর্বে উক্ত হইলেও পুনর্বার অন্য প্রকারে এ স্থলে
উপদিষ্ট হইয়াছে (শঙ্কর) ।

‘সম’ অর্থাৎ নিরীক্শেষ ভাবে ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্যন্ত সৰ্বভূত বা
প্রাণীর মধ্যে পরমেশ্বর অবস্থিত । দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অব্যক্ত ও
আত্মা’ হইতে পরম সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বর (শঙ্কর) । পূর্ক-
লোকোক্ত ইতরেতর সম্বন্ধ দ্বারা যুক্ত ক্ষেত্রক্ষেত্রজরূপ যে সৰ্বভূত দেবাদি
গণা প্রকার আকারে অভিব্যক্ত, তাহা হইতে বিযুক্তভাবে, অথচ সেই
সৰ্বভূতের দেহ মন প্রভৃতির পরম ঈশ্বররূপে অবস্থিত এই আত্মা ।
তিনি স্ফাত্ত্বরূপে বা স্ফাত্তভাবে সমান আকারে সৰ্বভূতে অবস্থিত
(সাত্বিক) । স্থাবর-জঙ্গমাশ্রক সৰ্বভূতে নিরীক্শেষ সংরূপে বা সত্তাভাবে
পরমাশ্রা অবস্থিত (স্বামী) । প্রপঞ্চাস্তঃপাতী স্থাবর-জঙ্গমাশ্রক
সৰ্বভূতে লীলার্থ অনেকবিধ রসভোগার্থ অবস্থিত, এবং রসানুভবার্থ
নাচোচ্চাদি ধর্মরহিত, একান্ত সমভাবে স্থিত (বল্লভ) । সৰ্বভূত
অর্থাৎ ভবন (উপাস্ত্রি)-ধর্মক স্থাবরাস্থাবরাশ্রক প্রাণিবর্গ । তাহাতে

সর্বত্র একরূপে সর্বত্রভূতবর্গের সত্তা ক্ষুণ্ণিত প্রদান দ্বারা পরমেশ্বর অবস্থিত (মধু) । পরাপ্রকৃতি ও অপরাপ্রকৃতি-সংযুক্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক দেহবান্ সর্বজীবে একরূপে পরমেশ্বর অবস্থান করেন (বলদেব) । সম—অর্থাৎ নানা স্থাবরজঙ্গমরূপ সর্বিশেষ ভূতভাবমধ্যে তাহা হইতে বিলক্ষণ নির্বিশেষ ভাবে উৎকর্ষাৎকর্ষিত ভাবে । পরমেশ্বর,— অর্থাৎ পরম এবং ঈশ্বর । পরম অর্থাৎ দেহ, মন, বুদ্ধি, জীবাত্মা হইতে পরম এবং তাহাদের নিরস্তা ঈশ্বর (গিরি) ।

পূর্বে প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ হইতে সংসারের উদ্ভব-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে । সেই সংসার হইতে মুক্ত হইবার অল্প প্রকৃতি-বিযুক্ত আত্ম-দর্শনের উপায় এ স্থলে উক্ত হইতেছে । ঈশ্বর সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাদি সমুদায় ভূতে সমভাবে অর্থাৎ দেহমনুষ্যাদি বিভিন্ন আকার-বিযুক্ত হইয়া কেবল জ্ঞান-স্বরূপে অবস্থিত (কেশব) ।

বিনাশী সবার মাঝে তিনি অবিনাশী—এই ভূত সকল বিনাশ-শীল হইলেও সর্বভূতাত্মা পরমেশ্বর অবিনশ্বর । পরমেশ্বর ও ভূতগণের মধ্যে যে আত্যাত্মক বৈলক্ষণ্য আছে, তাহাই ইহা দ্বারা দেখান হইয়াছে । সকল প্রকার বিকারের মধ্যে জন্ম বা উৎপত্তি-রূপ বিকারই সকল বিকারের আদি । অপচয় উপচয় হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত অল্প যে বিকার ভাবপদার্থের হইয়া থাকে, সে সকলই জন্মের পরবর্তী । বিনাশের পর আর কোন বিকারের সম্ভাবনা নাই । বিনাশের পর আর সে ভাবপদার্থই থাকে না ; এজন্য তাহার আর কোন বিকারই থাকে না । ধর্ম্মীতেই ধর্ম্ম অবস্থিতি করে । পরমেশ্বরে সকল প্রকার ভাববিকারের যে শেষ, তাহার প্রতিষেধ দ্বারা বিনাশের পূর্ণ-ভাবী সর্ববিকারও সেই আত্মাতে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । সুতরাং কোন প্রকার বিকারের কার্য্য আত্মাতে সম্ভবপর নহে । সর্বভূত এই ষড়্ভাব-বিকারের অধীন । এই হেতু বিকারী সর্বভূত হইতে সর্ববিকারহীন

পরমেশ্বরের বৈলক্ষণ্য ও নির্নিশেষত্ব সিদ্ধ হইতেছে (শঙ্কর)। সেই সর্ববিনাশীল দেহাদিতে বিনাশের অযোগ্যতাবচ্ছত্তে অবিনশ্বরভাবে পরমেশ্বর অবস্থিত (রামানুজ)। বিনাশী সর্বভূতে অবিনাশিতাবে পরমেশ্বর অবস্থিত (শ্যামী)। দেহনাশ হেতু বিনাশীল সর্বভূতে, তাহা হইতে বিলক্ষণ অবিনাশী পরমেশ্বর। স্ববিধ প্রকৃতিসংযোগ হইতে উৎপন্ন; স্মৃতরাং বিবিধ বিনাশধর্মী জীব হইতে একরস অবিনাশী পরমেশ্বরের বৈলক্ষণ্য এইরূপে দেখান হইয়াছে (বলদেব)।

অনেকবিধ জন্মাদিরূপ পরিণামশীল, আর গুণপ্রধান ভাবাপত্তিধারা বিষয়ের আকর্ষণ হেতু চাক্ষুণ্যযুক্ত—অতএব প্রতিক্ষণ পরিণামশীল এবং এতন্তু পরস্পরে বাধ্যবাধকভাবাপন্ন হইয়া পরিণামশীল ও বিনাশ বা মায়াসন্দর্শনগবাদির ত্রায় দৃষ্ট-নষ্টভাবযুক্ত এই সর্বভূত। আর প্রতিদেহে এক, জন্মাদি পরিণামশূন্য, বাধ্যবাধকভাবশূন্য, সর্বদোষবিরহিত দৃষ্ট-নষ্ট-পার সর্বদৈবতবাধা দ্বারা অবাধিত এবং সর্বপ্রকারে জড়প্রপঞ্চ হইতে বিলক্ষণ এই পরমেশ্বর (মধু)। সেই বিনাশীল সর্বভূতে অর্থাৎ তাদৃশ লীলাববোধরাহিত্য হেতু বিনাশপ্রাপ্ত সর্বভূতে, অগৃথাভাবে ক্রোধাদিরহিত হইয়া সেই সেই লীলাভূতকারী অবিনাশী পরমেশ্বরকে যে দেখিতে পারে, সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করে। যে এরূপ দর্শন করিতে অসমর্থ, সে অপরাধী হয় (বল্লভ)।

বিষমাকার দেহ বিনাশী হইলেও তাহাতে অবিনাশী অর্থাৎ বিনাশের অযোগ্য ও নিত্য স্বরূপে অবস্থিত (কেশব)।

পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই ষড়্ভাব-বিকারের কথা উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকের অর্থগ্রহণ জগত তাহা দেখিতে হইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অসত্তের ভাব হয় না। তাহা 'সৎ', তাহারই ভাব হয়। সেই ভাব দুইরূপ,—এক বিকার-হীন ভাব, আর এক জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, নাশ প্রভৃতি ছয় প্রকার

বিকারবুদ্ধ ভাব । যাহা সৎ বিকারহীন, তাহাই আত্মা, পরম পুরুষ বা পরমেশ্বর । এই নিত্য বিকারহীন ভাবের তত্ত্ব পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ে ২০শ হইতে ২২শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । আর যাহা বড়বিকারবুদ্ধ বা জন্মস্থিতিনাশাদি ভাববিকারের অধীন, তাহা সাংখ্যদর্শন অনুসারে পরিণামী 'সৎ', তাহাই প্রকৃতি । বলদেব বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি গীতা অনুসারে দুইরূপ ;—পরাজীবরূপা প্রকৃতি, আর অপরা অষ্টধা জড়প্রকৃতি । এই অপরা ও পরপ্রকৃতির অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ-সংযোগ হইতে সমুদার স্থাবরজঙ্গমাংক সর্বভূত সত্তা বা জীব । এ কথা কতদূর সঙ্গত, তাহা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব । যাহা বড়ক, একই 'সৎ' দুইরূপভাববুদ্ধ, এবং প্রত্যেক সত্তায় এই দুই ভাব অনুস্থিত । তাহার একটি নির্বিকার ভাব, আর একটি উক্ত সবিকার ভাব । এই দুই ভাব (যাহাদের আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় Noumenon ও Phenomenon বলিতে পারি, তাহারা) পরস্পর পৃথকভাবে থাকিতে পারে না । একত্র প্রত্যেক বিকারী ভাবের (Phenomenon) মধ্যে, সতের এই নির্বিকার (Noumenon) ভাবও অনুস্থিত । নির্বিকার 'সৎ' প্রত্যেক বিকারী ভাবের আধার, অথবা মধুসূদনের কথায় তাহার সত্তা স্ফুর্তির কারণরূপে অধিষ্ঠিত । এই নির্বিকার 'সৎ' নিগুণ ব্রহ্ম । তিনি নির্বিশেষ 'সৎ'রূপে প্রত্যেক বিকারী ভূতের অন্তরে অধিষ্ঠিত । তিনিই সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বররূপে সেই বিকারী ভূতের অন্তর্যামী নিরস্তা পরমপুরুষরূপে অধিষ্ঠিত । পটে যেমন চিত্র অবস্থিত, সেইরূপ ব্রহ্ম —এই সর্বভূতময় জগৎ অবস্থিত । অথবা নির্মল শুভ্রপটে যেমন আলোকসাহায্যে ছায়াচিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া নিরন্ত পরিবর্তিত হয়, ব্রহ্ম আধারে, ব্রহ্মমায়াশক্তিধারা সেইরূপ নিরন্ত পরিবর্তনশীল সর্বভূতময় জগৎ প্রকাশিত হয় । এই ভাবে সর্বাধিনাশীল ভূতগণের 'সৎ' আধার রূপে এবং তাহাদের হইতে বিলক্ষণ অধিক তাহাদের অন্তঃস্থরূপে

অবিনাশী অর্থাৎ অপরিণামী নির্বিকার সংস্বরূপ পরমেশ্বর অবস্থিত
আছেন, এই তত্ত্ব বুঝিতে হইবে ।

কেবল সর্কভূতের 'সৎ' আধারস্বরূপে যে ব্রহ্ম সর্কভূতে অবস্থিত,
তাহা নহে । আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ব্রহ্মকে 'সচ্চিদানন্দ'-
স্বরূপে ধারণা করা হয় । তিনি কেবল সৎ নহেন, তিনি 'চিৎ' ও আনন্দ-
স্বরূপও বটেন অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন সন্ধিনী-শক্তিযুক্ত, সেইরূপ সংবিৎ ও
স্লাদিনী-শক্তিযুক্ত । সেই অনন্ত সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অবস্থিত
হইয়াও সৃষ্টিতে বহু পরিচ্ছিন্ন 'সৎ, চিৎ' আনন্দস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া
বিভক্তের স্তায় বোধ হয় এবং অনন্ত সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ পরিচ্ছিন্ন
সত্ত্ব হইয়া সদসৎ, চিদচিৎ, আনন্দ-নিরানন্দ এই বৈতন্ড্যবাক্য বা পরস্পর
বিরোধী বন্দ্যভাবযুক্তের স্তায় (contradictory) প্রতীয়মান হয় ।
এইরূপ বিভক্তের স্তায় পরিচ্ছিন্নের প্রতিভাত ব্রহ্ম বা আত্মাই—জীবাত্মা
বা কর পুরুষ । তাহা ভূত বা জীব নহে, ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে ।
এই জীবাত্মা বা করপুরুষই ব্রহ্ম । প্রতিক্রমের আধাররূপে ব্রহ্ম স্থিত
হইয়া এই করপুরুষভাবে প্রতীয়মান হয় । কিন্তু সর্কক্ষেত্রে নির্বিশেষ-
ভাবে কেবল 'সৎ' আধাররূপে তিনি অক্ষর পুরুষ আর সর্কক্ষেত্রে জ্ঞাতা
দ্রষ্টা, অন্তর্ধামী, নিরন্তরভাবে তিনি পরমেশ্বর পরম পুরুষ । তিনি সর্কভূতে,
সমভাবে অপরিচ্ছিন্নরূপে পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে অবস্থিত । তিনি সর্ক-
ভূতে সমভাবে, অপরিচ্ছিন্নরূপে, পূর্ণ সর্কদানন্দস্বরূপে অবস্থিত । তিনি
সর্কভূতের অন্তরে যেমন 'সৎ'স্বরূপ, সেইরূপ চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ।
সর্কভূতে যে জ্ঞান, যে কর্মবৃত্তি ও যে আনন্দভোগজন্য 'কাম' বা বাসনার
বিকাশ হয়, তাহারও আধার সেই সর্কভূত-অন্তরে অবস্থিত সচ্চিদানন্দ-
ধন পরমেশ্বর । পরমেশ্বর সর্কভূতের অন্তরে অন্তর্ধামিরূপে নিরন্তররূপে
অবস্থান করেন, তাহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে । পরমেশ্বর যে সর্কভূতে
সমভাবে অবস্থিত, তাহা পূর্বে গীতার অনেক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে ।

গীতার পূর্বে উক্ত হইরাছে যে—

“বিজ্ঞাবিনঃসম্পন্নৈঃ স্রাজ্ঞৈঃ গবি হস্তিনি ।

ত্বনি চৈব স্বপাকে চ পশ্বিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ (৫।১৮)

সর্বভূতে কেন সমদর্শন করিতে হইবে, তাহার কারণ উক্ত শ্লোকে বলা হয় নাই । তাহার কারণ এই শ্লোকেই উক্ত হইরাছে । সর্বভূতে সমভাবে পরমেশ্বর অবস্থান করেন, এই অর্থ সর্বভূতে এই সমদর্শন বিহিত । গীতার পূর্বে উক্ত হইরাছে—

‘সর্বভূতহমাখ্যানং সর্বভূতানি চাখ্যানি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ (৬।২৯)

পরমেশ্বর সর্বভূতাত্মভূতাত্মা-রূপে সর্বভূতে অবস্থিত । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন,—‘অহমাখ্যা শুড়াকেশ সর্বভূতানবস্থিতঃ’ (১০।২০) । বাহা আমার আত্মা, তাহাই সর্বভূতের আত্মা ; সে আত্মা এক, অতএব আমার আত্মাতেই সর্বভূত অবস্থিত । আত্মা সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত । এই সর্বভূতে যিনি সমভাবে আত্মার অবস্থিতি দর্শন করেন, তিনিই সমদর্শী । তিনি পরমেশ্বকে সর্বত্র দর্শন করেন, এবং সর্বভূতকে এই পরমেশ্বের দর্শন করেন (৬।৩০) এবং যিনি এই পরমেশ্বকে এইরূপে সর্বভূতে সমভাবে স্থিত দেখিতে পান, তিনি এই ‘একম’ আশ্রয় করিয়া অনন্ততন্মিত্তে ভগবান্কেই ভজনা করেন (৬।৩১) । তিনি আত্ম-উপমাধারা সর্বত্র অর্থাৎ সর্বভূতে সমদর্শন করেন, সর্বভূতকে আপনার তুলনার আপনারই মত দেখেন, কাহাকেও পর বা আপনা হইতে তিন্ন মনে করেন না (৬।৩২) ।

গীতার ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

“ময়া ততমিদং সর্বং জগদবাক্তবুর্ভিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্ব য়ে যোগমেশ্বরম্ ।

ভূতভূয় চ ভূতহো মমাখ্যা ভূততাবনঃ ॥

যথা কাশ্মিরীভূতো নিতাং বায়ুঃ সৰ্বভূতগো মহান্ ।

তথা সৰ্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যপহারয় ॥” (২:৪-৬)

অতএব পরমেশ্বর সৰ্বভূতের অন্তরে সমভাবে অবস্থিত (Immanent) থাকিয়াও সৰ্বভূতত্বের অতীত হইয়া (transcendant ভাবে) অবস্থান করেন। পূর্বে এই অধ্যায়ের ১৭শ স্নে'কে “হৃদি সৰ্বশ্চ বিষ্টিতম্” ব্রহ্মতত্ত্বব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ সকল কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

পরমেশ্বর যে কেবল সৰ্বভূতের অন্তরে সমভাবে অবস্থিত থাকেন, তাহা নহে,—তিনি সৰ্বভূতের নিয়ন্ত্ৰরূপ সৰ্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহাও গীতার পরে উক্ত হইয়াছে, যথা—

‘ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশেভর্জুন তিষ্ঠতি ।

ব্রাহ্ময়ন্ সৰ্বভূতানি যন্ত্ৰকৃতানি মায়ায়া ॥”

(গীতা ১০:৩১) ।

এইরূপে আমরা, বিনাশশীল সৰ্বভূতমগ্নে সমভাবে অবিনাশী পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান বুঝিতে পারি, এবং এই জ্ঞানসংগ্ৰহ দ্বারা সৰ্বভূতে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে শিক্ষা করিতে পারি।

এরূপে যে হেরে সেই করে দর্শন—(যঃ পশুতি স পশুতি)—
যে ব্যক্তি এইরূপে পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত দর্শন করেন ;
যাহার চক্ষু আছে, সে দেখে বাট, কিন্তু প্রায়ই তাহারা বিপরীত দর্শন
করিয়া থাকে। পরন্তু আত্মদর্শীই যথার্থদর্শী। তিমিররোগগ্রস্ত ব্যক্তি
যেমন অনেক চন্দ্র দেখে, কিন্তু যাহার এই রোগ নাই, সে এক চন্দ্রই
দর্শন করে বলিয়া সে যথার্থদর্শী, সেইরূপ যে ব্যক্তি এক অবিভক্ত যথোক
আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি বিভক্ত ও অনেকাত্মদর্শনকারী অপেক্ষা
যথার্থ-দর্শী। অবিজ্ঞা হেতু যাহার আত্মজ্ঞান ভ্রমাত্মক, সে বিপরীত
দর্শনকারী। তাহাদের তুলনায় যাহারা সৰ্বভূতে সমভাবে হিত
আত্মাকে দর্শন করেন, অবিজ্ঞাদোষহীন তাঁহারািই যথার্থদর্শী বা সম্যগদর্শী।

(শঙ্কর) । অর্থ এই যে, তাহার। যথাবস্থিত আত্মাকে দর্শন করেন । আর যাহারা বিষমাকারে দেহাদিতে বিষমাকাররূপে স্থিত জন্মবিনাশ-সুস্তুভাবে আত্মাকে দর্শন করে, তাহার। সংসারী হয় ; অর্থাৎ সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, ইহাই অভিপ্রায় (রামানুজ) । অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত-দ্রষ্টা, অস্ত্রে নহে (শ্যামী) । তাহার।ই যথার্থদর্শী, অস্ত্রে নহে (বলদেব) । জড়প্রপঞ্চ হইতে বিলক্ষণ আত্মাকে যিনি বিবেক দ্বারা দর্শন করেন, অর্থাৎ শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা দর্শন করেন, তিনিই দর্শন করেন । তিনি জাগ্রদবস্থাকে স্বপ্নের স্থায় ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারেন । যে অজ্ঞ, সে এই স্বপ্নময় জগৎকে সত্য মনে করে । রজ্জুতে সে সর্প দর্শন করে । শুদ্ধ আত্মদর্শন দ্বারা সেই অবিদ্যা বা ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, এবং তাহাতে অবিদ্যাকার্য্যও নিবৃত্তি হয় । এই অবিদ্যা দূর হইলে ‘বিশেষ্য’ পদ যে আত্মা, তাহার।ই লাভ হয় । পরমেশ্বর তাহার।ই বিশেষণ, মর্যাদাপূর্ব্বক সেই বিশেষ্য আত্মার পরিবর্তে এ স্থলে বিশেষণ ‘পরমেশ্বর’ই ব্যবহৃত হইয়াছে । অথবা এই বিশেষ্য পদ (আত্মা),—বিষম—চঞ্চল—বাধ্যবাধকলক্ষণ—জড়বর্গ হইতে বৈধর্ম্ম্যযুক্ত সমস্তভাবে স্থিত পরমেশ্বররূপ বিশেষণ হইতেই প্রাপ্ত, ইহা বলা যায় (মধু) । ভূতগণ হইতে পরমেশ্বরের বৈলক্ষণ্য প্রথমে উক্ত হইয়া তাহার।ই উপসংহার করা হইতেছে যে, নির্কিশেষ সর্বভাববিকারাবিরহিত, কুটস্থ এক অদ্বিতীয় ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত ঈশ্বরকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা । যে ঈশ্বরপরায়ণ অনাস্বদর্শী, সে দর্শন করিলেও বিপরীতদর্শী । যে ঈশ্বরপ্রবণ, সেই সম্যগ্দর্শী, ইহাই অর্থ । (গিরি) । তিনিই প্রকৃত আত্মদর্শন করেন (কেশব) ।

এ স্থলে মধুসূদন যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে । শঙ্কর এ স্থলে পরমেশ্বরের উল্লেখ করেন নাই, আত্মারই উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি স্পষ্ট করিয়া এইরূপে ঈশ্বরতত্ত্বদর্শীকে যথার্থদর্শী বলেন নাই, আত্মদর্শীকেই যথার্থদর্শী বলিয়াছেন । মধুসূদন তাহার।ই বিস্তারিত করিয়া

উক্তরূপ অর্থ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, আত্মা বিশেষ্য, আর পরমেশ্বর বিশেষণ । গীতার ইহার বিপরীত মতই প্রতিষ্ঠিত । পরমেশ্বরের যে- এই আত্মরূপে অবস্থান বা অধ্যাত্মতাব, তাহা তাঁহার স্ব-ভাবে (গীতা, ৮।৩) । ইহা তাঁহার বিবিধ নিত্য ভাবের মধ্যে এক ভাব মাত্র । সর্বভূতকে অধিকরণ করিয়া, তাঁহার এই আত্মতাব, অতএব আত্মতাব যে বিশেষ্য, ইহা বলা যায় না । সর্বনিরন্তৃত্বতাব চর্চিতে ‘পরমেশ্বর’তাব যেমন ব্রহ্মের বা সগুণ ব্রহ্মের বিশেষণ, আত্মা বা পরমাত্মা-তাবও সেটরূপে সর্বভূতাস্তৃত্ব ভাবে তাঁহারই বিশেষণ । সুতরাং আত্মাকে বিশেষ্য ও পরমেশ্বরকে বিশেষণ বলা যায় না, উভয় শব্দই ব্রহ্মনির্দেশক বিশেষণ ।

সর্বভূত—এ স্থলে সর্বভূতকে বিনাশশীল অর্থাৎ ষড়্ভাববিকার-যুক্ত, অন্বস্থিতিলয় প্রভৃতি ভাববিকারের অধীন বলা হইয়াছে । এই ভূতগণের কথা গীতার নানা স্থলে উক্ত হইয়াছে । এই ভূতগণের স্বরূপ কি, তাহা এ স্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে । এই শ্লোকে দুই তরু উক্ত হইয়াছে—ঈশ্বরতরু ও ভূততরু, এবং ঈশ্বরও ভূতের সহিত সম্বন্ধতরু । এই শ্লোক হইতে এইমাত্র জানা যায় যে, ভূতগণ বিনাশশীল ও ঈশ্বর অবিনাশী ও সমভাবে সর্বভূতে অবস্থিত । এ স্থলে ইহা বাতীত সর্বভূতের সহিত ঈশ্বরের অন্য সম্বন্ধ উক্ত হয় নাই । গীতার অন্তত তাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া বুঝিতে হইবে । গীতার উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর “সর্বভূতাত্ম হুতাত্মা” (৫।৭) । তিনি সর্বভূতই আত্মা (৬।২৯), তিনিই আত্মরূপে সর্বভূতাস্বরে স্থিত (১০।২০) । পরব্রহ্মরূপ তিনি সর্বভূতের অন্তরে স্থিত (১৩।১৬) । তিনি সর্বভূতে সম বা ‘এক’ ভাবে স্থিত (১৮।২০) । ভগবান্ সর্বভূতের বীজ (৭।১০ ; ১০।৩৯) । তিনি তাঁহার যোনি মহদ্ব্রহ্মে বীজপ্রদান করেন, তাঁহা হইতেই সর্বভূত উৎপন্ন হয়—এজন্য তিনি সর্বভূতের বীজপ্রদ পিতা (১৪।৩) । ভগবান্ সর্বভূতের মুহূর্দ্ (৫।২৯), জীবন (৭।৯) ; তাঁহারই অংশ জীবলোকে

জীবভূত হইয়াছে (১৫।৭), তাহারই পরা প্রকৃতি জীবভূত হইয়া অগৎ-ধারণ করে (৭।৫)। তিনি সৰ্বভূতের নিরস্তা (১৮.৩১)। সৰ্বভূত-সীহাতে স্থিত (২।৪)। আর তিনি সৰ্বভূতে সমভাবে অবস্থিত (২।২২)। পরব্রহ্ম পরমেশ্বরভাবে ভূতভর্তা (১৩।১৩), ভূতভূৎ (২।৫) ; ভগবান্ ভূতভাবন (২।৫), ভূতমহেশ্বর (৩।১১)। তিনিই ভূতাদি (২।১৩)।

উপনিষদ্ হইতেও আমরা এ তত্ত্ব জানিতে পারি। পরমাত্মা পরমেশ্বর যে “সৰ্বভূতে গুঢ়” তাহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (শ্বেতাশ্বতর, ৩।৭ ; ৪।১৫ ; ৪।১৬ ; ৬।১১)। তিনিই ভূতাত্মা (মৈত্রায়ণী, ৩-২-৩)। সেই ভূতাত্মা এক—তিনিই ব্রহ্ম (ব্রহ্মবিন্দু উপ, ১২)। ব্রহ্মই বা পরমেশ্বরই ভূতাদিপতি (বৃহদারণ্যক, ৪.৪।২২)। নিগূর্ণ ব্রহ্মই ‘ভূতযোনি’ (যুগুৎক, ৩।১।৬)।

এই সকল শাস্ত্র হইতে ভূতগণের সহিত ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের যে সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারা যায়। এই জ্ঞান শাস্ত্রজনিত, শাস্ত্র-দৃষ্টির ফল। এক্ষণে এই ভূতগণের স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ কি, তাহা জানিতে হইবে। ভগবান্ আপনাকে সৰ্বভূতের জীবন বলিয়াছেন (৭।২)। তিনি একাংশে জীবভূত হইয়া পরা প্রকৃতিরূপে অগৎ ধারণ করেন বলিয়াছেন (১৫।৭)। অতএব ভূতগণ জীবনযুক্ত, তাহাদিগকে জীব বলিতে হয়। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ভূতগণ প্রাণযুক্ত—

“প্রাণো হ্যেষ যঃ সৰ্বভূতে বিভাতি ।” (যুগুৎক, ৩।১।৪)।

অতএব এই ভূতগণ প্রাণী। ভূতগণকে জীব বলা যায়, প্রাণীও বলা যায়। প্রাণই জীবন। ভূতগণ প্রাণী বা প্রাণযুক্ত বলিয়াই জীব জীবন-যুক্ত। সৰ্বভূত বা সৰ্বপ্রাণী কাহারো, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা—

“সুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ গরুজানি চ শ্বেদ-

জানি চোতিজানি চাখা গাং পুরুবা হত্তিনো বং কিকেরং প্রাণি জদবং চ
পতত্রি চ বহা হাবিরং সর্কং তং প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্।”
(ঐতরেয় উপঃ, ৩৩) ।

অতএব জ্ঞতি অহুসারে অতি ক্ষুদ্র অণু-পরিমাণ জড়জীব
মিশ্রভাববৃত্ত বাহা কিছু, বীজ বাহা কিছু (protoplasm), অণুজ,
শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, তরাসূত্র বাহা কিছু, অথ, গো, চক্ষী, মানুষ
বাহা কিছু—এক কথার বাহা কিছু হাবিরজদম সমুদায় প্রাণী । পূর্বে
২৩শ শ্লোক বে হাবিরজদবায়ুক সত্তার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে
জদম সত্তাকে আমরা প্রাণী বা জীব বলিয়া জানি ; তাহার এই সর্ক-
হতের অন্তর্গত । কিন্তু বাহা হাবির সত্তা, তাহাদের জীবে বা প্রাণী
বলিয়া আমাদের ধারণা নাই, তাহার জীবনহীন প্রাণহীন জড় বলিয়াই
আমাদের ধারণা । বাহা হটক, এই হাবির সত্তার মধ্যে উদ্ভিদ বে প্রাণী,
তাহা বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন । অধুনা বিজ্ঞান-বিশারদ
শ্রীবৃন্দ অসদীশচক্র বহু জড়েও এই জীবন, এই প্রাণ ও প্রাণ-ক্রিয়া
আবিষ্কার করিয়া, “প্রাণপ্রবেদং সর্কতঃ” এই জড়াক্র তথের প্রতিষ্ঠা
করিয়াছেন । অতএব বে সকল হাবির সত্তাকে আমরা জড় মনে করি,
তাহারও বে প্রাণী বা জীব, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে । সামান্ত জড়
পরমাণুটিও ক্ষুদ্রতম জীবাণুর স্তার প্রাণী বা জীব, তাহাও এই তৃতগণের
অন্তর্গত । তবে তাহাদের মধ্যে প্রাণ বা জীবনক্রিয়ার অস্তিত্ব নাই,
তাহা বীজভাবে নিহিত এইমাত্র অর্থাৎ বে সকল সত্তামধ্যে প্রাণ বা
জীবন অর্থাৎ প্রাণে বা জীবনের ক্রিয়া অস্তিত্ব, সাধারণভাবে আমরা
তাহাদিগকে জীব বলি, আর বে সকল সত্তার এই প্রাণ বা জীবন
অথবা তাহার ক্রিয়া অনস্তিত্ব, তাহাদিগকে আমরা জড় বলি ;
এবং এইরূপে জীব ও জড়ে প্রভেদ করি । এ কথা আমরা পূর্বে
২৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে আর তাহার

পুনরুন্মেষের প্রয়োজন নাই । পরে চতুর্দশ অধ্যায়ের ৩য়, ৪র্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা বিবৃত হইবে ।

এই ভূতগণের ইংরাজী প্রতিশব্দ being ; যাহারা 'ভবন্' ধর্মযুক্ত ভবন্ বা হনন = হওয়া । যাহারা উৎপত্তি প্রভৃতি ভাবযুক্ত, তাহারাও ভূত । ভূ ধাতু হইতে ভূত । এ অল্প বড় ভাববিকারযুক্ত যাহা কিছু সত্তা (entity), তাহা ভূত । গীতার সর্বত্র যে 'ভূত' শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই স্বাবরজ্জন্মান্বক সমুদায় সত্তা অর্থেই বৃত্তিতে হইবে । তাহারা সকলেই জীব, সকলেই প্রাণী । অতিক্ষুদ্র অণুটি পর্য্যন্ত এই 'ভূত' বা প্রাণী । গীতার কোথাও ক্ষিতি, অপ, ভেজঃ, বায়ু ও আকাশকে ভূত বলা হয় নাই । তাহাদিগকে 'অপর্য্য প্রকৃতিমাত্র বলা হইয়াছে, এবং তাহাদিগকে মহাভূতও বলা হইয়াছে (১৩।৫) ।* তাহারা গীতা অনুসারে 'ভূত' নহে । স্বাবর জন্ম সত্তা অর্থাৎ অচর বা চর যাহা কিছু শরীর (১৩।১৫), কেবল তাহাই ভূত ।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি সামান্য অণুটি পর্য্যন্ত ভূত, জীব বা প্রাণী হয়, তবে আমার এই যে শরীর, ইহার উপাদান কি ? আমি যদি একটি জন্ম বা 'চর'ভূত হই, তবে আমিই এই শরীরী ভূত, আমার মধ্যে বা আমার শরীরে আর দ্বিতীয় কোন ভূত থাকিতে পারে না । তাহাই

* আকাশাদি মহাভূত—ইহা বলিবার কারণ এই বোধ হয় যে, ইহারা এক অর্থে প্রাচীন বৈদিক দেবতা । আকাশ—দ্বাঃ (বা দ্বাঃ পিতা যাহা হইতে Jupiter এবং পৃথিবী, ইহারা সর্বভূতের পিতামাতা—দ্যাভা-পৃথিবী । বায়ু (বা ইন্দ্র ও মরুৎগণ) ও অগ্নি—ইহারা বেদের প্রধান দেবতা । বেদে অপ্ বা জলাধিপ বরুণও প্রধান দেবতা । গীতার একাদশ অধ্যায়ে ইহাদের উল্লেখ আছে । এই মহাভূতগণে অধিষ্ঠিত আত্মাই যে এই সকল দেবতা, তাহা যাস্ক বুঝাইয়াছেন । বেদান্ত অনুসারে আত্মা হইতেই এই আকাশাদির উৎপত্তি । (তৈত্তিরীয় ২।১।১) অতএব তাহারা গীতোক্ত এই ভূতের অন্তর্গত নহে । স্মার ও বৈশেষিক দর্শনের পাঁচ বা চারি ভূতবাদ এবং পরমাণুবাদ গীতার পৃষ্ঠিত হয় নাই । বেদান্তে যাহাদিগকে মহাভূত বলা হইয়াছে (ঐতরেয়, ৩।৩), তাহাই গীতোক্ত মহাভূত ।

যদি হয়, তবে আমার এই পাকভৌতিক স্থূল শরীরকে জড় বলিতে হয়, আমার আত্মার সংস্রোগে তাহা জীব বা প্রাণী হইয়াছে বলিতে হয় ! সুতরাং গীতা অনুসারে পূর্বে 'ভূত' শব্দকে যে অর্থ বুঝা গিয়াছে, আমাদের শব্দকে একরূপ ধারণা তাহার বাধক ।

যাহা হউক, আমরা গীতাতেই এ কথাই উক্তর পাই । গীতার আছে, যাহারা অসুরী-প্রকৃতিযুক্ত তপস্বী, তাহারা—

“কর্শমন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।” (গীতা ১৭।৬) ।

অতএব এতদনুসারে আমাদের প্রত্যেকের শরীরে ভূতগ্রাম অর্থাৎ বহুভূত বা বহুসত্তা মিলিত হইয়া বাস করে । * বহুভূত মিলিত হইয়া আমাদের শরীর হয়,—ইহার অর্থ এই যে, অতি ক্ষুদ্র ভূতসত্তা মিলিত হইয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত-জাতীয় জীব-শরীর সংগঠিত করে । এইরূপে ক্রমে উচ্চশ্রেণীর জীবের শরীর অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবাণু-সমষ্টি দ্বারা গঠিত । প্রত্যেক জাতীয় জীব-শরীর বিশেষ-জাতীয় ভূতগণ দ্বারা সংগঠিত । অতএব প্রত্যেক জাতীয় শরীরী জীবকে 'ভূত-বিশেষসমূহ' (১১।১৫) বলা যায় এবং এইরূপে সজাতীয় বা সেই জীবশরীর-বিশেষের অনুকূল বহুভূতবিশেষ মিলিত হইয়া শরীর বা ক্ষেত্র গঠিত হয় বলিয়া এই শরীরকে সজাত (১৩।৬) বলা হইয়াছে । আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, এই সকল ভূতগণ ও এই সকল সত্তা এক অর্থে জীব ; কেন না, প্রাণরূপ পরাপ্রকৃতি সকলের মধ্যেই অনুস্থিত । শ্রুতি অনুসারে প্রাণই এ সমুদায় । কিন্তু বিশেষভাবে ব্যবহারিক অর্থে জীবে ও ভূতে পার্থক্য আছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে (৬।৩।১) যে, ভূত সকলের বীজ তিন প্রকার ;—অণুজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ । জীবজ অর্থে জরাযুজ ।

* এই ভূতগ্রাম অর্থে স্থূল পঞ্চ মহাভূত নহে । তাহাদের কষণ, কোন জীবকর্ম দ্বারা সম্ভব নহে । আরও গীতার অন্তহানে (৮।১২ ; ১৩।৮ শ্লোকে) এই ভূতগ্রামের কথা উক্ত হইয়াছে । সেখানে ভূতগ্রাম অর্থে এই সত্তা সমূহ ।

অতএব যে সকল সূত জরায়ুজ, তাহাদিগকেই প্রথানতঃ জীব বলে।
এই জরায়ুজ জীব-শরীর, অল্প সত্তার শরীরের স্তার, এই ক্ষুদ্র সূত অর্থাৎ
অণু ও স্নেহজ সূতসমূহ দ্বারা গঠিত ।

এই তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত । আধুনিক বিজ্ঞানমতে প্রত্যেক
উদ্ভিদ ও জঙ্গম জীব-শরীর (organised body) বহু ক্ষুদ্র জীবাণু
(amoeba, protozoa প্রভৃতি নিম্নতম জীবাণু) দ্বারা সংগঠিত ।
প্রত্যেক শরীরটি যেন এক ক্ষুদ্র জগৎ । তাহাতে কত প্রকারের কত
কোটি এইরূপ জীবাণু বাস করে, তাহা কে বলিতে পারে ? এই জীবাণু
ব্যতীত কোন অড়-অণু যদি এই শরীরের উপাদানরূপে থাকে, তবে তাহাও
এক একটি স্বতন্ত্র সত্তা বা এক একটি ক্ষুদ্রতম জীবাণু মাত্র, ইহাও
আমরা এই গীতা হইতে জানিতে পারি । কেন না, অড়ও প্রাণ বা
জীবনবিশিষ্ট, তবে তাহাদের সে প্রাণের বা জীবনের ক্রিয়া অপেক্ষিত ।
যাহা হউক, এই শরীরের উপাদান যে জীবাণু বা অড়াণু, তাহাদেরও
শরীর একটি ক্ষুদ্র জগৎ বলিতে হইবে । কিন্তু সে ক্ষুদ্রত্বের সীমা আমরা
জ্ঞানে ধারণা করিতে পারি না । যিনি অণু হইতেও অণু, ক্রান্তিতে
তাঁহাকে ব্রহ্ম—মহৎ হইতেও মহৎ-ব্রহ্ম বলিয়াছেন ।

প্রত্যেক জীবশরীরে যে ক্ষুদ্র অণুগুলি উপাদান, তাহাদের প্রাণ বা
জীবনীশক্তির সমষ্টি হইতে সেই শরীরী জীবের প্রাণ বা জীবন. ইহাও
বলা যায় । * শরীরের প্রতি কেন্দ্রে (nerve centres. এ) এই জীবন-
ক্রিয়ার বিকাশ আমরা দেখিতে পাই । কোন প্রসিদ্ধ অঙ্গাণু পণ্ডিত

* কিন্তু তাহাকে অর্থাৎ শরীরস্থ জীবাণুর প্রাণশক্তি-সমষ্টি সে শরীরী জীবের প্রাণ
নহে । তাহার প্রাণশক্তি স্বতন্ত্র । তাহা এই সকল জীবাণুর প্রাণশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত
করিয়া আপনার বশীভূত করিয়া রাখে । যখন তাহা না পারে, তখন জীবাণুগুলি
পরস্পর বিঘ্নিত হইয়া যায়, শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন সেই জীবের প্রাণ সে শরীর
হইতে উৎস্রমণ করে, এবং সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীর সেই প্রাণের সঙ্গে গমন করে ।

(Hartmann) বলিয়াছেন যে, সেই সকল কেন্দ্রে (nerve এবং ganglion centre) বুদ্ধি ও জ্ঞান অপ্রকট (unconscious) ভাবে অর্ধাঙ্গিত। কোন উচ্চতর অপ্রকটিত এক অজ্ঞ জ্ঞান ও শক্তির প্রভাবে তাৎক্ষণিক নিমিত্ত হইয়া এই শরীরে কার্য করে। মধুমক্ষিকা যেমন পরস্পর পরানর্শনা করিয়াও, কোন অজ্ঞাত নিয়ন্ত্রার প্রেরণার নিমিত্ত হইয়া আশ্চর্য্য কৌশলযুক্ত মধুচক্র নির্মাণ করে, সেইরূপ আমাদের শরীরস্থ ভূতগ্রাম বা জীবানু সকল সম্মিলিত হইয়া কোন ভূমা সঙ্কলনী সর্বকারণ সর্বেশ্বরের নিয়ন্ত্রণে আমাদের প্রাণশক্তির বশীভূত হইয়া, আমাদের শরীরের গঠন, ধারণ ও রক্ষণ ব্যাপার সম্পাদন করে। এইরূপে ভূত-বিশেষসমূহ দ্বারা আমাদের যে শরীর গঠিত হয়—যে সংবাদ ~~হয়~~, তাহা আমাদের ক্ষেত্রের উপাদান। তাহাতে ক্ষেত্রজ পুরুষ অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া, সেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগে আমাদের বিশেষ মস্ত—মাহুসরূপে উদ্ভব হয়, এবং ক্ষেত্রজ আমার ক্ষেত্রে যে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয়, রাগ, হেষ্ প্রভৃতির বিকাশ করে, তদনুসারে আমাদের শরীরস্থ ভূতগ্রাম নিয়মিত হয়। আমাদের সহিত সংযুক্ত প্রকৃতিজ বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা তাহারা এইরূপে নিয়মিত হয়। আমরা হস্ত দ্বারা কোন বস্তু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, আমাদের মস্তিষ্ক হইতে প্রবাহিত জ্ঞান-নাড়ীর (sensory nerves) দ্বারা সেই ইচ্ছা হস্তে সংক্রমিত বা পরিচালিত হয় এবং কর্মশক্তি বাহিনী নাড়ী (motor nerves) দ্বারা প্রবর্তিত হইয়া হস্তের পেশী, শিরা প্রভৃতি সঙ্কোচ দ্বারা সেই গ্রহণ-কার্য সম্পন্ন করে। সেই সব জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তি প্রবাহক নাড়ী, শিরা, পেশী প্রভৃতি সকলই এই সমুদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব দ্বারা গঠিত। শরীররাজ্যে মস্তিষ্ক-গঠনকারী জীবানুগণই রাজমন্ত্রীর আয় রাজার আজ্ঞা প্রচার করে, অল্প জীবানুগণি সেই সকল নাড়ী, শিরা, পেশী প্রভৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া সেই আজ্ঞা বহন ও পাগন করে।

কিন্তু এই সকল জীবাণুগুলি অজ্ঞাতসারে ভূতের স্তায় এইরূপে আচ্ছাদিত হয় । তাহারা শরীরের মধ্যে বিশেষ স্থানে থাকিয়া নিজের বংশবৃদ্ধি করিতেছে, মরিয়া বাইতেছে, আবার তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে । সকলে নিজ নিজ কার্য করে, অথচ অলক্ষ্যে—অজ্ঞাতসারে এই সমষ্টি-শরীরের যিনি শরীরী তাঁহার কার্য সম্পাদন করে । অথচ তাহারা যে এই সমষ্টি-শরীরের কার্য করিতেছে, তাহা জানিতেও পারে না । আমাদের মানব-সমাজের যে নিয়ম, প্রত্যেক শরীর-রাজ্যেরও তদনুরূপ নিয়ম । মানব-সমাজ যেমন ভগবানের বিরূপ শরীরের অন্তর্গত, ও তাহার মধ্যে আমরা অবস্থিত থাকিয়া ও নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিয়া, অলক্ষ্যে সেই বিরূপ সমাজ-দেহের কার্য সম্পাদন করি, আমাদের শরীরমধ্যেও সেইরূপ এই জীবাণুগণ অবস্থিত থাকিয়া, সমষ্টিভাবে অজ্ঞাতে সম্মিলিত হইয়া সেই শরীরের কার্য সম্পাদন করে । * যখন তাহারা এই শরীরের কার্য আর সম্পাদন না করে বা করিতে পারে না, অথবা যখন তাহারা বিজাতীয় অণুগণের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন শরীর রুগ্ন হয়, এবং পরিণামে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয় । আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে শরীর তত্ত্ব এইরূপে বুঝিতে হয় । এইরূপে আমরা গীতোক্ত শরীরতত্ত্ব ভূতগ্রামের কথা বুঝিতে পারি, এবং গীতোক্ত এই সর্বভূততত্ত্ব ও স্বাবরজসমাখ্যক সমুদয় সত্তার তত্ত্ব বুঝিতে পারি, প্রত্যেক স্তাবর বা অস্তুম সত্তা যে এইরূপ ভূতগ্রাম, বা ভূতসজ্জ্ব দ্বারা সংঘাত বা শরীরযুক্ত, তাহাও ধারণা করিতে পারি, এই ভূতগণের সমষ্টিভাবে সংঘাত যে শরীর, সেই শরীরী জীবকেও ভূত বসিতে পারি এবং এইরূপ ভূতগণের সহিত সত্তার যে পার্থক্য, তাহা বুঝিতে পারি আর সে

* এই সমাজ-শরীরের তত্ত্ব, আমরা 'সমাজ ও তাহার আদর্শ' নামক পুণ্ড্র বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি ।

দর্শভূতবিশেষসজ্জ বা সত্তা সকল কিরূপে কেন্দ্র-কেন্দ্রজ-সংযোগ হইতে উদ্ভূত, ভ্রাহাও ধারণা করিতে পারি। * পূর্বে ২৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও ইহা বিবৃত হইয়াছে ।

ভূতগণের উৎপত্তি বিনাশ ।—গীতায় এ স্থলে ভূতগণকে বিনাশ-শীল বলা হইয়াছে ; সূত্রসং এই ভূতগণের উৎপত্তি-বিনাশতত্ত্ব আমাদের বুঝিতে হইবে। গীতা হইতেই আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই ভূতগণের যোনি বা উৎপত্তিহীন গীতায় পূর্বে (৭।৪-৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। ভূমি, অপ, অনল, বায়ু, আকাশ (এই পাঁচ মহাভূত) এবং মন, বুদ্ধ ও অঙ্কার (এই অস্থঃকরণ) এই আটটি অপরা প্রকৃতি। প্রকৃতি এই আটভাগে বিভক্ত। ইহাই লিঙ্গশরীর। অর্থাৎ এই অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে পরা প্রকৃতি, যাহা জীবতার অর্থাৎ ‘প্রাণ’ বা ‘জীবন,’—এই দুই প্রকৃতিই সমুদায় ভূতগণের যোনি বা উপাদান-কারণ। আর ভগবান্ তাহার নিমিত্ত-কারণ (গীতা, ৭।৬)। এই ভগবান্ ভূতগণের (৯।৫), ভূতম-স্থর (৯।১১), এবং ভূতগণের যোনি। যোনির অর্থ নিয়ন্তা (১৮।৬১)। যাহা হ'উক, উক্ত দুইরূপ প্রকৃতি এই সমস্ত ভূতগণের যেকোন উৎপত্তিকারণ, সেইরূপ যোনির অর্থ অর্থ দেহ (body, form) (গীতা ১৩।২১)

গীতায় অ'রও উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের যোনি—মহদ্ব্রহ্ম, তাহাতেই তিনি বাক্স প্রদান পূর্বক গর্ভ উৎপাদন করেন, তাহাতেই

† এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত দার্শনিক হেগেলের মত, খ্রীষ্টীয় হীরামাল হালবার মহাশয় তাঁহার ‘Hegelianism and Personality’ প্রবন্ধে যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল।

“The body of man is an organic unity. Ideally therefore it must be a system of cells, a self-differentiation of the Absolute, which is itself a system of differentiations..... This theory does not by any means destroy the unity of the human personality.” (p, 27)

সর্বভূতের সত্ত্ব বা উৎপত্তি হয় (১৩.৬) । অতএব যাহা এই পরা ও অপরা
 প্রকৃতি, তাহাই মহদ্ব্রহ্ম । মুণ্ডক উপনিষদে নিগূর্ণ ব্রহ্মকেই সর্বভূতের
 বলা হইয়াছে (১।১।৬) । অতএব প্রাণযুক্ত লিঙ্গই ভূতগণের উৎপা-
 কারণ, বা মূল-শরীর (nucleus) । কিন্তু ভগবান্ ইহাতে বীজ বলা-
 না করিলে, এই প্রাণবিশিষ্ট লিঙ্গ হইতে ভূতের উৎপত্তি হয় না ।
 বীজ কি, তাহা আমরা উক্ত ১৪।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিব ।
 সংক্ষেপে বলা বাইতে পারে যে, তাহাই ভগবানের ক্ষেত্রজ পুরুষরূপ
 প্রাণযুক্ত লিঙ্গ ক্ষেত্রের উপাদান মাত্র, তাহার সহিত এই ক্ষেত্রজ
 পুরুষের সংযোগ হইলে, তবে তাহা ভূঃ (বা being) রূপে উদ্ভূত হয় ।
 ক্রান্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্ম নানা ঘোনি কল্পনা
 করিয়া, নানরূপ দ্বারা তাহা বাক্ত করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট
 হইয়াছেন । এই অনুপ্রবেশই ভগবানের এষ্ট বীজনিষেক । তিনি জ্ঞানরূপে
 এই নানা ঘোনিতে অবস্থান করেন বলিয়া, তদনুসারে জীবের বিকাশ
 হয়, এবং জীব ভগবানের সেই জীবন-কল্পনার আদর্শ অভিমুখে অগ্রসর
 হইতে থাকে । সর্বত্র ব্রহ্মের পরাশক্তি বলক্রিয়া তাহার জ্ঞানক্রিয়া
 দ্বারা নিয়মিত হয় । শুধু ভগবানের জ্ঞানরূপ বীজদ্বারাই ভূতগণের
 উদ্ভব হয় না । এই যে বীজ, ইহা মায়ীশক্তি হেতু ভগবানের পরিচ্ছিন্ন-
 সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । প্রতি ক্ষেত্রে যিনি ক্ষেত্রজ পুরুষ, তিনি সেই
 সর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ পরম পুরুষেরই স্বরূপ । তবে তাহা মায়ী-পরিচ্ছিন্ন,
 এই মাত্র প্রভেদ । বীজের যেমন বিকাশ হইয়া বৃক্ষত্বে পরিণতি হয়,
 সেইরূপ এই প্রতিদেহস্থ ক্ষেত্রজ পুরুষও মায়ীযুক্ত হইলে সেই সচ্চিদানন্দ-
 যন পরমেশ্বর বা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হয় ।

যাহা হউক, এইরূপে এই ভূতগণের উৎপত্তি কখন হয়, তাহাও
 গীতার উক্ত হইয়াছে । প্রতি সৃষ্টির প্রারম্ভে ভূতগণের উৎপত্তি
 হয়, এবং প্রতি প্রলয়ে তাহারা বীজভাবে সূক্ষ্ম কারণরূপে অব্যক্ত

প্রকৃতিতে লীন থাকে । আবার যখন সৃষ্টি হয়, তখন তাহারা অব্যক্ত হইতে বাহ্যিক হয় ।’

“অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥

ভূতগ্রামঃ স এবানং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।

রাত্র্যাগমেঃ দশঃ পার্থ প্রভবন্ত্যহরাগমে ॥”

(গীতা, ৮।১৮।১৯)

গল্পত্ব আছে —

‘সর্বভূতানি কোন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ১”

প্রকৃতিং স্থানবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামনিমং কুৎসমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥”

(গীতা, ৯।৭।৮) ।

মানানের শাস্ত্র অনুসারে সৃষ্টি (creation) নাই । সৃষ্টি ও বিসর্জন (emanation) একই অর্থ । এই অর্গতে যত কিছু ভূতসদ্বা, তাহা সৃষ্টিতে পরমেশ্বর হইতে বিসৃষ্ট (Immanent) হয় । আর প্রলয়ে ঐই ভগবানের প্রকৃতি-শক্তিতেই লীন (absorption) হয় । এইরূপে পরা ও অপরা প্রকৃতিতে বা মহদ্বক্ষে পরমেশ্বর বীজ প্রদান করায় বা পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগে—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে যে সমুদয় ভূত-সত্তার উৎপত্তি হয়, তাহা সৃষ্টিতে অনাদি অথবা সৃষ্টিতে উৎপন্ন হইয়া প্রলয় পর্যান্ত সেই ভূতভাবে স্থিতি হয় । এই সৃষ্টির স্থিতি অবস্থার জীবগণের বার বার জন্ম হয় এবং বার বার নাশ হয়, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । জীবতাব গ্রহণ করিয়া পুরুষের নানাধোনি-ভ্রমণ হয় । জীবতাব গ্রহণ করাতেই পুরুষের সংঘাতরূপ সূক্ষ্মশরীর-গ্রহণ হয় এবং সে সূক্ষ্মশরীর প্রাগ করিতে হয় । কিন্তু তাহাতে যে ভূতগ্রামের সংঘাত হইতে সেই সূক্ষ্ম-

শরীর হয়, তাহার কোন :কৃতি-বৃদ্ধি হয় না । পুরুষের প্রাণশক্তির দ্বারা ভূতগ্রাম সংহত হইয়া শরীরের উপাদান হয়, সেই শক্তি উৎক্রমণ করিলে সে সংঘাত নষ্ট হওয়ার ভূতগ্রাম ভিন্ন ও বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় ।

এই শ্লোকে এই ভূতভাব যে বিনাশশীল বলা হইয়াছে, তাহা এইরূপে বুঝিতে হইবে । ভূতগ্রামের সংশ্লেষ দ্বারা যে 'সংঘাত' উৎপন্ন হয়, তাহার বিশ্লেষ হেতু ধ্বংস হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ভূতগণের বিনাশ হয় না, প্রত্যয়েই তাহাদের বিনাশ হয় ; তাহারা কারণে লীন হয়, আবার সৃষ্টিতে তাহাদের উদ্ভব হয় । কেবল যাহা ভূতসংঘাত, তাহাই সৃষ্টি অবস্থার উৎপত্তি ও বিনাশশীল ।

ভূতসর্গ ।—গীতা অনুসারে এই লোকে অর্থাৎ মনুষ্যালোকে ভূতসর্গ বিবিধ ;—এক দৈব ও আর এক আশুর । সমষ্টিভাবে ভূতসর্গকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং সেই ভূতসর্গমধ্যে মানবজাতির দৈব ও আশুরী প্রকৃতির কথা উক্ত হইয়াছে । (গীতা ১৩।৬-৭ দ্রষ্টব্য) । পুরাণে এই ভূতসর্গকে ব্রহ্মার সৃষ্ট দেবাসুর ঐভূতি ভাবে গৃহীত হইয়াছে । সাংখ্যদর্শনে এই ভূতসর্গকে চতুর্দশবিধ বলা হইয়াছে, যথা—

“অষ্টবিবল্লো দৈবৈশ্চৈর্যগ্ যোনয়শ্চ পঞ্চথা ভবতি ।

মানবশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ ॥” (কারিকঃ ৫৩)

অর্থাৎ অষ্টবিধ দেবযোনি, পঞ্চবিধ তির্গ্যগ্ যোনি ও একবিধ মনুষ্য-যোনি—সংক্ষেপে ইহাই ভূতসর্গ । এই স্থলে ভূত অর্থে জীবযোনি । ব্রহ্মা সৃষ্টির আরম্ভে যে বিভিন্ন-জাতীয় জীবযোনি কল্পনা করিয়া সৃষ্টি করেন, তাহারই কথা উক্ত হইয়াছে । গীতার যে সর্গভূতের কথা উক্ত হইয়াছে,—এই ভূতসর্গ তাহা হইতে কতকটা ভিন্ন । এই ভূতসর্গ বিভিন্ন ভূতযোনি মাত্র । অর্থাৎ ভূতগণের সংহত হইয়া উদ্ভবের বা নানি শরীর-সৃষ্টির কারণ । অতএব ব্রহ্ম এইরূপ বিভিন্ন-জাতীয় জীবকে নাম-রূপ (form) দ্বারা কল্পনা (idea) করিলে, প্রকৃতি হইতে তাহাদের বিস্ফ-

সেই উৎপন্ন হয় এবং এই লিঙ্গশরীরকে কেন্দ্র করিয়া, ভূতগণ সংহত হইয়া এই সকল বিভিন্নশ্রেণীর জীবদেহকে সেই (form) রূপ অনুসারে সৃষ্টি করে। এইরূপে ভূতগণের সংঘাতে যে যে ভিন্ন প্রকার যোনির (দেহের) সৃষ্টি হয়, তাহাই এই ভূতসর্গ; ইহারা এক ভূতযোনি। এই ব্যাপারের সহিত সাংখ্যদর্শনে ও গীতার যে ভূতসর্গ উক্ত হইয়াছে, তাহার বিরোধ নাই।

সমুং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাগ্নানাত্মানং ততো যা ত পরাং গতিম্ ॥ ২৮

সর্বত্র সমান আর সমভাবে স্থিত

ঈশ্বরে যে হেরে, আত্মা দ্বারা আত্মাকে সে

হিংসা নাহি করে,—তাহে পায় পরা গতি ॥ ২৮

২৮। সর্বত্র...ঈশ্বরে যে হেরে—পূর্বশ্লোকে ষে রূপে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে সেই পরমেশ্বরকে সর্বভূতে একভাবে অবস্থিত, স্তত্রাং সর্বত্র একই বলিয়া যে দর্শন করে (শঙ্কর)। সর্বত্র অর্থাৎ দেবাদি শরীরে, তাহার আধার ও নিয়ন্ত্ররূপে অবস্থিত ঈশ্বরকে অর্থাৎ আত্মাকে দেবাদি বিষম আকার হইতে বিযুক্ত ও জ্ঞান দ্বারা একাকার-ভাবে 'সম' যে দর্শন করে (রামানুজ)। সর্বত্র অর্থাৎ ভূতমাত্রে সমান অপ্রচ্যুতস্বরূপে অবস্থিত অক্ষর পরমাত্মাকে যে দর্শন করে (শ্রীমদী)। জন্মাদি বিনা অন্ত ভাববিকার যে নাশ, সেই ভাববিকারশূন্য হইয়া সম্যক-রূপে অবস্থিত অবিনাশী আত্মাকে দর্শন করিয়া, অবগু আনিই সেই, ইহা শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা যে সাক্ষাৎ করে (মধু)। সর্বত্র ভূতমধ্যে 'সম' অর্থাৎ সম্যক অপ্রচ্যুতস্বরূপ গুণ দ্বারা অবস্থিত ঈশ্বরকে যে দর্শন করে

(বলদেব) । সৰ্বত্র অর্থাৎ এই প্রপঞ্চের পদার্থমাত্রে সম্যক্ প্রাপ্তে স্থিত, অর্থাৎ তথাভূত লীনার্থ অবস্থিঃ সৰ্বসামর্থ্যযুক্ত, ঈশ্বরকে সমভাবে যে দর্শন করে, (বলভ) ।

উক্তরূপ সমদর্শনের ফল এ স্থলে উক্ত হইয়াছে । সৰ্বত্র দেবাদি-দেহে সমভাবে অবস্থিত, দেবাদি বিভিন্ন আকার বিবৃক্ত সমভাবে হিঃ দেহ উক্তিরাতির স্বামী ঈশ্বরকে যে দর্শন করে (কেশব) ।

[এই শ্লোকে সম্যক্দর্শনের ফলকীৰ্ত্তন দ্বারা স্তুতি করা হইয়াছে । (শঙ্কর, মধু) । উক্তরূপে ভূতগণ হইতে পৃথগ্ভাবে ঈশ্বরদর্শনের মহিমা এ স্থলে বর্ণিত হইয়াছে (বলদেব) ।]

আত্মদ্বারা আত্মাকে সে হিংসা নাহিংস করে,—সে আপনাকে আপনি হিংসা করে না, এবং আত্মহিংসা করে নাই বলিয়া সে পরমগতি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়া থাকে (শঙ্কর) । সে আত্মদ্বারা অর্থাৎ মনের দ্বারা স্বীয় আত্মাকে হিংসা করে না অর্থাৎ রক্ষা করে এবং সংসার হইতে মোচন করে । তাহা হইতে সে স্রাত্বস্বরূপে সৰ্বত্র সমানাকারে আত্মদর্শনফলে পরা গতি লাভ করে,—যাহা পরম গন্তব্য, সেই যথাবস্থিত আত্মাকে প্রাপ্ত হয় । আর যে দেবাদি আকারযুক্ত বিষমভাবে হিতরূপে আত্মাকে দর্শন করে, সে আত্মাকে হিংসা করে, অর্থাৎ ভবজলধিমধ্যে প্রক্ষেপ করে (রামানুজ) । সে স্বীয় আত্মদ্বারা আত্মাকে হিংসা করে না, অবিদ্যা দ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে তিরস্কার পূর্বক বিনাশ করে না । তাহাতে সে পরা গতি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । আর যে এইরূপ দর্শন করিতে না পারে, সে দেহাত্মদর্শী, দেহের সহিত আত্মাকে হিংসা বা অধঃপাতিত করে (স্বামী) । সে স্বলীলাস্বরূপে আত্মস্বরূপ অবিকৃত আত্মাকে নিশ্চয় পূর্বক হিংসা করে না অর্থাৎ অশ্রুতা প্রাপ্ত হয় না, যথার্থরূপে জানিয়া প্রপন্ন হয় । তাহা হইতে উৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠাখ্যাতি প্রাপ্ত হয় । শাস্ত্রে আছে,—

‘যোহনাথা সন্মাত্মানমনাথা প্রতিপত্ততে ।

সিং ভেন্ ন কৃতং পাপং চৌবেগাহ্মাপহাশিণা ॥” (বল্লভ) ।

সেই আত্মদর্শী, আত্মাধারা আত্মাকে হিংসা করে না। যাহারা অজ্ঞ, অজ্ঞান, অবিদ্যা দ্বারা যে পরমার্থ বস্তু এক অকর্তা অভোক্তা পরমানন্দরূপ আত্মা ‘সর্বদাস্তুতে অস্তি ভাতি’ হইলেও তাহাকে নাস্তি ‘ন ভাতি’ এই প্রতীতি হেতু আত্মাকে স্বয়ং তিরস্কার পূর্বক ‘নাই’ এইরূপ যে জ্ঞান করে, তাহারই আত্মার হিংসা বা হনন করে। আর অজ্ঞ ব্যক্তির সেই প্রকারে বিদ্যা (বৈদিককর্মকাণ্ড বিদ্যা) দ্বারা ও আত্মরূপে পরিগৃহীত দেহেন্দ্রিয়দংঘাতকে, কর্মবশে আত্মরূপে গ্রহণ করে। এইরূপে অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয় দ্বারাই আত্মহনন হয়। অনাত্মাতে আত্মাভিমানই আত্মহনন। যে আত্মজ্ঞ, যে অনাত্মবস্তুতে আত্মাভিমানশূন্য, যে শুদ্ধ আত্মরূপ দর্শন করে—সে আত্মরূপ লাভ করে, তাহা হইতে অর্থাৎ আত্মহননভাবে অবিদ্যা ও ভৎকার্যানিবৃত্তি হেতু পরাগতি বা মুক্তি লাভ করে। সে প্রকৃতি বিকার অবিবেক হেতু বিষয়রস-গ্রহণে আসক্ত হন্যারা নিজেই আত্মাকে হিংসা করে না অর্থাৎ অধঃপাতন করায় না। যে বিষয়বিলাসী প্রকৃতির বিকার হইতে ত্রিন্ন আত্মার বিবেক ধ্যাতি হইতে উৎকৃষ্ট গতিলাভ করে (বলদেব)।

এই সম্বন্ধে স্বামী ও মনু যে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাগ এই :—

“অশূর্যা নাম তে লোকা অক্লেন ভমসাবৃত্তা ।

ভাংস্তে প্রেতাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥”

(ঈশ উপঃ ৩) ।

এই শ্লোকের শাকর ভাষ্য অনুসারে যাহারা অবিদ্যা বশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে, তাহার আত্মঘাতী। আত্মা স্বপ্রকাশরূপে বিদ্যমান থাকিলেও যাহারা অবিদ্যাবশতঃ আত্মার অঙ্গর অমর প্রভৃতি ভাব অনুভব করিতে পারে না, . . তাহাদের নিকট সর্বদা আত্মা তিরোহিত বা

অবিজ্ঞাত থাকে, অর্থাৎ নিহতের মত অপ্রকাশিত থাকে । এ জনা আত্মজ্ঞানহীন লোককে আত্মঘাতী বলা যায় । তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে আগমন করে । গীতার পূর্বে (৬।৩০ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে যে,—

“যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বত্র ময়ি পশুতি ।

তস্মাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশুতি ॥”

অর্থাৎ যে সর্বত্র সমবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শন করে, সে আত্মাকে বা ঈশ্বরকে হিংসা করে না—নষ্ট করে না । এই হিংসা বা নাশ অর্থে সাধারণতঃ আমরা বাহা বুঝি, তাহা নহে । সে অর্থে আত্মা হত্যা করেন না, হত হন না (২।১৯) । এ স্থলে এই হিংসা বা নাশ অর্থে ‘আত্মা বা ঈশ্বরকে না দেখিয়া, বা জানিয়া আত্মদ্রোহী হওয়া ; এই শ্লোকের ব্যাখ্যাশ্রী শঙ্করাচার্য্য এইরূপে আত্মাকে হিংসা বা হনন করার অর্থ বুঝাইয়াছেন । তাহা এ স্থলে উক্ত হইল । “এক্ষণে একরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, কোন প্রাণীই ত আপনার আত্মাকে নিজে হিংসা করিতে পারে না । তবে কেন এ স্থলে অপ্রাপ্তপ্রাপ্তির প্রতিষেধ করা হইয়াছে ? কেহ যখন কোনরূপে আত্মার হিংসা করিতে পারে না, (গীতা ২।১৯ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য), তখন আত্মাহিংসা সর্বরূপে অপ্রাপ্ত ; তবে তাহার প্রতিষেধ কিরূপে সম্ভব ? কিন্তু একরূপ শঙ্কা নিরর্থক । বাহারা অজ্ঞ, তাহাদের নিকট আত্মার স্বরূপ সর্বদা আবৃত । তাহারা দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুকে আত্মা বলিয়া অঙ্গীকার করে এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চয় পূর্বক আত্মভাবে কল্লিত দেহাদিকে একবার স্বীকার করে, আবার ত্যাগ করে, আবার গ্রহণ করে, ত্যাগ করে । এই ভাবে আত্মাকে বার বার হনন করে । এইরূপে বাহারা অজ্ঞানী, তাহারা আত্মহা—আত্মঘাতী । বাহা বাস্তবিক পরমার্থতঃ আত্মা, তাহা অজ্ঞানের আবরণে যেন হত বলিয়া প্রতীত হয় । আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও অজ্ঞানহেতু তাহার বিদ্যমানতার কার্য্য-বিধর সম্বন্ধনাদি মধ্য মধ্য বিলুপ্ত হয় ; এজন্য লোকে অবিনাশী আত্মাকে

হত বলিয়া বোধ করে । অতএব সকল অস্ত্রব্যক্তির আত্মঘাতী । কিন্তু যিনি আত্মতত্ত্ব, তিনি উক্ত কোনরূপেই আত্মাকে হনন করেন না । সুতরাং আত্মদর্শনের ফল যে পরম গতি, তিনি তাহা লাভ করেন ।”

শঙ্কর প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপে আত্মাধারা আত্মহিংসা কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়াছেন । কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও সুসঙ্গত অর্থ হইতে পারে । ভগবান্ সর্বভূতের আত্মা । তিনি বলিয়াছেন, “অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতশয়স্থিতঃ” (১০।২০) ; অতএব যিনি জ্ঞানী আত্মদর্শী সর্বভূতমধ্যে সর্বত্র এই আত্মাকে দর্শন করেন, যে জ্ঞানীব্যক্তি সর্বভূতে বা সর্বজীবে সমভাবে অথবা এক অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের গায় স্থিত আত্মাকে দর্শন করেন, যিনি আত্মাতে সমুদায় দর্শন করেন, তিনি সর্বত্র সর্বভূতে সর্বজীবে সর্বাত্মভূতাত্মা সর্বাশ্রয়ামী ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তিনি কোন ভূতকে বা জীবকে হিংসা করিয়া তদ্বারা সেই সর্বভূতে স্থিত এক অবিভক্ত আত্মাকে হিংসা করিতে পারেন না । অহিংসাই তাঁহার পরম ধর্ম হইয়া, তাঁহার সার্বভৌম মহাব্রত হইয়া, তিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটটির মধ্যেও সমভাবে ভগবান্কে অবস্থিত দেখেন, তাঁহার নিজেরই স্বরূপ যে আত্মা, তাহাই তাঁহাতে অবস্থিত দেখেন । তাঁহার এইরূপ দর্শন-সিদ্ধি হইয়া, তিনি সামান্য কীটটি পর্য্যন্ত কোন জীবকেই হিংসা করিতে পারেন না । তিনি স্বয়ং আত্মস্বরূপ হইয়া নিজ আত্মা দ্বারা সর্বভূতস্থ আত্মাকে হিংসা করিতে পারেন না । তিনি সকলকেই এই এক আত্মস্বরূপ জ্ঞানিয়া কাহারও প্রতি ক্রোধ, ঘেঁষ, হিংসা কিছুই করিতে পারেন না । তিনি সর্বত্র সমদর্শী হইলে আত্ম দ্বারা কোন প্রকারে আপনাতে ও অন্তর্ভূতে স্থিত আত্মাকে আর হিংসা করিতে পারেন না । ইহাই পরমতত্ত্ব ।*

* জার্মান দার্শনিক পণ্ডিত পাল ড়সেন (Paul Deussen) তাঁহার “Philosophy of the Vedanta” গ্রন্থে বলিয়াছেন,—“The Gospels fix quite correctly as the highest law of morality “love your neighbour as

গীতার এই অধ্যায়ের এই ২৭,২৮ দুই শ্লোক, দর্শন-শাস্ত্রের সার। “তো পশ্যতি স পশ্যতি” এই বাক্য দ্বারা তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইগাই সার তত্ত্ব। এই দর্শনসিদ্ধি হইলেই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনসিদ্ধি হয়। এই দুই শ্লোক যে তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা যেমন দর্শনশাস্ত্রের সার, তাহার মূলমন্ত্র সেইরূপ ; তাহা সমগ্র নীতিশাস্ত্রের বা ধর্মশাস্ত্রের মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্র জানিলে সর্বজীবের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহা জানা যায়, এবং সর্বজীবের সহিত যে রূপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহা সহজে স্থির করা যায়। ইহা দ্বারা আমার নিজের সম্বন্ধে যে রূপ ব্যবহার কর্তব্য এবং আমার সহিত সংসৃষ্ট অপর যে কোন ব্যক্তির বা জীবের সহিত আমার যে রূপ ব্যবহার কর্তব্য, সে সমুদায় সহজে স্থির করা যায়। তাহার জন্য আর বিশেষভাবে কোন উপদেশের আবশ্যক হয় না।

yourself.” But why should I do so ?.....The answer is not in the Bible, but it is in the Veda, is in the great formula “*at twam asi*” which gives in three words metaphysics and morals together. You shall love your neighbour, as yourselves,—because you are your neighbour, and mere illusion makes you believe that your neighbour is something different from yourselves, or in the words of the Bhagbad Gita he who knows himself in everything and everything in himself, will not injure himself by himself—*na hinasti atmana atmanam*. This is the due and tenor of all morality and this is the stand point of a man knowing himself as Brahman. He feels himself as every thing—so he will not desire every thing, for he has whatever can be had ;—he feels himself as every thing,—so he will not injure anything for no body injures himself. He lives in the world surrounded by illusion, but not deceived by them....The *jivan mukta* sees the manifold world, and can not get rid of seeing it, but he knows that there is only one being Brahman the atman, his own Self, and he verifies it by his deeds of pure disinterested morality.”

গীতার এজন্য নীতিবিজ্ঞানের (moral philosophy) কোন উপদেশ
বিশেষভাবে পদতু হইয়া নাই ।*

* এই দুই শ্লোক সম্বন্ধে জগদানন্দশঙ্কর পণ্ডিতের "The Vedānta Sūtras" গ্রন্থে
একটি প্রস্তাব উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহা তাহার "Element of Metaphysics"
গ্রন্থে (pp 133-34) বর্ণিত—

"We know that these forces (appearing in the manifestation
of nature) from the lowest to the highest are only the original
forms in which the will to live variously appears. This truth
came to light in the conception that there is but one being, the
(impersonal) Brahman, and that all Gods, men, animals, plants
and inanimate beings are the diverse manifestations of it. The
relation between the phenomena and the thing-in-itself is conceived
figuratively as an emanation of the world from Brahman, compar-
ed to the coming forth of the web from the spider, the plants from
the earth, the hair from the body. But at the same time the
eternity of the souls for ever circulating in the *sansar* (i. e. the
phenomenal world) is maintained : from which follows clearly
that their relation to Brahman is to be conceived not as temporal
relation of the effect to its cause, but as the relation of the time-
conditioned to the timeless, that is of phenomena to the thing-
in-itself with this metaphysical antithesis between the undivided
Brahman, and the manifold world as which it appears, is im-
mediately connected the ethical between denial and affirmation
in the sense of the celebrated 'তত্ত্বমসি' a sentence which expresses
in three words at once the deepest mystery of metaphysics and
the highest aim of morality. *As an interpretation of this great
truth ; we may consider as in a wider sense our whole work so
already the motto prefixed to it which we here translate :*

The Lord of all things dwells in every living being. Not
dying when it dies.—He who sees him is seeing. Such will not,
when in all this highest Lord he knows wrong through himself
himself, and to perfection goes

Sri Bhagabad Gita Ch. xiii. 27. 28.

প্রকৃত্যেব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশ্যতি তথা ত্বানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯

সৰ্ব্বরূপে সৰ্ব্বকৰ্ম্ম প্রকৃতির দ্বারা
কৃত হয়, আত্মা কিন্তু নহে কৰ্ত্তা কভু,
এরূপে যে হেরে, সেই করে দরশন ॥২৯

২৯ । সৰ্ব্বরূপে সৰ্ব্বকৰ্ম্ম প্রকৃতির দ্বারা কৃত—পূৰ্বে শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সৰ্ব্বভূতে স্থিত পরমেশ্বরকে যিনি সৰ্ব্বত্র সমভাবে দর্শন করেন, তিনি আত্মাকে আত্মা দ্বারা হিংসা করিতে পারেন না । ইহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে, এই কথা বিকল্প । জীবের গুণ ও কৰ্ম্মের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া ইহাই প্রমাণিত হয় যে, দেহভেদে আত্মাও ভিন্ন, সকলভূতে এক আত্মা সমভাবে থাকিতে পারেন না ; সমভাবে থাকিলে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ জ্ঞানী, কেহ বা অজ্ঞানী হইত না । এই শঙ্কার (ও এই সাংখ্যদর্শনোক্ত বহুপুরুষবাদের) নিরাকরণ জন্য এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে । (শঙ্কর) । পূৰ্বে “কার্যাকারণ-কর্তৃত্ব হেতুঃ প্রকৃতি কৃত্যতে” (১৩.২০) ইহা উক্ত হইয়াছে । তদনুসারে এই শ্লোক উক্ত হইল (রামানুজ) । শুভাশুভ কৰ্ম্ম কর্ত্ত্ব দ্বারা আত্মার বৈষম্য দৃশ্যমান । সে আত্মার সমস্ত কিরূপে সম্ভব, এই আশঙ্কা-নিবারণার্থ এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু) । প্রকৃতি হইতে আত্মার বিবেক বা পার্থক্য কিরূপে জানা যাহবে, তাহারই প্রকার এই দুই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (বলদেব) ।

প্রকৃতি শব্দের অর্থ ভগবানে মায়া, তাহা ত্রিগুণাত্মিকা ।

“মায়াঃ তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ” (শ্বেতাশ্বতর উপ, ৪।১০)

এই শ্রুতিমন্ত্র দ্বারা ইহা জানা যায় । সেই প্রকৃতিই মহত্বাবি

কার্য ও কারণরূপে কৰ্ম করিয়া থাকে, প্রকৃতি বাতীত অন্য কেহ কৰ্তা নাই। এই সকল কৰ্ম তিন প্রকার ;—কারিক, বাচিক ও মানসিক (গীতা ৫।১১ দ্রষ্টব্য)। সৰ্ব্বপ্রকারে প্রকৃতিই সকল কার্য করিয়া থাকে (শঙ্কর)। দেহেন্দ্রিয়-আকারে পরিণত প্রকৃতি দ্বারা সৰ্ব্বপ্রকারে কৰ্ম সকল ক্রিয়মান হয় (স্বামী)। দেহেন্দ্রিয়সংঘাতাকারের কারণভূত ভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা মায়া কড়ুকই কামমনোবাকোর দ্বারা আরম্ভ কৰ্ম সৰ্ব্বপ্রকারে ক্রিয়মান হয় (মধু)। প্রকৃতি সৰ্ব্বকৰ্ম আমার অধিষ্ঠাত্বে, ও ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে বা প্রেরণায় সম্পাদন করে (বলদেব)। যদি পরমাত্মা ভগবানুই সৰ্ব্বরূপে সৰ্ব্বত্র আছেন, তবে সকলে তাঁহাকে একরূপে দেখিতে পারে না কেন? ইহার উত্তরে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতি ভগবানের লালী-উপযোগী সমুদয় কৰ্মই সম্পাদন করে, ইহা যে মর্শন করে (বলভ)।

আত্মা কিন্তু নহে কৰ্তা কভু—আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ কৰ্তা নহে ; কারণ, আত্মা সৰ্বপ্রকার উপাধি-বর্জিত (শঙ্কর)। আত্মা অকৰ্তা জ্ঞানাকার, প্রকৃতি-সংযোগ হেতু প্রকৃতিতে আত্মার অধিষ্ঠান হয়, তজ্জন্ত সুখ-দুঃখ অনুভব ও কৰ্তৃত্বাবে অজ্ঞানকৃত (রামানুজ)। দেহাভিমান হেতুই আত্মার কৰ্তৃত্ব, নতুবা আত্মা স্বতঃ কৰ্তা নহে (স্বামী)। পুরুষ সৰ্ব-বিকারশূণ্য, ক্ষেত্রে যে কৰ্ম কৃত হয়, সর্বোপাধিবর্জিত অসঙ্গ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা তাহার কৰ্তা নহে, আত্মা সৰ্বত্র সমান (মধু)। সকল কৰ্ম সম্বন্ধে আত্মা অকৰ্তা (বলদেব)।

এরূপে যে হেরে, সেই করে দরশন—এই প্রকারে প্রকৃতি ও আত্মার স্বরূপ যিনি দেখিয়া থাকেন, তিনিই পরমার্থদর্শী ; যাহা নিগূণ, সূত্রাং অকৰ্তা, তাহা আকাশের ত্রায় নির্কলেশ ও নিক্রপাধিক। আত্মা প্রতিদেছে ভিন্ন, সে বিষয়ে কোন প্রকার সমান নাই (শঙ্কর)। তিনি আত্মাকে যথাবৎ অবস্থিত দেখেন (রামানুজ)। তিনিই সম্যগ্‌দর্শী,

অগ্রে নহে (স্বামী) । তিনিই যথার্থদর্শী । সবিকার ক্ষেত্রে প্রাণি-
 দেহভেদে বৈষম্য হেতু সেই সেই দেহে বিচিত্রকর্তৃত্ব, নিষ্কর্তৃত্ব,
 আকাশরূপ আত্মার একরূপ ভেদের কোন প্রশ্ন নাই । ইহাই এই
 প্রতিপাদিত হইয়াছে (মধু) । এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, বিজ্ঞান-
 নন্দস্বভাব আমি (অহং) যজ্ঞযুদ্ধাদি দুঃখময় কर्म কার না ; কিন্তু
 অন্যাদি ভোগবাসনারূপ অবিবেক হেতু, আমারই নে ভোগসিদ্ধি জন্ত
 আমা দ্বারা অধিষ্ঠিত সুখদুঃখ-মোহান্বিত প্রকৃতি মম বাসনা-সমুৎপ-
 বা বাসনা অনুসারে পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, আমার দেহাদিদ্বারা
 কর্ম করে ; সেই হেতু সেই প্রকৃতিই কর্মকর্ত্রী । সেই কর্মকারিণী
 প্রকৃতি হইতে সেই কর্ম সম্বন্ধে অকর্ত্রী শুদ্ধ জীব ভিন্ন । অবিবেক হেতু
 সেই শুদ্ধ জীবের কর্তৃত্ব লোকে দেখিয়া থাকে (বলদেব) ।

আমরা পূর্বে ২০শ ও ২১শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রকৃতির কর্তৃত্ব এবং
 পুরুষের অকর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে তাহার
 পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন । এইমাত্র এস্থলে বলা উচিত যে, বলদেব
 আত্মা-জীব বঞ্জিলেও তিনি পরমেশ্বরের নিয়ন্ত্রণে ক্ষেত্রজ জীবের
 বাসনা অনুসারে তাহার স্বক্ষেত্র প্রকৃতি যে কর্ম করে, এইরূপ অর্ধ
 করিয়াছেন, ইহাই সঙ্গত । ইহা আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি ।

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকম্হম্নুপশ্যতি ।

ততএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩০

সর্বভূতদের এই যে পৃথক্ ভাব

যবে একে স্থিত হেরে, তা হতে বিস্তার

হেরে আর, তখন সে লভে ব্রহ্মভাব ॥ ৩০

৩০ । সৰ্বভূতদের এই যে পৃথগ্ভাব যবে একে স্থিত
হেরে—পুনর্বার এই সম্মাগ্‌দর্শন শব্দ শব্দের দ্বারা এ স্থলে প্রপঞ্চিত করা
হইতেছে । যে সমগ্র ভূতপৃথগ্‌ভাব অর্থাৎ ভূতগণের পৃথক্‌তাকে “একত্ব”
অর্থাৎ এক আত্মাতে (ব্রহ্মে) অবস্থিত দেখিতে পারা (অহু গুণিত),
অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে মনন করিয়া আত্মগতাক্ষের
বিষয় করিয়া থাকে অর্থাৎ আত্মাই এই বিশ্ব, এই ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া
থাকে, (শঙ্কর) । একত্ব অর্থাৎ এক আত্মাতে গুণিত (হু) ।

প্রকৃতি পুরুষ-তত্ত্বাত্মক দেবাদি সৰ্বভূতে তাহাদের মধ্যে দেবত্ব,
মনুষ্যত্ব, হৃষ্যত্ব-দীর্ঘত্বাদি যে পৃথগ্‌ভাব, তাহাকে একত্ব অর্থাৎ প্রকৃতিত্ব,
তাহা আত্মত্ব নহে—এইরূপ যখন দর্শন হয় (রামানুজ) । এই পৃথগ্‌ভাব-
যুক্ত ভূতগণ প্রলয়ে এক প্রকৃতিত্ব, ইহা যখন দর্শন হয়, (বলদেব) ।
স্বাবর জন্ম ভূতগণের যে পৃথগ্‌ভাব বা ভেদ, তাহা ঈশ্বরশক্তি-রূপ এক
প্রকৃতিতে প্রলয়ে স্থিত, ইহা অনুদর্শন বা আলোচনা করেন । ভূতগণ
প্রকৃতি-তাবন্মাত্র-স্বরূপে অর্থাৎ প্রকৃতিই তাহাদের স্বরূপ বলিয়া অভেদ,
আত্মাই ভূতভেদকারী, অথচ আত্মার ভেদ নাই, যিনি ইহা দর্শন করেন,
তিনি ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হন, ইহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (স্বামী) ।

পূর্বে ক্ষেত্রের যে আপাতভেদ দর্শন হয়, সেই ভেদ অস্বীকারপূর্বক
কেবল ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদদর্শন নিরাকৃত হইয়াছে । ইদানীং ক্ষেত্রভেদ
দর্শনও মারিক বলিয়া তাহা নিরাস করা হইতেছে । এ স্থলে অর্থ এই,—
যে কালে স্বাবরজন্মাত্মক সৰ্বভূতগণের বা জড়বর্গের পৃথগ্‌ভাব বা
পরস্পর ভিন্নতাব একই সং-রূপ আত্মাতে স্থিত বা কল্পিত দর্শন করেন ।
যাহা কল্পিত, তাহা তাহার আদিষ্ঠান হইতে অনাত্মেরক বা পৃথক্‌ নহে ।
সুতরাং আত্মাতে কল্পিত এই পৃথগ্‌ভাবযুক্ত ভূতগণও যে সংস্বরূপ
আত্মা হইতে ভিন্ন নহে । এই তত্ত্ব যিনি শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ
করিয়া মনন বা আলোচনা করেন । (যধু) ।

ভূতগণের পৃথগ্ভাব ব্রহ্মেরই ভেদ,—এই বিচিত্র অনেকরূপাত্মক ভাবকে একস্থ—অর্থাৎ প্রলয়ে সংহারেচ্ছাত্মক ব্রহ্মণাত্মক ব্রহ্মস্বরূপস্থ এইরূপ অনুদর্শন করেন (বল্লভ) । এক অর্থাৎ বিষ্ণু, সর্বভূতভাব সেই এক বিষ্ণুতেই অবস্থিত, ক্রমেই এক বিষ্ণু হইতেই বিস্তার হয় (শ্রীমন্মাদ্ধ) ।

প্রকৃতির বিকার সমুদায়, পুরুষ হইতে ভিন্ন, সাংখ্যাদের এই যে অভিমত, ইহা নিরাকৃত হইয়াছে । যিনি ভূতগণের অর্থাৎ বিকার-সমূহের নানাধ প্রকৃতির সহিত আত্মাতেই প্রলীন দেখেন, অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্মা হইতেই প্রকৃতি আদি বিশেষ পর্য্যন্ত বিবর্তিত, একত্র তাঁহার আত্মারই স্বরূপ, সেই আত্মামাত্রেরই এইরূপ যিনি দর্শন করেন (গিরি) ।

পূর্বে এইরূপে আত্মার সর্বত্র সমস্ত প্রতিপাদন পূর্বক আত্মার ক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্ত প্রকৃতি নিমিত্ত বিভিন্ন শরীররূপ বৈবন্ধ্য পরিহার করা হইয়াছে । এক্ষণে দেহভেদ ও তাহার কারণের একত্র দেখাইয়া, নিরাকরণ পূর্বক দ্রষ্টার ব্রহ্ম-সাদৃশ্যরূপ আত্মপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে । (কেশব) ।

তা হ'তে বিস্তার হেরে আর—আত্মা হইতেই এ জগতের বিস্তার অর্থাৎ উৎপত্তি বা বিকাশ দেখিয়া থাকে । আত্মতঃ প্রাণঃ, আত্মতঃ আশা, আত্মতঃ স্বরঃ, আত্মত আকাশঃ, আত্মতঃ তেজঃ, আত্মত আপঃ, আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবৌ, আত্মত অন্নম্ ইত্যাদি প্রকারে আত্মা হইতে এ সকলের বিস্তার যখন দেখিতে পান (শঙ্কর) । সেই প্রকৃতি হইতে উত্তরোত্তর পুত্রপৌত্রাদিভেদ-বিস্তার তিনি দেখেন (রামানুজ) । সৃষ্টি-সময়ে সেই প্রকৃতি হইতেই ভূতগণের বিস্তার, এইরূপ দর্শন করেন (যামী) । সৃষ্টিকালে প্রকৃতি হইতেই দেবাদি ভূতগণের পৃথগ্ভাবে বিস্তার হইয়াছে, সেই পৃথগ্ভাব আত্মস্থ নহে, এবং আত্মা হইতেও তাহার বিস্তার হয় নাই, ইহা যিনি দর্শন করেন (বল্লভ) । মাধারশে এক আত্মা হইতেই

স্বপ্ন-মায়াবৎ-ভূতগণের পৃথগ্ভাবে বিস্তার যিনি অনুদর্শন করেন (মধু) ।
প্রপঞ্চরমণেচ্ছুক ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিসময়ে সর্বস্বাবরজদমায়ক ভূতের বিকাশ
হয়, ইহা যিনি অনুদর্শন করেন (বল্লভ) । বিস্তার—বিকাশ (হমু) ।

সে লভে ব্রহ্মভাব--(ব্রহ্ম সম্পদ্যতে) তিনি ব্রহ্মই (ব্রহ্ম এব)
হন (শঙ্কর) । তিনি ব্রহ্ম-সম্পত্তি প্রাপ্ত হন । অপূর্ণত্ব হেতু অর্থাৎ অপূর্ণ
বলিয়া এ সকলকে সেই পূর্ণস্বরূপ আত্মাতে দর্শন বা আত্মসাৎ করাই
ব্রহ্মসম্পত্তি । ব্রহ্মত্বলাভ অর্থে এই জ্ঞান সমান (বা সমত্ব জ্ঞান), কালে
মুক্তিই এ স্থলে সূচিত হইয়াছে (গিরি) । তিনি অনবচ্ছিন্নজ্ঞানে একাকার
আত্মাকেই প্রাপ্ত হন (রামানুজ) । তিনি পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-সম্পদ লাভ
কারণা ব্রহ্মই হন (শ্রীমৌ) । তখন স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদদর্শনের
অভাবে ব্রহ্মই হন—সর্বানর্থ-শূন্য হন । স্মৃতিতে আছে—

“যস্মিন্ সর্বানি ভূতানি আত্মৈবাত্মদু বিজানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্রুতঃ ॥” (ঈশ-উপঃ ৭)

পূর্বে প্রকৃতিভেদ দ্বারা আত্মভেদ নিরাকৃত হইয়াছে, এ স্থলে
অনাত্মভেদ অব্যক্ত অপৃথগ্ভাব উপদিষ্ট হইয়াছে (মধু) । তিনি ব্রহ্মভূত
হন, অর্থাৎ আপনাকে স্বকৃতি হইতে পৃথগ্ভাবে অনভিব্যক্ত, সর্বপাপ-
বিরহিত, বৃহৎ ইত্যাদি অষ্টগুণযুক্তরূপে অনুভব করেন (বলদেব) ।
ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন (বল্লভ) ।

যখন ভূত পৃথগ্ভাব অর্থাৎ দেব-তির্য্যগ-মনুষ্যাদি ভেদে ভিন্ন দেহরূপ
ভাব বা কার্য্য, একত্ব, অর্থাৎ স্থিতিকালে একই ঈশ্বর-শক্তিরূপ প্রকৃতিতে
স্থিত সর্বদা দর্শন হয় এবং তাহা হইতে অর্থাৎ সেই প্রকৃতি-সকাশ
হইতে সৃষ্টি-সময়ে ভূতগণের বিস্তার বা অভিব্যক্তি দর্শন হয়, তখন
ভূতগণের কারণ বস্তুর একত্ব দর্শনহেতু ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ব্রহ্মবৎ
অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান সমান আত্মাকে প্রাপ্ত হয় (কেশব) ।

ভূতপৃথগ্ভাব—একত্ব—এই তত্ত্ব বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন-

রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি । শঙ্কর-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, এই 'এক' অর্থে আত্মা বা ব্রহ্ম, 'এক' এই যে ভূতপৃথগ্ভাব বা এই পরিদৃশ্যমান 'বহুত্ব' এই ভূতময় জগতের 'নানাত্ব' ইহা সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা আত্মাতে অবস্থিত । রামানুজ প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, এই 'এক' প্রকৃতি—সর্বভূতপৃথগ্ভাব প্রত্যয় অবস্থায় এই এক প্রকৃতিতেই অবস্থিত থাকে । এই বিভিন্ন-রূপ ব্যাখ্যার মধ্যে কোন ব্যাখ্যা সঙ্গত ও গ্রাহ্য, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যিক ।

গীতা হইতেই প্রথমে এ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত । গীতার পূর্বাঙ্গের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে অর্থ সঙ্গত হয়, তাহাই গ্রাহ্য । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন যে, তিনিই সর্বভূতাসম্বন্ধিত আত্মা (১০।২০), সর্বভূতস্ব আত্মা (৬।২৯), তিনি সর্বভূতাত্মভূতাত্মা (৫।৭) । তিনি সর্বভূতের বীজ (৭।১০), সর্বভূতের জীবন (৩।২৯), সর্বভূতের হৃদয়ে নিয়ন্তা অন্তর্যামিরূপে স্থিত (১৮।৬১) । সর্বভূত তাঁহাতে স্থিত (৯।৪), সর্বভূতে সমভাবে স্থিত (৯।২৯ ; ১৩।২৭), পরব্রহ্মরূপে তিনিই সর্বভূতের বহিঃ ও অন্তরে স্থিত (১৩।১৬) । পূর্বে ২৮শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য এ তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । অতএব গীতার বার বার নানাভাবে এই হৃকৌধ্য তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । যে সর্বভূতপৃথগ্ভাব, সর্বভূতবিশেষসম্বন্ধ (১১।১৫) সেই এক ব্রহ্ম বা পরমাত্মা পরমেশ্বরে স্থিত । এ তত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া গীতার পূর্বে উক্ত হইয়াছে—

“যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।

* * *

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভুক্তভ্যো কৃত্বমাশ্রিতঃ ।” (৬।৩০, ৩১) ।

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

‘অবিভক্তং ভূত্বৈব বিভক্তমিব চ স্থিতম্ । (১৩.১৬) ।’

অতএব গীতা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, এই ভূত্বপৃথগ্ভাব ব্রহ্মেরই, সে পৃথগ্ভাব, সে বিভক্তভাব পারমাথিক সত্য নহে, তাহার মধ্যে অবিভক্ত এক ব্রহ্মভাবটী পারমাথিক সত্য, সর্বভূতমধ্যে সেই একত্বদর্শনই প্রকৃত দর্শন । শ্রুতিতেও আছে,—“তত্ত্ব সর্বত্র ব্রহ্ম ইতি একতা ।” (ছান্দোগ্য-উপঃ ১।৫।১৭) । অতএব গীতা ও শ্রুতি অনুসারে এই ‘এক’ ব্রহ্মভাব ভূত্বপৃথগ্ভাব ‘একত্ব’, তাহা ব্রহ্ম, পরমেশ্বর বা পরমাশ্রী । ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব । পরব্রহ্ম নিগুণভাবে জগদগীত হইলেও সঙ্গুণভাবে পরমেশ্বর পরমাশ্রী । ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য তত্ত্ব পৃথক্ নাই, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সত্তা নাটী, অন্য জ্ঞান নাই । তাঁহার সত্তার বা সংস্বরূপে সমুদায়ই সত্তায়ুক্ত, তাঁহার জ্ঞানে সমুদায়ই অবস্থিত । এ তত্ত্ব পূর্বে বিবৃত হইয়াছে ।

এই স্পষ্টার্থ সত্ত্বের রামানুজ, স্বামী প্রভৃতি ব্যাখ্যা কারগণ কেন এই ‘এক’কে প্রকৃত বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না । তাঁহারা কেহই শুদ্ধদেহতবাদী নহেন । ঈশ্বর, জীব ও জড়জগৎ এ তিন নিত্য পৃথক্ তত্ত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন, কিন্তু এই তিন যে ব্রহ্মে অবস্থিত, এ তিন যে ব্রহ্মেরই বিস্তার, তাহা স্বীকার করেন না । একত্র তাঁহারা সর্বভূত যে ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে ‘এক’ হইয়া অবস্থিত, তাহা স্বীকার করেন না । যে সাধ্বিক জ্ঞানের কথা ভগবান্ উল্লেখ করিয়াছেন ;—

‘সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যঙ্গমীকৃতৈ ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাধ্বিকম্ ॥”

(গীতা ১৮.২১)

জ্ঞানের এই সাধ্বিকভাবও বোধ হয় ইহারা স্বীকার করেন না । যাহা হউক, ইহারা এই ‘এক’কে প্রকৃতি বলিলেন কেন ? গীতা হইতেই তাঁহারা ইহার উত্তর দিতে পারিতেন । গীতায় আছে—

“অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তনিধনাশ্চেব তত্র কা পরিমেদনা ॥” (গীতা ২।২৮) ।

কিন্তু এই শ্লোক হইতে ব্যক্তাবস্থার ভূতপৃথগ্ভাবে যে সেই অব্যক্তে একই, এ কথা বলা সম্ভব হয় না । এ স্থলে অব্যক্ত অর্থে মূল প্রকৃতি বা ভগবানের অব্যক্ত মূর্তি—যাহা দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত (৯।৪), তাহা নহে । এ স্থলে অব্যক্ত বিশেষ্য নহে,—বিশেষণ । অব্যক্তসংজ্ঞক বলায় তাহা বিশেষ্য হইলেও, সে অব্যক্ত ‘প্রকৃতি’ নহে ; তাহা এই গীতা অনুসারে এই ভগবানেরই মূর্তি ; সেই অব্যক্ত মূর্তি, ভগবান্ হইতেই সমুদায় ব্যক্ত হইয়াছে (৭।২৪) । সে অব্যক্ত ও অক্ষর ব্রহ্ম (৮।২১ ; ১২।১—৬) । গীতায় ১৩।১৫ শ্লোকে” যে অব্যক্ত ক্ষেত্রের উপাদানরূপে উক্ত হইয়াছে, সে অব্যক্ত নহে ।

গীতায় এ সম্বন্ধে আরও একটি শ্লোক আছে—

“অব্যক্তাদব্যক্তঃ সর্গাঃ প্ৰভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়েন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥”

(গীতা ৮।১৮)

এ স্থলেও অব্যক্ত অর্থে গীতাক্ত প্রকৃতি নহে । সে প্রকৃতি দুই রূপ ; —পরা ও অপরা (৭।৪-৫) । ইহা ব্যতীত অন্য প্রকৃতি গীতায় উপদিষ্ট হয় নাই । ইহা ব্যতীত যে অব্যক্তের কথা গীতায় উক্ত হইয়াছে, তাহা সাংখ্যের মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত নহে । কেন না, সাংখ্যের অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি স্বতন্ত্র—মূল্যতত্ত্ব । গীতা অনুসারে সে অব্যক্ত ঈশ্বরের অব্যক্ত মূর্তি, ব্রহ্মের অক্ষর স্বরূপ,—মহদ্ব্রহ্ম (১৪।৩) । তাহা স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে । তাহা হইতে পরা ও অপরা প্রকৃতির উদ্ভব হইলেও, তাহা হইতে উদ্ভূত বলিয়া ঋতিতে সর্বত্র উক্ত হইয়াছে । বিশেষতঃ উক্ত শ্লোক অনুসারে ভূতগণ ব্রহ্মার রাত্রিশেষে বা প্রলয়-শেষে কল্পারম্ভসময়ে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, এবং সৃষ্টিতে এই ব্যক্তাবস্থার থাকিয়া আবার ব্রহ্মার

দিনশেষে বা কল্পক্ষরে অর্থাৎ প্রলয়ান্ত্রে সেই অব্যক্তেই বিলীন হয় বা বীজরূপে অবস্থান করে (৮:১৯) । ইহা হইতে বলা যায় না যে, ভূতগণ সৃষ্টির স্থিতি-অবস্থায় যখন ব্যক্ত হইয়া পৃথগ্ভাবযুক্ত হয়, তখনও তাহারা সেই অব্যক্তে অবস্থান করে । রামানুজ ও স্বামী সে কথা স্বীকার করেন । তাঁহারাও বলিয়াছেন যে, 'এক' অর্থে প্রকৃতি, আর সর্বভূততাব প্রলয়েই সে 'এক' প্রকৃতি অবস্থান করে, এবং সৃষ্টির আরম্ভে তাহা হইতে বিস্তার হয় । মধ্য বা ব্যক্তাবস্থায় যে সর্বভূত-তাব এই প্রকৃতিতে একই, তাহা তাঁহারা বলেন নাই । কিন্তু এ স্থলে এই ব্যক্তাবস্থায় কথাই উক্ত হইয়াছে । অতএব ইহাদের অর্থ অনুসারেও বলিতে হয় যে, মধ্য বা ব্যক্ত অবস্থায় যে ভূতপৃথগ্ভাব, তাহা অব্যক্ত বা প্রকৃতিতে অবস্থান করে না, ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরেই অবস্থান করে ।*

সেই এক হইতে বিস্তার,—অতএব সেই 'এক' ব্রহ্ম, আত্মা বা পরমেশ্বর হইতেই এই সর্বভূতময় জগতের বিস্তার হয়, প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে হয় না, ইহাও সিদ্ধান্ত করিতে হয় । পূর্বে যে অহরাগমে অব্যক্ত হইতে ভূতগণের প্রভব হয় বলা হইয়াছে, সে অহঃ-স্বরূপ ব্রহ্মার দিবা বা কালিক সৃষ্টি আরম্ভ—তাহা মহাপ্রলয়ান্ত্রে সৃষ্টি নহে । এ স্থলে যে বিস্তার বা সৃষ্টি মহাপ্রলয়ান্ত্রে হইয়া থাকে, তাহারই উল্লেখ হইয়াছে । কালিক বা খণ্ড প্রলয়ের কথা এস্থলে উক্ত হয় নাই ।

* জর্মান দার্শনিক হেগেল বলিয়াছেন, 'Man as spirit is a reflection of God' (*Philosophy of Religion Eng. trans vol III, p 146*) । সর্বভূত ইন্দ্রে হিত ও তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত, এ কথাও হেগেল বুঝাইয়াছেন । যথা— "This act of differentiation is merely a movement, playing of Love with itself, in which it does not get to the otherness or other being in any serious sense, nor actually reach a condition of separation and division" (*Philosophy of Religion. ditto. Vol III, p 35*) জর্মান দার্শনিক কিল্টেও এই কথা বুঝাইয়াছেন ।

ব্রহ্ম চইতেই যে এই সৃষ্টি হয়, হহাহ শ্রুতির সিদ্ধান্ত । সাংখ্যদর্শনে পুরুষ-সাম্বোধো প্রকৃতি চইতেই এ জগতের পরিণতি হয়, এই সিদ্ধান্ত চইতেও বেদান্তশাস্ত্রের তাহা সিদ্ধান্ত নহে । গীতা বেদান্তের প্রশ্ন-ভেদ মাত্র । শ্রুতিতে আছে :—

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যং প্রযন্ত্যাসি বিশান্তি তদ্বিজিতাসম্ব, — তদ্ ব্রহ্ম উচ্যতি” (ঐতরেয়, ৩।১।১) । এই শ্রুতি অনুসারে বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মের লক্ষণা উক্ত হইয়াছে — “অন্যাত্মস্ত যতঃ” (ব্রহ্মসূত্র, ১।২।২) । নিগূর্ণ ব্রহ্ম মায়াম্বা পরাশক্তিস্বরূপ — এজন্য সগুণ । এই কারণরূপা পরাশক্তি কার্যোন্মুখ হইলে ব্রহ্ম, সগুণ হইবে ; তিনি পরমেশ্বর, পরমপুরুষ, ও পরমাত্মা হন, আর এই পরা সগুণ মায়ী প্রকৃতিরূপা হন । তখন এই মায়াকেই অব্যক্ত ও বলা যায় । অব্যক্ত মায়ী মায়িক মহেশ্বর হইতে যখন স্বতন্ত্রা নহেন, ভিন্না নহেন, এই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই মায়ারূপ উপাদান হইতে প্রথম কার্যরূপে আকাশাদি-ক্রমে পঞ্চ মচাভূতের সৃষ্টি হয় ; বুদ্ধি, মন অহঙ্কারের সৃষ্টি হয় । আত্মা বা পরম পুরুষ তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন বলিয়া ইঁহার সাকলে দেবতা । আকাশাদি দেবতার কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । তাঁহার সাকলে বৈদিক দেবতা । বুদ্ধিতবে আত্মা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া হিরণ্যগর্ভ হন । প্রাণতবে ইঁহারই অন্তর্ভূত । মনতবে অনুপ্রবিষ্ট আত্মা বা অধিদেবতা বিষ্ণু, আর অহঙ্কারতবে অনুপ্রবিষ্ট আত্মা বা অধিদেবতা রুদ্র । ইঁহারও বৈদিক দেবতা । সমষ্টি আকাশাদি-অভিমানী আত্মাই দেবতা । ইঁহাই শ্রুতির অধিদেবতারূপ । আর এই পরমাত্মা পরমপুরুষ আপনাকে এই পঞ্চ মচাভূত ও বুদ্ধি মন অহঙ্কারতবে হইতে বিমুক্তভাবে, ইঁহাদিগকে তাঁহার অপরা প্রকৃতি বলিতে পারেন । গীতার এইরূপেই এই আটকে অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে । আর যে মুখ্য প্রাণতবে, বাহার অভিমানী দেবতাও হিরণ্যগর্ভ, তাহাকে ভৃগুবান্ এইরূপে তাঁহার পরা-

প্রকৃতিও বলিয়াছেন । (গীতা ৭:৫৪ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।
 এই পরা ও অপরা প্রকৃতি, এই মায়াধা পরাশক্তির প্রথম কার্যাবস্থা
 সর্গভূতযোনি (গীতা ৭:৫) । ইহাট মাদ্রক্ষ, ব্রহ্মের সর্বব্যাপনরূপ
 (গীতা ১৪ ৩) । ইহাতে ভগবান্ অনুপ্রাণিত হইলে বা আত্মস্বরূপ
 (পুরুষরূপ) বীজ-নিবেক করিলে তবে সর্গভূত-পৃথগ্ভাবের উৎপত্তি
 হয় । এষ্টরূপে সেই এক ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টির কারণে ভূতপৃথগ্ভাবের
 বিস্তার হয় । মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টির কারণে এই নিয়ম । ব্রহ্মের
 প্রতিশেষে যে কালিক সৃষ্টির কথা ভগবান্ পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত
 করিয়াছেন তাহাতে ত্রিলোকের ধ্বংস হয় না, ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হয় না ;
 তাহাতে ভূতগণেরও ধ্বংস হয় না ; ভূতগণ সেই প্রলয়ে অংশ হইলে
 সেই যে অব্যাক্রাবস্থা হয়, তাহাতেই বীজভাবে গীত থাকে । এই
 কালিক প্রলয়ের অংশ যে ভূতগণের 'প্রভব', তাহা বীজ হইতে অক্ষুরাং-
 পদন স্থায় উৎপত্তি মাত্র । অথবা প্রস্তুত অবস্থা হইতে জাগ্রত-
 স্থাপ্রাণি মাত্র । তাহা আদিম ভূত-পৃথগ্ভাবের বিস্তার নহে ।
 ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত,—ইহাই সৃষ্টির ও বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । এ স্থলে
 এ তত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিবার প্রয়োজন নাই । পূর্বে ইহা বিবৃত
 হইয়াছে ।

লভ ব্রহ্মভাব ।—মূলে আছে—“এক্ষ সম্পত্তে ।” ইহার গর্ভ ব্রহ্ম-
 সম্পদ লাভ করা বা ব্রহ্মের সালোক্য লাভ করা । ইহা দিবা ব্রহ্মপুরে
 আয়ার প্রতিষ্ঠা (যুগুৎ, ২২৭) । ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি (কঠ,
 ৬:১৮) । ইহা ব্রহ্মভাবে পরমানন্দভোগ (নাদবিন্দু উপঃ ২০) । এই
 ব্রহ্মসম্পদ লাভ হেতু 'ব্রহ্মলোক'-প্রাপ্তি হয় (ছান্দোগা ৮:১১ ;
 বৃহদারণ্যক, ৬:২:১৫) । ইহাকে গীতার ব্রাহ্মী স্থিতিও বলা হইয়াছে
 (২:৭২ ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । এই ব্রাহ্মী স্থিতির ফল যে ব্রহ্ম-
 নির্মাণ, তাহাও উক্ত হইয়াছে (২:৭২) । আত্মতত্ত্বজ্ঞানেই অর্থাৎ

সর্বত্র আত্মদর্শন-ফলেই যে ব্রহ্মে নির্বাণ হয়, তাহাও গীতার পূর্বে উক্ত হইয়াছে, (৫।২৪-২৬) । যিনি নিরঞ্জন ব্রহ্মভূত হন, তিনি সর্বপাপশূন্য (৬।২৭), প্রসন্নাত্মা (১৮।৫৪), নিকাম, নিস্পৃহ, নির্যম, নিরহকার হন (২।৭১), তিনিই শান্তি লাভ করেন ।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, এই ব্রহ্মসম্পদ লাভ করিয়া অর্থাৎ সর্বত্র সর্বভূতে এক আত্মা বা ঈশ্বরকে 'সম' ভাবে দর্শনফলে যে ব্রহ্মসম্পদ-লাভ হয়, তাহার ফলে উক্তরূপ যে অবস্থান হয়, তাহা এক অর্থে নিগুণ ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থান,—সগুণ ও নিগুণভাবে জ্ঞেয় পরব্রহ্মে অবস্থান নহে । এই ব্রহ্মসম্পদলাভ বা ব্রাহ্মী স্থিতি যে পরম পুরুষার্থ নহে, প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিবেকজ্ঞান লাভ করিয়া পুরুষের স্বরূপ অবস্থা যে সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে, তাহাও পরম পুরুষার্থ নহে । গীতা অনুসারে সগুণ-নিগুণ-ভাবে জ্ঞেয় পরব্রহ্মের স্বরূপলাভই পরম পুরুষার্থ—ইহা পূর্বে উক্ত ২।৭২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ও পরে উক্ত হইয়াছে । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই ।

রামানুজ প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ ব্রহ্ম অর্থে জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা গ্রহণ করিয়াছেন । তাঁহাদের মতে এই প্রত্যগাত্মাই ব্রহ্ম । ঈশ্বর ও প্রকৃতি তাঁহা হইতে ভিন্ন । প্রকৃতি হইতে প্রত্যগাত্মার (পুরুষের) পার্থক্যজ্ঞান লাভ করিয়া সেই প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিই ব্রহ্মসম্পদ লাভ । সুতরাং এই মতানুসারে তাঁহারা এই শ্লোকোক্ত 'এক' ও 'ব্রহ্মসম্পদলাভের' অর্থ বুঝাইয়াছেন । ইহা শ্রুতি ও গীতা-শাস্ত্র-সম্মত নহে । সর্বত্র একত্ব-দর্শনে সর্বভূতপৃথগ্ভাব সেই এক ব্রহ্মে স্থিত, এই তত্ত্ব দর্শনে ব্রহ্মসম্পদলাভরূপ পরাগতি-প্রাপ্তি হয় । যে নানান্য দর্শন করে, বহু পুরুষ হইতে পৃথক্ এক প্রকৃতি এবং এই পুরুষ (ভগবানের পরাপ্রকৃতি) এবং প্রকৃতি (অপরা) হইতে ভিন্ন ঈশ্বর, এইরূপ নানান্য দর্শন করে, তাহার কখন পরাপ্রকৃতি লাভ হয় না ।

প্রতিতে আছে,—“নেহ নানাশ্চি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্চোতি য
ইহ নানেব পশুতি ।” (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯, কঠোপনিষদ্ ৪।১০।১১) ।

এ স্থলে আরও উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, পূর্বে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনকে
জ্ঞানের স্বরূপ বলা হইয়াছে (১৩।১১ শ্লোক), সেই তত্ত্বজ্ঞানার্থই এই
অধ্যায়ে প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনই এই
স্থলে ২৭শ শ্লোক হইতে এই শ্লোক পর্যন্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে ।
অর্থাৎ (১) বিনাশী সর্বভূতে বিনাশ-রহিত পরমেশ্বরের সমভাবে
অবস্থিতি দর্শন, (২) ভগবানেরই প্রকৃতি (ক্ষেত্ররূপে) সর্বরূপে সর্ব-
ব্যাপক, (ক্ষেত্রজ্ঞ) আত্মা বা পুরুষ অকর্তা এই তত্ত্ব দর্শন, এবং (৩)
সর্বভূতপৃথগ্ভাব সেই ‘এক’ অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বা ব্রহ্মে অবস্থিত’ এবং
সেই এক হইতে বিস্তারিত এই তত্ত্ব-দর্শন, এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন
সিদ্ধ হয় । ঈশ্বর সর্বভূতে সমভাবে স্থিত, ঈশ্বরের পরা ও অপরা
প্রকৃতিই কর্তা, পুরুষ অকর্তা, এই সকল তত্ত্বজ্ঞানার্থ পূর্বে বিবৃত
হইয়াছে । এ স্থলে ভূতপৃথগ্ভাব যে ‘এক’ স্থিত অর্থাৎ “একমেবা-
দ্বিতীয়ঃ” ব্রহ্মে স্থিত, এবং সেই এক হইতেই বিস্তারিত, ইহাই বিবৃত হইল
এবং এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনফলে যে ব্রহ্মসম্পদ লাভ হয়, ব্রহ্মের স্তায়
আপন আত্মাকে সর্বভূতে বিস্তার করিয়া, সর্বাভূত হইলে যে ব্রহ্ম-
স্বরূপ লাভ হয়, তাহা আমরা এ স্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এই
আত্ম-‘বিস্তার’ বা আত্ম-‘সম্প্রসারণ’ দ্বারাই ব্রহ্মসম্পদ-লাভ হয় । এ
তত্ত্ব আর বিস্তারিতভাবে বুঝিবার প্রয়োজন নাই ।

অনাদিত্বান্নিগুণত্বাৎ পরমাত্মাহয়মব্যয়ঃ ।

শরীরশ্চোহপি কোন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১

অনাদিত্ব নিগুণত্ব হেতু. হে কৌন্তেয় ।

সে অব্যয় পরমাত্মা দেহস্থ হয়েও

নাহি কিছু করে কিংবা নাহি লিপ্ত হয় । ৩১

৩১ । পূর্বশ্লোকে—ভূতপৃথগ্ভাব এক পরমাত্মাতেই স্থিত ইহা উক্ত হইয়াছে । ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, এক আত্মাই যদি সকল দেহের আত্মা হন, তবে সর্বদেহকৃত দেহের দোষের সহিত আত্মার সংস্ক হইতে পারে । সেই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য এই শ্লোক (শঙ্কর) । দেহ হইতে ভিন্ন পরমাত্মা দেহস্থ হইয়াও দেহস্থভাবে লিপ্ত হন না, ইহাই এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (রামানুজ) । সংসার অবস্থায় দেহসংস্ক নিমিত্ত কর্ম ও তৎকল সুখ-দুঃখাদি দ্বারা পরমাত্মার বৈষম্য ভ্রমপ্রতির সমদর্শন সম্ভব নহে, এই আপত্তির উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে (শ্বামী) । আত্মা স্বতঃ অকর্তা হইলেও ঔপাধিক শরীর-সংস্ক হেতু কর্তৃত্ব-যুক্ত হইতে পারে, এই শঙ্কার নিবারণ জন্য আত্মার অকর্তৃত্ব পুনর্বার এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে (মধু) । দেহের সহিত জীবের উৎপত্তি-বিনাশ হয় না, ইহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে (বলদেব) ।

আত্মা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সেই জন্য তাহার স্বতঃ কোন কর্তৃত্ব নাই, ইহা স্বীকার করিলেও শরীরে অবস্থান-দশায় ও শরীরের সহিত সংস্ক নিমিত্ত কর্ম দ্বারা ও তজ্জনিত সুখ-দুঃখাদির দ্বারা যদি আত্মা লিপ্ত হয়, তবে কিরূপে তাহার অকর্তৃত্ব ও সমত্ব-দর্শন সম্ভব হয়, তাহার উত্তরে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে (কেশব) ।

অনাদিত্ব—অনাদির ভাব অনাদিত্ব । আদি শব্দের অর্থ কারণ । যাদের কারণ নাই, তারা অনাদি । যে বস্তু আদিমৎ, তাহা নিজ স্বরূপে বিনাশশীল । আত্মা অনাদি বলিয়া ইহার বিনাশ নাই, ইহা অবিনাশী ।

আত্মা নিরবয়ব ; এই কারণেও তাহার বিনাশ হইতে পারে না (শঙ্কর) ।
 আদিমং বা উৎপত্তিবিনাশশীল শরীরস্থ হইয়াও আত্মা অনাদি অর্থাৎ
 উৎপত্তিরহিত (রামানুজ) । উৎপত্তি নাই বলিয়া অনাদি (স্বামী) ।
 আদি অর্থাৎ অসং অবস্থ', সর্বদা সৎ আত্মার কখন লাগসদবস্থা থাকিতে
 পারে না ; অতএব তাহার কারণভাবে জন্মভাব সৃষ্টিত হইয়াছে । যাহা
 নাদি, তাহার জন্ম সম্ভব নহে । জন্ম না হইলে বাহ্য শেবে ভাববিকার
 বা বিনাশ, তাহারও সম্ভাবনা নাই । যাহা অনাদি, তাহা অজ্ঞ ও
 অবিনাশী (মধু) ।

নিগূর্ণক ।—যে বস্তু সত্ত্ব, তাহার গুণের অপচয় হইলে বিনাশ
 হয় । আত্মা নিগূর্ণ ; সুতরাং তাহার বিনাশ হইতে পারে না । (শঙ্কর) ।
 সর্বাদি গুণরহিত্য (রামানুজ) । নির্দ্বন্দ্বক (মধু) । বিগুরু জ্ঞানা-
 নক (বলদেব) ।

অব্যয় পরমাত্মা ।—পরমাত্মা অনাদি এবং নিগূর্ণ, এই সমস্ত
 তাহা অব্যয় বা অবিনাশী (শঙ্কর) । ব্যয় দুই রূপ ;—কার্যাকৃত ব্যয়
 এবং গুণাপকর্ষ দ্বারা ব্যয় । পরমাত্মার এই দুই রূপ ব্যয়ের অভাব-
 হেতু অব্যয় (গিরি) । এই পরমাত্মা অনাদি বা উৎপত্তিধর্মহীন
 বলিয়া এবং নিগূর্ণ বলিয়া অব্যয় বা অবিকারী (স্বামী) । এই
 অপরোক্ষ পরমাত্মা—পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন প্রভাগাত্মা ব্যয়হীন বা
 সর্ববিকারশূন্য । যাহা ধর্মবুদ্ধ বা উৎপত্তিমং, অথবা যাহা উৎপত্তিমং
 না হইয়াও কেবল ধর্মিস্বরূপ হয়, তাহা ব্যয়গুরু—তাহা অব্যয় নহে ।
 পরমাত্মার উৎপত্তি নাই ; এই জন্মভাব হেতু পরমাত্মা অব্যয় । পর-
 মাত্মার কোন গুণ বা ধর্ম নাই । ধর্মোক্তে ধর্মের উপচয় বা অপচয় হয় ।
 ধর্মের সহিত ধর্মীর ভাদাত্ম্যহেতু ধর্মীরও উপচয় বা অপচয় হয় । আত্মার
 কোন ধর্ম নাই, একমু তাহার উপচয় বা অপচয় নাই । একারণও
 পরমাত্মা অব্যয় (মধু) । অব্যয়, অর্থাৎ পরম স্বরূপাদিনাশশূন্য (বলদেব) ।

এই আত্মা অর্থাৎ জীব—পরম এবং অব্যয় । ব্যয়ের প্রধান ধর্ম
বিনাশ । আত্মা শরীরস্থ হইলেও বিনাশরহিত (বলদেব) ।

দেহস্থ হয়েও নাহি কিছু করে...নাহি লিপ্ত হয় ।—আত্মার
উক্তরূপ স্বরূপ বলিয়া, আত্মা শরীরস্থ হইয়াও কোন প্রকার কার্য
করেন না, এবং কার্য্য করেন না বলিয়াই কোন প্রকার কর্মফলের দ্বারাও
লিপ্ত হন না । শরীরেই আত্মার উপলব্ধি হয়, এজন্য আত্মাকে শরীরস্থ
বলা যায় । এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কর্ম করে কে ?
পরমাত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন দেহী যদি কর্ম করে ও কর্মে বা কর্ম
ফলে লিপ্ত হয়, তবে ভগবান্ ‘আমাকেই কেন্দ্রস্থ বলিয়া জানিও’ (১৩২),
ইহা বলিয়া যে জীব ও ঈশ্বরে অভেদ—এই উপদেশ দিয়াছেন, ইহা
উপপন্ন হয় না অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে জীবের পার্থক্য অঙ্গীকারে, এই
উপক্রমের বিরোধ নাই—এরূপ বলা যাইতে পারে (গিরি)
অতএব যদি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কোন দেহী না থাকে, তবে কে কর্ম
করে এবং কেই বা লিপ্ত হয় ? যদি আর কেহ কর্ম না করে ও না
লিপ্ত হয়, তবে বলিতে হয় যে, কেন্দ্রস্থ ব্যতীত আর কেহ কর্ম করেনা
ও ফলভোগ করে না । এইরূপ আপত্তি হইতে বুঝা যায় যে, ভগবান্
যে উপনিষৎপ্রতিপাদিত আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সর্ব-
প্রকারে দুষ্কর্ম ও দুর্স্বাচ্য । এই কারণে বৈশেষিক, সাংখ্য, আইত্ব
ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এই প্রকার মত পরিত্যাগ করিয়াছেন । যাহা
হউক, এই আপত্তির যে উত্তর, তাহা ভগবান্ স্বয়ং দিয়াছেন । তিনি
বলিয়াছেন—“স্বভাবস্ত প্রাপ্ততে” (৫.১৪) । স্বভাব বা অবিচার
কেবল কর্ম করে ও কর্মে লিপ্ত হয়—এই প্রকার ব্যবহারমাত্র হইয়া
থাকে । প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাতে কোন প্রকার কর্ম বা কর্মফলের
সম্বন্ধ হইতেই পারে না । এজন্য যাহারা জ্ঞাননিষ্ঠ, এই পরমার্থ সাংখ্য-
দর্শনে স্থিত পরমহংস পরিব্রাজক, যাহারা সর্বপ্রকার অবিচার-ব্যবহার

মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কৰ্মে অধিকার নাই । ভগবান্ ইহাই এ স্থলে দেখাইয়াছেন (শঙ্কর) ।

পরমাশ্মা দেহ হইতে ভিন্নস্বভাব, ইহা নিরূপিত হইয়াছে । সেই পরমাশ্মা শরীরস্থ হইয়াও অনাদি হেতু এবং নিগুণ হেতু কোন কৰ্ম করেন না, এবং দেহস্থ কোন ভাবে লিপ্ত হন না, (রামানুজ) । উক্ত হেতু এই পরমাশ্মা দেহস্থিত হইয়াও কোন কৰ্ম করেন না, কোন কৰ্ম-ফলেও লিপ্ত হন না (স্বামী) ।

অনাদি জন্মরহিত । নিগুণ স্বরূপতঃ মায়া-গুণসম্বন্ধ-রহিত । অব্যয়=বিনাশ-বর্জিত । যাহার উৎপত্তি আছে এবং যাহা প্রকৃতি গুণযুক্ত, তাহার 'ব্যয়' বা নাশ হয় । আশ্মার এইরূপ 'ব্যয়' নাই, এই জন্ত অব্যয় । .পরমাশ্মা—দেহ মন বুদ্ধিকে আশ্মা বলে, ইহাদের অপেক্ষা যাহা পর বা শ্রেষ্ঠ, তাহাই পরমাশ্মা । সূত্রায়ং এই অব্যয় পরমাশ্মা শরীরে থাকিয়াও কিছু করেন না বা কিছুতে লিপ্ত হন না অর্থাৎ দেহের ভাব যে পরিণাম আদি বা পুণ্যদোষ আদি, তাগতে যুক্ত হন না (কেশব) ।

এই আশ্মা বা জীব পরম, অব্যয়, অবিনাশী ও নিগুণ বলিয়া যুক্ত-যজ্ঞাদি কোন কৰ্ম করেন না, এবং সেই হেতু উৎপত্তি-বিনাশ-লক্ষণ শরীর ইন্দ্রিয়স্বভাব দ্বারা লিপ্ত হয় না (বলদেব) । বলদেব আরও বলেন যে, পরমেশ্বর এবং আশ্মা—ইহাদের মধ্যে প্রভেদ দর্শন করিলেই যে কৃতার্থ হওয়া যায়, এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে, একরূপ প্রশ্ন হইতে পারে । শ্রুতিতে আছে,—“এতেত্য এব ভূতেত্যঃ সমুখায় তান্তেব অমুবিনশ্রুতি ধেত্য সংজ্ঞাস্তি” (বৃহদারণ্যক, ২।৪।১২) । অতএব শ্রুতি অমুসারে দেহ সহ আশ্মার উৎপত্তি ও বিনাশ শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে । এই প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে । ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, শ্রুতির এই অর্থ ঔপচারিক ।

সর্বগত ও সর্বাণ্য হেতু দেহাদিতে স্থিত হইলেও স্বতঃ দেহাদি আত্ম
রূপে কর্ম করেন না কর্মেও লিপ্ত হন না । কর্তৃত্বের অভাবেও ভোগ
হইতে পারে, এই জন্য উক্ত হইয়াছে যে, তিনি লিপ্তও হন না ।

‘যেহেতু আত্মা—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপচয় ও বিনা
এই বড়ভাবান্বিতশূন্য (পূর্বে ২।২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং
অধ্যাস সম্বন্ধে শরীরস্থ,—এজন্য শরীরে যে কার্য হয়, তাহা আত্ম
করেন না, এবং কর্ম না করায় কর্মফলেও লিপ্ত হন না । যেমন জলস্থ
(জলে প্রতিবিম্বিত) সবিতা জলের চলন হেতু চলিত হইয়া না, সেইরূপ
আত্মাও দেহের কর্ম দ্বারা কঠা হন না । যে যেই কর্ম করে, সে সেই
কর্মের ফলে লিপ্ত হয় । আত্মা অকর্তা বলিয়া কোন কর্মফলে লিপ্ত
হন না । হৃচ্ছা, দ্বেষ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি শরীরের বা ক্ষেত্রের কর্ম, ইহা পূর্বে
উক্ত হইয়াছে । প্রকৃতি বা মায়া দ্বারা সর্বকর্ম সর্বরূপে কৃত হয়, ইহাও
পূর্বে উক্ত হইয়াছে । অতএব যে পরমার্থদর্শী, তাহার সর্বকর্মনিবৃত্তি
হয় । আত্মার নির্দুর্গত এ স্থলে উক্ত হওয়ায়, আত্মার স্বগতভেদও নিরস্ত
হইয়াছে । অতএব আত্মা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে’ (মধু) ।
এই আত্মা শরীরস্থ অর্থাৎ শরীরে উপলভ্যমান (হু) ।

জীব ব্রহ্মের অংশ । অজ্ঞান হেতু দেহসম্বন্ধে জীবের কর্মলেপ
হয়, সেই অজ্ঞাননাশ হইলে সেই কর্মলেপ হয় না ; সুতরাং কিরূপে
সমদর্শন সম্ভব ? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, যাহারই অন্ত সহ
সম্বন্ধে উৎপত্তি হয়, তাহার নাশও হয় । অবিজ্ঞানতঃ জীবভাববৎ
দেহ সম্বন্ধে আত্মার উৎপত্তি হইলেও সে সম্বন্ধের অভাবে আত্মা কেবল
সাক্ষী । জ্ঞানের সাহিত্য যাহার সম্বন্ধ হয়, জ্ঞাননাশে তাহার নাশ হয় ;
এই পরমাত্মা নিঃশব্দ, এজন্য অব্যয়, নানশূন্য । এজন্য আত্মা শরীরস্থ
হইয়াও কোন কর্ম করেন না (বঙ্গ ৩) ।

পরমাত্মা ।—এ স্থলে যে পরমাত্মা উক্ত হইয়াছে, তিনি জীব নহেন।

বলদেব, বল্লভ প্রভৃতি যে এই পরমাত্মাকে জীব বা জীবাশ্মা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে । পূর্বে ২২শ শ্লোকে শরীরস্থ পুরুষকে পরমাত্মা বলা হইয়াছে । তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমত্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, পরমাত্মা ও এই দেহে বেহাতিরিক্ত 'পর' পুরুষ । তিনি যে ব্রহ্ম—সর্বদেহে আত্মস্বরূপে অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের গায় অবস্থিত, তাহা পূর্বে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই ।

পরমাত্মা অনাদি দেহ অব্যয় — পরমাত্মা যে অব্যয়, তাহার দুই কারণ,—তিনি অনাদি ও নিগুণ । অনাদি হইলে অব্যয় হয় কেন ? অনাদি অর্থাৎ যাহা কোন কারণ হইতে কার্যরূপে উৎপন্ন হয় না, এবং যাহার এই কারণরূপ হইতে কখনও কার্যরূপে প্রচ্যুতি হয় না । যিনি সর্বকারণের কারণ, কার্যকারণাত্ম সম্বন্ধ বা নিমিত্তের যিনি অতীত, নিমিত্তের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তিনি অব্যয় । যাহার ব্যয় নাই, তিনি অব্যয় । কারণ কার্যরূপে পরিণত হইলে, তাহার ব্যয় হয় । তবে যদি সেই কারণ অনন্ত হয়, আর কার্য সান্ত্ব হয়, তবে সে কারণ হইতে কার্যোৎপত্তি হইলেও, সে কারণ অনন্ত পূর্ণই থাকে, অব্যয় থাকে । পরমাত্মা ব্রহ্ম কার্য-কারণসম্বন্ধের অতীত হইয়াও স্বমামাশক্তি হেতু সর্বকারণ । ব্রহ্ম কার্য-কারণের অতীত হইয়াও এই বিশ্বের আদি কারণ (first cause) বলিয়া তিনি অনাদি । আর কার্যকারণ সম্বন্ধের (causation) অতীত বলিয়াও তিনি অব্যয় ।

পরমাত্মা নিগুণ বলিয়া অব্যয় ।—পরমাত্মা অনাদি বলিয়া অব্যয়, এবং নিগুণ বলিয়াও অব্যয় । এই নিগুণের অর্থ কি ? নিগুণ অর্থে সর্বপ্রকার গুণ বা ধর্মের অতীত । রামানুজ প্রভৃতির মতে সর্ব হেয় গুণের সহিত সম্বন্ধশূন্য অথচ সর্ব উপাদেয় গুণবৃত্ত যিনি, তিনিই নিগুণ । কিন্তু সে অর্থে ব্রহ্মকে নিগুণ বলা যায় না । ব্রহ্ম সগুণ ও

নির্গুণ উভয় ভাবযুক্ত । যেমন কোন পটের একদিকে চিত্র থাকে, ও অন্য দিক্ গুত্র সর্ববর্ণের দ্বারা অরঞ্জিত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম একভাবে নির্গুণ, অন্তভাবে সগুণ । ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব প্রপঞ্চাতীত ভাব (transcendent ভাব), তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে । সম্বন্ধ ব্যতীত কোন গুণের অভিব্যক্তি হয় না । ব্রহ্ম পরমায়া-রূপে এই জগতের অতীত হইয়াই সর্বত্র সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট । আকাশ যেমন নির্লিপ্ত হইয়াও সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট, সেইরূপ পরমায়াও সর্বশরীরস্থ হইয়াও নির্লিপ্ত । এই পরমায়া নিশ্চল, স্থির, অক্ষর, অব্যয়, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত ও প্রপঞ্চের সহিত সম্বন্ধহীন । এজন্ত এই পরমায়া, শরীরস্থ থাকিলেও নির্গুণ ব্রহ্মরূপ । শরীরস্থ পরমায়ার প্রতিবিম্ব-চিত্রে প্রতিফলিত হইলে যে জীবভাব হয়, সেই জীব কর্তা ভোক্তা হইলেও, তাহার প্রতিবিম্ব আবার পরমায়াতে প্রতিবিম্বিত হইলেও, পরমায়া তাহা দ্বারা রঞ্জিত হয় না । তবে অধ্যাস হেতু অবিজ্ঞাবশে জীব, তাহাকে সেই কর্তৃৎ ও ভোক্তৃৎের দ্বারা রঞ্জিত বর্ণিয়া মনে করে । অতএব শরীরস্থ হইলেও আকাশকল্প আয়া নির্গুণই থাকে । যাহা নির্গুণ, তাহার কোনরূপ ব্যয় হয় না । গুণ হেতু যে সম্বন্ধ হয়, সেই সম্বন্ধ হেতু সেই গুণীর ব্যয় বা অপচয় উপচয় হইতে পারে । গুণসম্বন্ধ না থাকিলে কোন উপচয় বা অপচয় হয় না, অর্থাৎ কোন ব্যয় হয় না । যে দ্রব্য আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, বা যাহার অনুমান হয়, তাহা জাতি গুণ, কর্ম ও সম্বন্ধ দ্বারাই আমরা জানিতে পারি । পরমায়া সম্বন্ধে কোন গুণ (connotation) আমাদের প্রমা-জ্ঞানের বিষয় নহে । ব্রহ্ম বা পরমায়া যে অপ্রমের, এই নির্গুণতাই তাহার কারণ । এ সম্বন্ধে শব্দর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত । পূর্বে ইহা বিবৃত হইয়াছে ।

পরমায়া অকর্তা ও অভোক্তা ।—এই দেহে অবস্থিত যিনি পরমায়া, তিনি কোন কর্ম করেন না, এবং কোন কর্মে লিপ্ত হন না ।

শ্রুতিতে যে শরীররূপ বৃক্ষে ছই পক্ষীর অধিষ্ঠানের কথা আছে, তাহার মধ্যে এক অর্থাৎ পরমায়া সর্বভূতে সমভাবে স্থিত । তিনি স্রষ্টা মাত্র, তিনি কোন কৰ্ম করেন না ও কোন কৰ্মফল ভোগ করেন না, কোন কৰ্মেও লিপ্ত হন না । বহু জীবায়াভাবেই তিনি কৰ্ম করেন ও কৰ্মে লিপ্ত হন, ইহা প্রতীয়মান হয় । এই শ্রুতিমন্ত্র পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । তাহা এই—

“বা সুপূর্ণা সমুজ্জা সখায়ী

সমানং বৃক্ষং পরিষদজাতে ।

ভয়োরন্যাঃ পিপ্লগং স্বাবৃন্তি

অনন্তরশ্চোহতিচাকশীতি ॥”

(ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।২১ ; মুণ্ডক উপঃ ৩।১।১)

‘অতং পিবন্তৌ স্কৃতস্য লোকে

শুহাস্প্রবিষ্টৌ পরমে পরাক্কে,

ছায়ান্তপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি.....॥” (কঠ উপঃ ৩।১) ।

এই “প্রাণসংজ্ঞক জীব” (মৈত্রায়ণী, ৬।১২)

मध्ये আয়া অনুপ্রবিষ্ট হন ।

“অনেন জীবেন আয়ানা অনুপ্রবিষ্ট নামরূপেণ ব্যাকরবাণীতি ।’ (ছান্দোগ্য, ৬।৩২) । অতএব জীবদেহে আয়া অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীবায়া ও পরমায়াৰূপে ব্রহ্ম অবস্থিত, এ কথা বলা বাইতে পারে । এই পরমায়ায় অধিষ্ঠান থাকায় জীবায়া শরীরবন্ধ ভাবে ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন থাকিয়াও এই ভূমা, পূর্ণ, অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন পরমায়ায় স্বরূপলাভে অধিকারী । শ্রুতিতে আছে—

“বালাগ্রণতস্তাগস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কন্নাতে ॥”

নৈব জ্ঞী ন পুমানেষ ন চৈবাগং নপুংসকঃ ।

যদ্ যদ্ শরীরমাদন্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥”

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৫।৯,১০) ।

এই জীব দেহে বদ্ধভাব হেতু জীবাত্মা ক্ষুদ্র, ‘অক্ষুষ্ঠমাত্র’ বালাগ্র-
ভাগশ্চ শতধা’ অনুমিত হইলেও, সে জীবাত্মার স্বরূপ যে পরমাত্মা, তাহা
বার বার উক্ত হইয়াছে । জীবাত্মারূপে বদ্ধভাবে তিনি কর্তা ও ভোক্তা
বলিয়া বোধ হইলেও পরমাত্মারূপে তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূত সর্বজীবে
সমভাবে স্থিত, অনাদি, নিগুণ ; একত্র পরমাত্মস্বরূপে তিনি কৰ্ম করেন
না, কৰ্মে লিপ্তও হন না ।

জীবদেহে বা সর্বভূতদেহে পরব্রহ্ম তিন ভাবে অধিষ্ঠিত, ইহা আমরা
গীতা হইতে জানিতে পারি । এক জীবাত্মা বা ক্ষর পুরুষরূপে, এক
পরমাত্মা বা অক্ষর পুরুষরূপে, আর এক পরমেশ্বর বা পরমপুরুষরূপে
ব্রহ্ম জীবাত্মারূপে অবিভক্ত হইয়াও প্রতিদেহে বিভক্তের গ্ৰাম স্থিত ;
কিন্তু পরমাত্মা পরমেশ্বররূপে সর্বদেহে সমভাবে স্থিত । পরমাত্মারূপে
ব্রহ্মের নির্মল স্বরূপ আমাদের অন্তরে নির্মল বুদ্ধিতে অধ্যাত্মযোগাধি-
গম্য । আর পরমেশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মরূপে তিনি আমাদের অন্তরে ও বাহিরে
সর্বত্র অন্তর্যামী নিয়ন্তরূপে একান্ত ভক্তি দ্বারা নির্মলজ্ঞানে অধিগম্য ।
জীবাত্মারূপে জীবের অন্তরে বিভক্তের গ্ৰাম হইয়া অনুপ্রবিষ্ট আত্মারূপে—
তাহাতে কৰ্ম ও কৰ্মফল ভোগ অধ্যাস হইলেও পরমাত্মরূপে তিনি
নিত্য নিগুণ, পরমকারণরূপে অনাদি, অকর্তা ও অভোক্তা ।

যাহা হউক, জীবাত্মা বা পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্তা হইলেও এবং কৰ্মে
লিপ্ত না হইলেও কিরূপে আপনাকে ভোক্তা জ্ঞান করেন, তাহা পূর্বে
২০শ ও ২১শ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই দুই শ্লোক ব্যতীত এই
ভদ্ ২২শ শ্লোকেও পুনরুক্ত হইয়াছে । এ স্থলে ইহার বিস্তারিত
ব্যাখ্যা নিম্নরোজন ।

বাহ্য হউক, এই শ্লোকের শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যাই
 সঙ্গত ও গ্রাহ্য । বলদেব প্রভৃতি ষে রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য
 নহে । ‘পরমাশ্মা’ বা জীবাশ্মা এক হইলেও যে বিশেষ আছে, তাহা
 ব্যবহারক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করা যায় না । পরমাশ্মা অর্থে যে দেহ হইতে
 উৎপন্ন ও ‘পর’ জীবাশ্মা, ইগাও বলা যায় না ; কেন না, একই পরমাশ্মা
 সর্বজীবে বা সর্বভূতে সমভাবে স্থিত, ইহা গীতার বারবার উপদিষ্ট
 হইয়াছে । শঙ্করাচার্য্য সেই বিশেষত্ব স্বীকার করেন নাই বলিয়া আশ্ম-
 জনীর পক্ষে নিষ্ক্রিয় সন্ন্যাস অবস্থাতেই অধিকার, এবং কস্মে তাহার
 অধিকার নাই, এই মত জ্ঞাপন করিয়াছেন । বলদেব কেশব প্রভৃতি ষে
 শ্রুতির উল্লেখ করিয়া শ্রুতি, তদনুসারে জীবাশ্মাকে বিনাশী বলিয়াছেন,
 এবং এই মত ঔপচারিক বলিয়া বুঝাইয়াছে, সে শ্রুতির এ অর্থ নহে ।
 মহাদারণাক উপনিষদের (২।৪।১২) সেই মন্ত্র এই:—

“...ইদং মহদভূতম্ অনন্তম্ অপারং বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ
 সমুখায় ভাগ্নেব • অনুভবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি ।” ইহার অর্থ,
 “এই বিজ্ঞানঘন আশ্মা মহদভূত, অনন্ত, অপার, এই ভূত সকল হইতে
 (মহাভূত হইতে) সমুখিত হইয়া তাহাতেই বিলীন হন, অর্থাৎ দেহাদি
 রূপে পরিণত এই সকল ভূত হইতে দেবমানবাদি ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া
 উঠে, বা এই সকল ভূতের বা ভূতসংঘাত দেহের নাশে আপনার
 নাশ অনুভব করিয়া সেই পরমাশ্মাতেই বিলীন হন । অর্থাৎ তাঁহার আর
 পুনর্জন্ম হয় না । যিনি জ্ঞান লাভ করিয়া অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়াছেন,
 তাঁহার ‘প্রাণ’ আর উৎক্রমণ করে না, দেহনাশের সহিত যিনি ব্রহ্মে
 বিলীন হন, তাঁহার আর দেবখানে বা পিতৃখানে গতি হয় না, এই
 উক্তি এ স্থলে শ্রুতিতে উক্তরূপে বুঝান হইয়াছে । অতএব ইহার
 দ্বারা জীবাশ্মা বিনাশী ইহা প্রতিপন্ন হয় না । দেহবৎ ভূতগণের মধ্যে
 যে আশ্মা অবস্থিত, তাহা জীবাশ্মাভাবে, দেহাশ্মাধ্যাস হেতু দেহনাশে

আপনার যে বিনাশ অনুভব করে, তাহা অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা জ্ঞান । এই মিথ্যা জ্ঞান হেতুই জীবাশ্মর ক্ষয়ভাব হয়, তাহাকে ক্ষয় পুরুষ বলা যায় । যুক্তিতে জীবাশ্মর সে বন্ধ জীবাশ্মভাব থাকে না, তাহার অবিনাশী নিগুণ পরমাশ্মরূপ অনুভূত হয় । জীবাশ্ম অকর্তা বলিয়া যিনি সৃষ্টাদিকর্ম করেন না, এই অর্থ হইলে ভগবান্ যে অর্জুনকে যুক্ত করিতে বারবার উপদেশ দিয়াছেন, এবং যজ্ঞ, দান, তপঃ, কর্ম, কাণ্ড, বলিয়া তাহা ত্যাগ্য নহে—এট উপদেশ দিয়াছেন, সমুদয় ব্যর্থ হয় । বলদেব জীব ও ঈশ্বরে যে ভেদ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও পরমাশ্মিক তত্ত্ব নহে । কেন না, ভগবান্ই সর্বভূতাত্মভূতাত্মা—তিনিই পরমাশ্মা, ইহাই গীতার উপদেশ । নিগুণ ব্রহ্ম পরমাশ্মা, সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর । এ উভয় একই, ইহা আমরা বার বার বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । পরমেশ্বরের এক অংশই জীবভূত হইয়া অগৎ ধারণ করেন । সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর অনন্তপ্রকার ভূতদেহ কল্পনা করিয়া তাহা সৃষ্টিপূর্বক তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া এ অগৎ ধারণ করেন, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । জীবের এই পৃথগ্ভাব এই বিভক্তের চার অবস্থান, প্রতি ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় বলিয়া, এই জীব ঈশ্বরের অংশ অংশিতাব উক্ত হইয়াছে । স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর নিফল দেশকাল-নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছেদ হইলে অংশভাব হয় । যাহা স্বরূপতঃ দেশকাল-নিমিত্তরূপ কোন উপাধি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তাহার অংশ হইতে পারে না । সুতরাং জীব ও ঈশ্বরে অংশাংশিতাব ব্যবহারিক পারমার্থিক সত্য নহে । অতএব জীবাশ্মর ও পরমাশ্মর এবং জীবাশ্মর ও ঈশ্বরে যে এই দেশকালনিমিত্ত পরিচ্ছেদ হেতু ব্যবহারিক সত্য এই ভেদভাব, তাহা পারমার্থিক সত্য নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত ; এ সত্যের শঙ্করের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য । তিনি এই ব্যবহারিকভাবে মিথ্যা বলিয়াছেন । সগুণ ব্রহ্মকে মায়াযোগ হেতু পারমার্থিকভাবে অসত্য বলিয়াছেন

এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে। তিনি মানুষকে ব্রহ্মের পরাশক্তি স্বীকার করিয়াও কেন ব্রহ্মের সগুণভাবে মায়িক বা মিথ্যা বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। শক্তি ও শক্তিমাণে প্রভেদ নাই, ইহা শ্রুতির উপদেশ। শক্তি নিত্য; তাহা কখনও বীজভাবে কারণরূপে থাকে, কখনও বা কার্যরূপে প্রকট হয়। শক্তির কখনও ধ্বংস নাই। শক্তি না থাকিলে শক্তিমান্ থাকিতে পারে, একরূপ কল্পনাই করা যায় না। অতএব ব্রহ্ম স্বমায়াশক্তির দ্বারা যে জগতের কারণ হন, সে জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। তাহা সেই শক্তিরূপ কারণে প্রলয়ে লীন থাকিলেও তাহার একেবারে ধ্বংস বা অভ্যস্তাভাব হয় না। অতএব এই জগৎ অনাদি ও অনন্ত। অতএব সগুণ ব্রহ্মের এই ব্যবহারিক জীবিতাবও পারমার্থিক তত্ত্ব। তবে জীবাশ্মার পরমাশ্মা-স্বরূপ যে আমরা জানিতে পারি না, সে ভ্রম অবশ্য অজ্ঞান বা অবিদ্যামূলক। এই অবিদ্যা দ্বারাই ভেদদর্শন হয়। সেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূর করিবার জন্য এবং জীবাশ্মার আপন পরমার্থস্বরূপ দর্শন করিবার জন্য গীতার বার বার এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাশ্চা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২

—:~:—

সূক্ষ্ম হেতু সর্বগত আকাশ যেমন

নাহি লিপ্ত হয়, আশ্মা সর্বত্র দেহেতে

অবস্থিত হয় তথা নাহি লিপ্ত হন ॥ ৩২

সূক্ষ্ম হেতু সর্বগত আকাশ যেমন নাহি লিপ্ত হয়।—যেমন আকাশ সর্বগত বা ব্যাপক হইয়াও সূক্ষ্মতা হেতু কাহারও সহিত সঘর্ষ

হয় না (শঙ্কর) । যেমন আকাশ সর্ববস্তুতে সংযুক্ত হইয়াও সূক্ষ্মত্ব হেতু সর্ববস্তুর স্বভাব দ্বারা লিপ্ত হয় না (রামানুজ) । যেমন আকাশ সর্বগত পক্ষাদিতেও স্থিত হইয়া সূক্ষ্মত্ব বা অসঙ্গত্ব হেতু পক্ষাদিতে উপলিপ্ত হয় না (স্বামী, মধু, বলদেব) । সর্বগত অর্থাৎ অড়ম্বীবাঙ্গত । সূক্ষ্ম— অর্থাৎ স্বরূপাভাবযুক্ত, সঙ্গরহিত । (বল্লভ) ।

আত্মা সর্বত্র দেহেতে অবস্থিত হয় তথা নাহি লিপ্ত হয়— এইরূপ সকল দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা কোন বস্তুর সহিত সংস্কৃত হয় না । কি কারণে আত্মা কৰ্ম করে না ও লিপ্ত হয় না, তাহা এ স্থলে আকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে (শঙ্কর) । আত্মা নিগুণ হইলেও নিত্য সংযুক্ত দেহস্বভাবের সহিত কিরূপে সংযুক্ত হয় না, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত হইয়াছে । আত্মা সূক্ষ্ম হেতু সর্বত্র দেব-মনুষ্যাদি দেহে অবস্থিত হইয়াও সেই সেই দেহ স্বভাবের দ্বারা লিপ্ত হয় না (রামানুজ) । সেইরূপ আত্মা উত্তম, মধ্যম বা অধম দেহে অবস্থিত হইয়াও দৈহিক দোষগুণে যুক্ত হয় না (স্বামী) । আত্মা অসঙ্গ হেতু শরীরস্থ হইয়াও শরীরের কৰ্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না, ইহার দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে (মধু) । আত্মা অর্থাৎ জীব সর্বত্র দেব-মনুষ্যাদি উচ্চোচ্চ দেহে স্থিত হইয়াও সেই দেহধর্মদ্বারা লিপ্ত হয় না, ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত হইয়াছে (বলদেব, কেশব) । আত্মাও সূক্ষ্ম ভাব হেতু অপ্রতিহতস্বভাব—এতদ্বয় সংস্কৃত হয় না ।

পূর্বে (৯৬) শ্লোকে এই আকাশের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । এহ সমুদায় জগৎ ভগবানের দ্বারা ব্যাপ্ত, সর্বভূত ভগবানেই স্থিত, অথচ ভগবান্ তাহাতে স্থিত নহেন, ভগবান্ আত্মস্বরূপে ভূতভূৎ ভূতভাবন হইয়া এবং সর্বভূতায়ৈ আত্মরূপে স্থিত হইয়াও (১০।২০) ভূতস্থ নহেন, এই ঐশ্বরীয় যোগ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য পূর্বে বলিয়াছেন,—

“যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।

তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্ব্যুপধারয় ॥”

মহান সর্বব্যাপী বায়ু যেমন আকাশে স্থিত, সেইরূপ সর্বভূত ভগবানেই স্থিত । বায়ু আকাশে স্থিত হইলেও আকাশ যেমন বায়ুতে স্থিত নহে, সেইরূপ সর্বভূত ভগবানে স্থিত হইলেও, ভগবান্ সর্বভূতে স্থিত নহেন । আধার-আধেয় ভাবে এই ভেদ । আকাশ, বায়ু প্রভৃতি ভূতগণের আধার, আকাশ বায়ু প্রভৃতির কারণ, এজন্য বায়ু প্রভৃতি ভূতগণ আকাশে স্থিত হইলেও সেই আধেয়ে আকাশরূপ আধারের স্থিতি নাই । সেইরূপ পরমেশ্বররূপ আধারে সর্বভূতের স্থিতি হইলেও সর্বভূতে পরমেশ্বর স্থিত নহেন । এ স্থলে ইহাই উক্ত হইয়াছে । পরমাত্মাতে সর্বভূতের স্থিতি বটে, অথচ পরমাত্মা সর্বত্র সর্বরূপে প্রকটিত দেহে লিপ্ত হন না । তাহার দৃষ্টান্ত আকাশ । আকাশ সূক্ষ্ম হেতু তাহাতে অবস্থিত সূক্ষ্ম কিছুতে লিপ্ত হয় না । আত্মাও সূক্ষ্ম হেতু সূক্ষ্ম ভূতদেহে স্থিত হইয়াও লিপ্ত হয় না ।

এই আকাশ দুই অর্থে ব্যবহৃত । এক অর্থ সর্বব্যাপক স্থান (space) আর এক অর্থ সর্বস্থানব্যাপক আকাশরূপ মহাভূত (ইহাকে ইংরাজীতে aether বলে) । এস্থলে এই দুই অর্থেই আকাশকে গ্রহণ করা যাইতে পারে । সাংখ্যমতে আকাশ স্থলভূত । তাহা হইতেই দিক্ (space) ও কাল (time) । এই মত বেদান্তসম্মত নহে । দিক্ উক্ত প্রথম অর্থে গৃহীত আকাশেরই রূপ । বৈশেষিক দর্শন অনুসারে এই অর্থে আকাশ ভূত নহে । দিক্ (space) যে সর্বগত সকল বস্তুর আধার, সকলের স্থান বা অবকাশদানকারী সর্বদ্রব্যে ওতপোত হইয়া স্থিত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি । আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারেও এই aether যে আমাদের সকলের শরীরে অনুপ্রবিষ্ট ও নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত এবং এই শরীরস্থ আকাশের মধ্য দিয়াও আলোক, উষ্ণ প্রভৃতি শক্তিক্রিয়া পরিচালিত হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় । অতএব এই সূক্ষ্ম আকাশ (aether) সর্বভূতশরীরস্থ থাকিয়াও, স্থলশরীরে যেমন লিপ্ত হয়

না, পরমাআত্মাও সেইরূপ এই সর্ষভূতশরীরে আত্মা-রূপে থাকিয়াও নির্লিপ্ত
ভাবে থাকেন, এই উপমা দ্বারা তাহা আমরা বুঝিতে পারি ।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩

সূর্য্য একা যেইরূপ করেন প্রকাশ

এই লোক সমুদায়, তথা হে ভারত !

ক্ষেত্রী একা সর্ষ ক্ষেত্র করেন প্রকাশ ॥ ৩৩

সূর্য্য.....লোক সমুদায় ।--আকাশের দৃষ্টান্তের দ্বারা ক্ষেত্রজ
আত্মার সমস্ত ও নির্লিপ্ত বৃত্তান হইল বটে, তথাপি আত্মা যদি
আকাশবৎ বিভূ বা ব্যাপক হয়, তবে তাহার সর্ষত্র ব্যাপ্তি হেতু
সর্ষঃস্বর্ষভূতী সূখদুঃখাদির অনুভব সমান হইবে এবং আমি, তুমি, সে
এইরূপ বিভাগের অভাব হইবে। আত্মা যদি মধ্য পরিণাম হয়, তবে
তাঁহা দেহের ঞ্চার নখর হইবে। পিপীলিকা-দেহে সেই দেহ-
পরিমাণ আত্মা কন্ম্ববেশে পরে হস্তির-দেহ গ্রহণ করিতে হইলে তাহার
সে দেহগ্রহণ অসম্ভব হইবে। এবং হস্তি-দেহস্থ আত্মারও কন্ম্ববেশে
পরজন্মে পিপীলিকা-দেহ গ্রহণ করিতে হইলে তাহাতে ব্যাপ্তি
অসম্ভব হইবে। আর আত্মা যদি অণুপরিমাণ হয়, তবে প্রতিদেহে
আত্মার অতি ক্ষুদ্র অংশে ব্যাপ্ত থাকায় দেহের সর্ষত্র সূখ দুঃখের
অনুভূতি তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্ত
এই শ্লোকে অণু দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মার স্বরূপ বৃত্তান হইয়াছে (কেশব)।
যেমন এক সবিতা বা আদিত্য এই সমুদায় লোকের অবভাসক
(শঙ্কর)। যেমন সূর্য্য স্বপ্রভার এই সমুদায় লোককে প্রকাশ করেন

(রামানুজ, বলদেব, স্বামী) । লোক অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় সংঘাতরূপবৎ বস্তুমাত্র সূর্য্য এই লোক সকল প্রকাশ করিয়াও প্রকাশ বস্তুর ধর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না, এবং প্রকাশ বস্তুর হেতু দ্বারা লিপ্ত হয় না (মধু) ।

ক্ষেত্রী একা সর্বক্ষেত্র করেন প্রকাশ ।—মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত (১৩ ৫-৬) সমগ্র ক্ষেত্রকে অর্থাৎ দেহকে সেই ক্ষেত্রী পরমায়া সেই-রূপ প্রকাশ করেন । সূর্য্যের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে আয়া সকল ক্ষেত্র এক, স্মৃতি স্বয়ং নির্লিপ্ত (শঙ্কর) । আমার এ ক্ষেত্র, ইহা জৈদ্ব, এইরূপে ক্ষেত্রের বাহ্য ও অন্তর, পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্বকীয় জ্ঞানে ক্ষেত্রী প্রকাশ করেন । প্রকাশ আলোক হইতে প্রকাশক সূর্য্য যেমন বিলক্ষণ, সেইরূপ এই যে বেগভূত বা জেয় ক্ষেত্র, তাহা হইতে উক্ত লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রী অত্যন্ত বিলক্ষণ (রামানুজ) । অদ্বৈত হেতু আয়া লিপ্ত হন না—ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে আকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে । প্রকাশক হেতু আয়া প্রকাশের ধর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হন না, তাহা সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু) । ক্ষেত্রী বা ক্ষেত্রজ এক হইয়াও সমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন, প্রকাশধর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন না, এবং প্রকাশের ধর্ম্ম দ্বারাও লিপ্ত হয় না (মধু) । এক ক্ষেত্রী অর্থাৎ জীব সমুদায় ক্ষেত্র অর্থাৎ আপাদমস্তক দেহকে প্রকাশ করেন, চেতনযুক্ত করেন (বলদেব) । ক্ষেত্রী আমার অংশ হেতু প্রকাশ করেন, কুৎস—অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন (বলভ) । যেমন এক অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন সূর্য্য নিজেই প্রভা দ্বারা সমুদায় লোককে প্রকাশ করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রজ ক্ষেত্রজ আয়া অণু পরিমাণ হইয়াও স্বধর্ম্মভূত জ্ঞানের দ্বারা আপাদমস্তক সমুদায় ক্ষেত্র বা দেহ প্রকাশ করেন । হে ভারত ! ক্ষেত্রজ আয়া উক্ত দোষ হেতু বিড় পরিমাণও নহেন, মধ্যপরিমাণও নহেন । আয়া যে অণু-পরিমাণ ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধ । (কেশব) ।

এ স্থলে কঠ শ্রুতির পূর্বেকৃত মন্ত্রের (৫।৯।১৩) পুনরুল্লেখ করা আবশ্যিক । যথা—

‘অগ্নির্ঘৈথেকে ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব ।

একস্তথা সর্ষভূতাস্তরাণ্মা

রূপং রূপং প্রতিক্রপো বহিষ্চ ॥

বায়ুর্ঘৈথেকে ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব ।

একস্তথা সর্ষভূতাস্তরাণ্মা

রূপং রূপং প্রতিক্রপো বহিষ্চ ॥

সূর্যো যথা সর্ষলোকস্ত চক্ষু-

র্ন লিপ্যাতে চাক্ষুর্ষৈর্বাহদোষৈঃ ।

একস্তথা সর্ষভূতাস্তরাণ্মা

ন লিপ্যাতে লোকহুঃখেন বাহুঃ ।

একো বণী সর্ষভূতাস্তরাণ্মা

একং রূপং বহুধা যঃ কয়োতি ।

তমাশ্বহং যোহনুপশ্রুস্তি ধীরা-

স্তেষাং সুখং শাস্বতং নেতরেষাম্ ॥

নিভ্যোহনিভ্যানাং চেতনশ্চেতনানাং

একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

“তমাশ্বহং যোহনুপশ্রুস্তি ধীরা-

স্তেষাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্ ॥”

এই কল্প মন্ত্রের অর্থ দুর্কোধ্য নহে । ইহা হইতে, বিশেষতঃ ইহার মধ্যে সূর্যের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, এক সর্ষগত সর্ষদেহস্থ সর্ষভূতাস্তরস্থ পরমাশ্বা সর্ষদেহকে প্রকাশ করিয়া ক্ষেত্রের নানারূপ বিধান

করিয়া, সৰ্বক্ষেত্ৰকে প্রকাশ করিয়া একইরূপকে বহুধা ভিন্ন করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন, এবং স্বয়ং অনিত্য চেতনায়ুক্ত হইয়া অনিত্য, অচেতন দেহসকলকে চেতনবৎ করিয়া, প্রতিদেহস্থ জীবতাবের অনুরূপ কামনার বিধান করেন । অথচ কোনরূপে লিপ্ত হন না । পূর্বে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান্ আপনাকে সৰ্বক্ষেত্ৰের ক্ষেত্ৰজ্ঞ বলিয়াছেন, এ স্থলে তাহাই অন্তর্ভাবে পুনরুক্ত হইয়াছে । এই উপনিষদ্পদিষ্ট তত্ত্ব গীতায় অতি স্পষ্টভাবে পরিষ্কৃত ভাষায় উপদিষ্ট হইয়াছে । শঙ্কর-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপেই এই কয়টি শ্লোক বুঝাইয়াছেন । কিন্তু বহুপুরুষবাদী রামানুজ, বলদেব, প্রভৃতি কেবল জীবা-
 ত্মাকে প্রতিদেহস্থ প্রত্যগাত্মাকে, তাহার জ্ঞেয় ক্ষেত্ৰের ক্ষেত্রী বলিয়াই বুঝিয়াছেন, এবং সমুদায় ক্ষেত্ৰের মগ্ন একই ক্ষেত্রেরই বিভিন্ন অংশ, এইরূপ বুঝিয়াছেন । এ অর্থ একান্ত অসঙ্গত স্মরণ্য গ্রহণীয় নহে । এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অর্থ প্রধানতঃ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই বুঝিতে হইবে ।

ক্ষেত্ৰক্ষেত্ৰজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষকং যে বিদূর্যাস্তি তে পরম্ ॥ ৩৪

জ্ঞানচক্ষু দ্বারা যেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের

এ প্রভেদ, আর ভূতপ্রকৃতি-মোক্ষের

তত্ত্ব জানে, সেই করে পরা গতি লাভ ॥ ৩৪

৩৪ । জ্ঞানচক্ষু দ্বারা—শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিত আত্মপ্রত্যয়রূপ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা (শঙ্কর, মধু) । বিবেক-বিষয়ক জ্ঞানাধ্য চক্ষু দ্বারা (রামানুজ, স্বামী) । বৈধর্ম-বিষয়ক প্রজ্ঞা-চক্ষুদ্বারা (বলদেব) । আলোচনা দৃষ্টি দ্বারা (বল্লভ) ।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের এ প্রভেদ ।—এই শ্লোকে সমুদায় অধ্যায়ের অর্থ উপসংহারে উক্ত হইয়াছে । যথাব্যাখ্যাত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-মধ্যে যথাদর্শিত যে অন্তর অর্থাৎ ইতরেতর বৈলক্ষণ্যবিশেষ (শঙ্কর) । উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের এই অন্তর বা বিশেষ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেক (রামানুজ) । অন্তর=ভেদ (স্বামী) । লৌকিক সৃষ্টি হেতু ভেদ (বল্লভ) । উক্ত প্রকারে পূর্বে ব্যাখ্যাত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-মধ্যে পরস্পর বৈলক্ষণ্য—জড় চেতন, সবিকার, নির্বিকার ইত্যাদিরূপ প্রভেদ (মধু) । ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ও ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরের যে প্রভেদ পূর্বে আমা কর্তৃক উক্ত হইয়াছে (বলদেব) । এই শ্লোকে এই অধ্যায়ের অর্থ ফলের সহিত উপসংহার করা হইয়াছে । এই অধ্যায়ে নিরূপিত ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ মধ্যে পরিণামী অপরিণামিরূপ বৈলক্ষণ্য জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ জনিত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ বাধ্যত্ম্য জ্ঞান দ্বারা বাহারা জানিতে পারে । (কেশব) ।

ভূতপ্রকৃতি-মোক্শের তত্ত্ব ।—ভূতগণের ও অবিষ্টালক্ষণ অব্যাক্ষাণ্য প্রকৃতি ইহাদের এবং মোক্ষণ বা অভাব গমন ইহার তত্ত্ব (শঙ্কর, মধু) । বহি দ্বারা মুক্তি হয় অর্থাৎ অমানিষাদি প্রভৃতি উক্ত-লক্ষণ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান, তাহাই মোক্ষ (রামানুজ) । ভূতগণের প্রকৃতি এবং তাহার সকাশ হইতে মোক্ষ অর্থাৎ মোক্ষের উপায় ধ্যানাদি (স্বামী) । মোক্ষ অর্থাৎ পরমার্থ তত্ত্ববিষ্টাদ্বারা অভাব গমন (মধু) । ভূতগণের প্রকৃতি সকল হইতে মোক্ষ, এবং সেই মোক্ষের সাধন অমানিষাদি (বলদেব) । ভূতগণের সম্বন্ধীয় যে সংসারোপযোগী প্রকৃতি, তাহা হইতে ধ্যানাদিরূপ মোক্ষসাধন (বল্লভ) । এই অধ্যায়োক্ত ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় । (কেশব) ।

পর্যগতি লাভ ।—পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, আর দেহ গ্রহণ করে না (শঙ্কর) । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-মধ্যে বিবেকবিষয়ক উক্ত প্রকার

জ্ঞানের দ্বারা তাহাদের মধ্যে বিবেক বা পার্থক্য আনিয়া ভূত-প্রকৃতি মোক্ষোপায় অমানিষাদি-সাধন-নিষ্ঠ ও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিবেক বিজ্ঞানবান্ সর্ব অনর্থনিবৃত্তি দ্বারা পরমপুরুষার্থ লাভ করে (রামানুজ, মধু) । পরমপদ প্রাপ্ত হয় (নামী) । পরমার্থবস্তুস্বরূপ চৈতন্য (মধু) । প্রকৃতি হইতে 'পর' সর্বোৎকৃষ্ট পরমব্যোমাধ্য মৎপদ প্রাপ্ত হয় (বলদেব) । অমানিষাদি জ্ঞাননিষ্ঠা হেতু ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ যথার্থ বিজ্ঞান দ্বারা সর্বানর্থনিবৃত্তি পূর্বক পরিপূর্ণ পরমানন্দাবির্ভাবলক্ষণ পুরুষার্থসিদ্ধি হয় (গিরি) । পর অর্থাৎ মোক্ষ (বলভ) । তাহারা অশেষ অবিষ্টা হইতে নিবৃত্তিলাভ করে ও প্রকৃতি-বিযুক্ত হইয়া শুদ্ধ আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় । (কেশব) ।

জ্ঞানচক্ষু ।—যে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন দ্বারা পরাগতি লাভ হয়, তাহাই সংক্ষেপে এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । সেই তত্ত্বজ্ঞানার্থ— প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান ও ভূতপ্রকৃতি-মোক্ষ-জ্ঞান । জ্ঞানচক্ষু দ্বারা এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন করিলেই শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয় । জ্ঞানচক্ষু—অর্থাৎ শাস্ত্রদৃষ্টি । শাস্ত্র-জ্ঞান হইতে যে দর্শন বা অপরোক্ষানুভূতি সিদ্ধ হয়, তাহারই ফলে জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষ হয় । ইহা যোগজ দৃষ্টি বা দিব্য দৃষ্টি নহে (১১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । 'সোহহং' এই শাস্ত্রহইতে ইন্দ্রিয় এবং ঋষি-বাঁদেব, এবং ভক্তির চরম অবস্থার উপাত্ত উপাসকে অভেদভাবনা-ফলে প্রহ্লাদ—ইহারা 'আমি স্রষ্টা ঈশ্বর, আমি সূর্য্য, আমি চন্দ্র, আমি ইন্দ্র, আমি এ সমুদ্র, আমাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান' এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন । বেদান্তদর্শনে (১'১'৩০) সূত্রে আছে, "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু উপদেশঃ বামদেববৎ" 'জীবও ব্রহ্মানুভূতি হইয়া আপনাকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করিতে পারে । তবে এই দৃষ্টিশাস্ত্রজনিত । ইহা 'শাস্ত্রযোনি' (বেদান্তদর্শন, ১।১।৩) । এই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, সূত্রবাং দিব্যদৃষ্টিরও বিষয় নহে । এ দৃষ্টি শাস্ত্রের উপদেশফলে

জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে, নিশ্চল জ্ঞানে অপরোক্ষ অনুভূতিরূপে সিদ্ধ হয় ।

মোক্শ—প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক, বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বারা পুরুষের বা আত্মার স্বরূপ জানিয়া, যে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত, সর্বগত, সর্বভূতানু-রাত্মা, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার এক ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে নিশ্চল জ্ঞানে দর্শন করা যায় । সেই প্রকৃতি-পুরুষের বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ আমরা পূর্বে বিশেষরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । ভূত কাহাকে বলে, এবং ভূত-প্রকৃতি কাহাকে বলে, তাহাও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । পরা ও অপরা-প্রকৃতি সর্বভূতযোনি । সেই ক্ষেত্রে পরমেশ্বরে আত্মারূপ বীজ নিষেক করিলে, তবে সকল প্রকার মুক্তির বা সত্তার উদ্ভব হয়, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ তত্ত্ব পরে চতুর্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । কিরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে সর্বসত্তার উদ্ভব হয়, কিরূপে গণ্ড রজঃ ও তমো লক্ষণ ভূতপ্রকৃতি দ্বারা পুরুষ প্রতিক্ষেত্রে বদ্ধ হয়, এবং কিরূপে সেই ত্রিগুণরূপা প্রকৃতির বন্ধন হইতে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করে, তাহা পরের অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন । তবে মোক্ষের কথা এ স্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে ।

মোক্শ কাহাকে বলে, তাহা পূর্বে বিবৃত হয় নাই । গীতার পূর্বে ‘জরামরণমোক্শ’ উক্ত হইয়াছে (৭।২৯) । সে স্থলে মোক্ষ অর্থে জরামরণ হইতে মুক্তি । গীতার অন্তর্ভুক্ত আছে,—বন্ধং মোক্ষং বা বেত্তি । (১৮।৩০) । সেখানেও মোক্ষ অর্থে জন্মমূতারূপ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি । গীতার অন্তর্ভুক্ত আছে,—“মোক্শ্যসে অশুভাৎ” (৪।১৬) ও ‘মোক্শ্যসে কশ্ম-বন্ধনৈঃ ।’ (৯।২৮) খেতাখতর উপনিষদে আছে, সেই বিশ্বকর্তাই সংসার-মোক্শ-স্থিতিবন্ধ হেতু (৬।১৩) । এ স্থলেও মোক্ষ অর্থে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি । অতএব এ স্থলে ভূতপ্রকৃতিমোক্শ বলিয়া যে মোক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এই মুক্তি,—এই ভূতপ্রকৃতিতে

আত্মা আপনার বহুভাব অবিষ্টা হেতু বোধ করে, তাহা হইতে মুক্তি, অর্থাৎ আপনার পরমাশ্রয়রূপ জানিলে মুক্তি। অতএব এ স্থলে শঙ্কর ও মধু কেন অর্থ করিলেন যে, মোক্ষ অর্থে মোক্ষণ বা অভাব গমন এবং রামানুজ, স্বামী ও বলদেব কেন অর্থ করিলেন যে, এই মোক্ষ অর্থে মোক্ষের সাধন অমানিষাদিলক্ষণ জ্ঞান, তাহা বুঝা যায় না। মোক্ষ অর্থে যদি অভাব গমন হয়, তবে বৌদ্ধের শূন্যবাদ আসিয়া পড়ে। সুতরাং এ স্থলে মোক্ষ অর্থে এই মোক্ষের তত্ত্ব।

অধ্যায়োপসংহার।—তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনরূপ জ্ঞানের বা জ্ঞানচক্র বিকাশ করাইবার জন্তু এবং তাহার ফলে সংসারনিবৃত্তি বা নিঃশ্রয়সিদ্ধি করাইবার জন্তু গীতার এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী কল্প অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইয়াছে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে এই তত্ত্বজ্ঞান, ইংরাজীতে যাহাকে Philosophy বা Metaphysics বলে তাহারই সার। কোন পাশ্চাত্য দর্শনে এই তত্ত্বজ্ঞান এরূপ সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণভাবে উপদিষ্ট হয় নাই। আমাদের দেশের কোন শাস্ত্রেও এরূপ ভাবে এই তত্ত্বজ্ঞান কোথাও সংগৃহীত হয় নাই। এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ বুঝা অত্যন্ত কঠিন। এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অর্থ গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেরই বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। যে সম্প্রদায়ের ধারণা মত, সেই মতানুসারে সেই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্তু মতবিশেষ অনিবার্য্য হইয়াছে। আমরা এই সমস্ত বিভিন্ন মত আলোচনা করিয়া ষথাসাধ্য এই অধ্যায়ের অর্থ বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। মূলের স্তায় এ ব্যাখ্যাও অনেক স্থলে পুনরুক্তি আছে। সে পুনরুক্তি অপরিহার্য্য; বিশেষতঃ তুর্কোধ্য দার্শনিক তত্ত্ব সকল বুঝিবার জন্তু এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসার্থ এই পুনরুক্তিরও প্রয়োজন। এইরূপ পুনরুক্তি ও বিস্তার সঙ্গেও অনেক স্থলে অনেক তত্ত্ব

তর্কোপাধি বহিষ্ণা গিয়াছে। অতি বিস্তার ভয়ে সে সকল স্থান আর সুবোধ্য কবিত্তে পারা যায় নাই। সকল স্থলেও যে আমরা বুঝিয়াছি, ইহাও বলিতে পারি না। হয় ত একত্র অনেক স্থলের অর্থ অপরিষ্কৃত ও অসংগত হইয়াছে। তাহা অপরিহার্য।

পূর্বে বলিয়াছি যে, এই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত বিষয়—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-তত্ত্ব, জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব, আত্মদর্শনের উপায়, স্বাবাসনাসনাত্মক সর্গ সঙ্কারণ, উৎপত্তিতত্ত্ব, ভূততত্ত্ব, সর্গভূততত্ত্ব পরমেশ্বরতত্ত্ব, ভূত প্রকৃতিমোক্শতত্ত্ব। এ অধ্যায়ে যে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, সেই জ্ঞান কি, তাহা বুঝাইয়া ভগবান সেই জ্ঞানের রূপে যাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞানার্গদর্শন, সেই তত্ত্বজ্ঞান সংক্ষেপে উপদেশ দিয়াছেন। বলিয়াছি তত্ত্বজ্ঞানার্গ দর্শন করাইবার জন্য এই অধ্যায়ে এই সকল মূলতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। এই তত্ত্ব সকলের মধ্যে প্রধান দশতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, জীব ও প্রকৃতির সম্বন্ধতত্ত্ব এবং জীব ও ঈশ্বরে সম্বন্ধতত্ত্ব। এ অধ্যায়ে যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজতত্ত্ব বা পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে, এই সকল তত্ত্ব তাহারই অন্তর্গত। জ্ঞান যখন এই সকল তত্ত্বদর্শনরূপ হয় তখন ব্রহ্ম তাহার জ্ঞেয় হন। ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধি হইলেই পরমমুক্তি লাভ হয়। এই জন্য এই অধ্যায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে যে সকল তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ বিহীনভাবে ব্রহ্মসূত্রপদের বর্তমান গ্রন্থ মূল উপনিষদে পাওয়া যায়। গীতার ইহা উক্ত হইয়াছে—

“ঋষিঃশির্ষল্লখা গীতং ছন্দোভির্বিবিষ্টৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥” (১৩৪)

অতএব যাহারা এই ব্রহ্মতত্ত্ব, পুরুষতত্ত্ব, প্রকৃতি বা ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রভৃতি বিশেষভাবে জানিতে চাহেন, তাহারা উক্ত ব্রহ্মসূত্রাদি প্রভৃতি হইতে অর্থাৎ উপনিষদ হইতে ইহা প্রধানতঃ জানিতে পারেন। আমরা এই

অধ্যায় প্রয়োজনমত উপনিষদের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া এই সকল তত্ত্ব
 বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । যাহারা উপনিষদ্ আলোচনা করেন নাই,
 তাহারা আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে যাহা অধকারী হইয়া থাকেন,
 বিশেষতঃ যদি আধুনিক জার্মান দার্শনিক ক্যান্ট, হেগেল, মেলিঞ্জক্কে,
 মপেনহের্জ, লাইবনিজ প্রভৃতির ও স্পাইনোজার প্রতিপাদিত দর্শনশাস্ত্রে
 বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া থাকেন এবং যদি হেগেলের জ্ঞানধর্মের ব্রহ্মতত্ত্ব
 (The absolute reason) এবং তাঁহার মতে এই জীব ও জড়স্বর্গের
 বিস্তারের তত্ত্ব বুঝিয়া না যান, তবে তাহাদের পক্ষে এই অধ্যায়ের তত্ত্ব
 সকল বুঝিতে কষ্ট হইবে না । অত্যাধিকার্য ভিন্ন আমবা এই সকল
 দার্শনিক পাণ্ডুগণের অসমত উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায়ের কোন
 তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি নাই । বসন্তেও গীতার এই অধ্যয়ে উপনিষদ্
 পাদপট্ৰ ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে । একত্র উপনিষদ্ অবগম্বন করিয়াই এই
 ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । মন্ত্র হোন মতের অবতারণা বা
 আলোচনা করি নাই । তবে স্থানে স্থানে উক্ত দার্শনিক পাণ্ডুগণের
 মতের ইঙ্গিত করিয়াছি মাত্র । জিজ্ঞাসু পাঠক তাহা দেখিয়া সহবেন ।



গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় শেষ হইল । এই অধ্যায়ের নাম কেন্দ্র-কেন্দ্রজ-বিভাগ যোগ । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“কেন্দ্রকেন্দ্রজয়োজ্ঞানং যন্তজ্জ্ঞানং যতং মম ।” (১৩।২)

এই কেন্দ্র-কেন্দ্রজ-জ্ঞানই প্রধানতঃ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এই অধ্যায় গীতার তৃতীয় বটকের প্রথম অধ্যায় । গীতার প্রথম বটক বা প্রথম ছয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব ও কর্মযোগ প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে । এই প্রথম বটকে সে জন্ম গীতার Psychology ও Ethics বিভাগ বলা যায় । গীতার দ্বিতীয় বটকে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিব্যোগ বিবৃত হইয়াছে । ইহাকে গীতার Theology ও Religion অংশ বলা যায় । সেইরূপ এই তৃতীয় বটকে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন বিবৃত হইয়াছে । ইহাই গীতার প্রকৃত দর্শন অংশ । ইহাকে Philosophy ও Metaphysics বিভাগ বলা যায় । এ অধ্যায়ের আরম্ভে এ কথা বিবৃত হইয়াছে ।

তত্ত্বজ্ঞানের যাগ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানার্থ, যাহা দ্বারা এই তত্ত্বজ্ঞানের অপরোক্ষ দর্শন সিদ্ধ হয়, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন : এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন সিদ্ধ হইলে যে ফল হয়—তাহাকেও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন বলে । এই জন্ম গীতার এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনকে জ্ঞানের স্বরূপ বলা হইয়াছে । শুধু ইহা জ্ঞানের এই অধ্যায়োক্ত বিংশতিরূপ জ্ঞানের একটি রূপ মাত্র নহে । ইহাই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান । এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ বা তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে কেন্দ্র-কেন্দ্রজ-জ্ঞানই প্রধান । তাহা ভগবান্ উক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন । পরে চতুর্দশ অধ্যায়ে পুনর্বার এই কেন্দ্র-সম্বন্ধীয় ত্রিগুণ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং কেন্দ্র-কেন্দ্রজযোগে জীবের উৎপত্তি ও কেন্দ্রের ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা কেন্দ্রজ জীবের বন্ধন উক্ত হইয়াছে । সেই জ্ঞানকে ভগবান্ “জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্” (১৪।১) -বলিয়াছেন । পঞ্চদশ অধ্যায়েও

এই তত্ত্বজ্ঞান জীবের সংসারবন্ধন, মুক্তি ও পুরুষোত্তমতত্ত্ব উপদেশ করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন,—ইহাই শুভতম শাস্ত্র (১৫।২০)। এইরূপে ভগবান্ এই তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বার বার উপদেশ দিয়াছেন ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব ।—এই তৃতীয় ষট্‌কের প্রথম তিন অধ্যায়ে অর্থাৎ এই ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বজ্ঞান প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে । পরের তিন অধ্যায়ে ইহার মধ্যে ক্ষেত্র-সম্বন্ধীয় ত্রিগুণতত্ত্বের বিস্তার করা হইয়াছে । এইরূপে এই তৃতীয় ষট্‌কে যে, তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন বিবৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম ও প্রধান—এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান । এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান ও সাংখ্য-দর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষজ্ঞান এক অর্থে একই । সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান হইতেই পরমপুরুষার্থ সিদ্ধি হয়—সর্ব্বহঃশ্চের একান্ত নিবৃত্তি হয়—কৈবল্য-মুক্তি হয় । প্রকৃতি হইতে ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয়—ক্ষেত্র প্রকৃতিরই পরিণাম । আর যিনি পুরুষ—তিনি এই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হন । এই জ্ঞান প্রকৃতিপুরুষজ্ঞানই—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান ।

ভগবান্ অতি সংক্ষেপে প্রথমেই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে, তাহা বলিয়া দিয়াছেন । এই শরীরই ক্ষেত্র । আর ক্ষেত্রকে যে জানে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ । ক্ষেত্রজ্ঞ—জ্ঞাতা, আর ক্ষেত্র—জ্ঞেয় । ক্ষেত্রজ্ঞমধ্যেও বিশেষ আছে । যিনি বা যে পুরুষ ব্যাষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা, তিনি সেই বিশেষ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, আর যিনি সর্ব্ব-ক্ষেত্রের জ্ঞাতা—নিরস্তা—তিনি পরমেশ্বর । পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি ব্যাষ্টি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ—তিনি ক্ষর পুরুষ, আর যিনি সমষ্টিভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি পুরুষোত্তম পরমেশ্বর । অতএব ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব জানিতে হইলে, ব্যাষ্টি ক্ষেত্রবদ্ধ ক্ষরপুরুষতত্ত্ব, ব্যাষ্টি-ক্ষেত্র-যুক্ত পুরুষতত্ত্ব, আর সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ উত্তম-পুরুষতত্ত্ব বুঝিতে হয় । সেইরূপ

ক্ষেত্রতত্ত্ব বৃত্তিতে হইলে, সেই ক্ষেত্রের ষাড়া উপাদান ও ষাড়া কারণ, সেই প্রকৃতিতত্ত্বও বৃত্তিতে হয়। অর্থাৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজতত্ত্ব বৃত্তিতে হইলে, সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ ঈশ্বরতত্ত্ব, বাষ্টিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ জীবতত্ত্ব এবং সমষ্টি ক্ষেত্ররূপ জগৎ-তত্ত্ব ও বাষ্টি-ক্ষেত্ররূপ জীব-শরীরতত্ত্ব সমূহ বৃত্তিতে হয়। ইহাই দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রসিদ্ধ বিষয়—

“জীবতত্ত্বং জগত্তত্ত্বং ঈশ্বরতত্ত্বং তৃতী কন্ম ।

স্থিতৈকাদশতন্ত্রেষু তত্ত্বছাত্ত্ব্যা নিরুপিতম্ ॥”

অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি—উপসংহার ।

ইহাই দর্শনশাস্ত্রের সাধারণ প্রতিপত্ত্ব বিষয়। কিন্তু ইহাই শেষ মর্মে এই তিন তন্ত্রকে এক অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বমধ্যে দর্শনই জ্ঞানের শেষ—দর্শনের শেষ, ইহাই বেদান্ত। এছাড়া উক্ত বৈদ্য-ব্রহ্মসিদ্ধিতে উক্ত তত্ত্ব আছে,—

“পশ্চাৎ বেদান্তসদ্যুক্ত্যা অদ্বৈতশ্রুতিমানন্তঃ ।

অদ্বয়ং ব্রহ্ম সংসিদ্ধং বৈদ্যশ্রুতিসরঃ কুঃ ॥”

যাহা হউক, এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-জ্ঞানই যে জ্ঞান,—ইহাই যে সর্ব জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তাহা আমরা ইহা হইতে বৃত্তিতে পারি।

আমরা বলিমাছি যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-জ্ঞানই সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি পুরুষ-বিবেকজ্ঞান। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে। সাংখ্যদর্শনে অনুসারে পুরুষ বদ্ধ—তন্মধ্যে কতক বদ্ধ ও কতক মুক্ত। বদ্ধ পুরুষই প্রকৃতিবদ্ধ থাকে, পরে পুরুষ প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান লাভে প্রকৃতিবদ্ধ হইতে মুক্ত হয়। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই। পাতঞ্জলদর্শনে পুরুষবিশেষ ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শনে অনুসারে এই পুরুষবিশেষ ঈশ্বর—বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন। কিন্তু গীতায় উত্তম পুরুষ যে সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ পরমেশ্বর, তিনি স্বরূপতঃ বদ্ধ বা মুক্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন নহেন, এ তত্ত্ব যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

এ ক্ষেত্রে সঙ্গত আর এক কথা বুঝতে হবে। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণের মতে যিনি প্রতিক্ষেত্রে স্বেচ্ছা, তিনি স্বয়ং পুরুষ হইলেও তিনি পরা প্রকৃতি। ভগবান্ পূর্বে যে বলিয়াছেন, উহার দুই প্রকৃতি ;—এক চেষ্টা অপরা প্রকৃতি আর এক পরা প্রকৃতি। সেই পরা প্রকৃতিই এই ক্ষেত্রে জীব। আর অপরা প্রকৃতি ক্ষেত্র, পরা প্রকৃতিই জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, এই অর্থ সঙ্গত নহে। পরা প্রকৃতি এই ক্ষেত্রে হইতে পারে না। ক্ষেত্রে পুরুষ পরা প্রকৃতি হইলে, সাংখ্যদর্শনে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান নিরর্থক হয়। আর গীতা অসংসৃত পরা এবং অপরা প্রকৃতি উভয়েই ভূতায়ান মাত্র। গীতায় উক্ত প্রকৃতির বীজ প্রদ পিতা। সুতরাং পরা প্রকৃতি জীবভূত হইয়া পরা প্রকৃতি ক্ষেত্রে জীবভূত হইবে। আর ব্যক্তি ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা হইয়া প্রকৃতি বলিলে, তাহার সহিত সকক্ষেত্রে স্বেচ্ছা হইলে স্বেচ্ছা হইতে হয়, সে ভেদের সীমাংসা হয় না। কোনরূপ স্বয়ং প্রকৃতি থাকে না। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, গীতায় পরা প্রকৃতি বৈদ্যোক্ত প্রাণ। উহাই জীবভূত হয়। এটি প্রাণই মুখ্যতঃ। এটি মূল প্রাণেরই বৃত্তি প্রাণ, অপান, সমান প্রভৃতি পঁচ প্রকার বৃত্তি সমন্বিত নহু প্রাণও স্বীকৃত হয় নাই। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুক সামান্য বস্তুও বলা হইয়াছে মাত্র। অতএব সাংখ্যদর্শন অনুসারে অর্থ করিতে হইলে, এই পরা প্রকৃতিকে প্রাণ না বোঝা চেতনা (consciousness) বলিতে হয়। পুরুষ-সম্মিথানে চিত্তদ্বারে চেতনার আভির্ভা হয়। এটি চেতনাই (consciousness) পরা প্রকৃতির স্বরূপ। চণ্ডীয়া উক্ত হইয়াছে,—

“চিত্তরূপেণ বা কুৎসমেতদ্ব্যাপ্য হিতা জগৎ।”

এই চেতনার দ্বারা জগৎ বিদ্যুত। তাই গীতার উক্ত হইয়াছে যে, পরা প্রকৃতি জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে (গীতা ৭৫)। যাহা হউক,

বেদান্ত অনুসারে এ স্থলে পরা প্রকৃতিকে প্রাণ বলাই অধিক সমত ।
চেতনার স্তার প্রাণও ক্ষেত্রের উপাদান ।

বাহ্য হউক, এইরূপে ভগবান্ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-তত্ত্ব সংক্ষেপে প্রথম ও দ্বিতীয়
শ্লোকে বুঝাইয়া, পরে সংক্ষেপে এই ক্ষেত্র কি, তাহা তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ
শ্লোক পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন । ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্রই
শরীর । ইহার প্রধান উপকরণ পঞ্চ মহাত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত ।
ইহাই গীতাক্ত অষ্টধা অপরা প্রকৃতি ও সাংখ্যাক্ত প্রকৃতি-বিকৃতি ।
আর ইহার অপর উপকরণ মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থলতত্ত্ব—ইহাই
সাংখ্যাক্ত প্রকৃতির বিকৃতি । উক্ত অষ্টধা প্রকৃতি-বিকৃতি ও মন, ইন্দ্রিয়-
গণ লিঙ্গশরীরের উপকরণ আর পঞ্চ স্থলতত্ত্ব স্থল শরীরের উপকরণ ।
প্রকৃতি হইতে পরিণত প্রকৃতি-বিকৃতি যে বুদ্ধি, মন ও পঞ্চ মহাত্ত (বা
তন্মাত্রা) এবং এই প্রকৃতি-বিকৃতি হইতে পরিণত কেবল বিকৃতি যে-মন,
দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থলতত্ত্ব—এই ঘোড়ণ বিকৃতি—সর্বত্র প্রকৃতির
পরিণাম এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব ও প্রকৃতি—ইহাই এই ক্ষেত্রের উপকরণ ।
এই পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত । গীতার ইহা ব্যতীত ইচ্ছা,
বেষ, সূখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, ধৃতি,—ইহাদিগকে এই ক্ষেত্রের উপকরণ
বলা হইয়াছে । সাংখ্যদর্শন অনুসারে চেতনা—স্বপ্নশরীরে পুরুষের
চৈতন্যের প্রতিবিম্ব মাত্র । তাহা স্বতন্ত্র ভাবে গৃহীত হয় নাই । ধৃতি
যে প্রাণশক্তি, তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । সাংখ্যদর্শন
অনুসারে তাহা করণের অর্থাৎ অস্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণের সামান্ত্য বৃত্তি ।
সংঘাত—স্থলশরীর-সমবায় শক্তি । ইচ্ছা, বেষ, সূখ, দুঃখ ইহারা অস্তঃ-
করণের ত্রিগুণজ ভাব হইতে উৎপন্ন । ইহারাই ক্ষেত্রের বিকারের কারণ ।
ভগবান্ সবিকার ক্ষেত্রতত্ত্ব বিবৃত করিবার প্রসঙ্গে এই ইচ্ছা-বেষাদির
উল্লেখ করিয়াছেন—এবং ইহাদিগকে সবিকার ক্ষেত্রের উপকরণ
বলিয়াছেন ।

এই ক্ষেত্র ও তাহার বিকার বৃদ্ধিতে হইলে, এবং এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রক্ষেত্র
কিরূপে বদ্ধ হন, তাহা বৃদ্ধিতে হইলে, সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণ-তত্ত্ব বৃদ্ধিতে
হয় । ভগবান্ তাহা চতুর্দশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের কতক দূর
পর্যন্ত বুঝাইয়াছেন, সে স্থলে এই ত্রিগুণের ভাব দ্বারা ক্ষেত্র কিরূপে
বৃদ্ধিত হইয়া ক্ষেত্রজ পুরুষকেও বৃদ্ধিত করে, তাহা বিবৃত হইয়াছে ।
নবিকার ক্ষেত্র এ স্থলে 'সমাসে' বা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে মাত্র । পরে
এই তত্ত্ব বিস্তারিত হইয়াছে । আমরা এই কয় শ্লোকে উক্ত ক্ষেত্রের
উপকরণের অর্থ যথাস্থানে বৃদ্ধিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে তাহার
পুনরুল্লেখ নিম্নয়োক্তন ।

এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগ সীতার এক বিশেষত্ব; পূর্বে দ্বিতীয়
অধ্যায়ে যে দেহ-দেহী বা শরীর-শরীরী বিভাগ উক্ত হইয়াছে, তাহাই
এ স্থলে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ নামে অভিহিত হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত
হইয়াছে,—

“দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কোমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপার্শ্বগীরন্তজ ন মুহতি ॥” ২।১৩

আরও উক্ত হইয়াছে যে—

“অস্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যাস্তোক্তাঃ শরীরিণঃ ।”

এই দেহী ক্ষেত্রজ । কিন্তু 'ইমে দেহাঃ' আমাদের স্থূল শরীর ।

ইহাঃ বিনাশী । মৃত্যুতে ইহার বিনাশ হয় এবং পরে ইহার আবার সুসদেহ
গ্রহণ হয় ; কিন্তু ক্ষেত্র এইরূপ বিনাশী নহে । ক্ষেত্রের যে উপাদান
এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, মৃত্যুতে তাহার বিনাশ হয় না । মৃত্যুতে
স্থূল বা কারণ-শরীরের বিনাশ হয় না, কেবল স্থূল পার্শ্বভৌতিক
শরীরেরই ধ্বংস হয় । পরে ১৫শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃষষ্ঠানৌল্লিঙ্গাণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যাক্রামতীর্থরঃ ।

গৃহীত্বৈতান্‌ন সংযাতি বায়ুর্গন্ধনিবায়মাৎ ॥” ১৫।৭,৮

ইহা হইতে জানা যায় যে, মৃত্যুতে স্থূলশরীরেরই ধ্বংস হয়; কিন্তু শরীরের যে উপাদানের কথা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহার ধ্বংস হয় না। তাহা আমোক্ষ-হায়ী। যতদিন ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ-সংযোগ থাকে বা পুরুষ-প্রকৃতিঃক থাকে, ততদিন তাহার ধ্বংস হয় না। আর মৃত্যুতে স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহের ধ্বংস হইলেও, যাহা সূক্ষ্ম পাঞ্চভৌতিক দেহ, তাহার বিনাশ হয় না। এই সূক্ষ্ম পাঞ্চভৌতিক দেহের নাম আতিবাহিক দেহ। বেদান্ত-দর্শনে ‘অতিবাহিকসুহৃৎস্বাৎ’ এই সূত্রে ইহা বিবৃত হইয়াছে। মৃত্যুর পর এই অতিবাহিক বা সূক্ষ্ম ভৌতিক দেহ অবলম্বনে প্রেতাস্থার গতি হয়। সে তৎ এ স্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা বলিয়াছি যে, এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগ গীতার এক বিশেষত্ব। এই বিভাগ পূর্বে কোথাও বিশেষভাবে বিবৃত হয় নাই। কিন্তু ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র যাহা, যে প্রকার, যে বিকারী এবং ক্ষেত্রজ যে প্রকার ইত্যাদি তৎ পূর্বে ঋষিগণ দ্বারা বিবৃত হইয়াছে—

“ঋষিভিবহুধা গীতং ছন্দোতিবিবর্ধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপট্টশৈব হেতুমন্তুবিনিশ্চিতৈঃ ॥” ১৩।৪

অথচ আমরা বেদ-সংহিতায় বা প্রচলিত ব্রহ্মসূত্র পদে কোথাও এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাই না। প্রামাণ্য উপনিষৎগুলির মধ্যে কেবল শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দুইটি মন্ত্রে এ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ নাম পাওয়া যায়। সে দুইটি মন্ত্রে এই—

“একৈকং জালং বহুধা বিকূর্ব-

য়স্মিন্‌ ক্ষেত্রে সংহরত্যেব দেষঃ” ১৫।৩

“প্রধান-ক্ষেত্রজ-পতিশু পৈশঃ

সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥” ৩।১৬

ইহা ব্যতীত আর কোথাও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগের উল্লেখ নাই । তবে ভগবান কেন বলিয়াছেন যে, পূর্বে ঋষিগণ দ্বারা বিবিধ ছন্দ এবং ব্রহ্মসূত্র পদে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে । ইহার হেতু এই বোধ হয় যে, ক্ষেত্রজ যিনি এবং ক্ষেত্র বাহা, সেই তত্ত্ব অন্ত নামে ঋগ্বেদে বিবৃত হইয়াছে । যিনি ক্ষেত্রজ, তিনি আত্মা, তিনিই পুরুষ, তিনিই ব্রহ্ম । ঋগ্বেদে নানাস্থলে নানাভাবে এই আত্মতত্ত্ব, পুরুষ-তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে ।

‘অয়ং আত্মা ব্রহ্ম,’ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি,’ ‘সোহহং,’ ‘আত্মৈব ইদম আসীৎ পুরুষাবধঃ’ ইত্যাদি মহাবাক্যে ঋগ্বেদে এই ক্ষেত্রজ-তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে । সেইরূপ ক্ষেত্র বা দেহের বিবরণও ঋগ্বেদে পাওয়া যায় । তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে যে, আমাদের দেহে পাঁচটি কোষ আছে, যথা,—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ । এই অন্নময় কোষই আমাদের পঞ্চভৌতিক সূক্ষ্ম শরীর । প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষই আমাদের সূক্ষ্মশরীর এবং আনন্দময় কোষই আমাদের কারণ-শরীর । কারণ-শরীরের উপাদান অবাকু বা মূলপ্রকৃতি, ইহাই মায়া । সূক্ষ্মশরীরের উপাদান বেদাস্তমতে প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান, আর সাংখ্যমতে বুদ্ধি, অহঙ্কার মন এই তিন অস্তুরকরণ এবং দশ ইন্দ্রিয় বা বহিঃকরণ এই ত্রয়োদশ করণ, এবং এই ত্রয়োদশ করণের সামান্ত বৃত্তি পঞ্চ প্রাণ এবং পঞ্চ উন্মাত্র বা বেদাস্ত অন্তসারে পঞ্চ মহাভূত । এইরূপে আমরা বেদাস্ত ও সাংখ্য-শাস্ত্র হইতে এই দেহের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারি । যোগ হটক, গীতায় এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-তত্ত্ব এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইলেও এই তৃতীয় ঘটকে তাহার যে বিবরণ আছে, সেইরূপ বিস্তৃত বিবরণ আর কোথাও পাওয়া যায় না; বলিয়া মনে হয় ।

একণে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগের মূল তত্ত্ব আমাদের বৃত্তিতে

হইবে । যখন আমাদের বুদ্ধিতে বৃত্তিজ্ঞানের বিকাশ হয়, তখন ‘আমি ইহা জানিতেছি’ জ্ঞান এইরূপ আকার ধারণ করে অর্থাৎ জ্ঞান ‘জাতা অহং’ এবং ‘জ্ঞেয় ইদং’ এই দুই ভাবে বিভক্ত হইয়া যায় । আমাদের বৃত্তিজ্ঞান এই ‘জাতা অহং’ এবং ‘জ্ঞেয় ইদং’ সর্ব অবস্থায় এই দুইয়ের সমষ্টিমাত্র । এক ভাবে দেখিলে এই অহং-ইদং জ্ঞান ‘জাতা অহং’ ‘জ্ঞেয়ং ইদং’ ‘কর্তা অহং’ ‘কার্য্যং ইদং’ এবং ‘ভোক্তা অহং’ ‘ভোগ্যং ইদং’ এই তিন ভাগে বিভাগ করা যায় । কিন্তু ‘ভোক্তা অহং’ ও ‘কর্তা অহং’ ইহা এক অর্থে ‘জাতা অহং’এর অন্তর্ভূত, এবং ‘ভোগ্যং ইদং’ ও ‘কার্য্যং ইদং’ ‘জ্ঞেয়ং ইদং’এর অন্তর্গত । একত্র ‘জাতা অহং’ ও ‘জ্ঞেয়ং ইদং’ সামান্ততঃ জাতা ও জ্ঞেয় এই দুই বিভাগই বধেট । শঙ্কর জ্ঞানের এই দুই বিভাগই গ্রহণ করিয়াছেন । তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । কোথাও তিনি অহং বা ইদং বা হং কোথাও বা আত্মা ও অনাত্মা এই বিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন । ‘বেদান্ত-পরিভাষায়’ প্রমাতৃ চৈতন্য ও প্রমের চৈতন্য এই বিভাগ গৃহীত হইয়াছে । সাংখ্যদর্শনে জ্ঞানের এইরূপ বিভাগ উক্ত হয় নাই বটে, কিন্তু পুরুষ-প্রকৃতি এই বিভাগই গৃহীত হইয়াছে এবং পুরুষকে চেতন জ্ঞ-স্বরূপে এবং প্রকৃতিকে অচেতন জড়রূপে গৃহীত হইয়াছে ।

যাহা হউক, জ্ঞানের জাতা ও জ্ঞেয় এই দুই বিভাগ সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, যাহা জ্ঞেয়, তাহা জাতা হইতে পারে না এবং যাহা জাতা, তাহা জ্ঞেয় হইতে পারে না । এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন—“জ্ঞেয়ের ধর্ম্ম জাতায় ও জাতার ধর্ম্ম জ্ঞেয়ে আরোপিত করা অবিদ্যার কার্য্য ।” * * “যাহা জ্ঞেয়, তাহা কখন আপনার দ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারে না ; তাহার নিজের প্রকাশের জন্য আত্মব্যতিরিক্ত প্রকাশের অপেক্ষা করিয়া থাকে । আর জাতা স্বপ্রকাশ, নিজের প্রকাশের জন্য অন্য কাহারও বা কিছুই অপেক্ষা রাখে না ।”

যদি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া, আর এক জন জ্ঞাতার কল্পনা করিতে হয় । জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ—জ্ঞানের বিষয় হইলে, তাহার আশ্রয় বলিয়া আর একটি জ্ঞাতার কল্পনা করিতে হয় । এইরূপ ভাবে জ্ঞাতৃত্ব-কল্পনার শেষ পাওয়া যায় না ; সুতরাং অনবস্থা দোষ হয় । যদি অবিদ্যা কেবল জ্ঞেয়ই হয়, জ্ঞাতার সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে জ্ঞাতা কেবল জ্ঞাতাই হইবে, জ্ঞেয় হইতে পারিবে না । সুতরাং অবিদ্যা ও তৎকার্য্য দ্বারা কেন্দ্রজ আত্মা কোন প্রকারে দূষিত হইতে পারে না ।” বেদান্ত-দর্শনের জ্ঞাতার উপক্রমণিকার শব্দর যে অধ্যাসবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ ‘অহং’ ও ‘ঐৎ’ বা ‘ইদং’ এই বিভাগ সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলিয়াছেন । “ইদং অর্থাৎ ইদম্ ; অস্মদ্ অর্থাৎ অহং । ‘ইদং’ বা ‘এই’ এতদ্রূপ জ্ঞানের আশ্রয় বা আলম্বন অনেক ; কিন্তু ‘অহং’ ‘আমি’ এতদ্রূপ জ্ঞানের আশ্রয় বা গোচর এক । দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও প্রত্যেক বাহুবস্তু,—সমস্তই ইদং প্রত্যয়-গোচর—‘এই’ বা ‘ইহা’-বলিবার যোগ্য অথবা ‘এই’ এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয় । কিন্তু আত্মা অস্মদ্ শব্দের গোচর ও ‘অহং’ ‘আমি’ এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ অহং জ্ঞানের আলম্বন বা আমি বলিবার যোগ্য । যাহা ইদং জ্ঞানের জ্ঞেয়, তাহা বিষয় এবং যাহা অহং জ্ঞানের জ্ঞেয় তাহা বিষয়ী । চিৎস্বভাব আত্মা বিষয়ী ; তাহার দেহাদি বিষয় আছে বলিয়া তিনি বিষয়ী—তন্নিয় অন্ত সমস্ত তাহার বিষয় অর্থাৎ জড় বা চিৎ প্রকাশ্য । অহঙ্কার এবং আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, অহং প্রত্যয়গম্য চিৎস্বভাব আত্মা ও ইদং-প্রত্যয়গম্য জড়স্বভাব অনাত্মা—ইহারাও তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব । যাহা আলোক, তাহা অহঙ্কার নহে ; আর যাহা অহঙ্কার, তাহা আলোক নহে । এইরূপ যাহা আত্মা, তাহা অনাত্মা নহে এবং যাহা অনাত্মা, তাহাও আত্মা নহে । সুতরাং অহং জ্ঞানে জ্ঞেয় আত্মার

সহিত ইদং-জ্ঞান-জ্ঞেয় অনাত্মার ইতরেতরঃ অর্থাৎ পরস্পরাধ্যাস বা তাদাত্মা-শ্রম থাকা যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না।” (পণ্ডিত-বর কাশীর বেদান্তবাগীশ কর্তৃক অনূদিত ‘বেদান্ত-দর্শনম্’) শঙ্করাচার্য্য এইরূপে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রভেদ স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যেন জ্ঞানের দুইটি পক্ষ। ইহাদের সহারে জ্ঞান বিষয়মধ্যে বিচরণ করে, বিষয় আহরণ করে এবং তাহার দ্বারা আপনাকে পরিপুষ্ট করে। শঙ্কর বলেন যে, গীতার এই যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ উক্ত হইয়াছে, তাহাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ মাত্র। ক্ষেত্ররূই জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় তাহার ক্ষেত্র। অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশে এই জ্ঞেয় ক্ষেত্রে জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যাস হয় এবং সে অজ্ঞ ক্ষেত্রজ্ঞ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথগ্ভাবে ভাবনা করিতে পারে না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূর হইয়া যদি জ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ হয়, তবেই এই প্রভেদের ধারণা হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথগ্ৰূপে জানিতে পারে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

“ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যত্তত্তজ্ঞানং মতং মম ॥” ১৩২

ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ করিয়া জানিবার একমাত্র উপায় এই, যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হইতে পারে না এবং যিনি জ্ঞাতা, তিনি জ্ঞেয় হইতে পারেন না। এই ক্ষেত্র বা শরীরমধ্যে যে মহাত্ম হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত ৩১টি উপাদান ভগবান্ নির্দেশ করিয়াছেন, সেগুলি সকলই জ্ঞেয়। এতদ্ব্যতীত তাহার কোনটাই জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ নহে। ক্ষেত্রজ্ঞ ইহ হইতে পৃথক্। যতদিন এই জ্ঞানলাভ না হয়, ততদিন আমাদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যাস থাকে। প্রথমে আমাদের স্থূল দেহাধ্যাস বড় প্রবল থাকে। এই স্থূল দেহই যে আমি, তখন এই ধারণা থাকে। তখন ‘অয়ং আত্মা অন্নরসময়ঃ’। এই অধ্যাস দূর হইলে তখন ‘আমি প্রাণ’ এইরূপ অধ্যাস থাকে,—তখন ‘অয়ম্ আত্মা প্রাণময়ঃ।’ সে অধ্যাস দূর হইলে তখন ‘আমি মন’ এই অধ্যাস থাকিয়া যায়। তখন ‘অয়ম্

আত্মা মনোময়ঃ ।' এ অধ্যায় দূর হইলে 'আমি বুদ্ধি' এই অধ্যায় থাকে ।
তখন 'অয়ম্ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ ।' এ অধ্যায়ও যদি দূর হয়, তখন 'অয়ম্
আত্মা আনন্দময়ঃ' এই অধ্যায় বাহিরীয়া যায় । তাহাও অবাঞ্ছিত বা মূল
প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বা আনন্দময় হেতু অবহান করিয়া আত্মা
আপনাকে আনন্দময় মনে কবে । এ অধ্যায়ও দূর না হইলে, ক্ষেত্রজ
জ্ঞান আপনার স্বরূপ অবহান করতে পারে না । এই যে অধ্যায়,
ইহার মূল অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা । পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে অস্মিতা পঞ্চপর্ক
অবিজ্ঞার এক পর্ক মাত্র । এই অস্মিতা দূর না হইলে ক্ষেত্রজ ক্ষেত্র
হইতে আপনাকে পূর্বকৃ জানিয়া ব-হরূপে অবহান করতে পারে না ।
সাংখ্যকারিকার আছে—

“এবং তস্তাভ্যাসাম্ভাস্য নাম নাহমিতাপরিশেষম্ ।

অবিপর্গায়াৎ শুভং ক্ষেত্রমুৎপাদ্যেত স্ত বন ॥' ৬৪

সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষের অবহান হেতু প্রকৃতি হইতে প্রথম যে
বুদ্ধিতত্ত্বের অভিভাব্যক্ত হয়, তাহা হইতেই অস্মিতার উৎপত্তি হয় । এই
অস্মিতাই 'অহং' 'মম' ও 'ইদম্' এই বিভাগের মূলা । সাংখ্যিক অস্মিতার
হইতে মন । ব্রাহ্মসিক অস্মিতার হইতে ইন্দ্রিয়গণ ও তামস অস্মিতার
হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও স্থল বিষয়ের অভিভাব্যক্ত হয় । অতএব এই 'অহং'
ও 'ইদং' বিভাগ বা 'জাতা' ও 'জ্ঞেয়' বিভাগ প্রকৃতিজ অস্মিতার হইতেই
অভিভাব্যক্ত । পুরুষ অজ্ঞানবশে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতিজ
স্বপ্ন ভোগ করে বলিয়া এই অহংতা ও মমতা বুদ্ধিতে বা অহং ইদং
জ্ঞানে বদ্ধ হয় । বাস্তবিক জ-স্বরূপ পুরুষের জ্ঞান নির্বিশেষ, নিক্রমাদিক,
অধঃ ও ভূম্য । তাহাতে এই জ্ঞাহ-জ্ঞেয় বিভাগ নাই অথবা তাহা
একীভূত । এই তত্ত্ব এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই ।

যাহা হউক, আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে, সাংখ্যদর্শন
অনুসারে যিনি ক্ষেত্রজ অহং, তিনি স্বরূপতঃ আত্মা নহেন ; তিনি প্রকৃতিজ

বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মার রূপ (Phenomenal self) মাত্র । কিন্তু শঙ্কর এ কথা স্বীকার করেন না । এইরূপে সাংখ্যদর্শন অনুসারে শঙ্করের জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-বিভাগে যে আপত্তি হইতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি । ইহা ব্যতীত এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-বিভাগ সম্বন্ধে আরও এক আপত্তি হইতে পারে । শঙ্কর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে যে ভেদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দূর করিয়া অভেদ বা অদ্বৈতজ্ঞান সহজে সম্ভব হয় না । আমরা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে একীভূত করিবার কোন মূল সূত্র পাই না । শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ স্থাপনের জন্য এই জ্ঞেয়কে মায়িক, কাল্পনিক বা অবাস্তব বলিয়াছেন । কিন্তু উপনিষদে বা বেদান্তদর্শনে এবং গীতার কোথাও জ্ঞেয় জগৎকে মায়িক বা মিথ্যা বলা হয় নাই । ঋত্বির মন্ত্রবাক্য যেমন ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’, সেইরূপ ‘সর্বং খবিদং ব্রহ্ম ।’ ঋত্বিতে এই অহং ও ইদং বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয়কে এক ব্রহ্মত্বের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে । জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয় তত্ত্ব একীভূত । অহং ও ইদং উভয়েই সন্বিত হইয়াছে । সুতরাং শঙ্করের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভেদবাদ কেবল আমাদের বুদ্ধিজ্ঞান সম্বন্ধে বুদ্ধিতে হইবে ।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই বিভাগ আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে । পাশ্চাত্য দর্শনের Subject ও Object বিভাগ এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগের অনুরূপ । এ স্থলে তাহা বুঝিবার প্রয়োজন নাই । গীতার কিন্তু এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ বা ‘অহং’ ‘ইদং’ বিভাগ গৃহীত হয় নাই । তাহার পরিবর্তে কেন্দ্রজ্ঞ ও কেন্দ্র বিভাগ গৃহীত হইয়াছে । কেন গৃহীত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বুদ্ধিতে হইবে । গীতার উক্ত হইয়াছে—

“যাবৎ সংজায়তে তিক্ৰিৎ সত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।

কেন্দ্রকেন্দ্রজঙ্গসংযোগাৎ তদ্বিক্ৰিচ্ছিত্ত তন্নতর্ষভ ॥” ১৩:২০

এ জগতে বাহ্য কিছু বস্তু বা সত্তা আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তাহা হইতে ভাগে বিভক্ত করা যায় ;—স্বাবর ও জঙ্গম বা অচর ও চর । জঙ্গম সত্তা বিভিন্নজাতীয় প্রাণিবর্গ । আর স্বাবর কেবল উদ্ভিদ নহে । বাহ্যকে আমরা জড় বলি, তাহাও স্বাবরের অন্তর্ভুক্ত । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন—
 ‘অহং স্বাবরাণাং হিমালয়ঃ ।’ অতএব অতি ক্ষুদ্র জড় অণু বা জীবাণু হইতে অতি বৃহৎকার জড় বা জীবসমুদায় এই স্বাবর বা জঙ্গমের অন্তর্ভুক্ত ।
 এতদ্ব্যপরে ১৪শ অধ্যায়ের ২৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত হইবে ।
 গীতা ‘অনুশারে ক্ষুদ্রতম জড় বা জীবাণু হইতে অতি বৃহৎ জড় বা জীব পর্য্যন্ত সমুদায় স্বাবর-জঙ্গমাত্মক সত্তা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগে উদ্ভূত হয় । অতি ক্ষুদ্র জড়াণু বা জীবাণু-মধ্যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ উভয়ই সংযুক্ত থাকে, এবং প্রত্যেকের—মধ্যে ক্ষেত্রের যে ৩১টি উপাদানের কথা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহাও নিহিত থাকে । আমরা ক্ষুদ্র জড়াণুর মধ্যে অবশ্য এই ক্ষেত্রজের ও ক্ষেত্রের অন্তর্গত বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রকাশ দেখিতে পাই না । কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে এগুলি বীজভাবে থাকে, তাহা গীতার উপদিষ্ট হইয়াছে । জড় ও উদ্ভিদ সমুদায় স্বাবর ও নিম্ন শ্রেণীর প্রাণিবর্গ ‘অন্তঃসংজ্ঞা’ কেবল উচ্চ শ্রেণীর জীব ও মনুষ্য বহিঃসংজ্ঞা । * মনুসংহিতায় ইহা উক্ত হইয়াছে, এবং বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণেও ইহা বিধৃত হইয়াছে । অতিক্ষুদ্র জড় বা জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নজাতীয় জীব পর্য্যন্ত বাহ্য কিছু সত্তা আছে, তাহারা অন্তঃসংজ্ঞা বলিয়া তাহাদের বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গণ অপ্রকাশিত ও বীজ-ভাবে নিহিত থাকে । এক্ষণে তাহাদের বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না । কেবল উচ্চজাতীয় জীবে ও মনুষ্যমধ্যে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-গণের বিকাশ হয় বলিয়া তাহারা বহিঃসংজ্ঞা হয় ও বাহ্য-বিষয় গ্রহণ

* অর্থাৎ গতিত মগ্নের বলিয়াছেন, “consciousness sleeps in stones, dreams in animals and awakes in man.”

করিতে পারে । মনুষ্যাদি উচ্চজাতীর জীবজ্ঞানেই কেবল বাহ্য জ্ঞের বিষয় বা ইন্দ্রজ্ঞান অভিব্যক্ত হয় । নিম্নজাতীর জীব তাহা হয় না । সুতরাং সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাণ্যক সৰ্ব্ব সৰ্ব্বক্কে জ্ঞাতা ও জ্ঞের বিভাগ সম্ভব হয় না ; কেবল ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগই সম্ভব হয় । নিম্নজাতীর জীবে ক্ষেত্রজ্ঞের কেবল ক্ষেত্র-সম্বন্ধীয় অনুভূতি থাকে । অন্য কোনরূপ অনুভূতি থাকে না । তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

“ইন্দ্র শরীরং কোন্তের ক্ষেত্রমিত্যাভিধীয়তে ।

এতদ্বো বেত্তি তং প্রোহঃ ক্ষেত্রজ ইতি তদ্বিদঃ ॥৪

এ স্থলে ‘বেত্তি’ শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে । জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু হইতে বেত্তি । বিদ্ ধাতু হইতে বেদনা । বেদনার অর্থ অনুভব করা । অতএব বাহ্য অপরোক্ণ ভাবে অনুভব করা যায়, তাহাই বেদনা । যে, এইরূপ অনুভব করে, সেই বেত্তা । অতএব এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যিনি ক্ষেত্র বা দেহমধ্যে আপনাকে সেই দেহরূপে অনুভব করেন, তিনি ক্ষেত্রজ । স্থাবর-জঙ্গমাণ্যক সকল সত্তাতে যিনি সেই সেই ক্ষেত্ররূপে আপনাকে বিশেষভাবে অনুভব করেন, তিনি ক্ষেত্রজ । তাঁহার বাহ্য বিষয়ের অনুভূতি থাকুক বা না থাকুক, সৰ্ব্বাবস্থায় তাঁহার এই আন্তরানুভূতি থাকে । ইহাই সৰ্ব্বজীব সৰ্ব্বক্কে বা সৰ্ব্ব-সত্তা-সৰ্ব্বক্কে সাধারণ নিয়ম । জ্ঞাতৃ-জ্ঞের-বিভাগ কেবল উচ্চশ্রেণীর জীব, বিশেষতঃ মনুষ্য সৰ্ব্বক্কেই সম্ভব । নিম্নশ্রেণীর সৰ্ব্ব তাহা সম্ভব নহে । এ জঙ্গ গীতোক ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগই বিশেষ সম্ভব । সে বাহ্য হউক, মানুষ্যের জ্ঞান যখন বিকশিত হয়, শুদ্ধ সাধিক হয়, তখন মানুষ্য আপনাকে জ্ঞাতরূপে এবং তাহার শরীরকে ও বাহ্য জগৎকে জ্ঞেররূপে জানিতে পারে । তখন সে জ্ঞাতরূপে আপনাকে আপনার জ্ঞের ক্ষেত্র হইতে ও জ্ঞের বাহ্য জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া, ক্ষেত্রজ-রূপে আপনার স্বরূপ জানিতে পারে, এবং সেই জ্ঞান প্রকৃতরূপে লাভ করিয়া, পরম অক্ষররূপে আপনাকে

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে । তখন ক্ষেত্রের সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ থাকে না ; তাহার কৈবল্য-মুক্তি হয় । কিন্তু এইজ্ঞান জ্ঞানের শেষ সীমা নহে এবং এই মুক্তিও চরম মুক্তি নহে । যখন ক্ষেত্রজ সর্বাস্তভূত আত্মা তাইয়া সমুদায়কে আপনাব অন্তভূত করিয়া সর্বক্ষেত্রে আপনাকে একমাত্র ক্ষেত্রজরূপে জানিতে পারে, যখন সে আপনাব সর্বাত্মা সর্বৈশ্বর স্বরূপ জানিতে পারে—সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহার ক্ষেত্রজ জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ হয় । তখন সে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের পূর্ণ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে । সে ঈশ্বরভাবে ভাবিত হয় । তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

“ক্ষেত্রজ্ঞানং মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজরোক্তানং যন্তজ্ঞানং মতং মম ॥” ১৩।২

জ্ঞান ও অজ্ঞান ।—আমরা বলিয়াছি যে, এ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিবেক-জ্ঞানই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় । কিন্তু ইহা ব্যতীত অল্প তদ্বৎ এ অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে । এ অধ্যায়ে প্রতিপাদ্য বিষয়,—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগ, পুরুষ প্রকৃতি বিভাগ, জ্ঞান এবং জ্ঞের । ইহার মধ্যে ক্ষেত্রতত্ত্ব সংক্ষেপে প্রথমে উক্ত হইয়াছে । তাহার পর কি, তাহা বিবৃত হইয়াছে । আমরা দেখিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শন অনুসারে জ্ঞান সাঙ্খিক বুদ্ধিরই এক রূপ । সস্বগুণ নিশ্চল, প্রকাশস্বভাব ও সূক্ষ্মস্বভাব বলিয়া (১৪।৬) এবং সস্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া (১৪ ১৭) এবং প্রকৃতির এই সস্বগুণ হইতে জ্ঞ-স্বরূপ পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির পরিণাম আরম্ভকালে বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হয় বলিয়া, নিশ্চল সাঙ্খিক বুদ্ধির স্বরূপ এই জ্ঞান । আমরা পূর্বে বখানানে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি ।

বুদ্ধির এই জ্ঞানভাবকে বৃত্তিজ্ঞান বলে । ইহা ব্যতীত আত্মা বা বস্তু চিৎস্বরূপ, নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ বা নিত্যবোধস্বরূপ । সাংখ্যদর্শন

অনুসারেও পুরুষ 'জ্ঞ'-স্বরূপ । পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ হেতু পুরুষ যখন অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানবশে প্রকৃতি-বদ্ধ হয়, তখন পুরুষের এই নিত্য জ্ঞানরূপ প্রকৃতিজ বুদ্ধিতবে প্রতিবিম্বিত হয় । বুদ্ধি—রজঃ ও তমোগুণপ্রভাবে মলিন হইলে, সেই নিত্যজ্ঞান তাহাতে পূর্ণ প্রতিবিম্বিত হয় না—বুদ্ধির মলিনতা অনুসারে তাহা মলিন হয় । যখন বুদ্ধি নির্মল সাত্বিক হয়, তখন এই জ্ঞানের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয় । যখন বুদ্ধি এইরূপ নির্মল হয়, তখন তাহাতে সেই পরম জ্ঞান-সূর্য্য উদ্ভিত হয়—তাহাতে আত্মজ্ঞান স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয় । অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায় । বুদ্ধিকে নির্মল করিয়া এই পরম জ্ঞান লাভ করিবার উপদেশ ভগবান্ পূর্বে চতুর্থ অধ্যায়ে ও পঞ্চম অধ্যায়ে দিয়াছেন । আমরাও পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ইহা বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । বিশেষতঃ,—

“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

জ্ঞেয়ানামিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥” (৫।১৬)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এই শ্লোকে উক্ত হইরাছে যে, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নাশিত হইলে, সেই পরম জ্ঞান আদিত্যরং প্রকাশিত হয় । এই পরমজ্ঞান আত্মস্বরূপ—ব্রহ্মস্বরূপ । এই শ্লোকে এইরূপে 'জ্ঞান' ও পরমজ্ঞান মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার ইঙ্গিত করা হইরাছে । পরে ইহার পুনরন্বেষণ হইবে । বাহা হউক, এই অধ্যায়ে ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে, এই বুদ্ধি-জ্ঞান—এই সাত্বিক নির্মল বুদ্ধির স্বরূপ যে 'জ্ঞান'—তাহা বিবৃত হইরাছে । এই জ্ঞানের তত্ত্ব জানা প্রথম প্রয়োজন এবং এই জ্ঞানতত্ত্ব জানিয়া, এই জ্ঞান সাধনাদ্বারা লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন । এই জ্ঞান লাভ করিলে, সেই জ্ঞানের জ্ঞেয় ব্রহ্ম তত্ত্ব লাভ করা যায় । তখন জ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্ম অস্বিকৃতি লাভ হয়,—প্রকৃত মুক্তি হয় ।

আমরা বলিয়াছি যে, চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ সাধিক নির্মল না হইলে, তাহা জ্ঞানস্বরূপ হয় না । বিশেষ সাধনা দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করিতে হয় । কর্মযোগসাধনা ইহাঙ্গ মধ্যে প্রধান । কর্মযোগ দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে যে এই জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই কর্মযোগ-সাধনাকালে 'অমানিষ, অনভিষ, অহিংসা, ক্রান্তি, ঋজুতা, শৌচ, তৈর্য্য, বস ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ শ্রদ্ধা পূর্বক গুরুর সেবাতৎপরতা লাভ হয় । এইরূপ সাধনা দ্বারা বিষয়বৈরাগ্য অহঙ্কার জন্ম মৃত্যু জরা-ব্যাধি হঃখানুদোষ-দর্শন সিদ্ধ হয় । বিষয়ে অনাসক্তি, অনভিষদ, ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিতে, নিত্য সমচিত্ত প্রভৃতি লাভ হয় । চিত্ত শুদ্ধ নির্মল হইলে, বুদ্ধি এই সকল ভাবযুক্ত হয়,—বুদ্ধি এই সকল জ্ঞানের স্বরূপ হয় । ইহারা সাধিক জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া ইহাদিগকে জ্ঞান বলা হইয়াছে ।

ভগবান্ এ স্থলে যে বিংশতি প্রকার জ্ঞান উল্লেখ করিয়াছেন, উক্ত কয়েকটি ইহার অন্তর্গত । আর যে ভগবন্তত্ত্বজ্ঞানলাভ জন্ত—ভক্তিযোগ-সাধন জন্ত যে নির্জ্ঞানসেবিত্ব ও জনতার অরতিবুদ্ধি, তাহাও এই জ্ঞানের অন্তর্গত । এ সকলই নির্মল সাধিক বুদ্ধির স্বরূপ । ইহা ব্যতীত ভগবান্ আরও তিন প্রকার জ্ঞানের রূপ বলিয়াছেন । তাহা ঈশ্বরে অনন্তযোগ অব্যভিচারিণী ভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন । এই তিনটিই জ্ঞানের প্রধান রূপ । শুদ্ধ সাধিক নির্মল চিত্তে যেমন অমানিষাদি উক্ত ভাব অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ উক্ত ভাবের সহিত ঈশ্বরে অনন্তভক্তিও বিকাশিত হয় । ইহাও নির্মল সাধিক ভাবস্বরূপ বুদ্ধির এক রূপ । তাই ইহাকেও জ্ঞান বলে । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন;—

“বহুনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে (৭।১৯) ।”

বুদ্ধি যখন উক্ত অমানিষাদি ভাবযুক্ত হয়, তখন জ্ঞানবান্ ইহায়া যায় । জ্ঞানবান্ হইলে তবে ঈশ্বরে অনন্ত অব্যভিচারিণী ভক্তিরূপে ‘জ্ঞানে’

স্থিতিলাভ হয় । এই ভক্তিতত্ত্ব পূর্বে দ্বিতীয় ষট্কে—প্রধানতঃ সপ্তম, নবম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ।

এই ভক্তির জ্ঞান অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন—এই জ্ঞানের চরম সীমা । যাহা অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব, তাহা প্রধানতঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগে বিবৃত হইয়াছে । পূর্বে কোথাও তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন বিবৃত হয় নাই । এজন্য এই তৃতীয় ষট্কে সেই তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে । বলিয়াছি ত, এই তত্ত্বজ্ঞান প্রধানতঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞান অথবা সাংখ্যদর্শনোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান । প্রকৃতি যখন এই তত্ত্বজ্ঞানরূপ হয়, অর্থাৎ যখন প্রকৃতিজ সাধ্বিক নির্মল বুদ্ধি এই তত্ত্বজ্ঞান-রূপ হয়, তখন সেই এক জ্ঞানরূপের দ্বারাই প্রকৃতি পুরুষকে বিমুক্ত করে । সাংখ্যকারিকায় আছে,—

“রূপৈঃ সপ্তভিরেব বধ্যাত্মজ্ঞানমাশ্রনা প্রকৃতিঃ ।

সৈব চ পুরুষার্থে প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥” ৬৩

অর্থাৎ বুদ্ধির আট রূপ বা ভাব । তাহাদের মধ্যে অধর্ম, অজ্ঞান, অটৈবরাগ্য, অটৈনৈখর্য্য, ধর্ম, টৈবরাগ্য ও টৈনৈখর্য্য এই সাত রূপ বা ভাব দ্বারা পুরুষের ভোগার্থ প্রকৃতি আপনাকে আপনিই বদ্ধ করে, আর সেই বুদ্ধি-রূপা প্রকৃতি এই একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানরূপ দ্বারা পুরুষের অপবর্গসাধন করিয়া আপনাকে মুক্ত করে ।

অতএব জ্ঞান মুক্তি-হেতু । সাধ্বিক বুদ্ধির জ্ঞানরূপ এই বিংশতি প্রকার ; ইহার মধ্যে এই তত্ত্বজ্ঞান রূপই শ্রেষ্ঠ । বলিয়াছি ত, ইহাই সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক-জ্ঞান । ভগবান্ও এই তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব—সর্বজ্ঞানের মধ্যে ইহার উত্তমত্ব উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং ইহা কেবল এই জ্ঞানের স্মৃতিবাদ মাত্র নহে ।

এইরূপে আমরা নির্মল শুদ্ধ সাধ্বিক বুদ্ধির এই জ্ঞানরূপ বুঝিতে

পারি । অমানিষাদি এই জ্ঞানরূপ নির্মল বুদ্ধির দৈবী সম্পদ ইহাতে এই জ্ঞানের যে শ্রেষ্ঠরূপ—ঈশ্বরে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তি, অধ্যাত্ম-জ্ঞানে নিত্যস্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন, তাহা লাভ হয় । এ স্থলে এই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনরূপ যে উক্ত সর্বরূপ জ্ঞানের মধ্যে উৎকৃষ্ট মোক্ষদ জ্ঞান, তাহাই উক্ত হইয়াছে বলিয়াছি ।

কিন্তু সাধনা দ্বারা বধন বুদ্ধি শুদ্ধ, সাত্বিক ও নির্মল হয় এবং তাহাতে 'জ্ঞ'-স্বরূপ আত্মার জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয় তখন বুদ্ধির যে জ্ঞানভাব, অজ্ঞানমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহার রূপ এই বিংশতি প্রকার । ইহার কোনটিই বাদ থাকে না । জ্ঞানের অমানিষাদি প্রথমোক্ত ভাব সকল অভিব্যক্ত না হইলে, তাহার ঈশ্বরে অনন্যভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞানে স্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন-ভাব লাভ হইতে পারে না ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্বে ভগবান্ বলিয়াছেন, কেন্দ্র কেন্দ্রজ এই উভয়ের জ্ঞানই জ্ঞান । তবে কেন আবার বলিয়াছেন যে, অমানিষাদি প্রভৃতি ২০টিই জ্ঞান । ইহাতে আপাততঃ বিরোধ মনে হয় । কিন্তু বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই । কেন্দ্র-কেন্দ্রজ বিভাগ জ্ঞান লাভ হইলে, কেন্দ্রজ পুরুষ আপনাকে কেন্দ্র হইতে পৃথকরূপে জানিতে পারে এবং সেই জ্ঞানে তাহার স্থিতিলাভ হয় । তখন সে কেন্দ্রের ধর্ম আপনাতে আরোপ করে না, তখন তাহার অধ্যাস দূর হয় । সুতরাং তখন কেন্দ্রের—বিশেষতঃ কেন্দ্রস্থ ত্রিগুণের যে ধর্ম, তাহাতে সে বদ্ধ থাকে না । মানিষ, দস্তিষ, হিংসা, অকাঙ্ক্ষা, ক্রুরতা, অশৌচ, অস্থিরতা, বিষয়ে আসক্তি, অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি কেন্দ্রস্থ বুদ্ধি অহঙ্কার মন প্রভৃতির ধর্ম আর আপনাতে আরোপ করে না । তখন তাহার অজ্ঞান দূর হইয়া যায় । ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অমানিষাদি জ্ঞানের বাহ্য অন্তর্থা বা বাহ্য বিপরীত, তাহাই অজ্ঞান । অর্থাৎ মানিষ, দস্তিষ প্রভৃতি অজ্ঞান । এইরূপে এই ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিভাগ করা

হইয়াছে । আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শন অনুসারে বুদ্ধিরই দুই রূপ ;—জ্ঞান ও অজ্ঞান । সাংখ্যিক বুদ্ধির রূপ জ্ঞান আর রাজসিক ও তামসিক বুদ্ধির রূপ অজ্ঞান । যখন বুদ্ধি সাংখ্যিক, সচ্ছ ও নিশ্চল হয়, তখনই বুদ্ধি এই জ্ঞানরূপে বা জ্ঞানভাবে স্থিত হয় । যতক্ষণ বুদ্ধি রজঃ-প্রধান বা তমঃপ্রধান থাকে—রজস্তমোমলার মলিন থাকে, ততক্ষণ বুদ্ধির এই জ্ঞানভাব অভিব্যক্ত হয় না । সূত্ররাং আমাদের চিন্তা যতক্ষণ রাজসিক ও তামসিক ভাবে অভিভূত করিয়া সচ্ছপ্রধান বা বিশেষভাবে সাংখ্যিক-ভাবযুক্ত না হইতে পারে, ততক্ষণ চিন্তার এই জ্ঞানভাব বিকাশিত হয় না । চিন্তা শুদ্ধ নিশ্চল হইলে, তাহাতে জ্ঞানরূপ আচার বা ব্রহ্মের জ্ঞান স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয় । এক্ষণে তখন বুদ্ধি এই জ্ঞানরূপ হয় । তখন ক্ষেত্রজ্ঞ আর মলিন চিন্তার যে অজ্ঞান, তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে না । এই জ্ঞান আমাদের দৈবী সম্পদ । আর অজ্ঞান আত্মরী সম্পদ । দৈবী ও আত্মরী সম্পদের কথা পরে ১৬শ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই । সে স্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, দৈবী সম্পদই মুক্তির হেতু আর আত্মরী সম্পদ বন্ধনের হেতু । সূত্ররাং আমাদের এই দৈবী সম্পদরূপ জ্ঞানই মোক্ষের হেতু ।

ক্ষেত্র ব্রহ্ম ।—ভগবান্ এইরূপে জ্ঞান ও অজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া, বাহা জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়, সেই ক্ষেত্র কি, তাহা বুঝাইয়াছেন । সেই ক্ষেত্র তদাখ্য পরম ব্রহ্ম । এ স্থলে অভিপ্রায় এই যে, যখন জ্ঞান অজ্ঞানযুক্ত হয়, তখন সেই জ্ঞানেই এই তদাখ্য পরম ব্রহ্ম ক্ষেত্র হন । অজ্ঞান বা অবিজ্ঞান না হইলে, ব্রহ্ম ক্ষেত্র হন না—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আদৌ উপস্থিত হয় না । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন—

“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাশ্বনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥” ৫।১৬

ইহার অর্থ আমরা যথাস্থানে বৃত্তিতে চেষ্টা করিয়াছি । সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে জ্ঞানের দ্বারা বাহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহাদের অন্তরে সেই তদাখ্য পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয় । এই শ্লোকোক্ত অজ্ঞান কি এবং জ্ঞান কি, তাহা এই অধ্যায়ের ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছি । সুতরাং এ স্থলে উক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞানের দ্বারা যখন তাহার বিপরীত মানিত্বাদি অজ্ঞান দূর হয় অর্থাৎ যখন অমানিত্বাদি সাধন দ্বারা চিত্তের মলিনতা ক্রমে দূর হইতে থাকে এবং সেইসঙ্গে মানিত্বাদি অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই নির্মল স্বচ্ছ সাত্বিকচিত্তে পরম জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন । এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনেক ব্যাখ্যাকারের মতে উক্ত শ্লোকের অর্থ এই যে, যখন জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয়, তখন সেই জ্ঞান “তৎপরম্” অর্থাৎ তদাখ্য পরম ব্রহ্মকে প্রকাশ করে । আমরা এই অর্থ গ্রহণ করি নাই ; কারণ, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ । এ স্থলে এই প্রকাশের উপমা দেওয়া হইয়াছে—‘আদিত্যবৎ ।’ সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করিয়া উদয় হইলে, আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, এবং সেই সঙ্গে অন্ত সকলকে প্রকাশ করে, সেইরূপ নির্মল জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করে এবং অন্ত সকলকে প্রকাশ করে । সুতরাং জ্ঞান ‘তৎপরম্’ ব্রহ্মকে আপনি প্রকাশ করিতে পারে না । সাংখ্যমতে বুদ্ধির যে জ্ঞানভাব, তাহা অড় । তাহার প্রকাশের সামর্থ্য নাই । এ জন্য আমরা বলিয়াছি যে, অজ্ঞানমুক্ত জ্ঞানে জ্ঞানস্বরূপ পরম ব্রহ্ম প্রকাশিত হন । আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানমুক্ত হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় । তখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন ।

বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্র—‘অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ । এই সূত্রের ‘অথ’ এই শব্দের অর্থ—অনন্তর । যখন শমদমাদি সাধনার দ্বারা আধিকারী হওয়া যায়, তখনই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উদয় হয় । শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, :

“বাহার অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অবশ্য সম্ভব হইতে পারে, তাহা কি ? নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক । ঐহিক আনুগমিক ভোগে বৈরাগ্য । শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধাঃ, শ্রদ্ধা, মুমুক্শু এই সকল গুণ বা এই সকল সাধন থাকিলে, ধর্মজিজ্ঞাসা পূর্বে ও পরে উভয় কালেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় ।” গীতোক্ত অমানিষাদি জ্ঞান ও এই বৈরাগ্যাदि চতুর্কর্গসাধন এক অর্থে একই তাই বলিয়াছি যে, জ্ঞেয়কে জানিলে অমৃতত্বলাভ হয় ; সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম এই অজ্ঞানমুক্ত জ্ঞানে জ্ঞেয় । যখন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগ-জ্ঞান হইলে ক্ষেত্রজ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক জানিতে পারে এবং ক্ষেত্রে মলিনতা আপনাতে আরোপ না করে ও অমানিষাদি জ্ঞান লাভ করে যখন জন্ম-মৃত্যু-অরাব্যাদি-দুঃখ-দোষ অনুদর্শন করে ও মৃত্যু-সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবার জন্ত ব্যগ্র হয়, তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় ও ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন ।

বুদ্ধি এইরূপ সার্ভিক ও নির্মল হইলে, যখন এই জ্ঞানস্বরূপ হয়, যখন ইহা প্রধানতঃ এই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনরূপে স্থিত হয়, তখন ইহা কিরূপে পরমমুক্তির কারণ হয়, তাহা এই জ্ঞানতত্ত্ব বুঝাইয়া পরে ভগবান্ বলিয়াছেন । সে জ্ঞান তখন আপনার প্রকৃত জ্ঞেয় কি, তাহা জানিতে পারে । ভগবান্ বলিয়াছেন, সেই জ্ঞেয়ই ব্রহ্ম । তিনিই এই জ্ঞানে একমাত্র জিজ্ঞাসার বিষয় । ব্রহ্ম — এই জ্ঞানে জ্ঞেয় বা জিজ্ঞাসার বিষয় হইলে, তাহার ফলে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় । এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ সেই ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ করে । (“ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যোত” — ইতি বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬, ৪।৪।২৫) । তাহার পরমনিকরূপ পরমপুরুষার্থসিদ্ধি হয় । তখন পুরুষ আপনার ব্রহ্মস্বরূপ নির্মল জ্ঞানস্বরূপ চিত্তদর্পণে দর্শন করিয়া জানিতে পারে । নির্মল স্বচ্ছ সার্ভিক জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিতে সে তাৎপর্যরূপ দেখিতে পারে । সেই জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিতে জ্ঞেয় ব্রহ্মস্বরূপ

প্রতিভাত হইলে বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মরূপ হয় । ইহাই চরম যুক্তি ।

ভগবান্ এ স্থলে পরম ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলিয়াছেন । আমরা পূর্বে জ্ঞানের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ উল্লেখ করিয়াছি । শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে আমরা দেখিয়াছি যে, ক্ষেত্রজ ‘অহং’ই জ্ঞাতা আর ক্ষেত্র বা ‘ইদং’ই জ্ঞেয় । এ স্থলে জ্ঞেয় সে অর্থে গৃহীত হয় নাই । এ স্থলে বাহ্য জ্ঞেয়, তাহা তদাখ্য পরম ব্রহ্ম । এই পরম ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ । তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই । তিনি জ্ঞাতরূপেই প্রধানতঃ জ্ঞেয় । বাহ্য জ্ঞানের বিষয়, তাহাই জ্ঞেয় । আত্মা বা ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় বলিয়া তিনি জ্ঞেয় । শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-দর্শনের অধ্যান-ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

“আত্মা যে নিতান্তই অবিষয়—কোনও প্রকারে বিষয় (জ্ঞানগোচর) নহেন, এষত নহে । এখন তাঁহাতে (এই জীবাবস্থায় তাঁহাতে) অস্বৎ-প্রত্যয়ের বিষয়তা আছে এবং অন্তরাত্মরূপে প্রসিক্ত বা প্রতীত হওয়ার অপরোক্ষতাও আছে । আত্মা যখন ‘অহং’ ‘আমি’ একতরূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাঁহাকে একান্ত অবিষয় বলা যায় না, এবং পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বলাও যায় না । অভিপ্রায় এই যে, চৈতন্যমাত্রস্বভাব পরমাত্মা বস্তুকল্পে নিরূপাধিক ও অবিষয় হইলেও আঁবষ্টাকল্পিত ‘অহং’ উপাধিধারা বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । বিবেককালে বা অনধ্যাস-কালে তিনি নিরূপাধিক ও নিরংশ ; কিন্তু আঁবষ্টকালে তিনি সোপাধিক ও সাংশ । আঁবষ্টাকল্পিত অহং যতকাল থাকবে, ততকালই তিনি অহং-বৃত্তির পরিচ্ছেদ্য বা বিষয় । সুতরাং আঁবষ্টাকল্পিত ‘অহং’ উপাধির বিলোপ বা বিগম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি একান্ত অবিষয় নহেন । অর্থাৎ আত্মা এখন অহং-বৃত্তির বিষয় ।” (পণ্ডিতবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় অনুদিত শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য উপক্রমণিকা) অতএব ব্রহ্ম অপরোক্ষাত্মত্ব দ্বারা জ্ঞেয় । আত্মার আত্মা বা জ্ঞাতার জ্ঞাতরূপে

তাঁহাকে জানা যায় বলিয়া তিনি জ্ঞেয় । 'ভগবান্' বলিয়াছেন যে, পরমব্রহ্ম জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অধিগম্য পরম জ্ঞাতরূপে তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত । অতএব পরমব্রহ্ম যেমন জ্ঞেয়, সেইরূপ জ্ঞাতাও বটে এবং জ্ঞানস্বরূপও বটে । আমরা পূর্বে দ্বাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি ; এ স্থলে তাহার পুনরুদ্বোধ নিম্নরোজন ।

বেদান্ত-দর্শন অনুসারে শুদ্ধ জ্ঞানের তিন রূপ ;—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান । ব্রহ্ম—শুদ্ধ চিৎরূপ । তিনিই মায়াক্রমি হেতু এই তিন রূপে অভিব্যক্ত হন । নির্মল বুদ্ধিতেই এই তিন রূপের প্রতিবিম্ব পতিত হয় ; সুতরাং বুদ্ধিও এই তিনরূপ হয় । যখন জ্ঞান উক্ত তিন রূপযুক্ত হয়, তখন ব্রহ্ম তাহার জ্ঞেয় হন । ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইলে জ্ঞান সেই ব্রহ্মরূপ হয়, জ্ঞেয়ের সহিত জ্ঞান একীভূত হয় । তখন জ্ঞাতরূপ ও এই জ্ঞানের মধ্য দিয়া জ্ঞেয় ব্রহ্মরূপ হয় । তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান একাকার হয় । ইহাই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্ব । জ্ঞানের মধ্য দিয়া এই জ্ঞেয় ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তিই জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা (১৮।৫০) । এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপে পুরুষের প্রতিষ্ঠাতেই পরমমুক্তি হয় । এই ব্রহ্ম ভগবান্ জ্ঞানের স্বরূপ বুঝাইয়া এই জ্ঞানের জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন ।

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার এই ব্রহ্মতত্ত্বের বিবরণ সংক্ষেপে ১২শ হইতে সপ্তদশ শ্লোক পর্য্যন্ত এই জ্ঞেয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । এই ব্রহ্মতত্ত্ব বেদসংহিতার ব্রহ্মসূত্রপদে বেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহাই গীতার সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । উপনিষদ এই ব্রহ্মপ্রতিপাদক । ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদেই বিবৃত হইয়াছে । ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা । এই ব্রহ্ম আমরা পূর্বে উক্ত ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উপনিষদ্ হইতে গীতাত্ত ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে তাহার পুনরুদ্বোধ নিম্নরোজন । সুতরাং

আমরা সংক্ষেপে মাত্র এ স্থলে গীতোক্ত এই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিব । গীতার অনেক স্থলে ব্রহ্ম শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি । ব্রহ্ম অর্থে শব্দব্রহ্ম বা বেদ ; ব্রহ্ম অর্থে ভগবানের বোনিরূপা প্রকৃতি । কিন্তু এ স্থলে জেয় 'পরম' ব্রহ্মতত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে । তাহার অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই ।

আম্মার ভ্রায় ব্রহ্ম নানা অর্থে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু পরমাশ্রা বা পরম ব্রহ্ম বলিলে সেই পারমার্থিক মূল তত্ত্বই নির্দিষ্ট হয় । গীতার এ স্থলে পরম ব্রহ্ম-তত্ত্বই নির্দিষ্ট হইয়াছে । যাহা শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও বেদান্তদর্শনে জিজ্ঞাসার বিষয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব—'অন্যাত্ত্ব বতঃ' এই তটস্থ লক্ষণ দ্বারা যিনি জেয়, 'ওং তৎসং' যাহার নির্দেশক, তিনিই গীতোক্ত পরম ব্রহ্ম । এ স্থলে সেই পরম ব্রহ্ম-তত্ত্বই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে এ স্থলে ব্রহ্ম জীবাশ্রা । কেহ বলেন, ব্রহ্মই মূল প্রকৃতি, তাহাই ভগবানের মহদ্বোনি । কেহ বলেন, এই ব্রহ্মই ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্রজ ও ক্ষেত্র-তত্ত্ব । সে অত্র তাঁহারাই এই শ্লোকের অর্থ করেন যে, ব্রহ্ম 'অনাদি' এবং 'মৎপর' অর্থাৎ ভগবানের অধীন । ভগবান্ এই ব্রহ্মের অতীত তত্ত্ব । তাই ভগবান্ বাসুদেব পরব্রহ্ম ।

এ অর্থ যে আদৌ সম্ভব হইতে পারে না, তাহা আমরা বখাশ্রামে বিবৃত করিয়াছি । এ স্থলে গীতার পরম ব্রহ্ম-তত্ত্ব বা 'একমেবাষিভীয়ন্' তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে ।

ইহা 'তৎ ব্রহ্ম' 'তে ব্রহ্ম তদ্বিদ্মঃ' (৭।২৯) 'কিং তৎ ব্রহ্ম' (৮।১), ইত্যাদি স্থলে এই 'তৎ'-পদবাচ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আছে । ভগবান্ বলিয়াছেন, এই তৎব্রহ্ম 'অক্ষর ব্রহ্ম পরমম্ ।' (৮।৩) । এই অক্ষর পরম-ব্রহ্ম কি, তাহা উক্ত ৮।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে ।

এ স্থলে যে ব্রহ্মকে উক্ত জ্ঞানের জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, তাহা এই উদাখ্য
অক্ষর পরম ব্রহ্ম—“অনাদিমং পরমব্রহ্ম ন সৎ তন্মাসহুচ্যতে ।”

(১৩।১২) ।

এই পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন—

‘পরম্ভ্রাত্তু ভাবোহত্ৰো ব্যাক্তোহব্যাক্তাং সনাতনঃ ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্চৎসু ন বিনশ্চতি ॥

অব্যাক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” (৮।২.০০২১)

এই পরমব্রহ্ম বা পরম পদ সম্বন্ধে ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন—

“যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি

বিশন্তি যদ্বষতয়ো বীতরাগাঃ ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি

তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥” (৮।১১)

ভগবান্ পরেও বলিয়াছেন,—

“পদং তৎ পরিমার্গিতবাম্

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।” (১৫।৪)

ইহা “তৎপদমব্যয়ম” (১৫।৫)

ভগবান্ আবার বলিয়াছেন,—

“ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাকো ন পাবকঃ ।

যদ্গতা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” (১৫।৬)

এই জ্ঞেয় ব্রহ্ম অক্ষর পরমব্রহ্ম, ব্রহ্মই এই অবায় পদ, ইহাই ভগবানের
পরম ধাম । এই অক্ষর অব্যাক্তের উপাসনার কথা ১২শ অধ্যায়ে ৩ঃ৪
শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।

অতএব এ স্থলে ভগবান্ নিৰ্ম্মল অমানিপ্রাদি রূপ ও ভক্তজানার্ধদর্শনরূপ
জ্ঞানের জ্ঞেয় যে ব্রহ্ম বলিয়াছেন,—তাহা যে গীতা অনুসারে এই অক্ষর

পরম ব্রহ্ম, এই ভগবানের পরম ধাম, পরম অব্যয় পদ ব্রহ্ম, সে সম্বন্ধে
 নন্দেহ থাকে না ।' এই কয় শ্লোক হইতেও এই তত্ত্ব স্পষ্ট জানা যায় ।
 ভগবান্ বলিয়াছেন, জ্ঞেয় ব্রহ্মকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয় । (১৩।১২) ।

এই জ্ঞেয়—অনাদিমং পরম ব্রহ্ম । এই ব্রহ্ম সৎ বা অসৎ-বাচ্য
 নহে । ইহার অর্থ আমরা দ্বাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা
 করিয়াছি । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নরোজন ।

এই ব্রহ্ম সর্বস্বরূপ অথচ সর্বাভীত । এ বিশ্বে যত ভূত বা হাবর-
 জন্মান্বক, সত্তা আছে—সেই চরাচরের তিনি সমষ্টিরূপ । একান্ত তিনি
 সর্বতঃ পাণিপাদ, সর্বতঃ অক্ষিরোমুখ, সর্বত্র ক্রতিমং । তিনি লোক
 সমুদায় আবৃত্ত কবিয়া স্থিত—“ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্” (ঈশ. ১) তিনি
 সর্বেশ্বর-বিবার্জিত হইয়াও সর্বেশ্বরের আভাস অর্থাৎ কারণ বা বীজ
 স্বরূপ ও প্রকাশক । অতএব ব্রহ্ম সর্বকারণ ও সর্বরূপ “সর্বং ধৰিদ্
 ব্রহ্ম” । তিনি এই বিশ্বের ভরণকর্তা, সর্বগুণভোক্তা । ব্রহ্ম সর্বস্বরূপ
 হইয়াও সর্বাভীত । তিনি অসক্ত ও নিগুণ ।

ব্রহ্ম চরাচর সর্বভূতের বাহু ও অন্তর ; তিনি দূরে, তিনিই নিকটে
 তিনি সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় । তিনি অবিভক্ত হইয়াও সর্বভূত সময়ে
 বিভক্তের স্রায় স্থিত । তিনি ভূতভর্তা ও সর্বপালনকারী, সর্বগ্রাসকারী
 ও সর্বসৃজনকারী ।

এই পরমব্রহ্মই স্বপ্রকাশ—সর্বজ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ, তিনি তমঃ-
 পারে অবস্থিত, তিনিই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানস্বরূপে সর্বদ্বন্দ্বের
 অবস্থিত ।

এইরূপে সংক্ষেপে এই জ্ঞেয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব এই অধ্যায়ে ১২শ হইতে
 ১৭শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম অনির্বাচ্য—
 তাহাকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না, তিনি সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয়—তিনি
 অপ্রমেয় । তিনি সগুণ (immanent manifest) রূপে সর্ব—বিশ্বরূপ,

আর তিনি নিঃশব্দ (Transeendent)রূপে (unmaifestরূপে) সর্বাতীত । তিনি সগুণরূপে বিভক্তের স্তায় হইয়া স্থিত—সর্বভূতরূপে, তাহাদের ইন্দ্রিয়-ও ইন্দ্রিয়গুণরূপে স্থিত, সর্বভূতের অন্তরে, বাহিরে, দূরে, নিকটে স্থিত । সমুদায়ই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে অবস্থিত, ব্রহ্মসত্তাতে সত্তাবুক্ত, ব্রহ্মশক্তিতে সংরূপে বিবর্তিত ও বিধৃত । আবার ব্রহ্ম এ জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তা । ব্রহ্মই এ জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ—সর্বকারণ ।

ব্রহ্মতত্ত্বে সকল বিরোধের সমন্বয় হয়, সকল বিপরীত ভাব একীভূত হয় । তিনি নিঃশব্দ অথচ সগুণ, সর্বৈন্দ্রিয়বৃত্ত অথচ সর্বৈন্দ্রিয়-বিবর্তিত, তিনি অতি দূরে অথচ অতি নিকটে । law of contradiction : অর্থাৎ জ্ঞানের বিকাশাবস্থায় যে কিছু বিপরীত ভাবের (thesis এবং antithesis এর অথবা antinomy রূপে) বিকাশ হয়, ব্রহ্মে সে সমুদায়ের সমন্বয় (synthesis) হয় । law of identity দ্বারা সমুদায় বিরোধী ভাব তাঁহাতে একীভূত হয় ।

ব্রহ্ম সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞের হইলেও—এই সর্বভূতমধ্যে—এই অনন্ত বহুত্বপূর্ণ জগতের মধ্যে যে এই একত্বের অনুভূতি হয়—যে এই সকল বিভক্ত ভাবের মধ্যে এক অবিভক্ত ভাবের অনুভূতি হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানা যায় । আরও তাঁহাকে এ জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তা বা জগতের মূল কারণরূপে তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও জানা যায় । তাঁহাকে জ্যোতীরূপে—সর্বপ্রকাশক তেজোরূপে এই শব্দার্থক জগতের মূল একমন্ত্র ব্রহ্ম—ওকাররূপে ধ্যান বা ভাবনা করিতে হয় । আর ব্রহ্মকে অধ্যাত্মজ্ঞানে নিজ আত্মাতে পরমাত্মরূপে ধ্যান ও ধারণা করিতে হয় । ধ্যানপরিণাকে আত্মাতেই ব্রহ্মদর্শন হয় । ব্রহ্ম অবিজ্ঞের হইয়াও যে এইরূপে জ্ঞের হন, তাহার কারণ এই যে, ব্রহ্ম সর্বভূতের জ্ঞান, জ্ঞের ও জ্ঞান-গম্যরূপ অর্থাৎ জাত্য, জ্ঞের ও জ্ঞান এই ত্রিগুটরূপে অবস্থিত । যখন এই জাত্য, জ্ঞান ও জ্ঞের/তত্ত্ব অনুধ্যান করিয়া তাহার

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, যখন এই তিনের একত্ব ধারণা করা যায়, যখন এই তিন এক হইয়া নির্বিশেষ জ্ঞানরূপে একীভূত হয়, তখন অস্তরে এই ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভব করা যায়, তখন ব্রহ্মস্বরূপ লাভ হয় । এ সকল বিষয় আমরা পূর্বে উক্ত কয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বৃষ্টিতে চেষ্টা করিয়াছি ।

যাহা হউক, আমরা ব্রহ্ম সম্বন্ধে উল্লিখিত তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে গীতার উক্ত শ্লোক হইতে জানিতে পারি । জ্ঞান যখন নির্মল হয়, তখন সেই 'জ্ঞান' ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তখন 'জ্ঞেয়' ব্রহ্মস্বরূপ হয়, আর তখন 'জ্ঞাতা'ও ব্রহ্মস্বরূপ হয় । অহং ইদং এক হয় । তখন 'অহং' থাকে না, মোহহং জ্ঞান হয় । যখন জ্ঞাতা ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তখন এই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় একীভূত হইয়া অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মভাব লাভ হয়—অমৃতত্বসিদ্ধি হয় ।

এই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত ঈশ্বরতত্ত্বের এবং মারা ও প্রকৃতি-তত্ত্বের সম্বন্ধ কি, তাহা পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে । পরে অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক ও একবিংশ শ্লোকে এই ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । তাহার পর দ্বাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই ব্রহ্মতত্ত্ব ও তাহার সহিত ঈশ্বরতত্ত্বের সম্বন্ধ পুনরাগোচিত হইয়াছে । এ অধ্যায়ের উক্ত ১২শ হটতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা উক্ত শ্লোক সকলের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে বৃষ্টিতে চেষ্টা করা গিয়াছে ।

এই ব্রহ্মতত্ত্বের এইরূপ বিস্তৃত ব্যাখ্যায় প্রয়োজন এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পরমমুক্তিলাভ হয় । আর এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন । ব্রহ্মতত্ত্ব শুভ্রতম, অতি দুর্কোধ্য । ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা 'অক্ষর অধিগম্য' হয় । ব্রহ্ম-তত্ত্ব দুর্কোধ্য, তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা ব্যতীত তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না । ইহা ব্যতীত আমরা দেখিয়াছি যে, এই গীতাক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে । বিভিন্ন ঋতি-বচনই এই মতভেদের কারণ । বেদান্ত-দর্শনে এই সমুদায় বিভিন্ন ঋতি সমন্বয় করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । তথাপি তাহাতেও

এই বিভিন্ন বাদের স্থান আছে । অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বৈতা-
দ্বৈতবাদ, শুদ্ধ দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বাদ অনুসারে যেমন এই বেদান্ত-
দর্শন বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ এই গীতা-শাস্ত্রও তদনুসারে
বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । উক্ত কয় শ্লোকে ব্রহ্মতত্ত্বের এই বিভিন্ন
বাদ অনুসারে ব্যাখ্যা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি ।

যাহা হউক, আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের
উপরের ভূমিতে যাইলে এই দ্বৈত (thesis) ও অদ্বৈত (antithesis)
এই উত্তরবাদ সমন্বয় (synthesis) করিলে, তবে এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানা
যায় । ইহাই সর্ব-সমন্বয়ের শেষ সমন্বয় (last synthesis) গীতার
যে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ উভয়েরই সমন্বয় হইয়া যে পরম অদ্বৈততত্ত্ব
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কোন বাদ অবলম্বন না করিয়া গীতার
সমগ্রভাবে—সর্বসামঞ্জস্য করিয়া আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় ।

আমরা পূর্বে ব্যাখ্যা-ভূমিকায় বলিয়াছি যে, এই ব্রহ্মতত্ত্বই গীতার মূল
মন্ত্র । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই । আমরা সে স্থলে
বলিয়াছি যে, ব্রহ্মকে সর্বিশেষ ও নির্কিশেষভাবে বুঝিতে হয় । সর্বিশেষ-
ব্রহ্মের দুই ভাব ;—সগুণ ভাব ও নিগুণ ভাব । সগুণ ব্রহ্মই পরমেশ্বর,
নিগুণ ব্রহ্ম পরম অক্ষর, অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব ; নিগুণ
ব্রহ্ম এইরূপ বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত আর ব্রহ্মের যে নির্কিশেষ ভাব, তাহা
অনির্বাচ্য, অজ্ঞেয়, নিক্রুপাধিক, কেবল 'নেতি নেতি' দ্বারাই নির্দেশ্য ।
পরম ব্রহ্মের এই নির্কিশেষ নিগুণ ভাব 'তৎ'-শব্দবাচ্য আর তাহার
সগুণ ভাব 'সঃ'-শব্দ-বাচ্য । বলিয়াছি ত, তিনি পরমেশ্বর । গীতার এই
সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব পূর্বে বিতীয় সূটকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে
দেখিয়াছি । এই অধ্যায়ে এই কয় শ্লোকে প্রধানতঃ 'তৎ'-বাচ্য
নির্কিশেষ ও নিগুণ পরম ব্রহ্মতত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে ।

গীতা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, যিনি পরম ব্রহ্ম, তিনি সৎ বা

অসংখ্য নহেন । তিনি অনির্বাচ্য নিবিশেষ । তাঁহাকে নিবেদন-
 নেতি নে ত' দ্বারা নির্দেশ করিতে হয় । ইহা উপনিষদেই উক্ত হইয়াছে ।
 এই ব্রহ্মতত্ত্ব সূক্ষ্ম অবিজ্ঞেয় । আমরা বলিয়াছি, আমরা ব্রহ্মকে দুই
 রূপে নির্দেশ করি,—এক সগুণরূপে আর এক নিগুণরূপে । এক
 Immanent রূপে, আর এক Transcendent রূপে । স্বরূপতঃ ব্রহ্ম
 এই দুই ভাবের অতীত, এই উভয়ের সমন্বয় কারণে তাঁহার এই নিবিশেষ
 ভাব ধারণা করা যায় । পরমার্থতঃ ব্রহ্ম সগুণও নহেন, নিগুণও
 নহেন ; তিনি উভয়ের অতীত, অথচ উভয় ভাবে অভিব্যক্ত । নিগুণ-
 রূপে তিনি অক্ষয়, অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচর, ঐব
 (১২।৩) ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্টরূপে বাচ্য ও নির্দেশিত হন, আর
 সগুণরূপে ঈশ্বরভাবে তিনি আমাদের সমগ্র জ্ঞেয় হন । তিনি এ
 জগতের স্রষ্টা, পাতা, নিরস্তা ও সংহতা মায়াক্রিয়াক্ষর । তিনিই
 অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ । তিনি সগুণরূপেই দ্রষ্টা ও দৃশ্য হন ; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়
 হন । জ্ঞাতরূপে তিনি পুরুষ ও জ্ঞেয়রূপে তিনি প্রকৃতি । সর্বজ্ঞাতরূপে,
 সর্ব নিরস্তরূপে তিনি পরমেশ্বর পুরুষোত্তম, আর পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতরূপে
 তিনি প্রকৃতিবদ্ধভাবে জীব বা ভূত । পরমেশ্বরের নিরস্তৃত্বে
 প্রকৃতির পরিণাম হইয়া এই জগতের অভিব্যক্তি হয় ; তাহা জীব-
 ভোগ্য হয় । প্রকৃতি হইতে জীবদেহ উৎপন্ন হয় । এইরূপে ব্রহ্মই
 সগুণরূপে নিরস্তা ঈশ্বর, ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগদ্রূপে অভিব্যক্ত
 হন । অতএব ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় হইলেও তাঁহার নিগুণ
 অক্ষরতাব, এবং সগুণ ঈশ্বর জীব ও জগদ্ভাব কতকটা ধারণা করিতে
 পারা যায় । গীতা হইতে পরম ব্রহ্মকে এই ভাবে বুঝিতে পারা যায় ।
 উপনিষদের মধ্যে খেতাখতর উপনিষদে ইহা উক্ত হইয়াছে ।

খেতাখতর উপনিষদ্ হইতে আমরা ইহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা
 করিব । খেতাখতর উপনিষদের প্রথমে আছে :—

“সৰ্বজীবে সৰ্বসংহে বৃহন্তে

তাস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে ।

পৃথগাখ্যানং প্রেরয়িত্তারঞ্চ মম্বা

জুষ্টন্তেতন্তেনামৃতত্বমেতি ॥” (১১৬)

অর্থাৎ “হংস বা জীব আপনাকে ও প্রেরয়িত্তা ঈশ্বরকে পৃথক্ মনে করিয়া সেই সৰ্বজীবাধার ও সৰ্বলয়স্থান বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমান হয় । পরে প্রেরয়িত্তা দ্বারা জুষ্ট বা উপকৃত হইয়া বা তাঁহার কৃপার অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় ।” কিরূপে এই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা পশ্চুবর্তী মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা—

“উদগীতমেতদ্ পরমম্ ব্রহ্ম

তাস্মিন্ধ্বয়ং সুপ্রতিষ্ঠাকরঞ্চ ।

অত্রাস্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা

লীনা ব্রহ্মণি ভৎপরা যোনিযুক্তা ।” (১১৭)

অর্থাৎ “এই পরম ব্রহ্মই উদগীত । অর্থাৎ বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে । তাহাতে তিন এবং অক্ষর সুপ্রতিষ্ঠিত আছে । ব্রহ্মবিদ এই সম্বন্ধে যে প্রভেদ, তাহা জানিয়া, যোনিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয় ।” এইরূপে এই মন্ত্র হইতে ব্রহ্মের অক্ষর স্বরূপ ও অস্ত্র তিন রূপ জানা যায় । এই অস্ত্র তিন রূপ বাহা ব্রহ্মেই সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা কি, সে তত্ত্ব এ স্থলে বিবৃত হইয়াছে । এই তিন রূপ ক্ষর, অক্ষর ও ঈশ্বর ।—

“সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ

ব্যক্তাব্যক্তং তরতে বিশ্বমীশম্ ।

অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোকৃত্যবৎ

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্বপাটৈঃ ॥” (১১৮)

অর্থাৎ ‘ঈশ্বর এই পরম্পর সংযুক্ত ক্ষর অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতি এবং অক্ষর বা জীবাশ্মা—এই উত্তরকে (১১১) বা ব্যক্ত অব্যক্ত এই সমুদয়কে

(বিখকে) ভরণ করেন—বা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নিরস্তা হন। এই জীবাশ্মা অনৌশ, এই ঈশিষ শক্তি বিহীন হইয়া ভোক্ত-
 তাব হেতু (সুখহুঃখাদিতে) বদ্ধ হয়। সে দেবকে বা ঈশ্বরকে জানিয়া
 সর্বরূপে সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। আরও উক্ত হইয়াছে—

“জ্ঞানো বাবজাবীশানীশা-

বক্তা হোকহ ভোক্ত ভোগ্যার্থ যুক্তা ।

অনন্তশাখ্যা বিখণরূপে হকর্তা

অয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥” (১১৯)

অর্থাৎ এই ‘জ্ঞ’স্বরূপ ঈশ্বর, ও অস্ত জীব—এই দুই ভাব অনাদি
 (অজ)। ইহা ব্যতীত আরও এক অনাদি (অজা) ভাব আছে—তাহা
 ভোক্তা জীবের ভোগ্যার্থযুক্ত। জীব স্বরূপতঃ আখ্যার্থ অনন্ত অকর্তা—
 বিখরূপ। যাহা হউক, জ্ঞানী যখন এই (ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতিরূপ)
 তিনকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারেন, ও ঈশ্বর অভিধ্যান দ্বারা তাঁহার
 সহিত একত্ব অনুভব করিতে পারেন, তখন তাঁহার বিখমারা নিবৃত্তি
 হয়। (১১১০)। যাহা হউক, ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পরম
 ব্রহ্মে যে এই অক্ষর কুটস্থ ভাব ব্যতীত এই তিন ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত—
 সেই তিন ভাব এই প্রেরণিতা ঈশ্বর, ভোক্তা জীব ও ভোগ্যা প্রকৃতির
 এই তিনই ব্রহ্ম—

“ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরণিতারঞ্চ যদ্বা

সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥” (১১১২)

পরম ব্রহ্মের এই তিন ভাব ব্যতীত তাঁহার যে অক্ষর ভাব, তাহা
 খেড়ানতর উপনিষদে পরে উক্ত হইয়াছে :—

“যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-

নসৎ চাসঞ্জিব এব কেবলঃ ।

তদক্ষরং তৎসবিতুবরেনাং

প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসূতা পুরাণী ॥”

(খেতাখতর, ৪।১৮)

অর্থাৎ যখন ‘অতম’ হয় অর্থাৎ সর্বরূপ অজ্ঞান দূর হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন এই ‘অক্ষর’ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন । তখন দিবাও নহে, রাত্রিও নহে, সৎও নহে, অসৎও নহে, তখন কেবল শিবরূপ প্রকাশিত থাকেন । তিনিই অক্ষর, তিনিই সবিতৃমণ্ডলাধিষ্ঠিত দেবের ও সম্ভজনীয় । তাঁহা হইতেই পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসূত হইয়াছে ।

“নৈনমূর্দ্ধং ন তির্ধ্যাক্ষ ন মধ্যো পরিজপ্রভুৎ ।

ন তস্ম প্রতিমা আস্তি যস্ম নাম মহদ্বশঃ ॥”

(খেতাখতর, ৪।১৯)

অর্থাৎ ইঁহাকে উর্দ্ধে, অধোদেশে বা মধ্যে ধরিতে পারে না । বাহার নাম মহদ্বশঃ, তাঁহার প্রতিমা নাই ।

“ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্ম

ন চক্ষুর্বা পশুতি কশ্চনৈনম্ ।

কদা হৃদিস্থং মনসা য এন-

মেবং বিচরমৃতান্তে ভবন্তি ॥”

(খেতাখতর, ৪।২০)

অর্থাৎ দর্শনযোগ্য প্রদেশে (সন্দৃশে) ইঁহার রূপ নাই । কেহ তাঁহাকে চক্ষুর্বারা দেখিতে পার না । বাঁহারি হৃদয়ে ও মনন দ্বারা হৃদিস্থিত ইঁহাকে জানেন, অর্থাৎ হৃদয় সংশয়রহিত বুদ্ধি ও সঙ্গী দর্শনরূপ গমন দ্বারা এ ভাবে ইঁহাকে দর্শন করেন (খেতাখতর, ৪।১৭), তিনি অক্ষর হন ।

ইঁহাই অক্ষর পরম ব্রহ্মের স্বরূপ । তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন, তাঁহা হইতে পুরাতন প্রজ্ঞা প্রসূত, তিনি উর্দ্ধে, মধ্যে ও

অধোদেশে নহেন বলিয়া প্রপঞ্চাগত, তাহার কোন প্রতিমা (বা তুলনা) নাই । তিনি অগাঙ্‌মানসগোচর । এইরূপে খেতাখতর উপনিষদে পরম ব্রহ্মের অক্ষয় ঈশ্বর স্রীব ও প্রধান বা প্রকৃতিরূপ ভাব উক্ত হইয়াছে ।

মাণ্ডুক্য উপনিষদেও পরম ব্রহ্মের বা পরমাশ্বার চারি পাদের কথা উক্ত হইয়াছে । অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে ঔকারতত্ত্ববিবৃতিকালে তাহা বিধিতে চেষ্টা করিয়াছি । পরম-ব্রহ্মের যে অমাত্র, অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চোপশম, শাস্ত, শিব, অদ্বৈত, অদৃষ্ট, অগ্রাহ, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অসাপদেণ্ড একাত্মপ্রত্যয়সার চতুর্থ বা তুরীয় পদ উক্ত হইয়াছে, (মাণ্ডুক্য উপঃ ৭, ১২) তাহা এই ‘অক্ষয় অব্যক্ত’ পরম ব্রহ্মের এই চতুর্থ ভাব ।

গীতা হইতেও আমরা এই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব—তাঁহার অক্ষয় অব্যক্ত পরম ভাব, পরমেশ্বরভাব, স্রীবাত্মভাব ও বিখরূপভাব জানিতে পারি । এ স্থলে তাঁহা বিস্মারিতভাবে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই । বলিয়াছি ত, পূর্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, অষ্টম অধ্যায়ের একবিংশতি ও দ্বাবিংশতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ও সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে এই অক্ষয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও এই উভয় তত্ত্বमध्ये সৰ্বক বিবৃত হইয়াছে । এ স্থলে তাহা দেখিতে হইবে ।

১৮শ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, (পূর্বে ১৭ শ্লোক পর্য্যন্ত) কেত্র জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে বেরূপে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরতত্ত্ব সেট তত্ত্ব জানিয়া ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয় । জ্ঞানের স্বরূপ জানিয়া সেট জ্ঞানে স্থিতি হইলে, তাহার দুই ফল হয় । সেই জ্ঞানে কেত্র হইতে কেত্রজ্ঞ বে পৃথক্, তাহা প্রতিভাত হয়, এবং জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিভাত হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি হয় । এইজন্য কেত্রতত্ত্ব প্রথমে বিবৃত হইয়াছে, এবং পরে ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত অনির্বাচ্য ‘তৎ’-

পদনির্দেশ্য পরম ব্রহ্মত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । এই 'তৎ'পদবাচ্য ব্রহ্ম জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইলেও, সমগ্র ব্রহ্ম-ত্ব নহে । এই 'তৎ'-পদবাচ্য পরম ব্রহ্ম এক অর্থে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত ভাব মাত্র । আমরা জানি যে, উপনিষদে ব্রহ্মের দুই ভাব প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে—সত্ত্ব ও নিস্ত্ব অর্থাৎ অপর ও পর ব্রহ্ম । এই ভাবে উপনিষদে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্যাদিত হইয়াছে । ব্রহ্মত্বই সর্বোপনিষদসার ।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

“তৎ ব্রহ্মোপনিষদং পরং তৎ ব্রহ্মোপনিষদং পরম্ ।” (৩।১৩)

এই ব্রহ্মত্বই—

“বেদান্তে পরমং শুভং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্ ॥”

(শ্বেতাশ্বতর, ৬।২২)

এই ব্রহ্মত্বই উদ্গীত । ব্রহ্মত্ব কিরূপে জানিতে হইবে, তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথমেই আছে—

“উদ্গীতমেতৎ পরমম্ ব্রহ্ম

তস্মিন্দ্রং সুপ্রতিষ্ঠাকরঞ্চ ।

অত্রাস্তং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা

লীনা ব্রহ্মণি তৎপরং যোনিমুক্তাঃ ॥” (১।৭)

ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম এই প্রপঞ্চ সম্বন্ধে অক্ষর ও উক্ত তিন রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত । ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকে এইরূপেই জানেন এবং যিনি এইরূপে ব্রহ্মকে জানেন ও ব্রহ্মপরায়ণ হন, তিনি যোনিমুক্ত হন— তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । প্রকৃতি-পুরুষ-জ্ঞানও এই ব্রহ্ম-জ্ঞানের অন্তর্গত, ইহা পরে বিবৃত হইবে । ১১শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্যন্ত নির্মল (৭ম হইতে ১১শ শ্লোকোক্ত) জ্ঞানে জ্ঞেয় ব্রহ্মত্বের মধ্যে তৎ-পদ-নির্দেশ্য অনির্কচনীয় পরম ব্রহ্মত্ব প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু উক্ত অবিধ ব্রহ্মরূপ বিবৃত হয় নাই । আমরা দেখিয়াছি যে, বেদান্ত

অনুসারে ব্রহ্ম সগুণ ও নিগুণ । কিন্তু সমগ্র সগুণ ব্রহ্মত্ব পূর্বে বিবৃত হয় নাই । এই সগুণ ব্রহ্মই এই ত্রিবিধ । খেতাখতর উপনিষদ্ অনুসারে সগুণ ব্রহ্মের এই তিন রূপ—তোক্তা জীবায়া, ভোগ্য জগৎ এবং প্রেরয়িতা ঈশ্বর । আমরা দেখিরাছি যে, এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম সবক্কে খেতাখতর উপনিষদ্ বলিরাছেন—

“তোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মহা

সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ।” (১।১২) ।

অতএব এই ঈশত্ব, জীবত্ব ও জগত্ত্ব স্বরূপতঃ ব্রহ্মত্বেরই অন্তর্গত । এই তিন ত্বই ব্রহ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত । ইহাদের মধ্যে ‘ভোগ্য’ই প্রধান বা প্রকৃতি,—ইহা কর, অজা, এক ও সর্বভোগার্থবৃত্তি (খেতাখতর ১।৮।১০) । এই তোক্তা—জীবায়া । অজ, অকর, অব্যক্ত, ইহা অনীশ আত্মস্বরূপ, ইহা অজ্ঞ হইলেও অনন্ত, অমৃত, বিশ্বরূপ, অকর্তা । (খেতাখতর ১।৮-১০) ; ইহা গীতোক্ত সংসারী জীবায়া—কর পুরুষ । আর এই প্রেরয়িতা—পরমেশ্বর । তিনি এক, দেব, হর, করাকর ও ব্যক্তাব্যক্ত-বিশ্বের বা অজ কর প্রধানের এবং অজ অকর জীবায়া—সকলের নিরস্তা ও ভরণকর্তা পরমেশ্বর (খেতাখতর ১।৮-১০) । এই পরমেশ্বরই পরমপুরুষ বা উত্তম পুরুষ । এইরূপে ব্রহ্মই এই প্রকৃতি এবং (ত্রিবিধ) পুরুষরূপ । এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি হয় । তোক্তা জীবায়া যখন আপনাকে, এই জগৎকে ও ঈশ্বরকে—এই ত্রিবিধকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারে, তখন পরমেশ্বরের অভিধ্যান যোজনা (সংযোগ) এবং তত্ত্বতাব (ব্রহ্মৈকত্বতাব) হইতে অন্তে নিঃশেষে বিশ্বমায়ী নিরস্তি ত্ব ও পরমেশ্বরকে জানিয়া সর্বপাপ হইতে মুক্তি হয়, সর্বক্লেশ কাণ হয়, ও অনন্যমৃত্যুর নিরূতি হয় ।

“তত্ত্বাভিধ্যানাদ্ যোজনাং তত্ত্বতাবাদ্

ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ।

জাত্বা দেবং সৰ্বপাশহানিঃ

ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ ॥

(খেতাখতর, ১।১১-১১) ।

এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যিনি পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি দেহভেদান্তে বিশেষার্থামুক্ত তৃতীয় পদ প্রাপ্ত হন এবং তদনন্তর ‘কেবল’ বা সৰ্বৈশ্বৰ্য্যামুক্ত নিক্রুপাধিস্বরূপ হইয়া আপ্তকাম বা পূর্ণানন্দময় হন ।

“তস্মাভিধানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে

বিশেষার্থাৎ কেবলমাপ্তকামঃ ॥”

(খেতাখতর, ১।১২) ।

এইরূপে পরমেশ্বর অনুধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে যে ফল হয়, তাহা অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, এবং সেই অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে যুক্তিভঙ্গে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই যুক্তির জঙ্কই ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ ভাব ; বিশেষতঃ পরমেশ্বরভাব জ্ঞেয় হইলেও পরম অক্ষররূপে তাঁহাকে অন্তরাত্মাতেই জানিতে হইবে। তিনিই পরমতত্ত্ব ।

“এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং

নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ॥” (১।১৩)

এই পরম অক্ষর ব্রহ্ম আত্মসংস্থ । ইহাকে জানিতে হইলে অন্তরেই ইহাকে অনুসন্ধান করিতে হয় । তিলে যেমন তৈল থাকে, দধিতে যেমন ঘৃত থাকে, স্রোতে যেমন ফল থাকে, কাষ্ঠে যেমন অগ্নি থাকে, এবং যেমন তিলকে শোধন দ্বারা তৈল নির্গত হয়, মছন দ্বারা দধি হইতে ঘৃত পাওয়া যায় ও অরনিকাষ্ঠ হইতে অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ তপস্বী ও ধ্যান দ্বারা আমাদের অন্তরাত্মাকে মছন করিলে ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যায় ।

“তিলেষু তৈলং দধিনীষু সপি-

রাপঃ স্রোতস্বরণীষু চাগ্নিঃ ।

এবমাত্মানি গৃহতেহসৌ

সত্যেইননং তপসা যোহনুপশ্রুতি ॥”

(খেতাখতর, ১।১৫) ।

ধ্যান দ্বারা এইরূপে আত্মাতে পরব্রহ্মদর্শন হয় । সে ধ্যানের প্রণালী এই—

“স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবক্ষোস্তরারণিম ।

ধ্যাননিশ্চখনাভ্যানাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥”

(খেতাখতর, ১।১৪) ।

অতএব মুক্তির জন্ম এই পরম ব্রহ্ম জ্ঞেয় । তাহা ব্যতীত অন্য বস্তু বা জ্ঞান কিছুই নাই । পরম ব্রহ্ম যখন ‘তৎ’পদনির্দেশে, অনির্বাচ্য-রূপে জ্ঞেয়, সেইরূপ জৈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ত্রিবিধভাবে সগুণরূপেও তিনি জ্ঞেয় । সগুণরূপে তাহাকে না জানিলে, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন হয় না এবং পরম ব্রহ্মতত্ত্বও জ্ঞেয় হয় না । একান্ত এই পরম ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের পক্ষে এই ত্রিবিধ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হইবে । এই কারণ এই অধ্যায়ে নিগূঢ় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইবার পর ১৯শ শ্লোক হইতে শেষ পর্গান্ত এই ত্রিবিধ ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং পরের দুই অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে । প্রথমে ১৯শ শ্লোকে ব্রহ্মের পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ বিবৃত হইয়াছে—এবং ঠাহাতেই পরম পুরুষ, অক্ষয়পুরুষ ও ক্ষয় প্রকৃতি এই ত্রিবিধ সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বটী সূচিত হইয়াছে ।

প্রকৃতি ও পুরুষ—গীতায় এ স্থলে যে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহার মূল যে শ্রুতি, তাহা আমরা পূর্বে ১৯শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি । উপনিষদে যে পুরুষ অব্যক্ত ও বুদ্ধি পত্নতির সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি মূল তত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায়, তাহা আমরা সে স্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । কঠ উপনিষদের এই অব্যক্তহ সাংখ্যদর্শনের মূল প্রকৃতি, তাহা সাংখ্যদর্শন হইতেই জানা যায় । একান্ত

আমরা বলিয়াছি যে, সীতার যে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহার মূল স্মৃতি, সাংখ্যদর্শন নহে। শ্রুতি হইতে এই 'প্রকৃতি-পুরুষবাদ' সম্বন্ধে আরও অনেক কথা পাওয়া যায়। এ হলে আমরা তাহার উল্লেখ করিব। তাহা হইলে এই প্রকৃতি-পুরুষবাদ কোন শ্রুতিমূলক, তাহা আমরা আরও বিশদভাবে বুঝিতে পারিব।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে যে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে—

“আনীদবাতম্ স্বধরা তদেকম্
তস্মাদ্ভিন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥” ২

অর্থাৎ “তখন সেই এক স্বধার সহিত অবিভাগাপন্ন বায়ুহীন অখচ প্রাণ বা চৈতন্যযুক্ত ছিলেন। এই অবিভাগাপন্ন ‘এক’ ও ‘স্বধা’র যে সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান ছিল উক্ত হইয়াছে, ইহারাই এক অর্থে পুরুষ ও মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—

“আঐশ্বব ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সোহমুবীক্ষ্য নাঐদাশ্বনো-
মুপশ্রৎ।” (১।৪।১)

ইহা হইতে আমরা ‘আশ্বাই যে পুরুষ’ তাহা জানিতে পারি। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে যে এই পুরুষতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। এই ব্রহ্ম বা পুরুষ যে আপনাকে পুং-স্ত্রীরূপে বিধা বিভক্ত করেন, তাহাও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে আমরা জানিতে পারি। ঐ উপনিষদে আছে যে,—

“স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকৌ ন ব্রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ স
হৈ তাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ স ইমমেবাশ্বানং যথা
পাতয়ৎ।” (১।৩।৩)

ইহার অর্থ—“তিনি আপনাকে একাকী বিবেচনা করিয়া ইষ্টার্ধ সংযোগজনিত স্ত্রীড়ার সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি আপনার দ্বিতীয়

অভিলাষ করিলেন । তিনি এতাবৎকাল মিলিত স্ত্রীপুরুষরূপে ভাবময় শরীরে অবস্থান করিতেছিলেন । অতএব আপনাকে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার উক্ত ভাবময় শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার একভাগে পুরুষাকার এবং অপর ভাগে স্ত্রীর আকার প্রদান করিলেন । এইরূপে ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রকাশ ভেদে পতি ও পত্নীর আকার ধারণ করিলেন ।”

ইহা হইতে জানা যায় যে, একই আত্মা বা পুরুষ সৃষ্টির প্রারম্ভে আপনাকে পুং-স্ত্রীরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন । ইহাই প্রকৃতি-পুরুষ-বাদের মূল ।

এই প্রকৃতি-পুরুষ-বে অমাদি এবং প্রকৃতি যে ত্রিগুণায়িক, তাহারও মূলতত্ত্ব আমরা উপনিষদ্ হইতে জানিতে পারি । যেতাস্থিতর উপনিষদে আছে :-

“অজ্ঞামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্ ।
অজ্ঞা হ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে
জহাতোনাং ভুক্তভোগামজ্ঞোহনুঃ ॥” ৪।৫ ।

অর্থাৎ লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা (অর্থাৎ অগ্নি, জল ও অন্নবিশিষ্টা, বা সস্ব রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়যুক্তা), বহু প্রকার উৎপাদিকা, সমানাকারী এক অজ্ঞাকে (অর্থাৎ প্রকৃতিকে) এক অজ্ঞ (অর্থাৎ আত্মা) সেবকভাবে ভজনা করে ; অন্ত্র অজ্ঞ ভুক্তভোগী ইহাকে পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ প্রকৃতিকৃত ভোগ পরিসমাপ্ত হইলেই পরমার্থ-জ্ঞান লাভ করিয়া বিষয়া-সক্তি ত্যাগ করে) ।

এই অজ্ঞাই জন্মরহিত বা অনাদি প্রকৃতি আর অজ্ঞই অনাদি পুরুষ । ইহা হইতে আপাততঃ সাংখ্যদর্শনের বহু বক্ত ও মুক্ত পুরুষবাদ এবং তাহা হইতে বতন্ত্র এক প্রকৃতিবাদ সিদ্ধ হয় বটে ; কিন্তু উক্ত বৃহদারণ্যক স্মৃতির

সহিত এই শ্রুতির সমন্বয় করিলে, আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, পুরুষ একটী এবং তিনি রমণার্থ আপনাকে দ্বিধা করিয়া পুরুষ-প্রকৃতি-রূপ হন এবং প্রকৃতি উপভোগ করিবার জন্য বহুরূপ হন । প্রকৃতি স্বাধীনা নহে ।

এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, এই অজ্ঞা প্রকৃতি লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-রূপা, ইহাই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ । ত্রিগুণ এই ত্রিবর্ণাঙ্কিকা, সত্ত্ব যাহা নির্যাল প্রকাশ-স্বরূপ ও সূক্ষ্মরূপ, তাহা শুক্ল ; যাহা রজঃ বা রঞ্জন করে, তাহা লোহিত আর তমঃ বা যাহা মোহকর ও আবরণকারী, তাহা কৃষ্ণ । ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—

“ষদগ্নে লোহিতং রূপম তেজসস্তরুপং যচ্চুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নশ্চ অপাগামগ্নেরগ্নিকং বাচারন্তুণং বিকারো নামশেষং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ।” (৬।৪।১) ।

শঙ্করাচার্যের ভাষ্য হইতে ঠিকার এইরূপ সংক্ষেপ ভাবার্থ পাওয়া যায়,—অগ্নি, জল ও অন্ন (বা পৃথিবী) এই তিন দেবতার মিশ্রণে বা ত্রিব্রহ্মকরণে যে সমুদায় ব্যক্ত পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে মূল অগ্নির লোহিতত্ব, জলের শুক্লত্ব এবং অন্নের বা পৃথিবীর কৃষ্ণত্ব নিহিত আছে । যেমন এই পরিদৃশ্যমান অগ্নির লোহিতত্ব তাহার মূলভেজোরূপ শুক্লত্ব, তাহার মূল অপূরণ এবং কৃষ্ণত্ব, তাহার মূল অন্নরূপ ইহা জানা যায়, এইরূপে জানা যায় যে, সকল পদার্থ ই ত্রিবর্ণাঙ্কিকা, বা তেজ, অপ ও অন্নাত্মক তাহারাই সকল বাস্তব পদার্থের মূলরূপ । তাহাই এই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাঙ্কিকা প্রকৃতি ।

অতএব সকল পদার্থ ই লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণবর্ণাঙ্কিকা বা ত্রিগুণাঙ্কিকা পূর্বে খেতাম্বতর শ্রুতিতেই উক্ত মন্ত্রে এই লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণাঙ্কিকা ‘অজ্ঞা’র উল্লেখ আছে, তাহাই অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি । ইহা ব্যতীত খেতাম্বতর উপনিষদে পুরুষ ও তাহার পরাশক্তি প্রকৃতিও উল্লিখিত

হইয়াছে । ষোড়শতর উপনিষদ্বুক্ত প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব আমরা পূর্বে বিবৃত করিয়াছি । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই ।

এইরূপে আমরা শ্রীতি হইতে এই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের মূল সূত্র পাই । শ্রুতি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, একই ব্রহ্ম বা পরমাশ্রা এই সৃষ্টি সম্বন্ধে পুরুষ-প্রকৃতিরূপে দ্বিধা বিভক্ত হন । উভয়ই অনাদি । পুরুষ এক হইয়াও ভৌক্তরূপে এই প্রকৃতিতে ভোগার্থ বহুরূপ হন । আর এই প্রকৃতি সেই পুরুষের ভোগ্য হয় । প্রকৃতি লোহিত, শুক্র, কৃষ্ণ এই ত্রিবিধাঙ্গিক । এই ত্রিবিধাঙ্গিকা প্রকৃতিতেই বহু হইয়া পুরুষ ভোক্তা হয় এবং সেই ব্রহ্মন ছেদন করিতে পারিলে সে মুক্ত হয় । আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, গীতায় এই শ্রীতি অর্থে পুরুষ-প্রকৃতি-বাদ বিবৃত হইয়াছে । যাহা হউক, এই প্রকৃতি-পুরুষবাদ সাংখ্যদর্শনেরই বিশেষত্ব । সাংখ্যদর্শনেই ইহা বিশেষভাবে গৃহীত । এক্ষণে গীতোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-বাদ বুঝিতে হইলে, সাংখ্যদর্শনেরও প্রকৃতি-পুরুষবাদ বুঝিতে হয় । এইহেতু আমরা এ স্থলে এই সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতিপুরুষবাদ অতি সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

সাংখ্যদর্শনের কোন মূল গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না । অনেকের মতে 'সাংখ্য তত্ত্বসমাস'ই সাংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থ । কিন্তু সে গ্রন্থ অতি সংক্ষিপ্ত । তাহাতে প্রকৃতি-পুরুষবাদের কোন তত্ত্বই পাওয়া যায় না । যে সাংখ্যসূত্র এক্ষণে প্রচলিত আছে, তাহা অনেকের মতে বিজ্ঞান ভিক্ষুর রচিত । রচিত না হইলেও পূর্বমুগ্ধ সাংখ্যসূত্র যে বিজ্ঞান ভিক্ষু উদ্ধার করিয়া ছিলেন, তাহা তিনি তাহার ভাষ্যের প্রথমে স্বীকার করিয়াছেন । এক্ষণে অনেকের মতে সাংখ্যকারিকাই সাংখ্য-শাস্ত্রের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ । তাহাও বিশেষ প্রাচীন নহে । যাহা হউক, সাংখ্যকারিকা হইতে প্রধানতঃ আমরা এ স্থলে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিপুরুষবাদ বুঝিতে চেষ্টা করিব । সাংখ্যদর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সম্বন্ধে কারিকার উক্ত হইয়াছে যে,—

“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহাদাত্মাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত ।

ষোড়শকল্পং বিকারী ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥” ৩০ ॥

অর্থাৎ মূল প্রকৃতি অবিকৃতি ; মহান্ (বুদ্ধিতত্ত্ব), অহঙ্কার ও রূপ-রসাদি পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি ; এবং মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই ষোলটি বিকৃতি । পুরুষ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে । এই পঁচিশটি মূল তত্ত্ব । সাংখ্যমতে পুরুষ ও মূল প্রকৃতি এই উভয়েই অনাদি আর সমুদয়ই অনিত্য । সাংখ্যান্ত্রে আছে,—“প্রকৃতিপুরুষয়োঃ অন্তঃ সর্বমনিত্যম্ ।” মূল প্রকৃতি হইতে যে সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি ও ষোলটি বিকৃতি অভিব্যক্ত হয়, তাহারা অনিত্য । কারণ, তাহারা মূল প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই লয় হয় ।

সাংখ্যমতে মূল প্রকৃতি অব্যক্ত বা প্রধান, তাহা হইতে অভিব্যক্ত লিঙ্গশরীর তদ্বিপরীত । সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি, মন ও দশ ইন্দ্রিয় এই আঠারটি তত্ত্বের দ্বারা এই লিঙ্গ বা লিঙ্গশরীর গঠিত হয় । আর পুরুষ অব্যক্ত এবং অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্ত প্রকৃতি-বিকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীতধর্মী ।

মূল প্রকৃতি যে এহ লিঙ্গের বিপরীতধর্মী এবং পুরুষ যে উভয়ের বিপরীতধর্মী, সে সম্বন্ধে কারিকার উক্ত হইয়াছে :—

“ত্রিগুণমবিবেকী বিষয়ঃ সামান্যচেতনং প্রসবধর্মী । ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্ ॥” ১১ ।

যে কারণে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়, তাহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে ।

সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদি বিপর্যায়াদধিষ্ঠানাৎ ।

পুরুষোহস্তি ভোক্তৃ ভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ১৭

এইরূপে সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিপুরুষ বাদ স্থাপিত হইয়াছে । এই পুরুষ ও প্রকৃতি মূলতত্ত্ব । বহু পুরুষ বাদ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকার আছে ।

অননমরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ ।

পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যাবিপৰ্য্যয়াচ্চৈব ॥ ১৮

অর্থাৎ জন্ম, মরণ, করণ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম হেতু, অযুগপৎ প্রবৃত্তিহেতু, আর ত্রৈগুণ্যের বিপর্য্যয় হেতু, পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ ।

পুরুষ যে অকর্তা এবং কেবল দ্রষ্টা ও সাক্ষিমাত্র, সে সম্বন্ধে কারিকায় উক্ত হইয়াছে ।

তস্মাচ্চ বিপর্য্যয়াৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমশ্চ পুরুষশ্চ ।

কৈবল্যং মাধ্যম্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃত্বাশ্চ ॥ ১৯

অর্থাৎ “সেই বিপর্য্যয় হইতেই পুরুষের সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যম, দ্রষ্টৃত্ব ও অকর্তৃত্ব সিদ্ধন”

পুরুষ যে অকর্তা হইয়াও কর্তার গ্ৰাম বোধ হয়, তাহার হেতু এই যে—

তস্মাত্ত্বং সংযোগাদচেতনং চেতনবদিব লিঙ্গবৎ ।

শূণকর্তৃত্বে চ তথা কর্তেব তবতীত্যান্দাসীনঃ ॥ ২০

“পুরুষের সংযোগ হেতু অচেতন লিঙ্গ চেতন বিশিষ্টের গ্ৰাম, আর গুণেরই কর্তৃত্ব আছে বলিয়া উদাসীনকে কর্তার গ্ৰাম বোধ হয় ।”

পুরুষ যে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভোক্তা হয় বা প্রকৃতিস্থ গুণ ভোগ করে ও সেই হেতু দুঃখ পায় এবং সংসারবদ্ধ হয়, সে সম্বন্ধে কারিকায় উক্ত হইয়াছে ।

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ ।

লিঙ্গাখ্যা বিনিবৃত্তেশ্চাস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন ॥ ৫৫

অর্থাৎ “চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষ তাহাতে (লিঙ্গ শরীরে) জরা-মরণ-অনিত দুঃখ ভোগ করেন; লিঙ্গ শরীরের যে পর্য্যন্ত নিবৃত্তি না হয়, সেট হেতু দুঃখ, স্বাভাবিক ।”

আরও উক্ত হইয়াছে যে,

তস্মান্ন বধ্যতে নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ ।

সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ ॥ ৬২

অর্থাৎ “সেইহেতু পুরুষ বদ্ধ হয়েন না, মুক্তও হয়েন না, এবং সংসরণ করেন না ; নানা আশ্রয়ভূত প্রকৃতিই সংসরণ করেন, বদ্ধ হয়েন ও মুক্ত-হয়েন ।”

সাংখ্যকারিকা হইতে এইরূপে পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্ব জানা যায় । আমরা পূর্বে সাংখ্যতত্ত্বসমাসের উল্লেখ রাখিয়াছি । তাহার বে এক ভাষ্য প্রচলিত আছে, তাহাতে এই পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে উক্ত হইলেও এস্থলে পুনরুক্ত হইল ।

অষ্ট প্রকৃতি ।—অব্যক্ত বা (মূল প্রকৃতি), বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র । এই আট প্রকৃতি ।

অব্যক্ত ।—লোকে যেমন ঘট, পট, কূট ও শয্যা প্রত্যক্ষ করে, মূল প্রকৃতিকে সেরূপে জানা যায় না—এইজন্য ইহাকে অব্যক্ত বলে । অর্থাৎ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহা গ্রাহ্য নহে । ইহার অবয়ব নাই ; কারণ ঠেচার আদি, মধ্য, অন্ত নাই । ইহাই অশক, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয় ; অখচ নিত্য রস-গন্ধাদি-বর্জিত । সুধীগণ বলেন, ইহার আদি নাই, মধ্য নাই, ইহা মহৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং ধ্রুব । ইহা সূক্ষ্ম, অলিঙ্গ, ইহার আদি নাই, বিনাশ নাই । ইহা প্রসবধর্মী, নিরবয়ব, এক এবং সাধারণ (বা সকলের মূল) ইহাই অব্যক্ত ।

অব্যক্তের পর্যায় শব্দ এই :—অব্যক্ত, প্রধান, ব্রহ্ম, পুর, ধ্রুব, প্রধানক, অক্ষর, ক্ষেত্র, তমঃ প্রসূত ।”

পুরুষ ।—পুরুষ অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্বগত, চেতন, অখণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্তা, ক্ষেত্রবিদ, অমল ও অপ্রসব-ধর্মী ।

পুরাণ বলিয়া, পুরিতে শয়ন করে বলিয়া, অথবা পুরোহিত বা সর্বাগ্রবর্তী, এজন্য ইহাকে পুরুষ বলে । ইহার আদি, অন্ত বা মধ্য নাই

বলিয়া ইহা অনাদি, নিরবয়ব বা অতীন্দ্রিয় বলিয়া ইহা সূক্ষ্ম । সৰ্ব্বহানে বিরাজমান এবং গগনবৎ অনন্ত ব্যাপ্ত বলিয়া ‘সৰ্ব্বগত’ ।

সুখ, দুঃখ ও মোহ উপলব্ধি করে বলিয়া ‘চেতন’ ।

ঠহাতে সৎ, রজঃ বা তমঃ গুণ নাই বলিয়া ইহা নিগুণ ।

ইহা সৃষ্ট বা উৎপাদ্য নহে বলিয়া নিত্য । প্রকৃতির বিকার উপলব্ধি করে বলিয়া ইহা ‘দ্রষ্টা’ ।

চেতন অন্ত সুখ, দুঃখ পরিজ্ঞাত হয় বলিয়া ইহা ‘ভোক্তা’ ।

উদাসীন ও অগুণ বলিয়া ইহা ‘অকর্তা’ ।

ক্ষেত্র বা গুণদিগকে বুঝিতে পারে বলিয়া ইহা ‘ক্ষেত্রবিদ’ ।

ঠহাতে শুভাশুভ কর্ম্ম নাই বলিয়া ইহা ‘অমল’ ।

নির্বীজ বলিয়া ইহা ‘অপ্রসবধর্ম্মা’ অর্থাৎ ইহা কিছুই উৎপন্ন করে না ।

এই সাংখ্য পুরুষের ব্যাখ্যা হইল ।

এই পুরুষের নামান্তর যথা :—পুরুষ, আত্মা, পুমান্, পুংগুণজহজীব, ক্ষেত্রজ, নর, কবি, ব্রহ্মা, অক্ষর, প্রাণ, যে, কে, সেই, এই ।”

এইরূপে সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবান আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম । প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, তৎ সমাস ব্যাখ্যা হইতে পুরুষ এক কি বহু তাহা জানা যায় না । কারিকায় ও সাংখ্য-সূত্রে প্রকৃতিবহু পুরুষ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে পুরুষ বহু । কিন্তু প্রকৃতিমুক্ত পুরুষ এক কি বহু এবং পুরুষ স্বরূপতঃ এক কি বহু তাহা উক্ত হয় নাই । একান্ত এ সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তে পুরুষবাদের বৈষম্য দৃষ্ট হয় না । আমরা আরও বলিতে পারি যে, তৎ সমাসে আট প্রকৃতির কথা উক্ত হইয়াছে ; ইহাই এক অর্থে গীতার অষ্টধা অপরা প্রকৃতি । এই আট প্রকৃতির মধ্যে ‘অব্যক্ত’ স্বতন্ত্র ভাবে উক্ত হইয়াছে । কারিকায় তাহাকে মূল প্রকৃতি বা প্রধান বলা হইয়াছে । এ স্থলে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবান সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই ।

একপে আমরা গীতার এ অধ্যায়ে উক্ত এই পুরুষ-প্রকৃতি-বাদ সংক্ষেপে বুঝিব ।

পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান ।—গীতার ১৩শ অধ্যায়ে ১৯শ ও ২০শ শ্লোকে প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক-জ্ঞান যথা সংক্ষেপে সূচিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে । এই প্রকৃতিপুরুষ বিবেক জ্ঞানই সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে প্রকৃত জ্ঞান, কেন না ইহা হইতে মোক্ষ বা অপবর্গ সিদ্ধ হয় । আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, প্রকৃতিপুরুষ বিবেকজ্ঞানই এক অর্থে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান । পৃথকভাবে দেখিলে, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান হইতেই প্রকৃতিপুরুষ বিবেকজ্ঞান হয় । ক্ষেত্রের মূল কারণ প্রকৃতি) প্রকৃতি 'কারণরূপ ক্ষেত্র কার্যরূপ আর ক্ষেত্রজ্ঞ মূলতঃ পুরুষ) পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বা সম্বন্ধ হইলে প্রকৃতি পরিণত হইয়া ক্ষেত্র ও জ্ঞের জগৎরূপে কার্যভাবে ব্যাপ্ত হন, আর পুরুষ তাহার জ্ঞাতা হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হন । ক্ষেত্র যখন তাহার জ্ঞের হয়—তখন এই ক্ষেত্রের জ্ঞাতরূপে পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ হন । ব্যষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা বা ক্ষেত্রজ্ঞ জীব, আর সমষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা—ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর । ব্যষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ—সেই ক্ষেত্রে বদ্ধ হইয়া, সেই ক্ষেত্রে আত্মজ্ঞান হেতু বদ্ধ পুরুষ বা ক্ষর পুরুষ হন । সমষ্টিক্ষেত্রের জ্ঞাতা—ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর । কোন ক্ষেত্রে বদ্ধ নহেন, সর্বক্ষেত্র সম্বন্ধে তাহার 'আমার' ভাব নাই । তিনি নির্লিপ্ত—অসঙ্গ,—নিষ্ক্রিয় অথচ তিনি সর্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও নিয়ন্তা । এই সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞত্ব এই ঈশ্বরত্ব পূর্বে দ্বিতীয় বটকে বিবৃত হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি । পরে পঞ্চদশ অধ্যায়েও ইহা উল্লিখিত হইবে । ঈশ্বরত্ব গীতার বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছি । এই ঈশ্বরত্বই গীতার বিশেষভাবে বিবৃত । সাংখ্য-দর্শন অনুসারে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষই ক্ষেত্রজ্ঞ । ব্যষ্টি ক্ষেত্র সম্বন্ধে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ । মুক্ত পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ নহে, শুদ্ধমুক্ত কুটম্ব তিনিই অক্ষর স্বরূপ ।

সাংখ্যদর্শনে সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর বা উত্তম পুরুষ স্বীকৃত হন নাই। বাহ্য হটক এই ক্ষেত্রজ্ঞের বে স্বরূপ 'পুরুষ' ও ক্ষেত্রের বে কারণরূপ প্রকৃতি, সেই পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব গীতায় ১৯শ শ্লোক হইতে বিবৃত হইয়াছে। গীতায় এই পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব—সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব হইতে যে ভিন্ন, তাহা আমরা বখাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। গীতাক্ত পুরুষতত্ত্ব পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে ; প্রকৃতির স্বরূপ কি, তাহা সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতিপুরুষ-বৈবেকজ্ঞান এই অধ্যায়ে ১৯শ ও ২০শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রকৃতি-তত্ত্ব ।—এই ১৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই আবদ্ধ। কেন না ইহা সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রহ্মেরই চাই অতি-ব্যক্ত রূপ। মায়াকৃতি হেতু পরমব্রহ্মই পরম জ্ঞাতা পুরুষরূপে ও পরম জ্ঞেয় অবাক্ত বা মূল প্রকৃতিরূপে প্রথম অভিব্যক্ত হন। মূল প্রকৃতির পরিণাম হইতে যে পরা ও অপরা প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয়, তগবান্ তাগাতে অধিষ্ঠানপূর্বক তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অগতের বিকাশ করেন, এবং সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীররূপ প্রকৃতিকে যোনি কল্পনা করিয়া তাহাতে স্বীয় বীজ-নিষেক দ্বারা সর্বভূতের অভিব্যক্তি করেন। এইজন্য ব্রহ্মের এই প্রকৃতি-পুরুষরূপ অনাদি। ইহার মধ্যে পরম পুরুষের ঈক্ষণ বা কল্পনা হেতু প্রকৃতির পরিণাম হয়, ইহা হইতে বিকার (ত্রয়োবিংশতি সাংখ্যোক্ত ৩৯) এবং গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের) উৎপত্তি হয়। এই প্রকৃতিই কার্যাকারণ-কর্তৃষের হেতু। প্রকৃতির কর্তৃত্বেই সর্ব-কার্যাকারণপ্রবাহ চলিতে থাকে। প্রকৃতির কর্তৃত্বেই কার্যাকারণ-সংঘাত শরীরের বা ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয়। এইরূপে সংক্ষেপে এ স্থলে প্রকৃতিতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির বাহ্য বিকার—প্রকৃতি হইতে যেভাবে শরীর বা ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, তাহা

গীতার কোথাও বিশেষভাবে উক্ত হয় নাই । পূর্বে ক্ষেত্র সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত এ সম্বন্ধে গীতার কোথাও ইহার উল্লেখ নাই । আমরা বলিতে পারি যে তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন জন্ম তাগ জানিবারও তত আবশ্যক নাই । গীতার পরে প্রকৃতিজ ত্রিগুণতত্ত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে । কেন না, মুমূর্ষুর পক্ষে এ তত্ত্বজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয় ; এই অধ্যায়ে প্রকৃতি সম্বন্ধে আর কোন তত্ত্ব উক্ত হয় নাই । তবে পরে ২৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতি দ্বারাই সর্বকর্ম সর্বরূপে কৃত হয় ।

পুরুষ-তত্ত্ব ।—এ অধ্যায়ের ২১শ শ্লোক হইতে অবশিষ্ট অংশে ক্ষেত্রজ বা পুরুষতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । পুরুষ অনাদি, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । পুরুষ সুখ-দুঃখ-ভোক্তৃত্বের হেতু তাহাও ২০শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । এই সুখ দুঃখ ক্ষেত্রের ধর্ম । পুরুষ-সান্নিধ্যে ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রের প্রধান উপকরণ অন্তঃকরণ চেতনবৎ হয়, এবং তাহাতে এই সুখ দুঃখ ভাব হয় । সুখ সাত্ত্বিকভাব আর দুঃখ রাজসভাব । অন্তঃকরণ সাত্ত্বিক হইলে, তাহাতে সুখভাব হয় ; অন্তঃকরণ রাজসিক হইলে তাহাতে দুঃখভাব হয় । আমরা বলিয়াছি যে অনাদি-স্বরূপ পুরুষের বা পরমাত্মার সান্নিধ্যে তাহার পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া অন্তঃকরণ ত্রিগুণজভাব হেতু সুখদুঃখ মোহভাব-বুক্ত হয় । বিষয় গ্রহণ কালেই এই সুখ দুঃখ বা মোহ তাহার বিকাশ হয় । অন্তঃকরণে সম্বন্ধের প্রাধান্য হইলে, তাহাতে সুখভাবের বিকাশ হয়, রজোগুণের প্রাধান্য হইলে, তাহাতে দুঃখভাবের বিকাশ হয় এবং তমোগুণের প্রাধান্য হইলে মোহভাববুক্ত হয় । অন্তঃকরণ যে ভাববুক্ত হয়, ক্ষেত্রবদ্ধ ক্ষেত্রজ পুরুষ তাহা গ্রহণ করিয়া সেই ভাবের ভোক্তা হন—আপনাতে সেই ভাবের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া আপনাকে সুখী বা দুঃখী জ্ঞান করেন ।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—পুরুষ যে এইরূপ সুখ দুঃখের ভোক্তা হয়, তাহার কারণ পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করেন । বিভিন্ন গুণের যে বিভিন্ন ভাব পুরুষ এইরূপে তাহা ভোগ করেন । যখন সাত্বিক-ভাবে বিবৃদ্ধিতে চিত্ত সুখভাবযুক্ত হয়, তখন পুরুষ সেই সুখভোগ করেন । চিত্ত রাজস ভাব যুক্ত হইলে,—পুরুষ সেই দুঃখ ভোগ করেন । এইরূপে প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়া পুরুষ আপনার আনন্দ স্বরূপ ভূমিমা সুখ-দুঃখরূপ প্রকৃতিজ গুণের বিভিন্ন ভাব উপভোগ করেন । ক্ষেত্রজ পুরুষ এইরূপ প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া ক্ষেত্রস্থ সুখ দুঃখ রাগ ঘেষাদি উপভোগ করিয়া সেই সুখে অনুরক্ত হন এবং দুঃখে ঘেষযুক্ত হন । ইহাতেই এই সুখ দুঃখের যে মূল—এই ত্রিগুণ, তাহাতে আসক্তি হয় এবং এই গুণে আসক্তি হেতু, তাহাকে জন্ম মৃত্যু প্রবাহের মধ্য দিয়া সংসার ভোগ করিতে হয়, সদসৎ ধোনিতে বারবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ।

কিন্তু এই আসক্তি ও আসক্তিজ ভোগ ভ্রম মাত্র । ইহা ক্ষেত্রে বা দেহে আত্মাধ্যাস হেতু জাত । দেহে 'আমি বা আমার' এইরূপ অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা যুক্ত হইয়া, পুরুষ এই ক্ষেত্র বা দেহ-ধর্ম সুখ দুঃখাদি আপনাতে আরোপিত করে । বাস্তবিক এই পুরুষ দেহ-ব্যতিরিক্ত,—দেহ হইতে পর বা উৎকৃষ্ট এবং দেহাতীত । বস্তুতঃ পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর, উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা বা অনুগ্রাহক, ভর্তা, ভোক্তা । পুরুষ স্বরূপতঃ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ও প্রকৃতির নিয়ন্তা । তিনি প্রকৃতিতে স্থিত হইলেও পরমাত্মার স্বরূপ । তিনি প্রকৃতির নিয়ন্তরূপে মহেশ্বর । তিনি প্রকৃতির উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা ভর্তা ও ভোক্তা । ইহাই পুরুষের পরমরূপ পরম অক্ষর রূপ । এই পরম রূপ বুদ্ধিতে হইলে, পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত তৎ বুদ্ধিতে হইবে । পুরুষের পরমাত্মা মহেশ্বর স্বরূপ দর্শনের উপায় প্রকৃতি ও পুরুষকে এই ভাবে বুদ্ধিতে হইবে—এইভাবে জানিতে হইবে । তাহা হইলে আর পুনরাবর্তন হয় না । প্রকৃতি-বিবিক্ত পুরুষের স্বরূপ জানিতে হইলে,

তাহার পরমাশ্রয় স্বরূপ দর্শন করিতে হইবে এই পুরুষের স্বরূপ পরমাশ্রয় দর্শনের উপায় বা সাধন তিনরূপ । ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ । ধ্যানযোগে চিত্তের দ্বারা চিত্তে আত্মদর্শন করিতে হয় । তাহাতে পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি হয় । ধ্যানযোগ সাধনা যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া ধ্যান সিদ্ধ হইলে, চিত্তের অপ্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে— এই আত্মদর্শন সিদ্ধ হয় । সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ সাধনা যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বারাও এই আত্মদর্শন সিদ্ধ হয় । সাংখ্যযোগ যেরূপে আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । গীতারও পূর্বে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । কর্মযোগে যেরূপে আত্মদর্শন বা পুরুষের স্বরূপ দর্শন সিদ্ধ হয়, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন ।

এইরূপে দ্বন্দ্ব উপায়ে আত্মদর্শন সিদ্ধ হইলে, পুরুষের স্বরূপ দর্শন হয়, পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক জ্ঞান লাভ হয়, তৎসংজ্ঞার্থ দর্শন সিদ্ধ হয় । আত্মদর্শন না হইলেও যাহারা আত্মার স্বরূপতত্ত্ব কেবল শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া পরমাশ্রয় উপাসনা করেন, তাঁহাদের উক্তরূপ উপায়ে আত্মদর্শন সিদ্ধ না হইলেও, তাঁহারাও ক্রমে মুক্ত হইতে পারেন । ভগবান্ ইহা ২৫শ শ্লোকে বলিয়াছেন ।

ত্রিবিধ পুরুষ— ইরূপে এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে । পুরুষ ক্ষেত্রবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির গুণসমূহ হেতু প্রকৃতিজ গুণের ভোক্তা হইয়া সদসদ্বোধনি ভ্রমণ করিলেও স্বরূপতঃ এই পুরুষ ক্ষেত্রের বা প্রকৃতির অতিরিক্ত তত্ত্ব প্রকৃতিজ দেহ হইতে ভিন্ন । পুরুষ স্বরূপতঃ উপদ্রষ্টা, অনুমস্তা, ভূক্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর পরমাশ্রয় । স্ততরাং স্বরূপতঃ এই পুরুষ পরমপুরুষ । পুরুষ পরিচ্ছিন্নভাবে দেহবদ্ধ হইয়া সেই পরম পুরুষের অংশভূত হয় । আর কর্ম পুরুষরূপ হয় । আর দেহে কুটস্থ ভাবে থাকিয়া তিনি অক্ষর পুরুষ হন—“ইহা পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে

বিবৃত হইয়াছে । এষ্ট ত্রিবিধ পুরুষ-তত্ত্ব পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে যথা স্থানে বিবৃত হইবে ।

এষ্ট প্রকৃতি-সংযোগ হেতু পুরুষ এক অবিভক্ত হইলেও বহু বিভক্ত ভাবে প্রকৃতিতে বদ্ধ হন । প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া পুরুষ ক্ষেত্রজ হন এবং প্রকৃতি তাঁহার ক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়, তাহা বলিয়াছি । এইরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ ভাবে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হয় । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগ হইতে সমুদায় স্বাবর-অঙ্গমাত্মক সত্তার উৎপত্তি হয় । এই তত্ত্ব সংক্ষেপে ২৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । ইহার বিবরণ—এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ সংযোগ হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি-তত্ত্ব পরে চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথমে (৩য়, ৪র্থ) শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । সেই স্থলের ব্যাখ্যান এ তত্ত্ব বুঝিতে হইবে ।

পুরুষ এইরূপে ক্ষেত্রজ হইয়া, ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত হইয়া, সমুদায় স্বাবর-অঙ্গমাত্মক সর্বসত্তার উৎপাদন করেন সত্য, কিন্তু পুরুষ এক অবিভক্ত, উত্তম পুরুষ রূপে সর্বক্ষেত্রে সমষ্টিভাবে ক্ষেত্রজ পরমেশ্বর হইয়া সর্বভূত বা সর্বসত্তা মধ্যে সমভাবে অবস্থান করেন । এই সর্বভূতভাব বিনাশী, এই ভূতভাবে সাতোক ভূতজ ক্ষেত্রজ পুরুষভাবও বিনাশী বা ক্ষর । কিন্তু উত্তম পুরুষ-ভাবে পরমেশ্বর যে সর্বভূতে অধিষ্ঠান করেন, সেই উত্তম পুরুষ ভাব অবিনাশী । তিনি পরমাত্মা । এ তত্ত্ব ২৭শ ও ২৮শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।

এই জীব ও ঈশ্বর ভাব বা ক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ ভাব, এই নিঃশিত ও নিরন্তর ভাব— এই প্রতিক্ষেত্রে বদ্ধ পরিচ্ছিন্ন অংশরূপ ক্ষেত্রজ ভাব ও সর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ পরিচ্ছিন্ন অংশ ঈশ্বর-ভাব— পুরুষের এই দুইভাব ব্যতীত, তাঁহার আরও এক ভাব আছে,— তাহা সর্বক্ষেত্র যুক্ত অক্ষর কূটস্থ ভাব । ইহা সর্বদ্রষ্টা সর্বতত্ত্বসাক্ষীর ভাব । গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষের এই কূটস্থ ভাবকে ‘অক্ষর’

পুরুষ বলা হইয়াছে । এ স্থলে তাহা ২৯শ শ্লোক হইতে ৩৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে । ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যখন পুরুষ, আপনাকে অকর্তৃরূপে দর্শন করিতে পারেন, এবং প্রকৃতি দ্বারা সর্ব কৰ্ম সর্বরূপে কৃত হইতেছে, ইহা দর্শন করিতে পারেন, তখন তিনি প্রকৃত দ্রষ্টা হন । যখন তিনি দেখিতে পান যে, এই যে অসংখ্য ভূত-পৃথকভূত জীব—এ সমুদায় সেই একের মধ্যে সেই এক পরমাশ্রয় অবস্থিত এবং এই দর্শন হেতু আপনাকেও সেই সর্বভূতস্থ এক পরমাশ্রয়রূপে আপনাকে দর্শন করেন—তখন তাহার সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ সর্বাধার অক্ষর ব্রহ্ম জীব লাভ হয়—তিনি অক্ষরকূটস্থ পুরুষ হন । তখন তিনি এই পরমাশ্রয় অবায় অনাদি নিগুণ হন এবং সর্বশরীরস্থ বা সর্বভূতস্থ হইয়াও কিছুই করেন না, —কিছুতে লিপ্ত হন না । যেমন আকাশ সর্বগত সর্বব্যাপ্ত হইয়াও সূক্ষ্ম হেতু কিছুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ এই পরমাশ্রয় সর্বত্র সর্ব দোহে অবস্থিত হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না, অথচ ইনি প্রকাশ-স্বভাব—নিজ প্রকাশ স্বভাবের দ্বারা সর্বক্ষেত্রে একমাত্র ক্ষেত্রী এই ক্ষেত্রজ হইয়া সমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন । সূর্য যেমন স্বীয় জ্যোতি দ্বারা আপনাকে ও সমুদায় লোককে প্রকাশ করে, সেইরূপ সেই এক সর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ স্বীয় জ্যোতি দ্বারা সমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন । পরমাশ্রয়রূপে ইনি সর্বক্ষেত্রের প্রকাশক, সর্বক্ষেত্রের দ্রষ্টা । প্রকৃতিজ বুদ্ধিতত্ত্ব ইহারই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, দ্রষ্টা সাক্ষী ও জ্ঞাতা হয় । পরমাশ্রয়রূপে ইনি সেই দ্রষ্টার দ্রষ্টা সেই জ্ঞাতার জ্ঞাতা । একত্র বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত দ্রষ্টার দ্বারা তিনি দৃষ্ট হন না—বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত জ্ঞাতাদ্বারা তিনি জ্ঞাত হন না,—বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত জ্ঞানের দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন না । বুদ্ধিতে জ্ঞাতৃ-ভাব, ভোক্তৃ-ভাব ও কর্তৃভাবের যে বিকাশ হয় (যাহাকে ইংরাজী দর্শনে phenomenal self or ego বলে) ইনি তাহার দ্রষ্টা (absolute self) । ইনি সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধিতে এইরূপ যে আশ্রয়ভাবের অধ্যাস হেতু দ্রষ্টা বা

জ্ঞাতা, কৰ্ত্তা ও ভোক্তার ভাব হয়, সে সমুদায় ভাবের তিনি দ্রষ্টা । এইরূপে তিনি সৰ্বক্ষেত্রজ্ঞ । আর তিনি সৰ্বক্ষেত্রে কেবল জ্ঞাতা বা উপদ্রষ্টা নহেন, তিনি অনুমন্তা ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বর । এইরূপে পুরুষ স্বরূপে তিনি সৰ্বক্ষেত্রের প্রভু, সৰ্বক্ষেত্রের দ্রষ্টা, অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা । আবার তিনিই প্রকৃতি বদ্ধ হইয়া প্রতিক্ষেত্রে ব্যষ্টিভাবে সেই ক্ষেত্রের গুণ বা ত্রিবিধ গুণময় ভাবের সহিত সঙ্গযুক্ত হইয়া তাহার দ্বারা বদ্ধ হন ও প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত জীবভাব গ্রহণ করেন । ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে আমাদের এই তিনরূপে—জীবরূপে । অক্ষর ও ঈশ্বররূপে তাঁহাকে জানিতে হয় । এই অধ্যায়ে ক্ষেত্রজ্ঞের এই তিনভাব সূচিত হইয়াছে । ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষের এই তিন ভিন্নভাব অনুসারে পুরুষ যে ত্রিবিধ হন বলিয়াছি, তাহা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞভাবে পুরুষকে আমাদের জানিতে হইবে এবং ক্ষেত্রভাবে প্রকৃতিকে জানিতে হইবে । এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান হইতে প্রকৃতি-পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান হয়, এবং ইহা হইতে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে যে পার্থক্য, যে ধর্ম, যে বিপরীতত্ব, তাহা জানা যায়—ভগবান্ বলিয়াছেন, যে, যিনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ ও তাহাদের পার্থক্য জানিতে পারেন, আর ভূত-প্রকৃতিমোক্ষতত্ত্ব জানিতে পারেন, তিনিই পরমপদ লাভের অধিকারী হন । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জ্ঞান হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ বদ্ধ পুরুষ সেই ক্ষেত্রের বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় বা ভূত-প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় জানিয়া সেই উপায় অবলম্বনে ভূত-প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন- এবং পরমপদ লাভ করিতে পারেন । ভূতভাব হইতে ও প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় এ অধ্যায়ে বিবৃত হয় নাই । ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বদ্ধ হইয়া ভূতভাব-যুক্ত হয়, তাহা এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধ হওয়ার যে ভূতভাব হয়, তাহা হইতে মুক্তির উপায় এখানে

উক্ত হয় নাই । প্রকৃতি যে ত্রিগুণের দ্বারা ক্ষেত্রজ পুরুষকে বদ্ধ করে, তাহাকে স্বীয়ভাবমুক্ত করে, সেই ত্রিগুণ দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইতে হয়, তাহার তত্ত্ব এবং সেই ত্রিগুণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিগুণাতীত ভাবে অবস্থান করিবার তত্ত্ব—এক কথায় ভূতপ্রকৃতিমোক্ষতত্ত্ব পরে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । যাহা হউক, এই ত্রয়োদশ অধ্যায়েই যে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান সূচিত হইয়াছে, তাহা আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিলাম ।

গীতার এই ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্বন্ধে আমাদের আর একটি কথা বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে । যাহা প্রকৃত 'গীতাজ্ঞান'—যাহা গীতোকৃত ধর্মের মূল সূত্র—তাহা এই অধ্যায় হইতেই আমরা জানিতে পারি । এই অধ্যায় হইতেই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহার উপদেশ পাই । ক্ষেত্রজ আমরা যে আমাদের ক্ষেত্র বা শরীর হইতে সম্পূর্ণ 'পৃথক্' তাহা জানিতে পারি । পুরুষ আমরা যে প্রকৃতি হইতে নির হইয়াও প্রকৃতিতে স্থিত হই এবং প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করিয়া তাহাতে বদ্ধ হই, কিন্তু আমাদের প্রকৃত স্বরূপ যে দেহাতীত ও দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ তাহাই যে পরমাত্মা মহেশ্বররূপে এই প্রকৃতির নিয়ন্তা, তাহা জানিতে পারি । শুধু তাহাই নয়, আমার গ্রাম ভূমি, তিনি, এই সর্বভূত, সর্বজীব, বা সর্বসত্তার প্রকৃত স্বরূপ যে একই, আমরা সকলেই যে পরমার্থতঃ ক্ষেত্রজ বা পুরুষ, তাহা জানিতে পারি । ইহা হইতে আমরা সর্বত্র 'সমদর্শনের' মূল সূত্র পাই ।

গীতার পূর্বে উক্ত হইয়াছে—

'বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ (৫।১৮)

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, যখন ধ্যানযোগে 'স্বাত্মদর্শন' হয়, তখন সর্বভূতমধ্যে সেই আত্মা বা ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, সর্বত্র সমদর্শী হওয়া যায় । ভগবান্ বলিয়াছেন—

‘সৰ্বভূতস্বমাখ্যানং সৰ্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সৰ্বত্র সমদর্শনঃ ॥ (৩।২৯)

এইরূপে সৰ্বত্র সমদর্শনের কথা — সৰ্বভূত মধ্যে আত্মদর্শনের কথা — পূর্বে উক্ত হইয়াছে । কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে . এই অধ্যায়ে সৰ্বত্র একত্ব দর্শনের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে । এ অধ্যায়ে পরমব্রহ্মের তত্ত্ব বুঝাইয়া সৰ্বভূতমধ্যে তাহার সমভাবে অবস্থান উপদিষ্ট হইয়াছে । ভগবান্ বলিয়াছেন যে, পরমব্রহ্ম ‘অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিবচ স্থিতম্’ । আর তিনি ‘জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সৰ্বত্র বিষ্টিতম্’ । ইহা ব্যতীত পরমেশ্বর যে সৰ্বক্ষেত্রক্ষেত্রকো ও সৰ্বভূতে সমভাবে স্থিত, তাহাও এ অধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পারি । ভগবান্ বলিয়াছেন,

‘ক্ষেত্রজ্ঞোপি মাং বিদ্ধি সৰ্বক্ষেত্রেষু ভারত ।’

তিনি বলিয়াছেন, —

সমং সৰ্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্বং স্বাবিনশ্বন্তং যঃ পশ্বতি স পশ্বতি ॥

সমং পশ্বন্তু হি সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাখ্যনাখ্যানং ততো বাতি পরাং গতিম্ ॥

(১৩শ অঃ ২৭।২৮)

এইরূপে গীতা হইতে এই অনন্ত বৈষম্যপূর্ণ জগতের মধ্যে কেবল ‘সম’ দর্শন করিবারই উপদেশ যে পাই তাহা নহে । এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় বহুত্বপূর্ণ অসংখ্য ভেদবিশিষ্ট চরাচর বিশ্বে অভেদ বা একত্ব দর্শন করিবারও উপদেশ এই অধ্যায় হইতে পাইয়া থাকি । ইহা এই গীতার সার উপদেশ । ইহাই বেদান্তের ‘সৰ্বংখলনং ব্রহ্ম’ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ‘সোহং’ বিশেষতঃ ‘তত্ত্বমসি’ এই মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ ।

যখন আমাদের জ্ঞান অজ্ঞান-যুক্ত হয়, যখন আমরা ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ আমাদের ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ জানিতে পারি, প্রকৃতযুক্ত পুরুষস্বরূপ

জানিতে পারি, যখন আমাদের মধ্যে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতে শিক্ষা করি এবং আমাদের সকলের মধ্যে সমবস্থিত পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই,—সর্বত্র পরমাত্ম দর্শন ব্রহ্ম-দর্শন ও ঈশ্বর-দর্শন সিদ্ধ হয়, তখন, বলিয়াছি ত সর্বভেদ মধ্যে অভেদ দর্শন হয়, সর্ব বহুত্ব মধ্যে একত্ব দর্শন হয়, সব বৈষম্য মধ্যে সাম্য দর্শন হয় । ইহাই নির্মল শুদ্ধ সাত্ত্বিক জ্ঞানের লক্ষণ । ভগবান্ পরে বলিয়াছেন—

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীকতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ১৮।২ঃ

এই জ্ঞান লাভ হইলে তুমি আমি ভেদ থাকে না । দেহ-ভেদ হেতু পুং-স্ত্রী ভেদ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল-ভেদ, মনুষ্য-পশু-পক্ষি প্রভৃতি ভেদ, স্বাবর-অসম-ভেদ প্রভৃতি অনন্ত ভেদমধ্যে সর্বত্র এক অভেদ আত্মাকেই দর্শন করা হয় সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে দর্শন করা হয় । তখন আমার মধ্যে তোমার মধ্যে সর্বভূত মধ্যে পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় ও পরম ক্ষেত্রজ পরমেশ্বরের দর্শন সিদ্ধ হয় । তখন তোমার মধ্যে, ত্রৈলোক্য চণ্ডালের মধ্যে, গো হস্তী, এমন কি, অতি ক্ষুদ্র কীটমধ্যে যে নারায়ণ অবস্থিত আছেন, সে জ্ঞান লাভ হয় । তখন পর বলিয়া আর কেহ থাকে না তখন পরমার্থসিদ্ধি হয় । স্বার্থ ও পরার্থ এক হইয়া যায় । ইহাই গীতাক্ত ধর্ম । ইহাই নিকামধর্মের মূলসূত্র । যখন পর আর পর থাকে না, আমিই তুমি এই জ্ঞান সিদ্ধ হয়, তখন পরের প্রতি রাগ, ঘেব, ক্রোধ কিছুই থাকিতে পারে না । তখন আমার স্বার্থ স্তুবিধা লাভালাভ বিচার থাকিতে পারে না । যাহার এই জ্ঞান হয়, তিনি নিকামভাবে সর্বভূতার্থকর্ম আচর করেন । তখন তিনি সুখ দুঃখ সর্বাবস্থায় আত্মোপমায় সর্বত্র সমদর্শন করিয়া পরমেশ্বরেই অবস্থান করেন । ভগবান্ বলিয়াছেন—

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকমাম্বিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥

আত্মোপায়োন সর্বত্র সমং পশুতি যোহজ্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥

৬অঃ ৩১।৩২।

এই জ্ঞান—এই দর্শনই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের শ্রেষ্ঠ, আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ, নীতির মূল ভিত্তি । আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিব না । প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক পল ডুসেন (Paul Deussen) এর কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

But the fact is nevertheless, that the highest and purest morality is the immediate consequence of the Vedanta. The gospels fix quite correctly, "love your neighbours as yourselves." But why should I do so, since by the order of nature I feel pain and pleasure only in myself, not in my neighbour? The answer is not in the Bible (this venerable book being not yet quite free from semitic realism), but it is in the veda, is in the grave formula "tatvamasī" (তত্বমসি), which gives in three words metaphysics and morals altogether. You shall love your neighbour as yourselves,—because you are your neighbour and mere illusion makes you believe, that your neighbour is something different from yourselves. Or in the words of the Bagabadgita : he, who knows himself, in everything and everything in himself, will not injure himself by himself, 'na hinasti atmana atmanam' (ন হিনস্ত্যাত্মনা আত্মানম্). This is the sum and tenor of all morality, and this is the stand-

point of a man knowing himself as Brahman. He sees himself as everything—so he will not injure anything for nobody injures himself. He lives in the world; surrounded by its illusions but not deceived by them like the man suffering from timira (তিমির) who sees two moons but knows that there is one only, so the Jivanmukta sees the manifold world and cannot get rid of seeing it, but he knows, that there is only one being, Brahman, the Atman, his own self, and he verifies it by his deeds of pure disinterested morality.

—————

